অন্দরে অন্তরে

উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা

সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী

স্ত্রী ॥ কলকাতা ৭০০ ০২৬

বাবা ও মাকে

সূচি

উপোদ্ঘাত

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় নারীচিন্তা বা নারীমুক্তি বিষয়টির প্রতি সাম্প্রতিক কালে সারস্বত সমাজের কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে। কয়েকটি পরিশ্রমসাধ্য গবেষণা ও সুখপাঠ্য বই ছাড়াও আরও বহু প্রবন্ধ ইতস্ততঃ লেখা হয়েছে ও হচ্ছে। বৃহত্তর অর্থে এই প্রয়াস গত শতক সম্বন্ধে আমাদের ক্রমবর্ধমান ঔৎসুক্যেরই পরিচয়। ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে অনিবার্যভাবে এই ঔৎসুক্য আমার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। সেই সঙ্গে বাংলা সাহিত্য পাঠ করতে করতে মনে হয়েছিল, বাংলা সাহিত্যের নারী চরিত্রের উদ্ভব, পরিকল্পনা ও বিকাশ সমসাময়িক মেয়েদের সঠিক অবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ; গত শতকের বাঙালি মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা ও সেই সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা বিষয়ে কিছু অনুসন্ধান হয়ত উনিশ শতককে আরও সম্যকভাবে অনুধাবন করতে সাহায্য করবে। সেই আকাঙ্ক্ষা থেকেই এই বিষয়ে পড়াশোনার সূত্রপাত।

'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি ভদ্রমহিলা' নামে গবেষণাগ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. উপাধির জন্য একদা অনুমোদিত হয়েছিল। তারপর বেশ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু জন্মসঙ্গী আলস্য ও ঈষৎ কুণ্ঠার কারণেই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য সদ্য উপাধিপ্রাপ্ত গবেষক-সুলভ কোনো ত্বরিত উদ্যোগ গ্রহণ করিনি। তদুপরি ছিল, এক সর্বগ্রাসী পেশাগত সময়াভাব। ফলে যে কোন গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রেই যে সময়সাপেক্ষ প্রাসঙ্গিকতা থাকে তা এ ক্ষেত্রে অনেকাংশে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। তাই অবশেষে সব অনড়তা ত্যাগ করে কিছুটা পরিমার্জিত রূপে প্রকাশিত হল বর্তমান গ্রন্থটি।

অধ্যাপক রজতকান্ত রায়ের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নেই। তিনি আমার গবেষণা-পত্রের পরিদর্শক ছিলেন। এই গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ই একাধিকবার লিখিত হয়েছিল। আমার দুষ্পাঠ্য হস্তাক্ষর সত্ত্বেও পরম যত্নের সঙ্গে সেগুলি পাঠ ও তার ওপর মূল্যবান মন্তব্য করে এবং পি. এইচ. ডি. পাওয়ার পরে, বর্তমান গ্রন্থের প্রস্তুতি পর্বেও, দিনের পর দিন, দীর্ঘ সময় ব্যয় করে গত শতকের বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা করে এবং সর্বোপরি প্রতিটি সিদ্ধান্ত বিষয়ে আমার মত অর্বাচীনকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে তিনি আমায় ঋণী করে রেখেছেন। তাঁর উৎসাহ ও প্রশ্রয় ব্যতীত এই বই লেখা সম্ভব হত না। তাঁর সর্বতোভদ্র ধৈর্যের প্রতি আমার স্বার্থপর আচরণ আমায় নিভৃতে পীড়ণ করে। যে উৎসাহ ও স্বাধীনতা আমায় তিনি দিয়েছিলেন, তার প্রতি মর্যাদা রক্ষা করতে পারলাম কি না, এই সংশয় আমায় অস্বস্তি থেকে মুক্তি দিচ্ছে না।

শ্রীনিখিল সরকার (শ্রীপান্থ) তাঁর অমূল্য সময় নষ্ট করে আমার গ্রন্থটি পাঠ করে কয়েকটি মূল্যবান অভিমত দিয়েছিলেন। শ্রীমতী চিত্রা দেব বর্তমান গ্রন্থের দুটি অধ্যায় পাঠ করে কয়েকটি সুচিন্তিত মতামত দিয়েছিলেন, দিয়েছিলেন কয়েকটি দুর্লভ গ্রন্থের সুলুক সন্ধান। অধ্যাপক তপোব্রত ঘোষের সঙ্গে আমি দীর্ঘদিন আলোচনা করেছি বাংলা

সাহিত্য ও তার ব্যবহারগত বিভিন্ন দিক নিয়ে। আমার অল্প জ্ঞানের পুঁজি তাঁর সান্নিধ্য ও আলোচনায় সমৃদ্ধ হয়েছে। তিনি শিষ্ট ও সর্বংসহ। তাঁর শান্ত, নিরূপদ্রব বাড়িতে আমার একপাক্ষিক অত্যাচার, আমাদের বহু যুক্তি-তক্কো-গপ্প এই গ্রন্থ রচনার অন্যতম মেদুর স্মৃতি। অধ্যাপিকা ভারতী রায় ও অধ্যাপিকা বিজয়া চক্রবর্তীর সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা আমার বহু সংশয় নিরসনে সাহায্য করেছে। আমার অগ্রজ অধ্যাপক কুণাল চক্রবর্তী কয়েকটি গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সন্ধান দিয়েছেন। পাণ্ডুলিপি 'টাইপ' হয়ে আসার পর সংশোধনের জন্য আমার পিতা শ্রীভবেশচন্দ্র চক্রবর্তী মূল রচনাটি দুবার পাঠের মত শ্রমসাধ্য ও ক্লান্তিকর কাজ সমাপন করে এই গ্রন্থ প্রস্তুতির গতিকে ত্বরান্বিত করেছেন। তাঁর বাৎসল্যের প্রতি আনুষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। এই চপল বিনোদন ও অডিও ভিস্যুযালের দোর্দণ্ড প্রতাপের যুগে গ্রন্থটি প্রকাশ করে 'স্ত্রী' প্রকাশনা প্রবন্ধরচয়িতাদের উৎসাহ দিয়েছেন। গবেষণাগ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় *সপ্তাহ* ও তৃতীয় অধ্যায়ের একটি অংশ *লা পয়েজি* পত্রিকায় একদা প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান গ্রন্থে অধ্যায় দুটি প্রকাশের অনুমতি দেওয়ায় আমি ঐ পত্রিকার কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞ।

যে কটি গ্রন্থাগারে আমি কাজ করেছি তাদের কর্মীদের কাছে আমি ঋণী। বিশেষতঃ জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটউট অব কালচার-এর কর্মীদের অকুণ্ঠ সাহায্য ভিন্ন যে এই কাজ সম্ভব হত না, তা বলা বাহুল্য মাত্র।

দীপাবলী, ১৪০১ বঃ

প্রাক্‌কথন

'পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে সে নহি নহি,
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি।
যদি পার্শ্বে রাখ মোরে সঙ্কটে সম্পদে,
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।' — রবীন্দ্রনাথ

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে বাংলাদেশের সমাজে বিদেশি ভাবধারার যে অভিঘাত শুরু হয়েছিল, তাকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা বাঙালি সমাজের ছিল না। ফলে অনিবার্যভাবে শুরু হয়েছিল মানসিক জগতে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন। পরিবর্তনের ধারা কখনও কখনও উচ্চকিত হলেও, মোটের ওপর তা ছিল মন্দাক্রান্তা ছন্দে, ধীর লয়ে প্রবহমান। তাই পরিবর্তনটা এক শতাব্দীরও বেশি সময় পরে যতটা স্বতঃস্ফূর্ত বলে প্রতীতি হয়, গত শতকে ততটা না হওয়ারই কথা। তবে এ কথাটি বোঝা গিয়েছিল যে পুরনো সঞ্চয়, পুরনো বিশ্বাস নিয়ে দিন অতিবাহিত করার যুগ শেষ হয়ে এসেছে। বিশ্বাসের জগতে এক আপাদমস্তক বিভিন্নতা দেখা দিল জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে, এমনকি অন্দরমহলেও। ঘেরাটোপের আড়ালে যে মেয়েরা এতদিন বাস করত 'কর্মহীন, গর্বহীন, দীপ্তিহীন সুখে' তাদের প্রতি সমাজের দৃষ্টি পড়ল বহুলভাবে। এই দৃষ্টিপাত নতুন বিশ্বাসের, নতুন জীবনবোধের ফল। বর্তমান গ্রন্থটি মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের জগতের পরিবর্তনের ও ধারাবাহিকতার কাহিনী। বিষয়টি জটিল ও বিশাল। তাই স্পর্ধোদ্ধত আত্মম্ভরিতায় একে ইতিহাস বলতে ভরসা হয় না।

গত শতকে বাঙালি সমাজে পরিবর্তন-সম্পর্কিত আলোচনার সিংহভাগ জুড়ে ছিল মেয়েরা। 'নারীমুক্তি' কথাটি যে কেবল এ শতকেই শোনা যাচ্ছে, তা নয়। সমাজের যে কোন পরিবর্তনেই মেয়েদের একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর ভূমিকা পর ও পুরুষমুখাপেক্ষী। পালে যখনই পরিবর্তনের হাওয়া লাগে, সচেতন ও সংবেদনশীল প্রগতিবাদীরা বহন করে নিয়ে আসেন নিত্য নতুন চিন্তাধারা। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের সময় থেকে শুরু হয়েছিল নারী-সংক্রান্ত নানা চিন্তাভাবনা। আমাদের দেশে এ ধরনের চিন্তা মোটামুটিভাবে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের সমবয়সী, হয়ত বা ঈষৎ অনুজ।

ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের ফলে বাংলাদেশের অনেকেই তৎকালীন সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ে নতুন করে চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন। বাঙালি সমাজের প্রতি দৃষ্টি পড়ার পর প্রথমেই যা নজরে এসেছিল, তা হল সমাজে মেয়েদের অবহেলিত স্থান। উনবিংশ শতকের সূচনায় যে বিশেষ করে

মেয়েদের সামাজিক মর্যাদার অবনমন ঘটেছিল, তা নয়। বহুদিন ধরে সমাজে মেয়েদের স্থান যেমন ছিল, গত শতকের সূচনায় তার চেয়ে খুব বেশি হেরফের ঘটেনি। গত শতকের আগে মেয়েদের মর্যাদা নিয়ে কাউকে খুব বেশি ভাবিত হতে আমরা দেখি না। উনিশ শতক থেকে অনেকে যে মেয়েদের মর্যাদাকে তাঁদের চিন্তাভাবনা, লেখাপত্রের উপজীব্য বিষয় বলে মনে করতে শুরু করেছিলেন, তা একান্তভাবে বিদেশি সভ্যতার সঙ্গে পরিচয়ের অবদান। পশ্চিমি সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে বাঙালি সমাজের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিদেশে মেয়েদের স্থানকে পশ্চিমের উন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে মনে করা হয়েছিল। এই মনে হওয়ার আরও একটি বড় কারণ ছিল বাঙালি সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের লেখাপত্র। বহু বিদেশি এ দেশে এসে তাঁদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন। এই সব লেখাপত্রের এক বড় অংশ জুড়ে ছিল এ দেশের সমাজে মেয়েদের স্থান নিয়ে আলোচনা। নিজেদের সমাজে তাঁরা যেসব প্রথার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তার অন্যথা দেখলে খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা অবাক হতেন। তাই তাঁদের লেখায় নিজেদের দেশের মেয়েদের সঙ্গে এ দেশের মেয়েদের তুলনা বারবার চোখে পড়ে। খ্রিষ্ট ধর্মপ্রচারকদের পত্রিকাতেও হিন্দু মহিলাদের অবস্থার ওপর প্রবন্ধ প্রকাশিত হত।

খুব সম্ভবতঃ এগুলি পাঠ করে ও বিদেশি সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে বাংলাদেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ধীরে ধীরে এ বিষয়টি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন। নতুন করে শুরু হয়েছিল মেয়েদের সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা। এই চিন্তা একবার শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয়েছিল বিভিন্ন লেখাপত্র। উনবিংশ শতকে মেয়েদের নিয়ে কয়েকটি সামাজিক আন্দোলনও (সতীদাহ-প্রথা নিবারণ, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ-বিরোধী আন্দোলন প্রভৃতি) হয়েছিল। মেয়েদের জন্য পৃথক কয়েকটি সাময়িক পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হত গত শতকে। নারীমুক্তি, মেয়েদের উন্নতি প্রভৃতি ছিল সেই সব পত্রিকার বিষয়সূচির অন্তর্গত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রত্যেক সমাজমনস্ক ব্যক্তিই মেয়েদের নিয়ে কিছু না কিছু লিখেছেন। এই সব পত্র-পত্রিকা বা লেখাপত্রের অনকেগুলিই হারিয়ে গিয়েছে, অনেকগুলি উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কীটদস্ট হয়ে আজ ব্যবহারের অনুপযুক্ত। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও, যে লেখাগুলি পাওয়া যায়, তার সংখ্যাও নেহাৎ ন্যূন নয়—অন্তত, গত শতকের নারী-সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার বা মানসিকতার ধারাটি অনুধাবন করার পক্ষে যথেষ্ট। নারী-সংক্রান্ত রচনার বিপুলায়তন দেখলে এযুগের যে-কোন গবেষকের মনেই এক ধরনের আত্মশ্লাঘা চলে আসতে বাধ্য। অবশ্যম্ভাবীভাবে মনে হয় যে গত শতকের বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা মেয়েদের নিয়ে কত চিন্তাভাবনা করেছেন বা স্ত্রীশিক্ষা, নারীমুক্তি প্রভৃতি নিয়ে তাঁরা কতটা ভাবিত ছিলেন। আবার, একই সঙ্গে মনে হয়, একটা গোটা শতক জুড়ে এত বক্তৃতা, এত লেখা হল, কিন্তু মেয়েদের সামগ্রিক অবস্থার প্রকৃত পরিবর্তন হয়েছিল কতটা? এটা অনুসন্ধিৎসার প্রথম স্তর, কোন পূর্বোপনীত সিদ্ধান্ত নয়।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তার জগৎ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা গড়তে হলে এই শতকে নারী-সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া অপরিহার্য। আবার, এই শতকের নারী-সংক্রান্ত চিন্তাভাবনাকেও সামগ্রিক চিন্তাধারা থেকে বিচ্ছিন্ন

করে দেখা সম্ভব নয়। সুতরাং নারী-সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা যেমন গত শতকের মানসিকতার অঙ্গ ছিল, সে রকম উনবিংশ শতকের মানসিকতাও মেয়েদের সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণাকে প্রভাবিত করেছিল। এই কারণ, কেবলমাত্র নারী-সংক্রান্ত লেখাপত্র থেকেই গত শতকের মেয়েদের নিয়ে চিন্তাভাবনার পূর্ণ ছবি পাওয়া সম্ভব নয়। এই চিন্তাভাবনার বিভিন্ন পরিচয় ছড়িয়ে আছে আরও অজস্র রচনায়। অনেক সময়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ের কোন রচনাতেও আকস্মিকভাবে মেয়েদের সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

গত শতকের বাঙালি মেয়েদের নিয়ে গবেষণা হয়নি বললে সত্যের অপলাপ হবে। সাম্প্রতিককালেই এ বিষয়ে দুটি উল্লেখযোগ্য গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে—গোলাম মুরশিদের *The Reluctant Debutante* ও মেরেডিথ বর্থউইকের *The Changing Role of Women in Bengal, 1849–1905*। দুই গবেষকই মেয়েদের জন্য প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন তাঁদের গ্রন্থে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, গত শতকের মেয়েদের নিয়ে আবার নতুন একটি গ্রন্থ রচনার কৈফিয়ৎ অবশ্যই একটা দিতে হয়।

প্রথমেই বলে রাখা দরকার যে, বর্তমান গ্রন্থটির কেন্দ্রীয় বিষয় মেয়েরা হলেও, এটি গত শতকের নারী-আন্দোলন বা নারীমুক্তির ইতিহাস নয়। অবরোধ-প্রথা ভেঙে গত শতকের মেয়েরা কীভাবে বেরিয়ে এসেছিল, তারা কবে কোন বিদ্যালয়ে পাঠ নিতে গেল—এ বিষয়গুলি নিয়ে এর আগেই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং একান্ত তথ্য-নির্ভর গবেষণার পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। পরিবর্তে, গত শতকের বিভিন্ন লেখাপত্র পড়তে পড়তে এক ধরনের ছদ্ম সন্দেহ মনে দেখা দিতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীকে কি সত্যিই বাঙালি মেয়েদের জাগরণের শতক বলা যায়? মেয়েদের বিষয়ে গত শতকে যা যা লেখা হত, তা থেকে আপাতদৃষ্টিতে উনবিংশ শতাব্দী সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা গড়ে উঠলেও, তার বোধহয় সবটা সত্যি নয়। গত শতকের মেয়েদের ওপর যাঁরা এ পর্যন্ত গবেষণা করেছেন, তাঁরা মূলতঃ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের ওপর ভিত্তি করে গ্রন্থ রচনা করেছেন, সাহিত্যের অন্যান্য উপাদান বিশেষ ব্যবহার করেননি। অন্ততপক্ষে, তাঁদের গবেষণায় তা প্রতিফলিত হয়নি। তাই উনিশ শতকের নারী-সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনার পুরোটা তাদের রচনায় ধরা পড়েনি। সবটা বুঝতে হলে বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন, বিশেষ করে নাটক। নাটক ও প্রহসনের এক জাতীয় তাৎক্ষণিক আবেদন আছে। গত শতকে বিভিন্ন সামাজিক বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত নাটক বা প্রহসনের সংখ্যা প্রচুর। এগুলি থেকে আমরা সেই সামাজিক বিষয়গুলির প্রতি সমসাময়িক সমাজের মনোভাবের কিছু পরিচয় পেতে পারি। এইভাবে, উনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যকে একত্রিত করে পড়তে পড়তে অনিবার্যভাবে মনে হয়েছিল যে মেয়েদের সম্বন্ধে গত শতকের দৃষ্টিভঙ্গি বলে যা বলা হয়, তা হয়ত পুরোপুরি ঠিক নয়। তৎকালীন নারী-সংক্রান্ত ধারণা বিষয়ে অনেকগুলি ফাঁক রয়ে গিয়েছে। অনেক কথা এতাবৎ বলা হয়েছে। আবার, অনেক কথা বলা হয়ও নি। বর্তমান গ্রন্থে এই না-বলা কথাগুলির ছিন্নসূত্র গাঁথার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই আলোচনার কেন্দ্রীয় চরিত্র গত শতকের বাঙালি ভদ্রমহিলা। নতুন শিক্ষা ও ভাবাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণীর দৃষ্টি পড়েছিল মেয়েদের সর্বাঙ্গীণ

অবস্থার উপর। সামাজিক ইতিহাসে 'ভদ্রলোক' শব্দটির লৌকিক ও প্রচলিত অর্থের অতিরিক্ত এক বিশেষ দ্যোতনা আছে। তবে এই শ্রেণীর সামাজিক সংজ্ঞা ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে সব ঐতিহাসিক সমমত নন।[১] ঐতিহাসিক ব্রুমফীলডের মতে ভদ্রলোক বলতে বোঝাত সমাজের একটি বিশিষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন পংক্তি ('status group')[২]. অপরদিকে ঐতিহাসিক এস.এন. মুখার্জীর মতে ভদ্রলোক ছিল একটি নতুন সামাজিক শ্রেণী ('class') ।[৩] ঐতিহাসিক রজতকান্ত রায় অবশ্য কোন একক মর্যাদাবান গোষ্ঠীর পরিবর্তে যাদের নিয়ে ভদ্র সমাজ ('respectable society') গঠিত ছিল, তাদেরই ভদ্রলোক বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে একক মর্যাদা গোষ্ঠী বলতে এক ধরনের বিভ্রান্তিকর সমজাতীয়তার ('misleading homogeneity') সৃষ্টি হয়।[৪] মালবিকা কার্লেকর এই শেষোক্ত মতটিকেই প্রকৃত অবস্থার অনেক বেশি বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা বলে মনে করেন। তাঁর মতে, শিক্ষা, সঠিক আচরণবিধি প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে ভদ্রলোকরা নিজেদের 'ছোটলোক', শ্রমজীবী দোকানদার প্রভৃতি শ্রেণীর থেকে নিজেদের পৃথক করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।[৫]

এই ভদ্রলোক পরিবারের মহিলাদেরই ভদ্রমহিলা বলা যায় কিনা, এ নিয়েও সংশয় আছে। বর্থউইকের মতে সূচনায় ভদ্রলোক পরিবারের নারী অর্থে ভদ্রমহিলা শব্দটি ব্যবহৃত হলেও পরবর্তী কালে এটি এক ধরনের আদর্শ মহিলা বোঝাতেই ব্যবহৃত হত। শুধু ভদ্রকুলবালা নন, ভদ্রমহিলা ছিলেন কয়েকটি সুনির্দিষ্ট গুণাবলীর অধিকারিণী ও এক বিশেষ ধরনের জীবনযাত্রার প্রতিমূর্তি।[৬] গত শতকের শেষভাগে কয়েকজন শিক্ষিতা মহিলা নিজেদের কথা লিখতে শুরু করেছিলেন। বর্থউইক এই আধুনিক মহিলাদের ভদ্রমহিলা বলে অভিহিত করেছেন।[৭]

এটি কিন্তু ভদ্রমহিলার এক অত্যন্ত সংকুচিত ও সীমাবদ্ধ সংজ্ঞা। কেবলমাত্র শিক্ষিতা আধুনিক নারী হিসেবে না দেখে বর্তমান গ্রন্থে ভদ্রমহিলা শব্দটিকে বৃহত্তর ও ব্যাপকতর সামাজিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত গত শতকের যাবতীয় আলোচনা, উপাদান, লেখাপত্র প্রভৃতিতে ভদ্র পরিবারের মহিলা অর্থেই ভদ্রমহিলা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল। ভদ্রমহিলা বলতে এক বিশেষ ধরণের গুণের অধিকারিণী শিক্ষিতা ও আধুনিক নারীকেই কেবল বোঝাত, ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য, আত্মজীবনী বা অন্য রচনাদি এমন কোন সাক্ষ্য দেয় না। এই গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে ভদ্রলোক পরিবারের মহিলা (মা, স্ত্রী, কন্যা, বোন, প্রভৃতি) অর্থেই ভদ্রমহিলা শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। কোন বিশেষ গুণ আরোপ করে তাকে সীমিত অর্থে গ্রহণ করা ঊনবিংশ শতাব্দীর সামগ্রিক লেখাপত্র ও সংস্কারমুখী আন্দোলনের মূল সুরের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

আমরা খুব সাধারণভাবেই ধরে নিতে পারি যে গত শতকে পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা ছিল অনেক কম। গত শতকের সূচনা সম্বন্ধে যেমন এটি সত্য, তেমনি গত শতকের সংক্রান্তিকাল সম্বন্ধেও। তবে, তার অর্থ এই নয় যে গোটা একশ বছর ধরে মেয়েদের অবস্থা ঠিক একই রকম রয়ে গিয়েছিল। গত শতকে মেয়েদের অবস্থার উন্নতি ঘটানর যথেষ্ট প্রয়াস লক্ষ করা যায়। অন্যান্য শতাব্দীর সঙ্গে এই শতকের যা প্রধান পার্থক্য তা হল মেয়েদের অবস্থা সম্বন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে এক ধরনের সচেতনতার উন্মেষ। মেয়েদের সার্বিক অবস্থার প্রকৃত পরিবর্তন কী হয়েছিল, তার

চেয়েও এখানে আলোচ্য বিষয় হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হল এই সচেতনতার জাগরণ।

এই আলোচনাকে প্রধানত দুটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। প্রথমত, আমি কেবলমাত্র হিন্দু মহিলাদের কথাই আলোচনা করেছি। মুসলমান রমণীদের সম্বন্ধে আমাদের হাতে উপাদান স্বল্প, এবং তার চেয়েও বড় কারণ, মুসলমান সমাজের বহু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাবের জন্য তাদের ঘর-গৃহস্থালি সম্পূর্ণরূপে বোঝা সম্ভব নয়। ঠিক একই কারণে, এই আলোচনা প্রধানত সীমিত রেখেছি শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রমহিলাদের মধ্যেই। গ্রামের মহিলাদের প্রসঙ্গের যে কখনও অবতারণা করা হয়নি, তা নয়। তবে, সে ক্ষেত্রেও কিছু লেখার জন্য উপাদানের স্বল্পতা এক প্রধান প্রতিবন্ধক।

উপাদানের স্বল্পতার জন্য আরও কয়েকটি বিষয়ের বিস্তৃততর আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। যেমন, গত শতকের পতিতালয়ের প্রায় কোন ইতিহাসই রচিত হয়নি। অথচ এই ইতিহাস বাদ দিয়ে গত শতকের দাম্পত্য-সম্পর্কের মাত্রা সঠিক অনুধাবন করা সম্ভব নয়। আবার, মেয়েদের নিজেদের কথাও আমরা খুব বেশি জানতে পারি না। গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কয়েকজন ভদ্রমহিলা আত্মজীবনী লিখে গেলেও, তাঁদের সংখ্যা এত কম যে সাধারণ বাঙালি মেয়ের মনের কথা, তাদের চিন্তাধারার কথা অনেকটাই অজ্ঞাত, অশ্রুত থেকে যায়। তবু তারই মধ্যে যতটা সম্ভব এই আত্মজীবনীমূলক রচনাগুলি ব্যবহার করে মেয়েদের নিজস্ব জগতের অনুসন্ধানের প্রয়াস করেছি।

মোহিতলাল মজুমদার ঊনবিংশ শতাব্দীকে একটি বঙ্গশালার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। এই সময়ে প্রত্যেকটি চরিত্র তাদের নির্দিষ্ট অভিনয় করে গিয়েছে। সেই অভিনয়ে বহু ক্ষেত্রেই বিরোধিতা চোখে পড়ে। মেয়েদের সম্বন্ধে গত শতকের ভাবনাচিন্তাও তার ব্যতিক্রম নয়। বিভিন্ন স্ববিরোধী চিন্তাগুলি থেকে আমার মনে হয়েছে একটা যুগের মানসিকতাকে বোঝার চেষ্টা করা যায়। বোঝার কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠি থাকে না। যা একজনের কাছে যুক্তিযুক্ত বলে বোধ হয়, তা-ই অপর জনের কাছে অযৌক্তিক মনে হতে পারে। এই সীমাবদ্ধতাগুলি মেনে নিয়েও, আমি আমার মত করে গত শতককে বোঝার চেষ্টা করেছি। সে বোঝার মধ্যে অনেক ভুলভ্রান্তি, ফাঁক-ফোঁকর থাকতেই পারে, আমার ব্যাখ্যার সঙ্গে অনেকেই ভিন্নমতও হতে পারেন। তবু, প্রাপ্ত উপাদানের ভিত্তিতে যা যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়েছে, চেষ্টা করেছি বর্তমান গ্রন্থে তা লিপিবদ্ধ করার।

উল্লেখপঞ্জী

১। 'ভদ্রমহিলা' বিষয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের মতের আলোচনার জন্য দ্র. Sonia Nishat Amin, *The World of Muslim Women in Colonial Bengal : 1876-1939* (Unpublished Ph.D. thesis submitted to the University of Dhaka, 1993), 'Introduction'

২। J.H.Broomfield. *Elite Conflict in a Plural Society*, (California, 1968). pp. 12-13

৩। S.N. Mukherjee, *Calcutta : Myths & History*, (Calcutta, 1977) p. 63

৪। Rajat K. Ray, *Social Conflict and Political Unrest in Bengal, 1875-1927*, (Delhi, 1984), p.30

৫। Malavika Karlekar, 'Kadambini and the Bhadrolok : 'Early Debates over Women's Education in Bengal, *Economic and Political Weekly*, vol. XXI, no. 17. April 26, 1986, p. WS-31

৬। *'Bhadramahila* was originally . . . used to describe the female members of *bhadralok* families, but it crystallized into the term for an ideal type, embodying a specific set of qualities and denoting a certain lifestyle. 'Meredith Borthwick, *The Changing Role of Women in Bengal, 1849-1905*, (Princeton, N.J. 1984), p.54

৭। ঐ .

১
শতক সূচনায় বাঙালি মহিলা

'হা অবলাগণ। তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।' —বিদ্যাসাগর

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে বাংলাদেশের সমাজের ওপর বিদেশি ভাবধারার যে প্রবল অভিঘাত শুরু হয়েছিল, তাকে উপেক্ষা করার মত শক্তি বাঙালি সমাজের ছিল না। প্রতীচ্যের ভাবধারার সঙ্গে পরিচয়ের অনিবার্য ফল হিসেবে দেখা দিয়েছিল বাঙালির চিন্তা ও মানসজগতে প্রভূত পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের ধারা ঊনবিংশ শতাব্দীতে কখনও কখনও উচ্চকিত হলেও, মোটের ওপর তা ধীরলয়ে, মন্দাক্রান্তা ছন্দে প্রবাহিত হয়েছিল। তবে পুরনো বিশ্বাসের জগতে যে ধীরে ধীবে পরিবর্তন আসছিল, এটা অনেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। বিশ্বাসের জগতের এই আপাদমস্তক ভিন্নতা দেখা দিল জীবনের সর্বক্ষেত্রে। নতুন ভাবধাবাব সংস্পর্শে এসে বাস্তবমুখী শিক্ষা ও আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রবেশপথই শুধু উন্মুক্ত হল না, 'মানুষ' সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গিই পরিবর্তিত হয়ে গেল। এই দৃষ্টিভঙ্গি একদিন প্রবেশ করল অন্দরমহলেও। এর ফলে অন্দরমহলে কী প্রভাব প'ড়েছিল, তা ঊনবিংশ শতাব্দীতে মহিলাদেব সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু প্রারম্ভিক আলোচনা ছাড়া সঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীব সূচনায় বাঙালি সমাজ, বিশেষতঃ মহিলাদের অবস্থা নিয়ে আলোচনার কয়েকটি বাস্তব প্রতিবন্ধকতা আছে। এর প্রধান কারণ হল সাহিত্যভিত্তিক সাক্ষ্যের অভাব। বাংলা সাহিত্যে তখন এক ধরনের পর্বান্তরের পালা চলছিল। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় ধারা, মঙ্গলকাব্যের যুগ, অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে এসে ধীবে ধীরে অবসিত হয়ে যাচ্ছিল। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুকে (১৭৬০) মোটামুটিভাবে মঙ্গলকাব্যের যুগের অবসান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তবে, ভারতচন্দ্রের মৃত্যু সিঁথির মত পূর্বাপরকে বিদারিত করে দেয়নি। মঙ্গলকাব্য পরবর্তী যুগেও রচিত হয়েছিল, কিন্তু তখন আসর জাঁকিয়ে বসেছিলেন কবিওয়ালার দল। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা-পর্বের বাংলা সাহিত্য বলতে বোঝায় কবিগান। কবিগানে প্রাচীন সাহিত্যের বিষয়বস্তুর অনুবর্তন যতটা থাকত, সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন ততটা নয়। তাছাড়া, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের আগে গদ্যসাহিত্যও গড়ে উঠতে শুরু করেনি। গদ্যসাহিত্য গড়ে ওঠার পর মেয়েদের নিয়ে যত লেখাপত্র হয়েছে তার এক বড় অংশ অনতি অতীত সম্বন্ধেও প্রযোজ্য, এই অনুমানের ওপর ভিত্তি করে আমরা গত শতকের প্রথম দিকে মেয়েদের অবস্থার বর্ণনা করতে প্রয়াসী হতে পারি। তবে, এক্ষেত্রে আরও একটি কার্যোপযোগী ব্যবহারিক সূত্র অবলম্বন করা যেতে পারে। গত শতকে বাঙালি সমাজের ওপর পাশ

প্রভাবের ছায়াপাতের আগে চিরাচরিত সামাজিক নিয়ম কানুনই সমাজে প্রচলিত ছিল। সেই হিসেবে এটা ধরে নেওয়া হয়ত খুব অসঙ্গত নয় যে উনবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে বাঙালি সমাজে নারীর স্থান অনেকাংশে মধ্যযুগীয় সমাজের মতই ছিল।

॥ এক ॥

প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রগ্রন্থাদি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে অনেকেই দেখিয়েছেন বটে যে বেদ-উপনিষদের যুগে মহিলাদের কতটা শ্রদ্ধা করা হত,[১] কিন্তু গত শতকের মেয়েদের বাস্তব অবস্থার যে চিত্র পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় না যে প্রাচীন শাস্ত্রের নির্দেশের প্রতি সমাজ খুব শ্রদ্ধাশীল ছিল। আদর্শ গৃহজীবনের ব্যাখ্যায় মনুসংহিতায় এমন কথাও ব্যক্ত হয়েছিল যে, যে পরিবারে মহিলারা সম্মানিত হন, সেখানে দেবতা প্রসন্ন থাকেন, আর যেখানে মহিলাদের সম্মান নেই সেখানে যাগাদি ক্রিয়াকর্ম সমস্তই ব্যর্থ হয়।[২] অথচ মনু নারীজাতির স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন না। মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ে 'বিবাহিতা নারীর নিত্যধর্ম' বিষয়ে আলোচনার সময়ে মনু স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন যে মেয়েদের দিন-রাত্রির মধ্যে কখনই স্বাধীন থাকতে দেওয়া যায় না।[৩] জীবনে পরমার্থ লাভের পথে যে দুটি প্রধান বিচ্যুতি হিসেবে গণ্য হত, তার একটি কাঞ্চন (যা পার্থিব বস্তুর প্রতি আসক্তির প্রতীক) ও অপরটি হল কামিনী (ইন্দ্রিয়পরায়ণতার প্রতীক)। পুরুষের ব্রহ্মচর্য, আধ্যাত্মিক লক্ষ্য অর্জন ও মোক্ষ লাভের পথে নারী-সংসর্গকে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে গণ্য করা হত।[৪] এটা মূলতঃ ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হলেও, সাধারণ মানুষের জীবনের লক্ষ্য হিসেবেও কাম ও কামনাশূন্যতার আদর্শের ওপর জোর দেওয়া হত। এমনকি, তন্ত্রেও (এটি হিন্দু ধর্মের একমাত্র শাখা যেখানে যোগ ও কামের মধ্যে সমন্বয় দেখা যায়) নারীর প্রয়োজন কেবলমাত্র পুরুষের মুক্তির উপায়মাধ্যম হিসাবে।[৫] এবং, পুরুষরা যুগ যুগ ধরে মেয়েদের ওপর প্রাধান্য বিস্তারে জন্য এইসব ধর্মীয় ভাবাদর্শকেই ব্যবহার করে এসেছে।[৬]

মধ্যযুগের সমাজে বাংলাদেশে স্থায়ী মুসলমান শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর হিন্দুরা মেয়েদের অন্তঃপুরের মধ্যে বন্দী করে রেখে তাদের শুচিতা রক্ষায় উদ্যোগী হয়েছিল। এছাড়া, বাল্যবিবাহ, সহমরণ, বহুবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক নিয়ম-নীতির ফলে মেয়েদের সামাজিক অবস্থা খুব একটা ঈর্ষনীয় ছিল না। তার ওপর, মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার চল ছিল একমাত্র বৈষ্ণবীদের ভিতর।[৭] স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক কেমন ছিল, তা বোঝা যায় ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের পার্বতীর উক্তি থেকে :

নারীর পতির প্রতি বাসনা যেমন।
পতির নারীর প্রতি মন কি তেমন ॥
পাইতে পতির অঙ্গ নারী সাধ করে।
তার সাক্ষী মৃতপতি সঙ্গে পুড়ে মরে ॥
পুরুষেরা দেখে যদি নারী মরি যায়।
অন্য নারী ঘরে আনে নাহি স্মরে তায় ॥

নিজ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা।
কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবা ॥[৮]

অতএব, পুরুষ স্ত্রীর প্রতি কেবল উদাসীনই নয়, সে দাম্পত্য-সম্পর্কের প্রতি বিশ্বাসহীন ও পরনারীতে আসক্ত। ভারতচন্দ্র বাঙালি মেয়েদের জীবন দুঃখময় বলে বর্ণনা করেছেন,[৯] তারা শুধু পড়ে পড়ে মার খায়।[১০]

॥ দুই

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বাঙালি সমাজে মেয়েদের অবস্থার আরও অবনতি হয়েছিল। একদিকে বহুবিবাহ, আচার অনুষ্ঠানের যে রকম বৃদ্ধি হচ্ছিল, সে রকম অবহেলিত হচ্ছিল নারীর মর্যাদা।[১১] মধ্যযুগে মেয়েদের অন্তঃপুরের মধ্যে বন্দী করে রাখার যে রীতি প্রচলিত হয়েছিল, তা ঊনবিংশ শতাব্দীতেও অব্যাহত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই প্রথাকে বলা হত 'অবরোধ প্রথা'। উঁচু ঘরের মেয়েদের প্রায় অসূর্যম্পশ্যা হয়ে জীবন কাটাতে হত। প্রিসিলা চ্যাপম্যান এই অন্তঃপুরের একটি চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন : 'The apartments for the women, dominated by "the Zenanah" are studiously secluded; the gratings or shutters with small air holes, serving not simply as a protection from the heat, but rather as a prison security, through which none can penetrate, to search into the sad scenes of misery resulting from the pervertion of heaven's greatest blessing.'[১২] ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় এই 'অবরোধ প্রথা' এত বহুল প্রচলিত ও সামাজিকভাবে স্বীকৃত ছিল যে কেউ এই প্রথা না মানলে তার চূড়ান্ত অসম্মান হত।[১৩]

পিতৃতান্ত্রিক বাঙালি পরিবারে পুরুষের ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। অন্তঃপুরবাসিনীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন মূল্য সেই সমাজে ছিল না। স্ত্রীর মর্যাদা ছিল স্বামীর অনেক নিচে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে, ১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দে, চার্লস গ্রান্ট তাঁর *Observations on the State of Society among the Asiatic Subjects of Great Britain, particularly with respect to Morals; and on the means of improving it* রচনায় পারিবারিক জীবনে স্ত্রীর পরাধীনতার প্রসঙ্গটি বিশদভাবে আলোচনা করেছিলেন। গ্রান্ট স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।[১৪] তাঁর মতে মেয়েদের প্রতি ব্যবহারে হিন্দুদের যেমন নিষ্ঠুরতা দেখা যায়, অন্য কোন বিষয়ে ততটা নয়।[১৫] মেয়েদের ওপর পুরুষদের প্রাধান্য সম্পর্কে প্রায় একই মন্তব্য করেছিলেন অকল্যান্ডও : 'The men here are a sadly idle set; they make almost slaves of their wives.'[১৬] কেরীর *কথোপকথন* (১৮০১) গ্রন্থ থেকে স্বামীর স্ত্রীকে 'গালাগালি তিরস্কারে'র কথা জানা যায়।[১৭] পাশ্চাত্যের ভিন্ন সামাজিক পরিবেশে বর্ধিত বিদেশিদের কাছে স্ত্রীর ওপর স্বামীর এই সর্বময় কর্তৃত্ব খুবই বিসদৃশ ঠেকেছিল।

বিদেশি ভাবধারার সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে যে সব বাঙালি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমাজকে পর্যালোচনা করতে উৎসাহী হয়েছিলেন, তাঁদের অনেকের মধ্যেও মেয়েদের পরাধীনতা সম্বন্ধে ধীরে ধীরে সচেতনতার উন্মেষ হচ্ছিল। ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত সতীদাহ প্রথা রদ করার জন্য তাঁর দ্বিতীয় পুস্তিকায় রামমোহন রায় মন্তব্য করেছিলেন যে মেয়েরা প্রধানতঃ হল রাঁধুনি, শয্যাসঙ্গিনী এবং বিশ্বস্ত পরিচারিকা। রামমোহন বলেছিলেন যে বিবাহের সময়ে পুরুষরা স্ত্রীকে অর্ধাঙ্গিনী বলে স্বীকার করে, কিন্তু ব্যবহারের সময়ে পশুর চেয়েও অধম ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হয় না। স্বামীর ঘরে প্রত্যেক স্ত্রীকে 'দাস্যবৃত্তি' করতে হয়।[১৮]

সাধারণতঃ মেয়েদের বিয়ে হত খুবই অল্প বয়সে। গ্রান্ট মন্তব্য করেছিলেন যে মেয়েদের যে বয়সে বিয়ে হয় তখন তাদের যুক্তি-বুদ্ধির তো বিকাশ হয়ই না, বরং তাদের মায়ের 'জেনানা' থেকে নিজেদের 'জেনানায়' সরাসরি প্রবেশ করতে হয়। গ্রান্ট এই জীবনকে 'animals of a lower species' -দের জীবনের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।[১৯] ১৮১১ থেকে ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত এক প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে তিন-চার বছরের মধ্যেই হিন্দু ছেলেমেয়েদের বিয়ে স্থির হয়ে যেত।[২০] এমনকি কোলের শিশুরও বিয়ে হত, এমন উদাহরণও আছে বলে লেখা হয়েছিল গত শতকে।[২১] তবে এত ছোট বয়সে বিবাহের উল্লেখ খুব বেশি পাওয়া না গেলেও খুবই বাল্যকালে বিবাহের প্রসঙ্গ অনেকেই আলোচনা করেছেন। কেরী *কথোপকথন* গ্রন্থে এক বালিকার অষ্টম বর্ষে বিবাহের উল্লেখ করেছিলেন।[২২] ক্রফোর্ড লিখেছিলেন যে আট-দশ বছরের মেয়ের সঙ্গে বৃদ্ধের বিবাহ প্রায়শই ঘটত।[২৩]

বাল্যবিবাহের চেয়েও গুরুতর সামাজিক সমস্যা ছিল কৌলীন্য প্রথা ও বহুবিবাহ। দ্বাদশ শতাব্দীতে বল্লাল সেন প্রবর্তিত কৌলীন্য প্রথা ধীরে ধীরে তার সামাজিক লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে এক ধরনের বিবাহ-ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় এই প্রথা ভয়াবহ সামাজিক আকার ধারণ করেছিল। গ্রান্ট বহুবিবাহকে 'rational domestic society'-র ধ্বংসের কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন।[২৪] কুলীন ঘরের মেয়েরা বিয়ের পর পিতৃগৃহেই দিন কাটাতে বাধ্য হত, স্বামীর সঙ্গে তাদের দীর্ঘদিন দেখা সাক্ষাৎও হত না।[২৫] ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল *জ্ঞানান্বেষণ* পত্রিকায় বহুবিবাহকারী কয়েকজন কুলীনের নাম, বাসস্থান ও বিবাহ-সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। এই তালিকা থেকে জানা যায় যে বাষট্টিটি বিবাহকারী কুলীনও বাঙালি সমাজে ছিল।[২৬] ঐ পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল যে এই বিবাহকারীরা বহু স্ত্রীলোকের 'সুখের কন্টক' হয়।[২৭]

কৌলীন্য প্রথার ফলে মেয়েরা অবৈধ সম্পর্কের প্রতি প্রলুব্ধ হত।[২৮] এই সমস্যাটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে 'বঙ্গদেশস্থ ভদ্রসন্তানসমূহ' ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তারিখের *সমাচার দর্পণ* পত্রিকায় লিখেছিলেন : 'এবং মেলবন্ধ থাকাতে অনেক কুলীন কন্যা জন্মাবচ্ছিন্ন অদত্তাই থাকিলেন। ইহাতে প্রজাবৃদ্ধি যত বিবেচনা করিয়া দেখিলেই সুবুদ্ধিরা বুঝিতে পারিবেন। ধর্ম্মলোপের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ বিদিত করিতে সঙ্কুচিত হইয়া লিখিতেছি যে এক ব্যক্তি হইতে বহু স্ত্রীর মনোভিলাষ কোনরূপেই পূর্ণ হইতে পারে না[।] ইহাতে ঐ কুলীনের স্ত্রী প্রায়ই পরপুরুষরতা হইয়া জারজ সন্তান উৎপন্ন করিতেছে এবং

পূর্ব্বোক্ত অবিবাহিতা স্ত্রীরা যৌবনযন্ত্রণায় কাতরা হইয়া পরসন্তাতে তাহাদের গর্ভ হইতেছে।'[২৯] যেহেতু কৌলীন্য প্রথা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত একটি প্রধান সামাজিক সমস্যা ছিল, তাই তার আনুষঙ্গিক কুফলগুলিও দীর্ঘদিন অব্যাহত রয়ে গিয়েছিল। ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার দত্ত বহুবিবাহকারী 'কুলীন ভ্রাতাগণ'দের সম্বোধন করে লিখেছিলেন : 'অবশেষে আপনারদিগকে এক অনুরোধ করিয়া নিরস্ত হই, অর্থাৎ শুভকর্মে যাত্রাকালীন সম্মুখ দ্বারে উপস্থিত হইয়া পশ্চাৎভাগে একবার ঈষৎ কটাক্ষপূর্ব্বক দৃষ্টি করিবেন, যে অপর দ্বারে কি আশ্চর্য্য পাপের নৃত্য হইতেছে।'[৩০]

উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক পটভূমিকায় মেয়েদের অবস্থার সবচেয়ে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় বিদ্যাসাগরের *বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব* (১৮৭১) গ্রন্থটি থেকে। বিদ্যাসাগরের মানবমুখী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে এই সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।[৩১] এ বিষয়ে তাঁর নিরলস প্রয়াসের স্বাক্ষর ছড়িয়ে আছে সমসাময়িক বিভিন্ন রচনায়। উপরোক্ত গ্রন্থটির সূচনায় তিনি লিখেছিলেন : 'স্ত্রীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল . . . এই দুর্বলতা ও অধীনতানিবন্ধন, তাঁহারা পুরুষজাতির নিকট অবনত ও অপদস্থ হইয়া কাল হরণ করিতেছেন . . . এই হতভাগ্য দেশে, পুরুষজাতির নৃশংসতা, স্বার্থপরতা, অবিমৃষ্যকারিতা প্রভৃতি দোষের আতিশয্যবশতঃ, স্ত্রীজাতির যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা অন্যত্র কুত্রাপি লক্ষিত হয় না।'[৩২] বিদ্যাসাগর হুগলী জেলায় একশ তেত্রিশজন ও কলকাতার অনতিদূরে অবস্থিত জনাই গ্রামের চৌষট্টিজন বহুবিবাহকারী পুরুষের নাম, বাসস্থান, বয়স ও বিবাহ-সংখ্যা প্রকাশ করে প্রমাণ করেছিলেন যে যারা বলতেন যে বহুবিবাহ বাঙালি সমাজে কমে এসেছিল, তাঁরা কতটা ভ্রান্ত।[৩৩]

বিদ্যাসাগর পরিসংখ্যান দিয়ে প্রমাণ করলেও, যখন কয়েকজন এই ধারণা পোষণ করতেন যে বহুবিবাহ আগের তুলনায় গত শতকের শেষার্ধে কমে গিয়েছিল,[৩৪] তখন সহজেই অনুমেয় যে উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় এই প্রথা কী ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় আর একটি সামাজিক কুপ্রথা ছিল সতীদাহ। সতীদাহ বা মৃত স্বামীর চিতায় বিধবা স্ত্রীর সহমরণের প্রথা ভারতবর্ষে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতের সাহিত্যেও সহমরণের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।[৩৫] মধ্যযুগে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি প্রধান প্রধান মঙ্গলকাব্যসহ কৃত্তিবাসী রামায়ণেও এই প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩৬] কিন্তু সতীদাহ প্রথা নিয়ে বিশদ আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল ইংরেজদের ভারতবর্ষে আসার পর। বিদেশি সমাজ-ব্যবস্থায় সহমরণের অনুরূপ কোন প্রথা প্রচলিত না থাকায় খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট হয়েছিল।

ক্রফোর্ড লক্ষ করেছিলেন যে সতীদাহ ভারতবর্ষের সব প্রদেশেই প্রচলিত ছিল। ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলের লোকদের এ বিষয়ে নিরুৎসাহ করা হলেও এর সংখ্যা ছিল প্রচুর।[৩৭] তিনি সহমরণকে হিন্দুদের মধ্যে একটি সার্বজনীন প্রথা বলে বর্ণনা করেছিলেন।[৩৮] এই প্রথা সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে যেমন প্রচলিত ছিল,[৩৯] সেরকম ছিল অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর মধ্যেও। ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিভাগের (Calcutta

Division) অন্তর্গত কয়েকটি জেলা ও শহরের ম্যাজিস্ট্রেটরা যে প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন, তা থেকে দেখা যায় যে সহমৃতার তালিকায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ছাড়াও ছিল বাগদি, তাঁতি, চণ্ডাল, ময়রা, কুরী, কৈবর্ত, চাষা, আগুড়ি, সদগোপ, শুঁড়ী, গোয়ালা, কালওয়ার, শাঁখারি, তাম্বুলি, কুমোর, ডোম, মালি, মুচি প্রভৃতি জাতির অন্তর্গত বিধবারা।[৪০] এর বছর দুই আগে (১৮২০) বর্ধমানে যে সাতান্নটি সতীদাহের বিবরণ পাওয়া যায় তার মধ্যেও নফর, বাগদি, যুগী, গোয়ালা, মুচি, ছুতোর, কৈবর্ত, মোদক, চাষা প্রভৃতি জাতির উল্লেখ আছে।[৪১] ঐ একই বছরে হুগলী জেলায় তিরানব্বইটি সতীদাহের ঘটনার মধ্যে উচ্চবর্ণের হিন্দু বিধবাদের সঙ্গে পাইক, কলু, লোহার, মুঠি, বারুই, ময়রা, কুমোর, তুলী, তাঁতি, পোঁদ, মালি, বুদি, হাড়ি প্রভৃতি জাতের অন্তর্ভুক্ত বিধবারাও উপস্থিত ছিল।[৪২] সামাজিক মর্যাদার বিচারে জমিদার বা পণ্ডিতের বাড়ি থেকে ভিখারি, দেশীয় রাজ কর্মচারী এবং বিত্তবান পরিবার থেকে শুরু করে অর্থনৈতিকভাবে শোচনীয় দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির স্ত্রীকেও সহমৃতা হতে দেখা যেত।[৪৩] সাধারণতঃ, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশেই সতীদাহের ঘটনা বেশি ঘটত।[৪৪] অনেক সময়ে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনও বিধবাকে 'সতী' হওয়ার জন্য বল প্রয়োগ করত। ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ রমণী ফ্যানি পার্কস একটি সহমরণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে প্রজ্জ্বলিত চিতা থেকে যখন বিধবাটি প্রাণের ভয়ে পালানোর চেষ্টা করছিল তখন তার আত্মীয়স্বজন এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা 'কেটে ফেল', 'মাথায় বাঁশ মার', 'হাত পা বাঁধ' বলে চীৎকার করতে করতে বিধবার পিছনে ছুটছিল।[৪৫] নিজামত আদালতের একটি 'রায' (৭.৮.১৮২১) থেকে জানা যায় যে দরকার হলে, তরোয়ালের আঘাত দিয়েও পলায়মানা বিধবাকে চিতায় ফিরিয়ে আনা হত।[৪৬] অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি লাভের আশায় বিধবার শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়রা তাকে 'সতী' হওয়ার জন্য প্ররোচিত করত। কারণ 'the family of the deceased husband save by the immolation of the widow the third of the defunct's property, which would otherwise go to her.'[৪৭] অনেক সময়ে বিধবাকে বাড়ির অন্যান্য লোকেরা বোঝা বলে মনে করত। দরকার হলে, গোটা গ্রামসুদ্ধ সবাই বিধবাকে জোর করে নদীর ধারে টেনে নিয়ে এসে তাকে মৃত স্বামীর চিতায় তুলে দিত।[৪৮] অনেক সময়ে সতীদাহের জন্য উৎসাহী লোকেরা এত স্থিরসঙ্কল্প হত যে তাদের বাধা দিলেও তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে এই কাজ সম্পন্ন করত। তদানীন্তন সরকারি সচিব বেইলী নিম্নপ্রদেশ সমুহের (Lower Provinces) পুলিশের অধ্যক্ষের কাছে একটি পত্রে (তাং ২১.৩.১৮১৭) এ রকম একটি ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন।[৪৯]

সতীদাহের জন্য আত্মীয়স্বজনের পরই সবচেয়ে বেশি উৎসাহী ছিলেন ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা। অর্থপ্রাপ্তির লোভে তারা বিধবাদের সহমরণের মাধ্যমে 'পুণ্যার্জনের' জন্য উৎসাহিত করতেন।[৫০] বহু ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়রাও বিধবাকে 'সতী' হতে উৎসাহিত করার জন্য ব্রাহ্মণদের উৎকোচ দিত।[৫১] ইংরেজ কর্মচারী ওয়াল্টার ইউয়ার মন্তব্য করেছিলেন যে মেয়েদের মধ্যে স্বেচ্ছায় 'সতী' হওয়ার সংখ্যা অত্যন্ত কম। ঐ তীব্র মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে চারদিকের গৃধ্নু আত্মীয় ও ব্রাহ্মণদের চাপের জন্যেও তারা অনেক সময়ে সহমরণে মত দিতে বাধ্য হত।[৫২]

তবে একমাত্র যে স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের বল প্রয়োগের কারণেই বিধবারা 'সতী' হত, তা নয়। উইলিয়ম কেরী ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে একটি সতীদাহ প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। বিধবা নিজেই সহমরণে ইচ্ছুক জেনে কেরী তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু 'she in the most calm manner mounted the pile, and danced on it with her hands extended as if in the utmost tranquillity of spirit.'[৫৩] কেরী চিতায় ওঠার আগে বিধবাকে ছবার চিতা প্রদক্ষিণ ও সেই সময়ে মিষ্টান্ন বিতরণ করতে দেখেছিলেন।[৫৪] মোটামুটি একই বর্ণনা দিয়েছিলেন ক্রফোর্ডও।[৫৫]

কেরী ও ক্রফোর্ড দুজনেই বিধবাদের স্বেচ্ছায় 'সতী' হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। স্বেচ্ছায় 'সতী' হওয়ার ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন বারুইপুরের 'সল্ট এজেন্ট' প্লাউডেনও। চব্বিশ পরগণার ম্যাজিস্ট্রেটকে লেখা একটি চিঠিতে প্লাউডেন উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি নানাভাবে বুঝিয়েও একটি বিধবাকে 'সতী' হওযা থেকে নিরস্ত করতে পারেননি।[৫৬] অনেক সময়ে 'সতী' হওয়ার জন্য বিধবাদের প্রতিজ্ঞা এমন অটল হত যে সে কাজে বাধা দিলে তারা অনশনে আত্মহত্যার সঙ্কল্পও গ্রহণ করত। মেজর জেনারেল স্লীম্যান সতীদাহ নিবারণের জন্য একবার সৈন্যবাহিনী পর্যন্ত মোতায়েন করেছিলেন। স্লীম্যানের ধারণা ছিল যে বিধবার আত্মীয়রাই তাঁকে 'সতী' হওয়ার জন্য প্ররোচিত করেছিল। কিন্তু তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করেন যে বিধবাটি 'সতী' হওয়ার সিদ্ধান্তে এত স্থির ও অনড় ছিল যে সে কোন খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ না করে অনশনে প্রাণত্যাগের প্রতিজ্ঞা করেছিল। বহু অনুরোধ সত্ত্বেও তাকে এতটুকু খাবারও খাওয়ানো যায়নি।[৫৭] স্লীম্যান সতীদাহ দেখার জন্য বহু লোকের উপস্থিতি লক্ষ করেছিলেন। তাদের বিশ্বাস ছিল যে বিধবা তার জীবদ্দশায শেষ যে বাক্যগুলি উচ্চারণ করত সেগুলি ভবিষ্যতে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যেত এবং সেই ভবিষ্যদ্বাণী যারা শুনে ফেলত, তাদের জীবন হত দুর্বিষহ।[৫৮] সতীদাহের জায়গায় যারা সমবেত হত, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আসত এই 'পুণ্যকাজ' দেখার সৌভাগ্যের আশায়।[৫৯] আবার অনেকে আসত নিছকই কৌতুহলবশতঃ।[৬০]

এটা খুবই সম্ভব যে সতীদাহের সংখ্যা হয়ত আগের তুলনায় খুব বেশি বাড়েনি। ইংরেজরা এই প্রথার সঙ্গে একেবারেই পরিচিত ছিল না বলে কোন জীবিতা স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার ঘটনায় তারা অত্যন্ত বিস্মিত বোধ করেছিল। অষ্টাদশ শতকের বা উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায সহমরণের কোন সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসেব আমাদের কাছে নেই। কারণ, ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দের আগে সতীদাহের নিয়মিত পরিসংখ্যান রাখা হত না। যা হত, তা নিছকই প্রক্ষিপ্ত কয়েকটি সমীক্ষা। যেমন, ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে কেরীর পরিচালনায় শ্রীরামপুরের 'ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটি'র পক্ষ থেকে একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছিল যে কলকাতার ত্রিশ মাইলের মধ্যে ছয় মাসে সতীদাহের সংখ্যা ছিল ২৭৫।[৬১] সরকারি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ১৮১৫, ১৮১৬ ও ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিভাগে (Calcutta Division) সহমরণের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৫৩, ২৮৯ ও ৪৪১। পরের বছর ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৫৪৪।[৬২] ঐ একই সরকারি প্রতিবেদনে এক বছর আগের হিসেব অবশ্য সামান্য অন্য রকম ছিল। সেখানে বলা হয়েছিল যে ১৮১৭, ১৮১৮ ও ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দে সতীদাহের

সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪২৮, ৫৩৩ ও ৩৮৮।[৬৩] পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৮১৫ থেকে ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কোন একক বছরেই বাংলাদেশে সতীদাহের সংখ্যা নয়শ অতিক্রম করেনি। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা তখন ছিল ছয় কোটি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সতীদাহ যে খুব ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল, তা বলা যায় না।[৬৪]

কিন্তু পরিসংখ্যান দিয়ে সমস্যাটির গুরুত্ব পুরোপুরি বোঝা যায় না। যে বিধবারা সহমৃতা হত, তাদের মধ্যে বৃদ্ধার সংখ্যা ছিল খুবই কম। মধ্যবয়সী বিধবারাই 'সতী' হ'ত বেশি। ১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দের এক পরিসংখ্যান অনুযাযী :[৬৫]

	২০ বছরের কম	২০-৪০ বছরের মধ্যে	৪০-৬০ বছরের মধ্যে	৬০ বছরের বেশি	মোট
ব্রাহ্মণ	৭	৮৬	৯৭	৪৫	২৩৫
ক্ষত্রিয়	৬	১১	১১	৬	৩৪
বৈশ্য	২	৭	৩	২	১৪
শূদ্র	১৭	১০৪	১১৫	৫৬	২৯২
	৩২	২০৮	২২৬	১০৯	৫৭৫

১৮১৫-১৮২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত নিজামত আদালতের পেশ করা প্রতিবেদন[৬৬] অনুযায়ী কুড়ি বছরের কম বয়সী বাষট্টি জন সহমৃতা বিধবার মধ্যে সাড়ে ১৪ জনের বয়স ছিল ১৭ বছর, ১ জনের ১৬ বছর, ২২ জনের ১৬ বছর, ১০ জনের ১২ বছর, ৩ জনের ৮ বছর, এমনকি এক জনের ৪ বছর। ২ জনের বয়স ১৪ বছর, ২ জনের বয়স ১৩ বছর, ১ জনের বয়স ১০ বছর।

এছাড়াও সতীদাহের আরও একটি বৃহত্তর সামাজিক দিক ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় বহুবিবাহ ও কৌলীন্য প্রথা খুব ব্যাপকভাবে প্রচলিত থাকার ফলে একজন কুলীন বা বহুবিবাহকারী পুরুষের মৃত্যু হলে প্রায়শই অনেক স্ত্রী একসঙ্গে বিধবা হত। তাই যে সব পরিবারে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, সেখানে একটি মাত্র পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী 'সতী' হত। ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে জনৈক অনন্তরামের মৃত্যুর পর তার মৃতদেহের সঙ্গে ৩৭ জন বিধবা পত্নী সহমৃতা হয়েছিল। উইলিয়াম ওয়ার্ডের লেখা থেকে জানা যায় যে একশটিরও বেশি বিবাহকারী পুরুষ অনন্তরামের চিতা তিনদিন ধরে প্রজ্জ্বলিত ছিল— প্রথম দিন তিনজন, পরের দিন পনেরোজন ও শেষদিন উনিশজন স্ত্রী 'সতী' হয়েছিল। সবচেয়ে বিস্ময়কর হল, এই 'সতী'দের মধ্যে মাত্র প্রথম তিনজন তাদের স্বামীর সঙ্গে বাস করেছিল, বাকিরা তাদের স্বামীকে ক্বচিৎ-কদাচিৎ দেখেছিল মাত্র। ওয়ার্ড এই ধরনের আরও বেশ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন।[৬৭] ১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর তারিখের *সমাচার দর্পণ* পত্রিকা থেকে জানা যায় যে কোন্নগড়-নিবাসী জনৈক কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর সময়ে তার জীবিতা স্ত্রীর সংখ্যা ছিল বাইশ এবং এদের মধ্যে মাত্র দুজন স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর সময়ে তার বাড়িতে উপস্থিত ছিল। তার মৃত্যুর পরে 'কলিকাতার এক স্ত্রী ও বাঁসবাড়ীয়ার এক স্ত্রী নিকটস্থা দুই স্ত্রী এই চারি জন সহমরণোদ্যতা হইল।'[৬৮]

অনুরূপভাবে বল্লভপুরের হরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তার দুই স্ত্রী[৬৯] এবং বংশবাটী নিবাসী পঞ্চানন বসুর মৃত্যুর পর তারও দুই স্ত্রী 'তৎসহগামিনী' হয়েছিলেন।[৭০]

সবাই যে স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গেই সহমৃতা হত তা নয়। অনেক সময়ে তারা স্বামীর ব্যবহৃত দ্রব্যাদিকে স্বামীর প্রতীক কল্পনা করে 'সতী' হত। বিশপ হিবার লক্ষ করেছিলেন যে স্বামীর পরিধেয় বস্ত্রাদি, ব্যবহৃত জুতো বা লাঠি সঙ্গে করেও বিধবারা 'সতী' হত। তবে এই সুবিধা ('privilege') ব্রাহ্মণ বিধবাদের দেওয়া হত না।[৭১] অনেক সময়ে বিধবারা স্বামীর মৃতদেহ সৎকারের পর তার ভস্মাবশেষের সঙ্গেও অনুমৃতা হত।[৭২] আবার এমনও হত যে প্রোষিতভর্তৃকা স্ত্রীর ছেলে কারও মুখে বাবার মৃত্যু সংবাদ পেলে, সেই স্ত্রী অনুমৃতা হত। ছেলের খবরের সত্যতা যাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তাও তারা অনেক সময়ে অনুভব করত না।[৭৩]

তবে সতীদাহের সংখ্যা বাংলা বিভাগের সামগ্রিক জনসংখ্যার তুলনায় কখনই ভয়াবহ আকার ধারণ না করলেও তা আগের তুলনায় খুব কমেওনি। ১৮১৯—১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে কলকাতায় মোট সতীদাহের সংখ্যা ছিল ১৮৫১।[৭৪] যদিও কলকাতা বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই সতীদাহ সবচেয়ে বেশি ঘটত, কিন্তু বাংলাদেশের সর্বত্রই এই প্রথা ছিল প্রচলিত।[৭৫] আমরা আগেই দেখেছি যে সব সতীদাহের ক্ষেত্রেই বিধবাদের ওপর বল প্রয়োগ করা হত না। বরং *সমাচার চন্দ্রিকা* একেবারে বিপরীত চিত্রই তুলে ধরেছিল। এই পত্রিকার মতে 'পতিপ্রাণা' মেয়েরা সব ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছায় 'সতী' হয়।[৭৬] *সমাচার চন্দ্রিকা* সতীদাহ প্রথা রদ করার বিপক্ষে ছিল,[৭৭] তাই এ সাক্ষ্য নির্বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে মেয়েরা কয়েক ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছায় সতী হত।

মেয়েরা কেন স্বেচ্ছায় এই অত্যন্ত যন্ত্রণাকর মৃত্যুর উপায়কে নির্বাচন করত, সে বিষয়েও গত শতকে কিছু লেখাপত্র হয়েছিল। একটা সহজবোধ্য কারণ বোধহয় এই যে তাদের সামনে সতী হওয়ার মহান আদর্শ তুলে ধরা হত। তারা সেই আদর্শে ছোটবেলা থেকে বড় হয়ে উঠত বলে সহমরণের মাধ্যমে অক্ষয় পুণ্যার্জন সম্ভব, এমন ধারণা তাদের মনে সুদৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হয়ে থাকত। *সমাচার দর্পণ* থেকে জানা যায় যে শান্তিপুরের এক আঠারো বছরের সতী হতে বদ্ধপরিকর বিধবাকে থানার লোকেরা সে দারিদ্র্য বা পারিবারিক বিদ্রূপের ভয়ে 'সতী' হতে চাইছে কি না, এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় সেই যুবতী বলেছিল : '. . . আমি স্বামি শবের সহিত দগ্ধা হইলে চতুর্দশ ইন্দ্রকাল পর্যন্ত পতিলোকে বাস করিব। এই স্বর্গ ভোগ সতী না হইলে পাই না। এই মত অনেক কথোপকথনের পর ঐ স্ত্রীর দুই ক্ষুদ্র বালককে তাহার সম্মুখে আনাইল। কিন্তু বালকদিগকে দেখিয়াও ঐ স্ত্রীর হৃদয়ে মাতৃস্নেহ জন্মিল না।[৭৮]

মেয়েরা যে সব সময়ে যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করে এই কথাগুলি বলত, তা নয়। এগুলি শুনতে-শুনতে তাদের মনে এই বিশ্বাসগুলি স্থায়ী হয়ে যেত। বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট মোলোনি বলেছিলেন যে যেখানে মেয়েরা নিজেদের নাম পর্যন্ত লিখতে পারে না, সেখানে তারা 'সতী' হওয়ার মাহাত্ম্য বোঝে, এরকম মনে করার কোন কারণ নেই। তাঁর মতে, যে মেয়েরা 'সতী' হয়, তাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বইজন নিজেরা সতীদাহের মাহাত্ম্য বোঝে না, বরং 'the resolution to become suttees cannot proceed so much from having reasoned themselves into a conviction

of the purity of the act itself, as from an infatuation produced by the absurdities poured into their ears by ignorant Bramins.'[৭৯] ওয়াল্টার ইউয়ারও মেয়েদের ওপর এই ধরনের প্রভাবের উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর মতে প্রতি দশ জনের মধ্যে নজন 'সতী'র ক্ষেত্রেই এই প্রভাব লক্ষ করা যেত।[৮০]

কিন্তু এটিও বিধবাদের স্বেচ্ছায় 'সতী' হওয়ার পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা নয়, সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা তো নয়ই। পরলোকে অক্ষয় পুণ্যলাভের বাসনার চেয়েও অনেক বেশি বাস্তব ছিল অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর কষ্ট। সেই ভয়কে অতিক্রম করেও যখন বিধবারা কোন কোন ক্ষেত্রে সহমৃতা হতে চাইত, তখন অনেকেই চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন যে অনির্দিষ্ট পুণ্যার্জন ছাড়াও এর পিছনে অন্য কোন গূঢ় কারণও থাকা সম্ভব। ১৮১৩ থেকে ১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষের গভর্ণর-জেনারেল লর্ড হেস্টিংসের ('মার্কুইজ অব হেস্টিংস') মনে হয়েছিল যে আদর্শগত কারণ ছাড়াও মেয়েদের 'সতী' হওযার পেছনে একটি জটিল মনস্তাত্ত্বিক কারণ কাজ করে। তিনি মেযেদের এই বাসনার পেছনে উত্তেজনা ও অভিযান প্রবৃত্তি আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর মতে, মেযেরা যেখানে স্বেচ্ছায় সহমৃতা হত, সেটি এক ধরনের আত্মহত্যা, এবং এই আত্মহত্যার মাধ্যমে তারা তাদের নিজেদের ইচ্ছার এক জাতীয় নেতিবাচক প্রকাশ ঘটাত। জীবিত অবস্থায তাদের ইচ্ছার কোন মূল্য ছিল না। এই অবরুদ্ধ ইচ্ছার আত্মপ্রকাশ ঘটত তাদের আত্মহত্যার অধিকার ঘোষণার মাধ্যমে। জীবন এত নিস্তরঙ্গ ও একঘেঁযে ছিল বলেই তাদের মধ্যে সহমরণের প্রবণতাও দেখা দিত। ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে জুন লর্ড হেস্টিংস তার দিনলিপিতে লিখেছিলেন যে স্বামীর মৃত্যু মেয়েদের জীবনে এক ধরনের বিপ্লবের সূচনা কবত।[৮১]

মেয়েদের অবদমিত বাসনা সংক্রান্ত এ ব্যাখ্যা যতটা মৌলিক, ততটাই অসম্পূর্ণ। লর্ড হেস্টিংস যে জটিল মনস্তাত্ত্বিক কাবণের কথা উল্লেখ করেছিলেন, তা অবশ্যই কিছুটা সত্য ছিল— বিশেষতঃ মেয়েদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিহীন সমাজ ব্যবস্থায় 'সতী' হওযার মাধ্যমে তারা নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছাকে জীবনে অন্তত একবার প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পেত। তাদের 'গর্বহীন দীপ্তিহীন' অস্তিত্বের মধ্যে সহসা লোকের চোখে 'দেবী' হযে ওঠার প্রলোভনও হযত এই সিদ্ধান্তের অন্যতম কারণ ছিল।[৮২] সর্বদা 'সতী'র এমনভাবে মাহাত্ম্যকীর্তন করা হত, সতীদাহের জায়গায় মঠ-মন্দির নির্মাণ করে যে ভাবে লোকজন ভক্তি নিবেদন কবত, তাতে ইহজীবনের উপেক্ষিত অস্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিত মৃত্যুর পরে মানুষের শ্রদ্ধা পাওয়ার দুর্দমনীয় স্পৃহার মধ্যে অস্বাভাবিকতা হয়ত তেমন নেই। অন্ততপক্ষে, এটি একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা তো হতেই পারে।

কিন্তু সম্ভবতঃ মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার চেয়েও বড় কারণ ছিল তৎকালীন সমাজব্যবস্থা। বৈধব্য জীবনে মেয়েদের অসীম দুঃখের মধ্যে দিন কাটাতে হত। তাদের অধিকাংশ সময়েই পরিবারের অন্যান্য উপার্জনশীল ব্যক্তিদের গলগ্রহ হয়ে থাকতে হত। মেয়েরা অনেক সময়েই মনে করত যে বিধবা অবস্থার দুঃসহ গ্লানিময় জীবনের তুলনায় মৃত্যুও অনেক ভাল। *Friend of India* পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল যে স্বামীর মৃত্যুর পর মেয়েদের কাছে একটা নির্বাচনের প্রশ্ন বড় হয়ে দাঁড়াত। সতীত্বের পুণ্যের জোরে পরলোকে তবু সৌভাগ্য আশা করা যায়, কিন্তু বৈধব্যদশায় পৃথিবীতে দুঃখময় অস্তিত্ব সুনিশ্চিত।[৮৩] লর্ড হেস্টিংস 'সতী' হওয়ার পেছনে মেয়েদের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার কথা

উল্লেখ করলেও, তিনিও মেয়েদের বৈধব্য জীবনের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর হেস্টিংস তাঁর দিনলিপিতে বিধবাদের বিবিধ দুর্ভাগ্যের কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন যে তাদের অবস্থা আরও দুর্বিষহ হয় যদি কোন সন্তান না থাকে।[৮৪] আর যদি তাদের ছেলে বা মেয়ে থাকে তা হলে ছেলের বৌ বা তার নিজের মেয়ে বাড়ির কর্ত্রী হয়ে বসে। বিধবার অবস্থা হয় অনেকটা দাসীদের মত। তখন তাদের বেঁচে থাকাটাই খুব কঠোর হয়ে পড়ে। অন্ধকার, অস্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশে তাদের দিনই কাটতে চায় না। তারা নিজেরা লেখাপড়া জানে না বলে বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরও তারা পড়াতে পারে না। লর্ড হেস্টিংস লক্ষ করেছিলেন যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইসব কারণ মিলেমিশে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হত যে মেয়েরা ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হয়ে 'সতী' হওয়ার কথা ঘোষণা করত। এই ঘোষণার পর সদ্য-বিধবারা যাতে তাদের কথা ফিরিয়ে না নিতে পারে, তার জন্য 'ভাং' বা ঐ জাতীয় কোন ওষুধ খাইয়ে দেওয়া হত।[৮৫]

মোটামুটি একই ধরনের কথা বলেছিলেন খ্রিষ্টধর্মপ্রচারক মার্শম্যানও। ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি তারিখের দিনলিপিতে হিবার সতীদাহ প্রসঙ্গে মার্শম্যানের মতামত লিপিবদ্ধ করেছিলেন। মার্শম্যান লক্ষ করেছিলেন যে তিনি বাংলাদেশে যখন প্রথম এসেছিলেন (১৭৯৯),তার তুলনায় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সতীদাহের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। মার্শম্যানের মতে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবারগুলি বিলাসিতা ও ইউরোপীয় আদব-কায়দা অনুকরণ করতে গিয়ে অপরিমিত অর্থব্যয়ের ফলে দরিদ্র হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় ব্যয় সঙ্কোচের জন্য তারা মা বা অন্যান্য বিধবা আত্মীয়দের ভরণপোষণের দায় থেকে অব্যাহতি পেতে চেয়ে বিধবাদের 'সতী' হতে উৎসাহিত করত। তাঁর মতে সতীদাহের অপর একটি প্রধান কারণ ছিল স্ত্রীর ওপর স্বামীর স্বত্ব বজায় রাখার বাসনা।[৮৬]

এরকম পৃথক পৃথক ভাবে কারণ না দেখিয়ে গোটা সমস্যাটির এক পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন রামমোহন রায়। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি জানিয়েছিলেন যে শাস্ত্রীয় নির্দেশ বা পরকালে অক্ষয় সুখশান্তির প্রতিশ্রুতি, এ দুটোর কোনটাই মেয়েদের সহমৃতা হতে চাওয়ার পুরো কারণ নয়। তাঁর মতে, বিধবাদের দুঃখ-কষ্ট ও প্রত্যাহিক অপমান দেখে মেয়েরা স্বামীর মৃত্যুর পর তাদের নিজেদের জীবনের ওপর যাবতীয় আসক্তি হারিয়ে ফেলত। পার্থিব জীবনের প্রতি এই ঔদাসীন্য এবং 'সতী' হলে ভবিষ্যৎ জীবনে শান্তির সম্ভাবনা, এই দুয়ের সম্মেলনেই মেয়েরা সহমৃতা হতে চাইত।[৮৭] তার ওপর, মেয়েদের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার ছিল অত্যন্ত সীমিত। ক্রফোর্ড বলেছিলেন যে যদি কোন বিবাহিত পুরুষ অপুত্রক অবস্থায় মারা যেত, তাহলে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত তার দত্তক পুত্র, আর যদি কোন দত্তক পুত্র না থাকত তাহলে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি পেত তার নিকটতম আত্মীয় এবং সেই আত্মীয়কে মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী ও নাবালক সন্তানদের পালন করতে হত।[৮৮] ক্রফোর্ডের এই মত অবশ্য সর্বাংশে ঠিক নয়। বলা যায়, মেয়েদের উত্তরাধিকারের ওপর অনেক বিধিনিষেধ ছিল।[৮৯] রামমোহন রায়ের মতে এই বিধি-নিষেধগুলি পুরুষদের বহুবিবাহ করতে উৎসাহিত করত।[৯০] এর ফলে বহুবিবাহকারী পুরুষের স্ত্রীদের ভরণপোষণের জন্য তাদের নিজেদের

আত্মীয়দের ওপর নির্ভর করতে হত (কারণ, বহুবিবাহকারী পুরুষের স্ত্রীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের পৈত্রিক বাড়িতেই থাকত)।[৯১] রামমোহন রায় দেখিয়েছিলেন যে এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীর মৃত্যুর পর সাধারণতঃ বিধবা স্ত্রীর কাছে তিনটি পথ খোলা থাকত : (১) আত্মীয়দের দয়ার ওপর একান্ত নির্ভরশীল হয়ে তাদের বাড়িতে সম্পূর্ণ দাসী হয়ে দুঃসহ জীবনযাপন করা, (২) আত্মনির্ভর ও স্বাধীন হওয়ার বাসনায় ধর্মচ্যুত হওয়া, কিংবা (৩) প্রতিবেশীদের প্রশংসা ও সম্মান মাথায় নিয়ে স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে 'সতী' হওয়া।[৯২] বৈধব্যজীবন ছিল অত্যন্ত কঠোর। এর প্রধান কারণ ছিল হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত একটি কুসংস্কার। চার্লস গ্রান্ট ১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দে লিখেছিলেন যে হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে মেয়েরা বিধবা হয় তাদের গত জন্মের পাপে। তৎকালীন যুগে প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, যে স্ত্রী বিধবা হয় সে নিশ্চয় গত জন্মে কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়া ছিল এবং সে তার স্বামীকে ত্যাগ করে অপর কোন পুরুষের সঙ্গে বাস করত ও সেই পরপুরুষের মৃত্যুর পর তার মৃতদেহের সঙ্গে সহমৃতা হয়েছিল। গ্রান্ট লিখেছিলেন যে এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য মেয়েদের দিয়ে বর্তমান জন্মে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করানো হত।[৯৩] অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে গ্রান্ট যা লক্ষ করেছিলেন, সেই বিশ্বাস উনবিংশ শতাব্দীতেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাঙালি সমাজে প্রচলিত ছিল। ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব* পুস্তিকাটির যুক্তি খণ্ডন করতে গিয়ে পীতাম্বর সেন কবিরত্নও মেয়েদের বৈধব্যের পেছনে পূর্বজন্মের পাপকেই প্রধান কারণ হিসেবে নির্দেশ করে লিখেছিলেন : 'পূর্বজন্ম কৃত পাপজন্য নারীদিগের বৈধব্যাবস্থা হয় [।] তাহা একবার পতির মৃত্যু হইলেক পুনর্বিবাহ করিয়া যদি তাহারো পূর্বজন্মীয় পাপ জাগ্রত বিধায় মৃত্যু হইলে তবে কতবার নারীদিগের বিবাহ হইতে পারে . . . যদিচ পুনঃ পুনর্বিবাহ তাহানহ [?] অসম্মত হয় তবে যে ভ্রূণহত্যাদি নিবৃত্তি কারণে এতদূর গমন পূর্ব্বক গলদঘর্ম্ম হইয়াছেন তাহার অনিবারণ হেতুক কেবল শয্যাতে মুত্রণ সার হইলেক আর যদি পুনঃ পুনর্বিবাহ যদি অনুমতি করেন তবে সে নারী যাহাকে পতি করিবেক সে ইত্যপাপবসতঃ [তদেব] আয়ুঃক্ষয় হইয়া সমন [তদেব] ভবন গমন করিলে এক নারীর কারণে কত পুরুষের প্রাণ বিয়োগ করিবার ইচ্ছা তাহা নিরূপণ করা উচিত বটে . . .।'[৯৪] অর্থাৎ বিধবাদের বিয়ে দিলেও,তারা অবার বিধবা হবে। কারণ, পূর্বজন্মকৃত অপরাধের দায়ভাগ বহন করা থেকে অব্যাহতি তাদের কখনই নেই। এখানে কবিরত্নের লেখায় আমরা এক নতুন তত্ত্বের আভাস পাই। বহুবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথা জর্জরিত বাঙালী সমাজে একজন স্বামীর মৃত্যু হলে একাধিক বিধবা হত। কবিরত্নের মতে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে ঠিক তার বিপরীতই ঘটার সম্ভাবনা। অপরিশোধ্য পাপের দণ্ডস্বরূপ যখন তাদের বিধবা হতেই হবে, তখন একজন নারীর দোষে একাধিক নির্দোষ পুরুষের মৃত্যুর মধ্যে তিনি অবিচার আবিষ্কার করেছিলেন।

আরও বহু সমসাময়িক রচনার মধ্যেই এই বিশ্বাসের সমর্থন পাওয়া যায়। যেহেতু বিধবারা আবার বিয়ে করলে তাদের অবশ্যকৃত্য প্রায়শ্চিত্ত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তাই অত্যন্ত অল্প বয়স্ক অক্ষতযোনি বিধবার বিয়েও হিন্দু সমাজে অকল্পনীয় ব্যাপার ছিল।[৯৫]

হিন্দু সমাজে বিধবাবিবাহের প্রতি বিরোধিতা যে কী প্রবল ছিল, তা একটি হিসেব থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহের উপর একটি ক্ষুদ্র

পুস্তিকা প্রকাশিত হওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই[৯৬] প্রায় ত্রিশজন পণ্ডিত বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করে পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন।[৯৭] যদিও বিদ্যাসাগরের পুস্তিকাটিও সংখ্যায় প্রচুর বিক্রি হত[৯৮] কিন্তু পরবর্তী কালে বিধবাবিবাহ নিয়ে বাঙালি সমাজে বিরোধিতার প্রাবল্য থেকে এ রকম অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে এই বিপুল সংখ্যক ক্রেতাদের অধিকাংশের কাছেই বিষয়বস্তুর অভিনবত্বের জন্য কৌতূহল নিরসনই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, বিধবাবিবাহকে সমর্থন করা হয়ত ছিল না। কারণ, বিধবাবিবাহের বিরোধী রচনাগুলির মধ্যে এই ধরনের বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করার প্রয়াস যেমন পাওয়া যায়, সে রকম বিধবাদের চরিত্র বিষয়েও সন্দিগ্ধ মন্তব্য করা হত। এই মন্তব্যগুলিতে প্রকৃতপক্ষে মেয়েদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলনই পাওয়া যায়।

শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ বিধবাবিবাহের ফলে একটি ঘোরতর সামাজিক 'অনিষ্ট' ঘটার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর মতে, হিন্দু স্ত্রীবা জানে যে স্বামীই তাদের জীবনের সর্বস্ব, তাই তারা প্রাণপাত করেও স্বামীকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। এমনকি, ব্যাভিচারিণীরাও তাদের ব্যবহারে স্বামীর বশ্যতা স্বীকার করে। কারণ, স্বামী জীবিত থাকলে তবু অনেক কলঙ্ক গোপন করার সুযোগ থাকে, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পব নানাবিধ দুর্ঘটনা ও সামাজিক কলঙ্কের ভযে ব্যাভিচারিণীদেরও পরপুরুষসঙ্গ ত্যাগ করতে হয। কিন্তু বিধবাবিবাহ চালু হলে 'পত্নীরা যখন জানিবে যে আমার পতি অতিশয় পীড়াগ্রস্থ কিম্বা রতিকার্য্যে অপটু, সর্বদা প্রবাসী, অথবা উপপত্নীতে আশক্ত [তদেব] তখনই তাহারা মনে করিবে যে, এ পতির মৃত্যু হউক, শান্ত বর্নিতারা ঐ প্রকার মনে করিযা যত্নের ত্রুটি করিবে, কিন্তু দুর্ব্বৃত্তারা তাদৃশ পতির প্রাণ বিনাশেরই চেষ্টা করিবে।'[৯৯] অথচ, প্রায ছয দশক আগে, সতীদাহ প্রথা রদ প্রসঙ্গে যখন একই ধরণের বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ ওঠে তখন রামমোহন রায় স্পষ্ট বলেছিলেন যে বিশ্বাসঘাতকতা করে প্রধানতঃ পুরুষরাই। বিশ্বাসঘাতকা বিষয়ে রামমোহন লিখেছিলেন : 'এ দোষ পুরুষে অধিক কি স্ত্রীতে অধিক উভয়ের চরিত্র দৃষ্টি করিলে বিদিত হইবেক। প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে বিবেচনা কর, যে কত স্ত্রী পুরুষ হইতে প্রতারিতা হইয়াছে আর কত পুরুষ স্ত্রী হইতে প্রতারণা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমরা অনুভব করি যে প্রতারিত স্ত্রীর সংখ্যা দশগুণ অধিক হইবেক, তবে পুরুষেরা প্রায় লেখাপড়াতে পারগ এবং নানা কাজকর্ম্মে অধিকার রাখেন, যাহার দ্বারা স্ত্রীলোকের কোন এরূপ অপরাধ কদাচিৎ হইলে সর্ব্বত্র বিখ্যাত অনায়াসেই করেন, অথচ পুরুষে স্ত্রীলোককে প্রতারণা করিলে তাহা দোষের মধ্যে গণনা করেন না।'[১০০] রামমোহন এটি ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দে লিখেছিলেন, কিন্তু ১৮৫০-এর দশকের মধ্যভাগেও মেয়েদের চরিত্র সম্বন্ধে এই অবিশ্বাস ও সন্দেহ পুরোপুরি বর্তমান ছিল।

এর সঙ্গে সমানুপাতিকভাবে ছিল মেয়েদের সমস্যাকে সহানুভুতির সঙ্গে বিবেচনা করার দৃষ্টিভঙ্গির অভাব। রামধন দেবশর্মা বিধবাবিবাহের বিপক্ষে যে প্রধান দুটি যুক্তি দিয়েছিলেন, তাতেও এই সহানুভূতির অভাবই চোখে পড়ে। তাঁর মতে বিধবাবিবাহ চালু হলে ঈশ্বরের অভিপ্রেত প্রজাবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে, এটা যদি সত্য হয়, তাহলে ঈশ্বর বন্ধ্যা স্ত্রী সৃষ্টি করলেন কেন, আর মেয়েদেরই বা রজোনিবৃত্তির ব্যবস্থা করলেন কেন ? যদি বন্ধ্যা স্ত্রী অদৃষ্ট হয়, তবে বৈধব্যও অদৃষ্ট। সুতরাং ঈশ্বরের ব্যবস্থায় যা অদৃষ্ট,মানুষের তাকে পরিবর্তনের চেষ্টা করা অর্থহীন। বিধবাবিবাহের অপ্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করার

জন্য রামধন দেবশর্মা আরও একটি যুক্তির অবতারণা করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের বক্তব্য ছিল, স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুরুষ আবার দার পরিগ্রহ করতে পারলে মেয়েরাই বা পারবে না কেন ? এই সাম্যবাদী যুক্তির অসারত্ব প্রমাণ করার জন্য রামধন দেবশর্মা বলেছিলেন যে পুরুষ পুরুষ এবং মেয়ে মেয়ে—এই কারণেই তাদের ব্যবহাররীতি পৃথক হতে বাধ্য। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত পরুষের কামস্পৃহা বর্তমান থাকে, আর মেয়েদের 'স্তনপতনাবধি রতি। অর্থাৎ স্তন পতনের পর কোন প্রতি বন্দক [প্রতিবন্ধক] বশত রতির সম্ভব না থাকা। এক্ষণে বিবেচনা করুন স্ত্রী পুরুষ কদাচ সমান হয় না।'[১০১]

শুধু একটি-দুটি এ রকম প্রক্ষিপ্ত রচনা নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু রচনাতেই এই একই ধরনের বক্তব্য এত বারবার চোখে পড়ে যে এই মন্তব্যগুলিকে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজের এক বড় অংশের দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। এটি রাখালদাস হালদারের রচনা থেকেও প্রমাণিত হয়। বিধবাবিবাহের বিরোধীদের যুক্তি খণ্ডন করার জন্য রাখালদাস হালদার যে প্রত্যুত্তর রচনা করেছিলেন (এই রচনাটি পরবর্তীকালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি। বর্তমানে এটি পাণ্ডুলিপি আকারে বিশ্বভারতীর 'রবীন্দ্রভবনে' রক্ষিত আছে), তার মধ্যেও তিনি বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে বাঙালি সমাজের চারটি প্রধান আপত্তির উল্লেখ করেছিলেন। এই যুক্তিগুলি হল : (এক) বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে 'অনেক স্ত্রী অমনোনীত স্বামীকে বিনাশ পূর্ব্বক অন্য পতি গ্রহণ' করবে, (দুই) যে দেশে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে, সে দেশের অধিকাংশ মেয়েরা অসতী, (তিন) যে মেয়েরা ভ্রূণ হত্যা করতে পারে, তারা স্বামী হত্যাও করতে সক্ষম, (চার) যৌবন ক্ষণস্থায়ী সুতরাং বিধবাবিবাহের প্রয়োজন কী ?[১০২] প্রাণনাথ পণ্ডিত বলেছিলেন যে পুনর্বিবাহিতা বিধবাকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত না করলে দেশে অসতী নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হবে : 'সাভিনিবেশ দৃষ্টিপাত করুন অধিকতর অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাইবেন। ভদ্রাসনে বিধবার সর্ব্বাংশে তুল্যাধিকার। সে সেই গৃহে নিরুপায় দেবরদ্বয়ের পুত্রকন্যা পরিবারের মধ্যে ও সমক্ষে যথেচ্ছ ব্যাভিচারে প্রবৃত্ত হইবে।'[১০৩] এই অবিশ্বাস কেবল দু-একজন ব্যক্তির পৃথক বৈশিষ্ট্য ছিল না, এটি ছিল বাঙালি সমাজের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য। বেথুন সোসাইটি আয়োজিত এক সভায় প্রদত্ত একটি ভাষণে বিধবাদের অবস্থা বর্ণনা করে হরচন্দ্র দত্ত মন্তব্য করেছিলেন যে বৈধব্যদশা সহানুভূতি বা অনুকম্পার পরিবর্তে মেয়েদের জীবনে ডেকে আনে অবহেলা, তিরস্কার, নিন্দামন্দ ও অসম্মান।[১০৪]

বৈধব্যজীবনের কঠোরতার কিছু পরিচয় পাওয়া যায় প্রসন্নকুমার ঠাকুর সম্পাদিত উদারনৈতিক ইংরেজি সাপ্তাহিক *Reformer* পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি রচনায়। সম্পাদকের প্রতি পত্রাকারে রচিত একটি প্রবন্ধে জনৈক 'R' স্বাক্ষরকারী ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ তারিখে লিখেছিলেন যে স্বামীর মৃত্যুর পর মেয়েদের পুনর্বিবাহের বয়স থাকলেও তাদের বাকি জীবন ব্রহ্মচর্য পালন করতে হত এবং তাদের জীবনাযাপনও ছিল অত্যন্ত কঠোর। মাসের মধ্যে নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন তাদের অনাহারে থাকতে হত। এছাড়া তাদের প্রাত্যহিক খাবারেও সংযম পালন করতে হত—সমস্ত দিন-রাত্রির মধ্যে তারা মাত্র একবার ভাত খেতে পেত, তাও মাত্র এক কড়ির সমান ওজনের ঘি ও অন্যান্য কিছু তরকারি দিয়ে।[১০৫] বিধবাবিবাহ আইন পাস হয়ে যাওয়ার ঈষৎ পরবর্তী কালের রচনা হলেও ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারক জগৎচন্দ্র গাংগুলী হিন্দুদের সামাজিক জীবন বর্ণনা

করতে গিয়ে বিধবাদের অপরিসীম কষ্টের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, তেরো-চোদ্দ বছরের বিধবাদের কষ্ট-হতাশা কে দেখতে পারে? গ্রীষ্মকালে যখন পুকুরের জল শুকিয়ে যায়, গাছের পাতা ঝলসে যায় তখন কুসংস্কারের বলে এই মেয়েরা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় হাঁপাতে থাকে, অজ্ঞান হয়ে যায়।[১০৬] দীনবন্ধু মিত্রের *বিয়ে পাগলা বুড়ো* (প্রথম প্রকাশ, ১৮৬৬) নাটকের একটি চরিত্রের সংলাপে বিধবাদের কঠোর জীবনযাপনের ছবি খুব জীবন্ত হয়ে ধরা পড়েছে। এই নাটকে গৌরমণি তার দিদি রামমণিকে বলছে : 'দিদি। বালিকা বিধবাদের কত যাতনা . . . একাদশীর উপবাসে আমাদের অঙ্গ জ্বলে যায়, পেটের ভিতর পাঁজার আগুন জ্বলতে থাকে, জ্বর বিকারে এমন পিপাসা হয় না। একখান থাল নিয়ে পেটে দিই, তাতে কি জ্বালা নিবারণ হয়। দ্বাদশীর দিন সকালে গলা কাঠের মত শুকিয়ে থাকে, যেমন জল ঢেলে দিই তেমনি গলা চিরে যায়, তার জন্যে আবার কদিন ক্লেশ পেতে হয়। আমি যখন সধবা ছিলেম, তখন তিনবার ভাত খেতেম, এখন একবাব বই খেতে নাই, রেতে খিদেয় যদি মরি তবু আর খেতে পাব না।'[১০৭]

সোমপ্রকাশ পত্রিকায় এক বিধবা কন্যার মাতা ছন্দোবদ্ধভাবে এই একই বর্ণনা দিয়েছিলেন :

কেমনে হেরিব আমি এ চাঁদ বদন।
শুকায়ে হয়েছে যেন কালীর বরণ ॥
অবলা বধিতে হেন সংহার তামসী।
কে সৃজিল বল পাপ একাদশী ॥

. . .

না গেল গলের অধে বিন্দুমাত্র বারি।
এ সব যাতন আর দেখিতে না পারি ॥

. . .

চলিবার শক্তি নাই মুখে নাই রব।
জিয়ন্তে হয়েছে বাছা শ্মশানের শব ॥

সবশেষে, মেয়ের এই অসহনীয় দুঃখ দেখে অসহায় মায়ের সমস্ত ক্রোধ গিয়ে পড়েছিল শাস্ত্রকর্তা ও শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া পুরুষ জাতির ওপব।[১০৮]

এর ওপর ছিল বিধবাদের প্রতি পারিবারিক অবহেলা। রেভঃ কে.এম. ব্যানার্জি মন্তব্য করেছিলেন যে অল্পবয়সী বিধবার যদি সম্পত্তি না থাকে তাহলে বাড়িতে তাকে দাসীর মত থাকতে হয়।[১০৯] বিধবাদের প্রতি এই মনোভাব বাঙালি সমাজে গত শতকে খুব বেশি পরিবর্তিত হয়নি। এর প্রায় চার দশক পরের রচনাও সাক্ষ্য দেয় যে প্রায়শই পরিবারের অন্যান্য সদস্যারা বিধবাদের সঙ্গে দাসীর পার্থক্য করত না।[১১০] বিধবাদের পারিবারিক মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়* অক্ষয়কুমার দত্ত[১১১] লিখেছিলেন : 'স্বামীর মৃত্যু হইলে, তাঁহার বিধবা ভার্য্যা নিরাশ ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া নিতান্ত পরাধীন হইয়া পড়ে। ভর্ত্তার ভগিনী ও ভ্রাতৃবধূ প্রভৃতি যাহারা চিরকালই তাহার বিদ্বেষিণী, তাহারা তখন অবসর পাইয়া মনোভিলাষ সাধন করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহাকে সাতিশয় শ্রমসাধ্য কঠিন কঠিন গৃহ-কর্ম্মে নিযুক্ত করে, এবং সামান্য সামান্য বিবাদসূত্র

উপলক্ষ করিয়া নিগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন কে বা তাহার বিষণ্ণ বদন দর্শন করিয়া কৃপা করিবে? কে বা তাহার বাষ্পাকুল লোচনের অশ্রুবারি মোচন করিবার চেষ্টা পাইবে? . . . কোন বিধবা স্ত্রী আপন গৃহে এইরূপ অশেষবিধি ক্লেশ স্বীকার করিয়া দাসীভাবে জীবন নিঃশেষিত করে।'[১১২]

যেহেতু কৌলীন্য ও বহুবিবাহ গত শতকের সমাজে একটি অতি প্রচলিত প্রথা ছিল এবং যেহেতু অতি অল্প বয়স্ক মেয়ের সঙ্গে বৃদ্ধ ব্যক্তির বিবাহও প্রচুর হত, তাই গত শতকের বাঙালি সমাজে বাল্যবিধবার সংখ্যাও ছিল সুপ্রচুর। সাধারণভাবে বিধবাদের বিশেষ করে বাল্যবিধবাদের সারা জীবনই এই 'অসহ্য যন্ত্রণা' ভোগ করতে হত।[১১৩] অন্ন সংস্থানের উপায়ান্তর না থাকায় অনেক বিধবাই পারিবারিক অবহেলা ও শারীরিক কষ্ট সহ্য করত। কিন্তু ব্রহ্মচর্যের আদর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন করা অনেকের পক্ষেই (বিশেষতঃ, বাল্যবিধবারা যখন যুবতী হত) সম্ভব ছিল না। এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত সমস্যা বাঙালি জীবনে বেশ ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। গত শতকের বিভিন্ন লেখাপত্র পড়লে মনে হয় যে এই বিষয়টি সম্বন্ধে অনেকেই অবহিত ছিলেন। মেদিনীপুর জেলার কয়েকজন 'বিপ্রকুলোদ্ভবা বিধবা' *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকায় (১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৬২ বঃ) প্রেরিত একটি পত্রে বিধবাবিবাহের বিরোধীদের সম্বন্ধে লিখেছিলেন : '. . . কিন্তু তাঁহারদিগের বাটীর বিধবারা অসহ্য ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালনে যে অপারগ হইয়া স্বেচ্ছাচারিণী হইতেছে তাঁহারা কি একবারও নেত্রোন্মীলন করিয়া দেখেন না? কি আক্ষেপের বিষয়।'[১১৪] বিধবাদের 'স্বেচ্ছাচারিণী' হওয়ার প্রবণতাকে বিধবাবিবাহের সমর্থকরা নিজেদের পক্ষে অন্যতম প্রধান যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।

রাখালদাস হালদার তাঁর অপ্রকাশিত 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া অবশ্য উচিত' রচনায় লিখেছিলেন : 'অনেক বিধবা অক্ষমতাপ্রযুক্ত কামকে চরিতার্থ করিয়া শত শত ভ্রূণহত্যা করিতেছে . . . অনেকে গৃহ পরিত্যাগ করিতেছে . . . কেহ কেহ বিষপানপূর্ব্বক জীবন নষ্ট করিতেছে।'[১১৫] পুরুষসংসর্গরহিত বিধবাদের স্বাভাবিক রিরংসা, তাদের অবৈধ কাম চরিতার্থতা এবং পরিণতিতে ভ্রূণহত্যার প্রসঙ্গ *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়ও* একাধিকবার আলোচিত হয়েছিল। পূর্বোল্লিখিত 'বিধবা বিবাহ' প্রবন্ধে বলা হয়েছিল : 'স্ত্রী লোকের রিপুবিশেষ পুরুষদিগের অপেক্ষায় অষ্টগুণ প্রবল এতদ্দেশীয় লোকের হৃদয়ঙ্গম আছে, অথচ প্রচলিত প্রথানুসারে, পুরুষেরা সহস্রবার বিবাহ করিতে পারেন, কিন্তু পতিহীনা অবলারা দ্বিতীয় স্বামীর পাণিগ্রহণ করিবার অধিকারিণী নহে, ইহা অপেক্ষায় আশ্চর্য্যের বিষয় আর কিছু নাই।'[১১৬] তাই, 'এতদ্দেশীয় লোকে স্ত্রীলোকদিগকে যত কেন অবরুদ্ধ করিয়া রাখুন না, সকল স্ত্রীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি একেবারে রুদ্ধ করিতে কদাচ সমর্থ হইবেন না। প্রত্যুত, ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্রাদি বহু ব্যক্তি সপরিবারে এক গৃহে একত্র বাস করাতে এবং স্ত্রীলোক পরস্পরা সকলে অবরোধ মধ্যে সতত অবরুদ্ধ থাকাতে, এতাদৃশ ভয়ঙ্কর পাপের উৎপত্তি হয়, যে বেশ্যা-বৃত্তি অবলম্বনও তদপেক্ষায় শ্রেয়স্কর। . . . বিধবাবিবাহের প্রতিষেধকবিষয়ক কুৎসিৎ প্রথায় উল্লিখিত কারণদ্বয়ের সাহচর্য্য থাকতে, কত স্থানে কত পরিবার উক্ত প্রকারে কলঙ্কিত হইয়াছে, তাহা গণনা করিয়া কে বলিতে পারে। সুতরাং ভ্রূণহত্যা ঐ পাপময়ী প্রথার অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য্য ফল।'[১১৭] বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়ন এবং কলকাতায় প্রথম বিধবাবিবাহ (২৩শে অগ্রহায়ণ, ১২৬৩ বঃ)

অনুষ্ঠিত হওয়ার পর এই আইনকে স্বাগত জানিয়ে লেখা হয়েছিল : 'এদেশে পতিহীনা অনাথাদিগের পুনরুদ্ধারের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে যে এখানে ভ্রূণহত্যা স্ত্রীহত্যা ব্যাভিচার প্রভৃতি নানা প্রকার উৎকট উৎকট পাপের পথ পরিস্কৃত ছিল, তাহা নানা পণ্ডিত বারম্বার নানা প্রকার যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন . . .।'[১১৮]

বিধবাদের এই অবস্থা সবচেয়ে দরদিভাবে বর্ণনা করেছিলেন অবশ্যই বিদ্যাসাগর স্বয়ং। বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত পুস্তকের শেষে তিনি 'ভারতবর্ষীয় মানবগণ'কে সম্বোধন করে লিখেছিলেন : 'অভ্যাসদোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে, তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হওয়া কঠিন এবং ব্যাভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিযাও মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। . . . তোমরা মনে কর পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়, দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না, যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না, দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায়।'[১১৯]

'দুর্জয় রিপুবর্গ' যে সত্যিই নির্মূল হত না ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ সংস্কারমূলক লেখাপত্র থেকে তা পরিস্কার বোঝা যায়। 'রাঁড়' শব্দটির আদি অর্থ বিধবা।[১২০] কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে অসতী নারী অর্থে এই শব্দটির বহু ব্যবহার লক্ষ করা যায়।[১২১] তার একটি সহজবোধ্য কারণ বোধহয় এই যে অনবদমিত রিরংসা থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিণতি হিসেবে বিধবাদের মধ্যে অনেকের কাছেই বারাঙ্গণাবৃত্তি গ্রহণ ভিন্ন উপায়ান্তর থাকত না। বিধবানারীর পক্ষে ভোগের আকাঙ্ক্ষা যে কতটা সর্বনাশকর এবং তাকে যে বিপথগামিনী হওয়া থেকে রক্ষা করা কতটা প্রয়োজনীয় সে বিষয়ে একটি জনপ্রিয় বাংলা প্রবাদ ছিল—'রাঁড়ী হয়ে ভোগ বালাই, ডাক বলে আগে তারে সামলাই।'[১২২] গত শতকের একটি পত্রিকায় সমাজে মেয়েদের উপযোগিতা সম্বন্ধে একটি সংলাপে এক চরিত্র বলেছিল যে মেয়েরা 'রাঁড় হয়ে বাপ, মা বা শ্বশুর কুলের গলায় দড়ী [তদেব] হয়।'[১২৩] রাঁড় বা বিধবা হয়ে আত্মীয়কুলে কলঙ্কারোপের যে ধারণা এখানে ব্যক্ত হয়েছিল, তা থেকে বিধবাদের 'অসতীত্ব' সম্বন্ধেও ধারণা করা সম্ভব। দাশরথি রায়ের পাঁচালীতে 'বাবু'দের যে চারটি সর্বক্ষণের সঙ্গীর উল্লেখ পাওয়া যায়, সেগুলি হল 'ব্রান্ডী-রেন্ডী-গাজা- গুলী'।[১২৪] বঙ্কিমচন্দ্রকথিত একটি গল্প থেকে জানা যায় যে চণ্ডীচরণ সেন নামে জনৈক বিচারক একবার মন্তব্য করেছিলেন যে বাঙালি বিধবাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বইজনই অসতী। কাহিনীটি উল্লেখ করে বঙ্কিমচন্দ্র ঠাট্টা করে বলেছিলেন যে আর একটিকেই বা উনি সতী রাখলেন কেন ?[১২৫] বঙ্কিমচন্দ্রের পরিহাস থেকেই বোঝা যায় যে চণ্ডীচরণের এ মন্তব্যটি অতিরঞ্জিত। কিন্তু এই সমস্যাটি যে অত্যন্ত ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল, তা হুতোম বাউলের একটি গানের প্রথম দুই চরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় :

> আজব সহর কলকেতা।
> রাঁড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি মিছে কথার কি কেতা।[১২৬]

গণিকা অর্থে রাঁড় শব্দের এই বহুল প্রচলন থেকে আমরা বিধবাদের নৈতিক 'স্খলন' সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি এবং বিধবাদের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতটি মনে রাখলে

এই 'স্খলন'কে খুব অস্বাভাবিক মনে হয় না। ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দের পর বিধবাবিবাহ আইনসম্মত হয়েছিল বটে, কিন্তু সমাজ খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাতে সাড়া দেয়নি। একটি বা দুটি বিধবাবিবাহ যা ঘটত, তাতে বাঙালি সমাজে আলোড়ন যতটা সৃষ্টি হত, ততটা প্রভাব পড়ত না। বিধবাবিবাহের প্রতি বাঙালি সমাজের একটি সাধারণ অনীহা ছিল। ফলে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ বিধবার মধ্যে ষাট-সত্তর জনের বেশির বিয়ে হয়নি।[১২৭] এবং উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বিভিন্ন লেখা থেকে মনে হয় যে বাঙালি পরিবারে বিধবাদের মর্যাদা ও জীবনযাপনের ধারা আগের তুলনায় খুব বেশি পরিবর্তিত হয়নি।

সব মিলিয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে মেয়েদের অবস্থা আদৌ ঈর্ষণীয় ছিল না। বাল্যবিবাহ, দীর্ঘ বৈধব্যজীবন, বহুবিবাহ প্রভৃতি প্রথা জর্জরিত বাঙালি সমাজে মেয়েদের দুঃখময় অস্তিত্বের অপর একটি বড় কারণ ছিল তাদের শিক্ষার অভাব। মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উনবিংশ শতাব্দীর আগে অনুভূত হয়নি। মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা বিষয়ে অনেকগুলি কুসংস্কার কাজ করত। তার মধ্যে প্রধানটি ছিল, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয়ে যায়।[১২৮] উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ভাবধারার সান্নিধ্যলাভের ফলে কয়েকজন ব্যক্তিমাত্র স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা বুঝতে পেরেছিলেন। *সমাচার দর্পণ* মন্তব্য করেছিল, 'স্ত্রীলোক যদি বিদ্যাভ্যাস করে তবে অতি শীঘ্র জ্ঞানাপন্না হইতে পারে। অতএব যেমত গৃহকর্ম্মাদি শিক্ষা করান সেমত বালক কালে বিদ্যাশিক্ষা করান উচিত।'[১২৯] এটি ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দের রচনা। তার বহুদিন পরেও মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে বাঙালি সমাজের অনীহা ও সন্দিগ্ধতা দূর হয়নি। বিধবাবিবাহের মত স্ত্রীশিক্ষাকেও বাঙালিরা খুব সহজে গ্রহণ করতে পারেনি। মেয়েদের শিক্ষার অভাবের পরিণাম আরও বেশি অনুভূত হয়েছিল গত শতকে পুরুষদের শিক্ষালাভের পর। পুরুষরা চিরকালই শিক্ষা গ্রহণ করত—কিন্তু গত শতকে নতুন নতুন শিক্ষা-নির্ভর বৃত্তির পথ উন্মোচিত হওয়ায় উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হওয়া খুব স্বাভাবিক ছিল। জাতি-নির্ভর বৃত্তির স্থান নিয়েছিল শিক্ষা-নির্ভর বৃত্তি। শহর কলকাতায় সদ্য গড়ে ওঠা ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে চাকুরি পাওয়ার প্রধান শর্ত ছিল ইংরেজি ভাষায় জ্ঞান।[১৩০] উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই শিক্ষা পুরোপুরি পেত পুরুষরাই। নতুন শিক্ষার আগমনের ফলে পুরুষ ও নারীর সাংস্কৃতিক জীবনে ঘটে গেল এক আপাদমস্তক পার্থক্য। মেয়েদের সঙ্গে ছেলেদের সাংস্কৃতিক জীবনে এতদিন খুব পার্থক্য ছিল না। কিন্তু পুরুষদের মধ্যে তুলনামুলকভাবে শিক্ষা বিস্তারের ফলে অন্তঃপুরবাসিনী মেয়েরা তাদের তুলনায় আরও বহুলাংশে পিছিয়ে রইল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বা আরও আগে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে হয়ত এতটা পার্থক্য চোখে পড়ত না।

এর সঙ্গে আরও একটি নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায়। কলকাতার উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন শ্রেণীও গড়ে উঠেছিল—'বাবু' শ্রেণী। বাবু সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রায় শৌখিনতা ও শৈথিল্য গত শতকের বাঙালি সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাবু শ্রেণীর জীবনধরার ছবি খুব সার্থক ভাবে ফুটে উঠেছিল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *কলিকাতা কমলালয়* (১৮২৩) ও *নববাবু বিলাস* (১৮২৫) গ্রন্থ দুটিতে। হঠাৎ ধনস্ফীত ও স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তিদের ভবানীচরণ 'নববাবু' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। এদের বিদ্যার প্রতি কোন অনুরাগ ছিল না, জীবন ছিল বিলাসবহুল এবং নীতিবোধ ছিল

শিথিল। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে এক অবারিত যৌনাচার লক্ষ করা যায়। বাবু সম্প্রদায়ের অনেকেই উপপত্নী রাখতেন, বাগানবাড়িতে যেতেন এবং বাঙালি সমাজে গণিকার পোষকতা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে অনেকের কাছেই এটি দুর্নীতি বলে বোধ হত না। দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন যে গণিকালয়গুলি পরস্পরের সাক্ষাৎ ও আমোদের স্থান হয়ে উঠেছিল, রাত দেড়টা পর্যন্ত এইসব স্থানে নিয়মিত জনসমাগম হত এবং 'লোকে পূজার রাত্রিতে যেমন প্রতিমা দর্শণ করিয়া বেড়াইতেন, বিজয়ার রাত্রিতে তেমনই বেশ্যা দেখিয়া বেড়াইতেন।'[১৩১]

এই সার্বিক অনৈতিকতা, পুরুষ-সমাজের একাংশের চারিত্রিক অধঃপতন, প্রভৃতি মেয়েদের মর্যাদাকে আরও নামিয়ে দিয়েছিল। ভবানীচরণের *নববাবু বিলাস* গ্রন্থে আমরা বাবুদের বারাঙ্গণাসক্তির বিস্তারিত ছবি পাই। ভবানীচরণ লিখেছিলেন যে নববাবুরা 'কখন নিজাগারে কখন বেশ্যামন্দিরে' মজা করে বেড়ান।[১৩২] সমাজের এই ব্যাপক বারাঙ্গণাসক্তির দায়ভাগ বহন করতে হয়েছিল অন্তঃপুরের মেয়েদের। পরনারীর প্রতি আসক্তি পুরনারীর মর্যাদাকে করেছিলে ভূলুণ্ঠিত। নীরদচন্দ্র চৌধুরী মন্তব্য করেছিলেন যে কূলবধূদের কেউ চিনত না, যাদের সবাই চিনত তারা হল বকনাপিয়ারী, কোঁকড়াপিয়ারী, দামড়াগোপী, ছাড়ুখাগী, ওমদা খানুম, পেয়ারা খানুম, নান্নিজান, মুন্নিজান, স্বপনজান প্রমুখ।[১৩৩] এই নামগুলি নীরদ চৌধুরীর অবশ্যই নিজস্ব সৃষ্টি নয়, *নববাবু বিলাস* গ্রন্থে এদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্বনামধন্যা গণিকাদের নাম পৃথকভাবে উল্লেখ করাতে বোঝা যায় তৎকালীন সমাজে এঁদের কী প্রবল প্রতিপত্তি ছিল।

পতিসঙ্গবঞ্চিতা বিবহিণী কুলকামিনীদেব মানসিক যন্ত্রণার ছবি খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে কয়েকটি কবিগানে। কবিগানের বিষয়বস্তু ছিল বৈষ্ণব ভাবপ্রধান। তবু তারই ভেতর থেকে রাধা-কৃষ্ণের মোড়কের আড়ালে কুলস্ত্রীদের মর্মবেদনার কিছু আভাস পাওয়া যায়।[১৩৪] রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিত্যানন্দ বৈরাগী, নীলু ঠাকুর প্রমুখ সে যুগের প্রায় সমস্ত কবিওয়ালার গানেই পুরনারীর বেদনাহত হৃদয়ের ছবির প্রকাশ ঘটেছিল। যেহেতু কবিগানের প্রধান কেন্দ্র ছিল কলকাতা নগরী,[১৩৫] তাই এই গানের ও তার জনপ্রিয়তার এক ভিন্নতর সামাজিক তাৎপর্য ছিল। এঁদের রচনায় মেয়েদের আক্ষেপ, দুঃখ ও হতশ্বাসের এমন সার্থক ও সজীব প্রতিফলন পড়েছিল যে মনে হয়, এই মানসিকতার বাস্তব প্রতিমূর্তির সঙ্গে তাদের সম্যক পরিচয় ছিল।

॥ তিন ॥

উনিশ শতকের সূচনায় মেয়েদের অবস্থার খুব পূর্ণ ছবি আঁকা প্রায় অসম্ভব। এর প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলি আলোচনা প্রারম্ভেই উল্লিখিত হয়েছে — উপাদানের অভাব। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ বিষয়টি অনুধাবন করতে কোন অসুবিধা হয় না যে গত শতকের সূচনায় মেয়েরা ছিল বাঙালি সমাজে সর্বাধিক অনাদৃত ও আদ্যন্ত অবহেলিত। মেয়ে হয়ে জন্মগ্রহণ করাই ছিল দুর্ভাগ্যের সূচক। জগৎচন্দ্র গাংগুলী লিখেছিলেন যে ছেলের জন্ম হলে ছেলের মাকে বলা হত 'হীরা বিউনি' (রত্নগর্ভা অর্থে)। বাড়ীতে শুরু হত আনন্দ, উৎসব। কিন্তু মেয়ে জন্মালে ঠিক এর বিপরীত ছবি চোখে পড়ত।[১৩৬] এমনকি প্রসূতি

স্বয়ং মেয়ে হয়েছে শুনলে এত মুষড়ে পড়ত যে মানসিকভাবে উজ্জীবিত রাখার জন্য তাকে সাময়িক স্তোক দিয়ে বলা হত যে ছেলে হয়েছে। অবশ্য অল্প পরেই যখন তার চেতনা ফিরে আসত, যখন সে শাঁখের শব্দ শুনত না (কেবল ছেলে জন্মালেই শাঁখ বাজত) তখনই সে বুঝতে পারত মেয়ে জন্মেছে। ফলে অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়ত।[১৩৭] প্রসূতিরই যখন এই মনে হত, সেখানে কন্যার আগমনকে স্বাগত জানানোর জন্য কোন অনুষ্ঠান তো হতই না, বরং নিরানন্দই যেন গাঢ় হয়ে নেমে আসত বাঙালি পরিবারে। এই অবস্থাটির খুব বাস্তব প্রকাশ ঘটেছিল *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকায় একটি পত্রে। 'অহং কৌতুকদর্শক' নামের অন্তরালে পত্রকার লিখেছিলেন : 'স্ত্রীলোকেরা যে অবধি গর্ভধারিণী হয় সেই পর্যন্ত তাহার আত্মীয়বর্গেরা দেব-দেবি নিকট প্রার্থনা করেন যে একটি পুত্র সন্তান হউক। . . . কিন্তু কি আশ্চর্য্য যে কেহ কখন বিস্মৃতক্রমে কহেন না যে এ জনের একটি মেয়ে অর্থাৎ কন্যা সন্তান হউক, তাহার পর দশ মাস দশদিবস গত হইলে প্রসব হইবার নিমিত্তে ওই গর্ভিণি [তদেব] যখন শুতিকা [তদেব] গৃহে প্রবেশ করেন তখন তাহার স্বামী পিতা মাতা ইত্যাদি সকলে এই অনুমান করেন যে কি ছেলে হইল, গর্ভিনি [তদেব] কেমন আছে বলিয়া একটি কথাও কেহ জিজ্ঞাসা করে না। . . . যদি গর্ভধারিণির দুর্দ্দশা প্রযুক্ত কন্যা সন্তান জন্মে তবে মস্তকে বজ্রাঘাতের ন্যায় নিরানন্দের শব্দ পরিজনের মধ্যে উঠে।[১৩৮] . . . পুত্র সন্তানের ঠিকুজি হয় . . . কিন্তু কি আশ্চর্য্য যে, কন্যার . . . কোন মাসে জন্ম হইয়াছে তাহা নির্ণয় থাকে না।'[১৩৯] শুধু তাই নয়। হিন্দু কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ জেমস্ কার লিখেছিলেন যে ছেলে জন্মাল ধাই পেত পুরো এক টাকা, আর মেয়ে জন্মালে তাকে দেওয়া হত আট আনা।[১৪০]

প্রকৃতপক্ষে, এটিও ছিল বাঙালি হিন্দু সমাজের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাঙালি সমাজে স্ত্রীর ভূমিকা ও কর্তব্য সম্বন্ধে যে ধ্যান-ধারণা প্রচলিত ছিল, তা থেকেই এই মনোভাবের উৎপত্তি হয়েছিল। বিবাহ ছিল মানুষের জীবনে দশটি সংস্কারের মধ্যে প্রধান। হিন্দুদের বিবাহ বিষয়ে ধারণা একটি প্রতীকের সাহায্যে ব্যক্ত করা হত। প্রতীকটি হল বীজ ও ক্ষেত্রের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ক।[১৪১] এই ধারণা অনুসারে, স্ত্রীর গর্ভে জনকের শুক্র ও জননীর শোনিতের মিলনেই গর্ভধারণ সম্পূর্ণ হয়। এ দুটোর মধ্যে শুক্রকে শোণিতের তুলনায় বেশি ক্ষমতাশালী ও সমাজের স্থিতাবস্থা ও সম্পদের জন্য অধিকতর সহায়ক বলে গণ্য করা হত। ফলতঃ, 'জাতি' ও 'কুল' নির্ধারক বৈশিষ্ট্যগুলি এক প্রজন্ম থেকে অপর প্রজন্মে শোণিতের পরিবর্তে শুক্রের মাধ্যমে বাহিত হয় বলে মনে করা হত। এই বিশ্বাসের মধ্যেই 'বীজ' ও 'ক্ষেত্র' প্রতীকের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বলা হত, শুক্র বা বীজ বহন করে প্রতিটি জাতি ও ধর্মের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। আর, গর্ভ বা ক্ষেত্রের কাজ হল সেই বীজকে অঙ্কুরোদ্গমের জন্য ধারণ করা। এই কাজটি সম্পূর্ণ হলে যে সন্তান জন্মাবে, সে হবে পিতার (মাতার নয়) 'জাতি' ও 'কুলে'র রক্ষক। এই কাজটি সম্পন্ন হয় কেবল মাত্র বিবাহের মাধ্যমে। সেই অর্থে, বিবাহের উদ্দেশ্য ছিল পুরুষের বীজের ধারক হিসাবে একটি ক্ষেত্র যোগানো।[১৪২]

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বিবাহের উদ্দেশ্য ছিল জাতি ও কুলের বাহক হিসেবে পুত্র সন্তানের জন্মদান। অবিবাহিতা মেয়ে ('কুল-কন্যা') কুলের অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হত বটে, কিন্তু তার সঙ্গে অন্য কুলের কারও বিয়ের পর সে আর পৈত্রিক কুলের অন্তর্গত

থাকত না। সে তখন অপর কুলের 'কুলবধূ'। তাই গর্ভধারিণীর স্বাস্থ্যের চেয়েও 'জাতি' ও 'কুলে'র ধারক হিসাবে পুত্র সন্তানের জন্ম ছিল সনাতন বিশ্বাস অনুযায়ী অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে যখন আমরা রাসসুন্দরী দেবীর আত্মজীবনীতে মেয়েদের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে সমকালীন ব্যক্তিদের মন্তব্য পড়ি, 'তখনকার লোক বলিত, বুঝি কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিতে পাই। এখন বুঝি মেয়েছেলেও পুরুষের কাজ করিবেক। এত কাল ইহা ছিল না, একালে হইয়াছে। এখন মাগের নামডাক, মিনসে জড়ভড়ত, আমাদের কালে এত আপদ ছিল না। এখন মেয়ে রাজার কাল হইয়াছে। দিনে দিনে বা আর কত দেখিব। এখন যেমন হইয়াছে, ইহাতে আর ভদ্রলোকের জাতি থাকিবে না,'[১৪৩] তখন 'জাতি' শব্দটি একটি ভিন্ন দ্যোতনা লাভ করে। 'জাতি' পুরুষের কাজের ওপর নির্ভরশীল— 'জাতি' রক্ষায় মেয়েদের কোন ভূমিকা নেই। সুতরাং, মেয়েরা যদি পুরুষের কাজ করে, তাহলে জাতির ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং বিবাহ সংক্রান্ত ধারণায় মৌলিক পরিবর্তন ঘটে যাবে। তাই, জাতির বিশুদ্ধতা কেবল পুরুষের ওপরই নয়, দাম্পত্য-জীবনে স্ত্রীর নিষ্ক্রিয়তার ওপরও নির্ভরশীল ছিল। অন্য দিকে মেয়ের জন্ম হলে লোকে বলত, 'এত করে দশ মাস ধরে বোঝা বইলেক . . . ঘটা করে সাধ খেলেক . . . শেষে একটা মাটির ডেলা বিউলো। . . . মেয়েছেলে আর একদলা মাটি সমান।'[১৪৪] উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে উপনীত হয়েও মেয়েদের সম্বন্ধে ধারণার খুব বেশি পরিবর্তন চোখে পড়ে না। শ্রীমতী মায়াসুন্দরী লিখেছিলেন : 'আমরা কি কুক্ষণেই নারী হইয়া এই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। যদি পরমেশ্বর আমাদিগকে সহিষ্ণুতা গুণ অধিক পরিমাণে না দিতেন, তাহা হইলে আমাদের অবস্থা যে কি হইত, তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না। আমাদিগের জন্মাবধিই পোড়া কপাল। ভূমিষ্ট [তদেব] হইবামাত্র পিতামাতা আত্মীস্বজন সকলেই বিমর্ষ। মঙ্গলসূচক শঙ্খধ্বনি পর্য্যন্ত হইল না। পিতা বলিলেন, আহা একটা পুত্র না হইয়া "একটা মেয়ে" হইয়াছে।'[১৪৫]

আরও আকর্ষনীয় একটি সংলাপ শুনিয়েছিলেন শরৎকুমারী চৌধুরাণী। লেখিকা ভোর বেলায় পুকুর ঘাটে দুই মহিলার কথোপকথন লিপিবদ্ধ করেছিলেন। গত রাত্রে পাড়ায় শাঁখ বাজছিল, বাড়ীর বউ-এর পুত্র জন্মেছে কিনা, এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় জনৈকা কেষ্টদাসী উত্তর দিচ্ছে :

'না গো ছোটকাকী, সে কথা আর ব'লো না — আমাদের যেমন অদৃষ্ট, বৌয়ের আর আবার বেটাছেলে এ জন্মে হবে! যা হয়, একটা মেয়ে হয়েছে।'

'এবার নিয়ে তিনটে মেয়ে হ'ল বুঝি ?

'হ্যা গো, কাকী, তিনটে হ'ল।'

'তা হ'লে গন্ডা ভর্ত্তি হবে—তবে যদি বেটাছেলে হয়।'

'হ্যা গো খুড়ী, তারই তো মতন দেখছি। তা মেয়েটা হয়েছে শুনে দাদা বলে . . . কেষ্ট, আমি আর উঠতে পারি না, আমার গায়ে আর বল শক্তি নেই। মায়ের কাছে ধাই বিদেয় চাইলে, মা আসলে বিছানা থেকে উঠলো না, কথা কইলে না। বউ মেয়ে তুলবে না, কত বলা কওয়ায় কোলে নিলে, তা বলে যে গলা টিপে দেব। . . . বাড়ীশুদ্ধ দুঃখেতে কেমন হয়ে রয়েছে।'

'তা থাকবে বই কি, . . . অভাগীর মেয়ের যেমন অদৃষ্ট, দশ মাস গর্ভে ধরে কি না একটা মাটির ঢেলা হ'ল।'[১৪৬]

এইটি ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দের রচনা। এ থেকে আমারা শতাব্দীর অন্তিম লগ্নেও মেয়েদের সামাজিক মর্যাদার বিষয়ে অবহিত হতে পারি। তবে এ কথাও স্বীকার্য যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানসিকতায়ও কিছু পরিবর্তন অবশ্যই দেখা দিয়েছিল। সদ্যোদ্ধৃত সংলাপে আমরা মেয়ের মাকে কোন শাস্তি দেওয়ার কথা শুনি না। অথচ, ঠিক একশ বছর আগে (১৭৯২) কন্যা প্রসব করা এমনি এক অমার্জনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হত যার জন্য গর্ভধারিণীকে দণ্ড পেতে হত। বাঙালিদের বিশ্বাস ছিল যে পূর্বজন্মকৃত পাপের ফলে বর্তমান জন্মে কোন স্ত্রী কন্যা প্রসব করে। এই অপরাধ কী ধরনের, সে সম্বন্ধেও ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল—এই নারী অবশ্যই বিগত জন্মে একজন অত্যন্ত অহঙ্কারী স্ত্রী ছিল এবং সে তার স্বামীকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করত না — এই অপরাধেই তার এ জন্মে মেয়ে হয়েছে। এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ছিল বৃষকে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করা, স্বর্ণ-নির্মিত দেবমূর্তি গঠন, একশ ব্রাহ্মণকে ভোজন করান, মন্ত্রপাঠ প্রভৃতি।[১৪৭] প্রায়শ্চিত্তের এই বিস্তৃত আয়োজন উনবিংশ শতাব্দীতে ভাবধারাগত কিছু পরিবর্তন, আর্থিক কারণ ও অন্যান্য বাস্তব অসুবিধার জন্য অবশ্যই ধীরে ধীরে কমে এসেছিল ; কিন্তু মানসিকতায় মৌলিক পরিবর্তন তত ঘটেনি। তবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষেও কন্যা প্রসব করলে প্রসূতির অপযশ হতই, কারণ, বিবাহের যা প্রধান উদ্দেশ্য, তাকেই সে ব্যর্থ করে দিচ্ছে: 'বংশ রক্ষার জন্য বৌয়ের আদর, নইলে পরের মেয়ে ঘরে এনে জঞ্জাল বৈ ত নয়।'[১৪৮]

বাঙালি বাড়িতে স্ত্রীর স্থান ছিল একান্তভাবেই উপযোগিতাগত। তাকে পুত্রোৎপাদনের জন্য 'ক্ষেত্র'র কাজ করতে হত এবং অন্য সময়ে তার গুণাগুণ নির্ধারিত হত কর্মক্ষমতার ওপর। গত শতকের একটি পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল যে বাঙালি পরিবারে বধূকে দেখা হত 'সর্ব্বগুণান্বিতা দাসীরূপে'।[১৪৯] রাসসুন্দরী দেবী লিখেছিলেন যে বাড়ির বউদের সংসারের সমস্ত কাজই শুধু এককভাবে করতে হত না, খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে দেবার পর যে সময় থাকত, তখনও বাড়ির কর্তার সামনে 'অতিশয় নম্রভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে হইত। যেন মেয়েছেলের গৃহকর্ম বৈ আর কোন কর্ম্মই নাই। তখনকার লোকের মনের ভাব এইরূপ ছিল। বিশেষতঃ তখন মেয়েছেলের এই প্রকার নিয়ম ছিল, যে বৌ হইবে, সে হাত খানেক ঘোমটা দিয়া ঘরের মধ্যে কাজ করিবে, আর কাহারও সঙ্গে কথা কহিবে না, তাহা হইলেই বড় ভাল বৌ হইল। . . . যেন কলুর বলদের মত দুইটি চক্ষু [তদেব] ঢাকা থাকিত।'[১৫০] কলুর বলদ যেমন পুরোপুরি পরের ইচ্ছায় ও নির্দেশে চালিত হয়, বাঙালি পরিবারের বউদের অবস্থাও ছিল সেরকম। তাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ যেমন ছিল না, তেমনি তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিও দেখান হত চরম ঔদাসীন্য। অনেক সময়ে এই মনোভাব ইচ্ছাকৃতভাবে প্রদর্শন করা হত না—এটি বাঙালির ঐতিহ্যের মধ্যেই এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে তারা এ বিষয়ে সচেতনই ছিল না। লর্ড হেস্টিংস একবার লক্ষ করেছিলেন যে বৃষ্টির মধ্যে প্রত্যেক পুরুষের মাথায় একটা করে ছাতা ছিল, কিন্তু কোলে শিশু থাকা সত্ত্বেও কোন মেয়ের মাথাতেই ছাতা নেই। হেস্টিংস খুব বিস্মিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে ওখানে সমবেত পুরুষদের কারও মধ্যে এ বিষয়ে ভ্রূক্ষেপও ছিল না।[১৫১]

পাশ্চাত্য ভব্যতার আদর্শে বর্ধিত লর্ড হেস্টিংসের কাছে মেয়েদের প্রতি এই বৈষম্য অসঙ্গত মনে হলেও চিরন্তন বাঙালি সমাজের কাছে এই আচরণ এতটুকু বিসদৃশ মনে হত না। এক মার্কিন পর্যবেক্ষক বলেছিলেন যে তাঁর স্বদেশবাসীরা বিশ্বাসই করতে চাইত না যে বাংলাদেশে বিধবাবিবাহ ছিল প্রধান সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলন—বিধবাবিবাহ যে কোন সমাজে প্রচলিত নেই, এবং তা প্রবর্তন করতে হলে যে আন্দোলন করতে হবে, এটা পশ্চিমের লোকেদের কাছে প্রায় অবিশ্বাস্য বলে মনে হত।[১৫২] ক্রফোর্ড লিখেছিলেন যে মানসিকতায় এই পার্থক্যের প্রধান কারণ ছিল স্ত্রীর ভূমিকা সম্বন্ধে হিন্দুদের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁর মতে, হিন্দুরা স্ত্রীর আমোদ-প্রমোদ বা অন্য কোন চিত্তবিনোদনের কথা ভাবতেই পারত না। তারা মনে করত এর ফলে স্বামীসেবা বা সন্তানপালনের মত ঈশ্বরনির্দিষ্ট কাজের প্রতি তাদের মনোযোগ কমে যাবে।[১৫৩] ফলে, বাঙালি পরিবারে স্ত্রীর চাওয়ার কিছু ছিল না, তার ভূমিকা ছিল কেবল দেওয়ার। অলিখিত ব্যবহারবিধির দুর্লভ শাসন (যার কিছু পরিচয় রাসসুন্দরী দেবীর আত্মজীবনীতে পাওয়া যায়) অতিক্রম করার ক্ষমতা তার থাকত না। এসবের পরিবর্তে বাঙালি বাড়িতে স্ত্রী খুব মানবিক ব্যবহারও সবসময়ে প্রতিদান হিসাবে পেত না। বিশপ হিবার এদেশে মেয়ের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন যে 'the roughest words, the poorest garments, the scantiest alms, the most degrading labour, and the hardest blows, are generally their portion'. তিনি লক্ষ করেছিলেন যে বাড়ির চাপরাশিও মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে সৌজন্য বজায় রাখে না।[১৫৪]

সমাজে স্ত্রীর এই মর্যাদার উৎস ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যেই নিহিত ছিল। যুগ যুগ ধরে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের যা মহোত্তম ও শ্রেষ্ঠ বলে বর্ণিত হয়ে এসেছিল, যার আদর্শ কালে-কালে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সামনে তুলে ধরা হত, তার মধ্যে পাতিব্রত্য, সতীত্ব প্রভৃতির আদর্শ যতটা ছিল, মেয়েদের প্রতি সম্মান দেখানর আদর্শ ততটা ছিল না। ভারতবর্ষের দুই মহাকাব্যে মেয়েদের পাতিব্রত্য, সতীত্ব, ধর্মরক্ষা প্রভৃতি যতটা গুরুত্ব পেয়েছে, নারীজাতির সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধান ও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা ততটা প্রাধান্য পায়নি। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থে মেয়েদের প্রতি সম্মান দেখানোর কোন ঐতিহ্যই যে আদৌ ছিল না, তা নয়। তবে তার ধর্মীয় আবরণের অন্তরাল থেকে মেয়েদের সম্বন্ধে কী ধারণা পোষণ করা হত, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। রামায়ণের '. . . দেশ দেশ কলত্রাণি . . .' যুগ যুগ ধরে ভারতীয়দের কাছে ভ্রাতৃপ্রেমের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হিসেবে বর্ণিত হয়ে এসেছে। এটি যে স্ত্রীর প্রতি প্রতিশ্রুতিহীনতারও চরম উদাহরণ সে কথা কখন কারও মনে হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে, ভারতীয়রা এই আদর্শকে এত সহজে গ্রহণ করেছিল যে এর গূঢ়ার্থ নিয়ে তারা কখনও বিচলিত হয়নি। এই বিষয়টির প্রতি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন রবীন্দ্রনাথ। *সবুজপত্র* পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ বঃ) 'হৈমন্তী' গল্পে উত্তম পুরুষে বর্ণিত 'আমি' একটি কাপুরুষ চরিত্র। স্ত্রীর প্রতি তার শ্বশুর-শাশুড়ীর অপমান,অত্যাচার ও নির্মম অবহেলা দেখে গল্পের নায়ক ঠিক করেছিল স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ির বাইরে চলে আসবে। কিন্তু পিতার ঈষৎ চোখ রাঙানিতেই তার যাবতীয় প্রতিজ্ঞা নিমেষে অন্তর্হিত হয়েছিল। সহসা এই মত পরিবর্তনের কারণও রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন : 'গেলাম না কেন ? কেন ! যদি

লোকধর্মের কাছে সত্যধর্মকে না ঠেলিব, যদি ঘরের কাছে ঘরের মানুষকে বলি দিতে না পারিব, তবে আমার রক্তের মধ্যে বহুযুগের যে শিক্ষা তাহা কী করিতে আছে। জান তোমরা ? যেদিন অযোধ্যার লোকেরা সীতাকে বিসর্জন দিবার দাবি করিয়াছিল তাহার মধ্যে আমিও যে ছিলাম। আর সেই বিসর্জনের গৌরবের কথা যুগে যুগে যাহারা গান করিয়া আসিয়াছে আমিও যে তাহাদের মধ্যে একজন। আর, আমিই তো সেদিন লোকরঞ্জনের জন্য স্ত্রী-পরিত্যাগের গুণ বর্ণনা করিয়া মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছি।'[৫৫] রবীন্দ্রনাথ এখানে স্ত্রীর প্রতি অসম্মান ও পুরুষ চরিত্রের কাপুরুষতাকে রাজ্য-কাল-পাত্রের উর্ধ্বে এক সর্বভারতীয় ব্যাপ্তি দান করেছিলেন। প্রাক-আধুনিক ভারতীয় ঐতিহ্যে পিতৃসত্যের গুণকীর্তন যতটা স্পষ্ট, স্ত্রীসত্যের উপেক্ষাও বোধহয় ততটাই। মেয়েরা নিজেরাই এই ব্যবস্থায় এত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে তাদের প্রত্যাশাও বিশেষ কিছু ছিল না। রাসসুন্দরী দেবীর আত্মকথায় আমরা পড়ি যে শতাব্দীর প্রথম দিকে এক মেয়ে অপর মেয়েকে বলছে 'মেয়েছেলে হওয়া মিছা'।[৫৬] এটি প্রাক্-আধুনিক মূল্যবোধ ও সমাজব্যবস্থা নিয়ে মেয়েদের আক্ষেপ। সেখান থেকে রবীন্দ্রনাথের *যোগাযোগ* উপন্যাসের (১৯২৯) কুমুদিনী যখন তার স্বামীকে একটি নৈতিক প্রশ্ন করে 'স্ত্রী যাদের দাসী তারা কোন জাতের লোক'—তখন এক শতাব্দী কালের মধ্যে উত্তরণটা আপাতদৃষ্টিতে যত সহজ বলে মনে হয়, গত শতকের বাঙালি জীবনে নারী বিষয়ক চিন্তার ইতিহাস তার চেয়ে ঢের বেশি জটিল।

উল্লেখপঞ্জী

১। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন শাস্ত্রে মেয়েদের সম্বন্ধে উল্লেখের জন্য দ্র. ক্ষিতিমোহন সেন, *প্রাচীন ভারতে নারী* (কলকাতা, ১৩৫৭ বঃ), পৃ ১—২৮, ৫২—৫৪
Swami Ranganathananda, *Indian Ideal of Womanhood* (Calcutta, 1966), Ch. I

২। মুরারিমোহন সেন শাস্ত্রী (সম্পা.), *মনুসংহিতা* (কলকাতা, ১৯৮৫), পৃ ৮৫

৩। *মনুসংহিতা,* ৯ম অধ্যায়, শ্লোক - ২ (পূর্বোক্ত), পৃ ৩৭৫

৪। Michael Allen, 'The Hindu view of women' in Michael Allen and S.N. Mukherjee (ed.), *Woman in India and Nepal* (Canberra, 1982), p. 2

৫। 'But the male Tantric's attitude towards woman is, like siva's, essentially that of the world renouncer - she is a means towards an end that in the final analysis accords her little positive value.' Ibid, 13

৬। ঐ

৭। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য বর্তমান গ্রন্থের 'স্ত্রীজনোচিত শিক্ষা' অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য।

৮। *রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্র রচনাসমগ্র,* (রিফ্লেক্ট, কলকাতা, ১৯৮৬), পৃ ২৭২

৯। ঐ, ২০৬

১০। ঐ, ২২৭

১১। Manisha Roy, *Bengali Women* (Chicago. 1975), p.6
১২। Priscilla Chapman. *Hindoo Female Education*, (London, 1839), p.3
১৩। Ibid, 10
১৪। *Parliamentary Papers (House of Commons)*, 1812 - 13, vol.X, p.29
১৫। Ibid, 55-56
১৬। Rev. T. Acland, *A Popular Account of the Manners and Customs of India*, (London, 1847), p.20
১৭। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.) *পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন* (প্রথম খণ্ড), (কলকাতা, ১৯৭৮), পৃ ১৬৭
১৮। *রামমোহন গ্রন্থাবলী* (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৮০ বঃ), পৃ ৪৭
১৯। *Parliamentry papers (HOC)*, 1812 - 13, vol.X p. 29
২০। *Sketches of India; Or, Observations Descriptive Of The Scenery, etc. In Bengal*, (London, 1816), p.187
২১। M. Weitbrecht, *The Women of India And Christian Work In The Zenana*, (London, 1875). p. 41
২২। *পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন* (প্রথম খণ্ড), (পূর্বোক্ত), পৃ ১৫৩
২৩। Q. Craufurd, *Sketches Chiefly Relating to the History, Religion, Learning and Manners of the Hindoos*, vol. II, (London, 1792), p. 2
২৪। *Parliamentary Papers (HOC)*, 1812 - 13, vol. x p.29
২৫। বহুবিবাহকারী পুরুষের স্ত্রীরা যে শুধু পিতৃগৃহেই থাকত, তা নয়। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে জামাইকে বাড়ি আনতে হলে মেয়ের বাবাকে টাকা দিতে হত এবং টাকা দিতে না পারলে জামাই সেই শ্বশুরের বাড়ি যেত না। বিদ্যাসাগর এরকম এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন যে সেই বহুবিবাহকারী ব্যক্তিকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি তার সব শ্বশুরবাড়িতে যান কি না, তিনি অম্লান বদনে উত্তর দিয়েছিলেন, 'যেখানে ভিজিট পাই, সেইখানেই যাই'। বিদ্যাসাগর মন্তব্য করেছিলেন : 'স্বামিগৃহবাস, স্বামিসহবাস, স্বামিদত্ত গ্রাসাচ্ছাদন কুলীনকন্যাদের স্বপ্নের অগোচর।' দ্র. *বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ* (দ্বিতীয় খণ্ড), (স্বাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭২), পৃ ১৯৬-১৯৭
২৬। Suresh Chandra Moitra (ed.), *Selections from Jnanannesan*, (Calcutta, 1979), p. 29 (Bengali section)
২৭। ঐ
২৮। K.K. Datta, *Survey of India's Social Life And Economic Conditions In the Eighteenth Century, 1707 - 1813*, (Calcutta, 1961), p. 35
২৯। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), *সংবাদপত্রে সেকালের কথা* (দ্বিতীয় খণ্ড), (কলকাতা, ১৩৮৪ বঃ), পৃ ২৪৯
৩০। বিনয় ঘোষ (সম্পা.), *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র* (তৃতীয় খণ্ড), (কলকাতা, ১৯৮০), পৃ ৮
৩১। ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ প্রথা রদ করার জন্য ভারতসরকারের কাছে আবেদন পাঠিয়েছিলেন। এই আবেদনপত্রের অন্যতম স্বাক্ষরকারী ছিলেন বর্ধমানের মহারাজা। দ্র. বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ* (কলকাতা, ১৯৮৪), পৃ ২৮১

৩২। *বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ* (দ্বিতীয় খণ্ড), (পূর্বোক্ত), পৃ ১৭১
৩৩। ঐ, ২০১-২০৮
৩৪। *জ্ঞানান্বেষণ* পত্রিকাতেও বহুবিবাহকারী কুলীনদের নামের তালিকা পেশ করার আগে বলা হয়েছিল যে কোন কোন সংবাদপত্র লিখেছিল যে বহুবিবাহ কমে গিয়েছে। দ্র. *Selections from Jnanannesan.* op. cit., pp. 22-29 (Bengali Section)
৩৫। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য দ্র. স্বপন বসু, *সতী* (কলকাতা ১৯৭৮), পৃ ১৫-২০
৩৬। দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গসাহিত্য পরিচয়* (প্রথম খণ্ড) (কলকাতা, ১৯১৪), পৃ ৪১-৪৪
৩৭। Q. Craufurd, Ressarches Concerning The Laws, Theology, Learning, Commerce Etc. Of Ancient and Modern India. vol. II, (London, 1817), p. 132
৩৮। *Sketches Chiefly Relating to the History, Religion, Learning and Manners of the Hindoos.* vol. II, op. cit., p.14
৩৯। Ibid, 16
৪০। *Parliamentary Papers (HOC).* 1825, vol. XXIV, pp. 28-31
৪১। *Parliamentary Papers (HOC),* 1823, vol. XVII, p. 32
৪২। Ibid, 34
৪৩। W.H. Carey, *The Good Old Days of Honourable John Company* (1882), (Quins Book Co. Calcutta, 1964), pp. 202 - 203
৪৪। *Friend of India,* (Quarterly Series). March, 1821, quoted in *Parliamentary Papers (HOC),* 1825, vol. XXIV, p. 25
৪৫। Fanny Parks, *Wanderings of a Pilgrim in Search of the Picturesque* (1850) (Karachi, 1975), p. 92
৪৬। *Parliamentary Papers (HOC),* 1823, vol. XVII, p. 66
৪৭। Bute, Marchioness of (ed.), *The Private Journal of The Marquess of Hastings* (1858) (Allahabad, 1907), p. 380
৪৮। *Parliamentary Papers (HOC)* 1826 - 1827, vol. XX, p. 17
৪৯। *Parliamentary Papers (HOC),* 1821, vol. XVIII, p. 45
৫০। Ibid, 228
৫১। *Parliamentary Papers (HOC),* 1826 - 1827, vol. XX, p. 17
৫২। ঐ
৫৩। H.H. Dodwell (ed.), *Cambridge History of India.* vol.6, (Cambridge, 1936), p. 134-তে উদ্ধৃত
৫৪। ঐ
৫৫। Q. Craufurd, *Researches Concerning the Laws, Theology, Learning, Commerce etc. of Ancient and Modern India,* vol. II, op. cit, pp. 134-136
৫৬। *Parliamentary Papers (HOC),* 1826 - 1827, vol. XX, p.15
৫৭। W.H. Sleeman. *Rambles and Recollections of an Indian Official* (1844) (Oxford, 1980), p. 20
Ibid, 23

৫৯। Q. Craufurd, *Researches Concerning the Laws, Theology, Learning, Commerce etc. of Ancient and Modern India,* vol. II, op. cit. p.134
৬০। *Parliamentary Papers (HOC),* 1826-1827, vol. XX, p.17
৬১। Vide. A. Mukherjee, *Reform and Regeneration in Bengal,* 1774-1823, (Calcutta, 1968), pp. 245-246
৬২। *Parliamentary Papers (HOC),* 1825, vol. XXIV, p.3
৬৩। *Parliamentary Papers (HOC),* 1824, vol. XXIII, p.32
৬৪। Elizabeth Leigh Statchbury, 'Blood, Fire and Mediation : Human Sacrifice and Widow Burning in Nineteenth Century India' in Allen and Mukherjee (ed.), *Women in India and Nepal,* op. cit., p.28
৬৫। *Parliamentary Papers (HOC),* 1825, vol. XXIV, p.153
৬৬। *Parliamentary Papers (HOC),* 1826-1827, vol. XX, p.17
৬৭। W. Ward, *A View of the History, Literature and Religion of the Hindoos,* vol. II (London, 1815), p. 305
৬৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.) *সংবাদপত্রে সেকালের কথা* (প্রথম খণ্ড), (কলকাতা,১৩৭৭ বঃ),পৃ ২৫৩-২৫৪
৬৯। ঐ, ২৫০
৭০। ঐ, ২৫৪
৭১। Reginald Heber, *Narrative of a Journey Through the Upper Provinces of India,* vol.I (London, 1828), pp. 351-352
৭২। *Parliamentary Papers (HOC),* 1821, vol. XVIII, p.30
৭৩। Heber, op. cit. p.352
৭৪। *Parliamentary Papers (HOC),* 1825, vol. XXIV, p. 4
৭৫। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে বর্ধমানে সতীদাহের সংখ্যা ছিল ১৩২ ও হুগলীতে ১৪১। দ্র. *Parliamentary Papers (HOC),* 1824, Vol. XXIII, p.32
বাংলাদেশের সর্বত্র যে সতীদাহ কত পরিব্যাপ্ত ছিল, তা ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দের সরকারি প্রতিবেদন থেকে অনুমান করা যায়। ঐ বছর বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় সতীদাহের হিসেব ছিল বর্ধমান ৬২, হুগলী ৯৫, যশোর ৩১, জঙ্গল মহল ৩৯, মেদিনীপুর ৬, নদীয়া ৫৯, কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ৩৯, এবং ২৪ পরগণা ৩৩। দ্র. *Parliamentary Papers (HOC),* 1824, vol. XXIII, pp. 6-14
৭৬। *সংবাদপত্রে সেকালের কথা* (প্রথম খণ্ড), (পূর্বোক্ত), পৃ ২৫৬
৭৭। *সমাচার চন্দ্রিকার* সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে রামমোহন রায়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে *সম্বাদ কৌমুদী* পত্রিকার সম্পাদনা করলেও, সমাজ-সংস্কার, বিশেষতঃ সতীদাহ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেওয়ায় ভবানীচরণ রামমোহনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এরপর তিনি হিন্দু ধর্মের গোঁড়া সমর্থকে পরিণত হন এবং গোপীমোহন দেব, হরিমোহন ঠাকুর প্রমুখ রক্ষণশীল ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্যে রক্ষণশীল সমাজের মুখপত্রস্বরূপ ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ থেকে *সমাচার চন্দ্রিকা* প্রকাশ করতে শুরু করেন।
দ্র. Smarajit Chakrabarti, *The Bengali Press* (Calcutta, 1976), p. 33
সতীদাহ প্রথা নিবারক কোন আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করার কাজে এই

পত্রিকা রক্ষণশীল সমাজের মতামতের বাহকে পরিণত হয়েছিল। *সমাচার দর্পণ* পত্রিকা থেকে জানা যায় যে সতীদাহ রদ সংক্রান্ত আইন প্রত্যাহারের জন্য কলকাতার রক্ষণশীল ব্যক্তিরা সরকারের কাছে একটি আবেদন পাঠিয়েছিলেন ও ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি ওই আবেদনের উত্তরের প্রত্যাশায় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ ব্যক্তিরা তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্কের (Bentinck) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। অবশ্য তাতে কোন ফল হয়নি। দ্র. *সংবাদপত্রে সেকালের কথা* (প্রথম খণ্ড), (পূর্বোক্ত), পৃ ২৫৯

৭৮। *সংবাদপত্রে সেকালের কথা* (প্রথম খণ্ড), (পূর্বোক্ত), পৃ ২৫৩

৭৯। *Parliamentary Papers (HOC)*, 1826-1827, vol. XX, p.9

৮০। *Parliamentary Papers (HOC)*, 1826-1827, vol. XX, p.17

৮১। *The Private Journal of the Marquess of Hastings*, op. cit, p.37

৮২। স্বপন বসু, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস*, (কলকাতা, ১৯৮৫), পৃ ১১৬

৮৩। 'Female Immolations', *The Friend of India*, March 1822, p.93 Weitbrechtও মন্তব্য করেছিলেন যে বিধবাদের কষ্ট ছিল অবর্ণনীয়। এই দুঃসহ জীবন থেকে মুক্তি লাভের জন্যেও অনেকে সহমৃতা হত। দ্র. The *Women of India And Christian Work In the Zenana*, op. cit., p.49-50

৮৪। *The Private Journal of the Marquess of Hastings*, op. cit, p. 380

৮৫। ঐ

৮৬। *Narrative of Journey Through the Upper Provinces of India*, vol. I. op. cit, p.57

৮৭। Rammohan Roy, *Brief Remarks regarding Modern Encroachment on the Ancient Rights of Females* (1823) (Calcutta, 1856), p.6

৮৮। Q. Craufurd, *Sketches Chiefly Relating to The History, Religion, Learning and Manners of the Hindoos*, vol. II, op. cit, pp. 2-3

৮৯। বাংলাদেশে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ণীত হত দ্বাদশ শতাব্দীতে জীমূতবাহন রচিত 'দায়ভাগ' গ্রন্থ অনুসারে। 'দায়ভাগ' আইনে হিন্দু মহিলাদের উত্তরাধিকার অত্যন্ত সীমিত হলেও তারা সম্পত্তির অধিকার থেকে একেবারে বঞ্চিত হত না, যদিও বহু বিধি-নিষেধের জন্য তাদের সীমিত আইনগত অধিকার ধীরে ধীরে আরও খর্ব হয়েছিল। 'দায়ভাগ' অনুসারে হিন্দু মহিলাদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনের বিশদ আলোচনার জন্য দ্র. D.F. Mulla, *Principles of Hindu Law*, (Bombay, 1986), pp.157-161

৯০। *Brief Remarks regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females*, op. cit, p.6

৯১। বহুবিবাহকারী পুরুষের স্ত্রীরা যে পিতৃগৃহেই থাকত, তা বোঝা যায় রামমোহন রায়ের *প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ* (১৮১৯) পুস্তিকার একটি অংশ থেকে। রামমোহন লিখেছিলেন যে, যারা বহুবিবাহ করে তাদের 'প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত দুই চারিবার সাক্ষাৎ করেন, তথাপি ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকেই ধর্মভয়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও এবং স্বামীর দ্বারা কোন উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ সহিষ্ণুতাপূর্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম নির্বাহ করেন।' দ্র. *রামমোহন রচনাবলী* (হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৩), পৃ ২০২

৯২। *Brief Remarks regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females*, op. cit. p. 6

৯৩। *Parliamentary Papers (HOC)*, 1812-13, vol. X, p.72

৯৪। পীতাম্বর সেন কবিরত্ন, *বিধবাবিবাহ নিষেধ*, (কলকাতা, ১৮৫৫), পৃ ৮

৯৫। Q. Craufurd, *Sketches Chiefly Relating on the History, Religion, Learning And Manners of the Hindoos* (vol.-II), op. cit., p.2

৯৬। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এবং সমস্ত প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর সহ এই বিষয়ে পুস্তকটি তিনি প্রকাশ করেছিলেন ঐ বছরেরই অক্টোবর মাসে। অনুমান করা সঙ্গত যে রাশীকৃত প্রমাণ সংগ্রহ করে প্রত্যুত্তর রচনার জন্য বিদ্যাসাগরের অধ্যয়নে কিছু সময় ব্যয়িত হয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায়, কত স্বল্প সময়ের মধ্যে এই প্রতিবাদী পুস্তিকাগুলি. প্রকাশিত হয়েছিল।

৯৭। *The Calcutta Review*, July-December, 1855, vol.. XXV, p. 360

৯৮। দ্র. শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, *বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ*, (কলকাতা, ১২৯৮ বঃ), পৃ ১২০

৯৯। শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ, *বিধবাবিবাহের নিষেধক*,(কলকাতা, ১২৮৪ বঃ), পৃ ১০০-১০২

১০০। *রামমোহন গ্রন্থাবলী*, (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৮০ বঃ), পৃ ৪৬

১০১। রামধন দেবশর্মা, *বিধবা বেদন নিষেধক*, (কলকাতা, ১৮৫৫), পৃ ১৬২-১৬৪

১০২। দ্র. বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ* (কলকাতা, ১৯৮৪), পরিশিষ্ট ২, পৃ ৫৩৯-৫৪০

১০৩। প্রাণনাথ পণ্ডিত, *অসতী বিধবার বিষয়াধিকার বিষয়ে বক্তৃতা*, (কলকাতা, ১৭৯৫ শকাব্দ), পৃ ১০

১০৪। Hur Chunder Dutt, *Bengali Life and Society, A Discourse*, (Calcutta, 1853), p. 4

১০৫। Vide. Gautam Chattopadhyay (ed.), *Bengal : Early Nineteenth Century*, (Calcutta, 1978), p. 164

১০৬। Joguth Chunder Gangooly, *Life And Religion Of The Hindoos With a Sketch Of My Life And Experience, London*, 1860, p. 61.

১০৭। *দীনবন্ধু রচনাবলী* (সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৮১), পৃ ১০৮-১০৯

১০৮। 'একাদশী দিবসে বিধবা কন্যার মাতার খেদ', *সোমপ্রকাশ*, ১লা অগ্রহায়ণ, ১২৭০ বঃ, পৃ ৫

১০৯। Rev. K.M. Banerjee, *Native Female Education* (2nd edn.), Calcutta, 1848, pp. 48,67.

১১০। 'হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হইবে কি না', *সোমপ্রকাশ*, ২রা আষাঢ়, ১২৯২ বঃ

১১১। সে যুগের বহু পত্রিকাতেই রচনাকারের নাম থাকত না। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার* এ প্রবন্ধটিতেও ছিল না। তবে রচনারীতি দেখে বিনয় ঘোষ মন্তব্য করেছিলেন যে এই রচনাটি খুব সম্ভবত পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের লেখা। দ্র. *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, (পূর্বোক্ত), পৃ. ২৪৭, পা. টী

১১২। 'বিধবা বিবাহ', *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, চৈত্র, ১৭৭৬ শক, পৃ ১৮২

১১৩। *বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ* (দ্বিতীয় খণ্ড), (পূর্বোক্ত), পৃ ৩২

১১৪। দ্র. বিনয় ঘোষ (সম্পা.), *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র* (প্রথম খণ্ড) (কলকাতা, ১৩৮৫ বঃ), পৃ ১৯৪

১১৫। বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ* (পূর্বোক্ত), পৃ ৫৪০
১১৬। চৈত্র, ১৭৭৬, পৃ ১৮৩
১১৭। ঐ, ১৮৪
১১৮। 'বিধবা বিবাহ' *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, পৌষ, ১৭৭৮ শক, পৃ ১২৭
১১৯। *বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ* (দ্বিতীয় খণ্ড), (পূর্বোক্ত), পৃ ১৬৪-১৬৫
১২০। দ্র. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ* (দ্বিতীয় খণ্ড), (নয়াদিল্লী, ১৯৭৮), পৃ ১৯০৩
১২১। বিধবাদের মধ্যে অসতীদের সংখ্যাধিক্যের জন্যই বোধ হয় রাঁড় ও গণিকা শব্দ দুটি সমার্থক হয়ে গিয়েছিল। যেমন, প্যারীমোহন সেনের *রাঁড় ভাঁড় মিথ্যা কথা তিন লয়ে কলকাতা* (কলকাতা, ১৮৬২) নাটকে 'রাঁড়' শব্দটি গণিকা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বিশদ আলোচনার জন্য দ্র. গোলাম মুরশিদ, *সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক* (ঢাকা ১৯৮৪), পৃ ১৬, পা. টী. নং ১৮
১২২। দ্র. সত্যরঞ্জন সেন, *প্রবাদরত্নাকর*, (কলকাতা, প্রকাশ সন নেই), পৃ ৭৯৪
১২৩। 'মেয়েছেলে এত অনাদরের কেন ?' *বামাবোধিনী পত্রিকা*, মাঘ, ১২৭০ বঃ, পৃ ৬৫-৬৬
১২৪। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), *রসগ্রন্থাবলী*, (কলকাতা, ১৩১২ বঃ), পৃ ৮৬
১২৫। নীরদচন্দ্র চৌধুরী, *বাঙালী জীবনে রমণী*, (কলকাতা, ১৩৮৯ বঃ), পৃ ৬৫
১২৬। কালীপ্রসন্ন সিংহ, *হুতোম প্যাঁচার নকশা*, (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৯১ বঃ), পৃ ৪৬।
১২৭। বিহারীলাল সরকার, *বিদ্যাসাগর*, (কলকাতা, ১৩১৭ বঃ), পৃ ৩০৩
১২৮। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য গ্রন্থের 'স্ত্রীজনোচিত শিক্ষা' অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য।
১২৯। দ্র. *সংবাদপত্রে সেকালের কথা* (প্রথম খণ্ড), (পূর্বোক্ত), পৃ ১৩
১৩০। *বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ* (তৃতীয় খণ্ড), (পূর্বোক্ত), পৃ ৪১২
১৩১। কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়, *দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবন চরিত*, (কলকাতা, ১৩৬৩ বঃ), পৃ ৪২
১৩২। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.) *পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন* (দ্বিতীয় খণ্ড), (কলকাতা, ১৯৮১), পৃ ১৬৯
১৩৩। নীরদচন্দ্র চৌধুরী, *বাঙালী জীবনে রমণী*, (পূর্বোক্ত), পৃ ৭২
১৩৪। উদ্ধৃতিসহ এ প্রসঙ্গটির বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'দাম্পত্য-ভাবনা' অধ্যায়ে।
১৩৫। দ্র. প্রফুল্লচন্দ্র পাল (সম্পা.), *প্রাচীন কবিওয়ালার গান*, (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশ সন নেই)
১৩৬। *Life And Religion Of The Hindoos With A Sketch Of My Life And Experience*, op. cit., pp. 13-14
১৩৭। Shib Chunder Bose, *Hindoos As They Are: A Description Of The Manners, Customs And Inner Life Of Hindoo Society In Bengal*, Calcutta, 1881, p. 24
১৩৮। পত্রকার এখানে সন্তানের জন্মের পর প্রসূতির জন্মাশৌচের ক্ষেত্রে শাস্ত্র নির্দেশিত বৈষম্যের কথা উল্লেখ করেছেন। পুত্র জন্মালে প্রসূতিকে কুড়ি দিন ও কন্যা জন্মালে ত্রিশ দিন অশৌচ পালন করতে হত। শুধু শাস্ত্রের নির্দেশই নয় বাস্তব জীবনেও ছেলে ও মেয়ের জন্মের পর অশৌচ পালনের ক্ষেত্রে এই বৈষম্য পালিত হত।
দ্র. Rev. K.M. Banerjee, *Native Female Education*, op. cit, p. 10

১৩৯ । *সংবাদ প্রভাকর*, ১৪.৬. ১৮৪৯

১৪০ । James Kerr. *The Domestic Life, Character, And Customs Of The Natives Of India*, London. 1865, p. 206

১৪১ । মনু বলেছিলেন :
'ক্ষেত্রভূতা স্মৃতা নারী বীজভূতঃ স্মৃতঃ পুমান।
ক্ষেত্রবীজসমাযোগাৎ সম্ভবঃ সর্ব্বদেহিনাম ॥ (মনুসংহিতা, ৯ । ৩৩)
অর্থাৎ, 'নারীজাতি ক্ষেত্রস্বরূপ এবং পুরুষ বীজস্বরূপ, ক্ষেত্র এবং বীজের সংযোগেই সমস্ত প্রাণীর উদ্ভব হয়ে থাকে।' দ্র. মুরারিমোহন সেন শাস্ত্রী (সম্পা.). *মনুসংহিতা*, (পূর্বোক্ত), পৃ ৩৮২ । মেয়েদের ক্ষেত্র হিসাবে গণ্য করা হত বলেই নিয়োগ প্রথার দ্বারা উদ্ভূত সন্তানকে বলা হত 'ক্ষেত্রেজ সন্তান', দ্র. Prabhati Mukherjee, *Hindu Women: Normative Models* (Calcutta. 1978) p. 68

১৪২ । Ronald B. Inden. *Marriage and Rank in Bengali Culture*, (Delhi. 1976), pp. 92-96

১৪৩ । নরেশচন্দ্র জানা, মানু জানা, কমলকুমার স্যান্যাল (সম্পা.), *আত্মকথা* (প্রথম খণ্ড), (পূর্বোক্ত), পৃ ২২-২৩ (বাসসুন্দরী দেবীর আত্মকথা)

১৪৪ । *বামাবোধিনী* পত্রিকা, মাঘ, ১২৭০ বঃ, পৃ ৬৫

১৪৫ । 'নারীজন্ম কি অধর্ম', *বঙ্গমহিলা*, শ্রাবণ. ১২৮২ বঃ, পৃ ৯৩

১৪৬ । 'আদরের, না অনাদরের ?' *সাধনা*, মাঘ. ১২৯৮ বঃ, পৃ ২৫১-২৫২

১৪৭ । *Parliamentary Papers (HOC)*, 1812-13, vol. X. p. 72

১৪৮ । *সাধনা*. মাঘ, ১২৯৮ বঃ, পৃ ২৬২

১৪৯ । 'আমাদিগের নারী জাতির অবস্থা', *বামাবোধিনী পত্রিকা*, শ্রাবণ. ১২৮১ বঃ, পৃ ১২৩

১৫০ । *আত্মকথা* (প্রথম খণ্ড) (পূর্বোক্ত), পৃ ২১ (রাসসুন্দরী দেবীর আত্মকথা) ·

১৫১ । *The Private Journal of the Marquess of Hastings* (vol. II) op. cit. p. 208

১৫২ । C.H. Dall, *A Lecture on Women in America and in Bengal*, (Calcutta, 1857), p. 5

১৫৩ । *Researches Concerning the Laws, Theology, Learning, Commerce etc. of Ancient and Modern India.* (vol. II), op. cit, pp. 146-147

১৫৪ । *Narrative of a Journey Through the Upper Provinces of India* (Vol.I), op. cit. p. 391

১৫৫ । *রবীন্দ্র রচনাবলী* (সপ্তম খণ্ড), (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৬১), পৃ ৬২৬

১৫৬ । *আত্মকথা* (প্রথম খণ্ড), (পূর্বোক্ত), পৃ ১৪ (রাসসুন্দরী দেবীর আত্মকথা)

২
'স্ত্রীজনোচিত শিক্ষা'

'সকল সমাজেই স্ত্রীজাতি পুরুষাপেক্ষা অনুন্নত পুরুষের আত্মপক্ষপাতিতাই ইহার কারণ। পুরুষ বলিষ্ঠ, সুতরাং পুরুষই কার্য্যকর্ত্তা, স্ত্রীজাতিকে কাজে কাজেই তাহাদিগের বাহুবলের অধীন হইয়া থাকিতে হয়। আত্মপক্ষপাতী পুরুষগণ, যতদূর আত্মসুখের প্রয়োজন, ততদূর পর্য্যন্ত স্ত্রীগণের উন্নতির পক্ষে মনোযোগী, তাহার অতিরেকে তিলার্ধ নহে। এ কথা অন্যান্য সমাজের অপেক্ষা, আমাদিগের দেশে বিশেষ সত্য।' —'প্রাচীনা এবং নবীনা', বঙ্গদর্শন , বৈশাখ, ১২৮১বঃ

আমাদের দেশে 'নারীমুক্তি' বা 'নারী আন্দোলন' বলে যে শব্দগুলি ইদানিং খুব শোনা যাচ্ছে, তার প্রকৃত সূচনা হয়েছিল গত শতকে। গত শতকে বাঙালি সমাজে পরিবর্তন বা পবিবর্তন-সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনা, লেখাপত্রের সিংহভাগ জুড়ে ছিল মেয়েরা। নানাভাবে, নানারূপে তাদের সমস্যা আলোচিত হয়েছে। পশ্চিমি দুনিয়ার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে বাঙালি মেয়েদের অনগ্রসরতা, দুর্দশা প্রভৃতি নিয়ে লেখা হয়েছে প্রচুর। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালির দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট হয়েছিল সর্বপ্রথম। পশ্চিমের মেয়েদের সঙ্গে আমাদের অন্তঃপুরবর্তিনীদের যে প্রথম ও প্রধান পার্থক্য চোখে পড়ল, তা হল বাঙালি মেয়েদের শিক্ষার অভাব। অবস্থার উন্নতিকল্প উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার বিস্তার নিয়ে কথাবার্তাও শুরু হয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হল স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী দলের প্রচার। গোটা উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে সমাজ-সংস্কারকদের আলোচনার সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয় ছিল স্ত্রীশিক্ষা ও তার আনুষঙ্গিক দিকগুলি। বর্তমান অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় মেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে গত শতকের ভাবনা-চিন্তা।

আলোচনার বিষয় হিসেবে স্ত্রীশিক্ষা একেবারে আনকোরা নতুন নয়। কবে কোথায় মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় খোলা হল কিংবা কোন ব্যক্তি বা দল কবে সরকারের কাছে আর্থিক অনুদানের আর্জি জানালেন—এ বিষয়ে এর আগেই লেখাপত্র হয়েছে। স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসে এ সব অবশ্যই অত্যন্ত জরুরি তথ্য। কিন্তু প্রধানতঃ দুটি কারণে এই কালানুক্রমিক তথ্যপঞ্জীকে পরিহার করা হয়েছে। প্রথমত, এ নিয়ে গবেষণা এর আগেই হয়ে গেছে, আর পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই। তার চেয়েও বড় কারণ, স্ত্রীশিক্ষার বিবরণ বর্তমান গ্রন্থের মুখ্য আলোচ্য বিষয় নয়। পরিবর্তে, মেয়েদের কী ধরনের শিক্ষা দেওয়া হত, সেই শিক্ষা থেকে মেয়েদের ভূমিকা সম্বন্ধে সমাজের কী মনোভাব বেরিয়ে আসে, এই প্রশ্নগুলি অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। আমরা এ আলোচনায় দেখব, স্ত্রীশিক্ষা নামের এই অগ্নিগর্ভ শব্দটি উনিশ শতকের সমাজে কী ধরনের আলোড়ন তুলেছিল। স্ত্রীশিক্ষা বলতে সঠিক কী বোঝাত? অনেকের ধারণা, গুটিকয় গোঁড়াদের বাদ দিয়ে গোরাদের দেখাদেখি

পশ্চিমি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা প্রায় সকলেই এ বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। প্রকৃত অবস্থা কি সত্যিই তাই ছিল ? বর্তমান অধ্যায়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের ইতিহাসের চেয়ে স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের উপরে গুরুত্ব দেওঁয়া হয়েছে সমধিক।

॥ এক ॥

ইতিহাস ঘাঁটলে ভারতীয় মহিলাদের শিক্ষা-দীক্ষার গৌরব-গাথার খুব লম্বা ফর্দ তৈরি করা সম্ভব নয়। চিত্রা দেব একবার বলেছিলেন, মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে আমরা গার্গী-লীলাবতীর পরেই ঝপ করে চলে আসি জ্ঞানদানন্দিনী-স্বর্ণকুমারীর যুগে।[১] কথাটা নির্মমভাবে সত্যি। ইংরেজরা আসার অনেক আগে থেকেই বিদেশিদের সংস্পর্শে এসেছি আমরা, কিন্তু সযত্নে পরিহার করেছি তাদের সংশ্রব। একদিকে দাসত্ব করেছি রাজদরবারে, অপর দিকে অন্দরমহল রয়ে গেছে অপরিবর্তিত। আর, এইভাবেই আমরা অন্দরের 'পবিত্রতা' বজায় রাখতে চেয়েছি।

কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে সরস্বতীর কি সত্যিই চিরবৈধব্য ছিল ? আমরা যখন বলি, গত শতকের আগে মেয়েরা লেখাপড়ার বিশেষ ধার ধারত না, তখন সেটা সাধারণ অবস্থার বর্ণনা হিসাবে ব্যবহার করি। মধ্যযুগে বাঙালি মেয়েদের মধ্যে প্রথাগত শিক্ষার বিশদ বিবরণ পাই না সত্য, তবে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের অনতিবিলম্বে বাংলা সাহিত্যে দেখা দিয়েছিল ভক্তি সহিত্যের এক অভূতপূর্ব জোয়ার। চৈতন্যদেবের প্রযাণের কিছুদিনের মধ্যেই আমরা কয়েকজন মহিলা ভক্তের নাম পাই, জাহ্নবা দেবী কিংবা সীতা দেবী। এঁরা তো আবার প্রচারকার্যেও ব্রতী হয়েছিলেন। বৈষ্ণবপদ রচয়িত্রী হিসাবে শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা দেবীর উল্লেখও সাহিত্যের ইতিহাসে পাওয়া যায়।[২]

এই ধারাটি কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে অব্যাহত ছিল। বহুদিন পর্যন্ত বৈষ্ণবীরা অন্তঃপুরে বহন করে এনেছে জ্ঞানের চর্চা। গত শতাব্দীর তিনটি দশক অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরেও বাংলায় এ রীতির প্রচলন ছিল। রাজশাহী জেলা সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে অ্যাডাম মন্তব্য করেন যে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত অজ্ঞানতার মধ্যে একমাত্র বৈষ্ণবরাই বিদ্যাচর্চা করত। তিনি নাটোরেই চোদ্দশ কিংবা পনেরোশ বৈষ্ণবের খোঁজ পান, যারা তাদের মেয়েদের লেখাপড়া শেখাত এবং ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে একমাত্র তারাই মেয়েদের শিক্ষার প্রতি যত্ন নিত।[৩]

অ্যাডাম রাজশাহী জেলার নাটোর মহকুমায় যা দেখেছিলেন, তা বোধহয় বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল সম্বন্ধেও কমবেশি প্রযোজ্য। বৈষ্ণবীরা অন্দরমহলের মেয়েদের লেখাপড়া শেখাত। ঠাকুরবাড়িতেও বৈষ্ণবীদের আগমনের উল্লেখ পাই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীর পরিশিষ্টাংশে : 'নীলমণি ঠাকুরের [মৃত্যু, ১৭৯১] পরিবারবর্গ নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন, এবং খড়দহের গোস্বামীদের শিষ্য ছিলেন। সেই গোস্বামীদের নিকট তাঁহারা দীক্ষা গ্রহণ করিতেন। দীক্ষাগুরু পত্নীকে "মা গোঁসাই" বলা হইত।... মা গোঁসাই ছাড়া আর এক শ্রেণীর বৈষ্ণবী শিক্ষয়িত্রী যে যুগে পরিবারে পরিবারে গমন করিয়া মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইতেন। দ্বারকানাথের পরিবারেও তাহা করা হইত।... তাঁহারা প্রতিদিন পড়াইতে আসিতেন, অনেক সময়ে ছাত্রীদের বাটীতেও থাকিতেন। এই

সকল বৈষ্ণবীর শিক্ষাদান কেবল বাংলায় শেষ হইত না, তাঁহারা সংস্কৃত ও বৈষ্ণব স্তবগুলিও অর্থের সহিত শিক্ষা দিতেন।'[৪] যেহেতু বলা হয়েছে এই বৈষ্ণবীরা 'পরিবারে পরিবারে গমন করিয়া মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইতেন', এই প্রথাকে তাই কেবলমাত্র ঠাকুরবাড়ির বৈশিষ্ট্য হিসেবে মনে করার কোন কারণ নেই। ঠাকুরবাড়িতেও এই প্রথা দীর্ঘদিন চালু ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও (জন্ম, ১৮৪৯) ছোটবেলায় আন্দরমহলে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য একজন 'ভবি্যযুক্ত তিলক-কাটা' বৈষ্ণবীকে আসতে দেখতেন।[৫]

বৈষ্ণবীদের অন্দরমহলের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ছিল। শুধু লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্ব ছাড়াও তারা দুপুরবেলায় অন্দরমহলে ভিক্ষা চাইতে যেত। বঙ্কিমচন্দ্রের *বিষবৃক্ষ* উপন্যাসে আমরা ভেকধারী বৈষ্ণবীকে নগেন্দ্রনাথের অন্তঃপুরে 'জয় রাধে' বলে দাঁড়াতে দেখি। বৈষ্ণবী যখন প্রশ্ন করে 'কি গায়িব ?', তখন মেয়েদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন উত্তর থেকে সে যুগের মেয়েদের জ্ঞানবিদ্যা তথা সংস্কৃতির মান সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যায়: 'তখন শ্রোত্রীগণ নানাবিধে ফরমায়েস আরম্ভ করিলেন, কেহ চাহিলেন "গোবিন্দ অধিকারী"—কেহ "গোপাল উড়ে"। যিনি দাশরথির পাঁচালী পড়িতেছিলেন, তিনি তাহাই কামনা করিলেন। দুই একজন প্রাচীনা কৃষ্ণ বিষয় হুকুম করিলেন। তাহারই টীকা করিতে গিয়া মধ্যবয়সীরা "সখী সংবাদ" এবং "বিরহ" বলিয়া মতভেদ প্রচার করিলেন। কেহ চাহিলেন "গোষ্ঠ"— কোন লজ্জাহীনা যুবতী বলিল, "নিধুর টপ্পা গাহিতে হয় ত গাও— নহিলে শুনিব না।" সবশেষে বৈষ্ণবী গাইল :

শ্রীমুখপঙ্কজ—দেখবো বলে হে,
তাই এসেছিলাম এ গোকুলে।
আমায় স্থান দিও রাই চরণতলে।[৬]

১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে লিখতে বসে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীনাদের মুখ দিয়ে কৃষ্ণবিষয়ক গানের ফরমাস করিয়েছেন। বোঝা যায়, শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মেয়েদের কাছে আরও দু-একটি নতুন ধরনের গানের প্রতি আকর্ষণ থাকলেও প্রাচীনারা অভ্যস্ত ছিলেন কৃষ্ণবিষয়ক গানে। গত শতকের দিকে মেয়েদের সংসারের চৌহদ্দিতে সারা দিনই আটকে থাকতে হত, একথা সত্য। কিন্তু সেটাই সব নয়। তাদেরও নিজস্ব বিনোদন-ব্যবস্থা ছিল, বিনোদনের এই ধারাটি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হলেও তাকে বহমান রেখেছিল বৈষ্ণবীরাই।

বাংলার মেয়েদের 'আধুনিক' শিক্ষা শুরুর প্রাক্কালে বৈষ্ণবীদের আরও একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। এক অর্থে তারাই ঠিক করত ঐ সময়ে পঠিত পুস্তকের সূচি। বাংলা সাহিত্যের সেটি বড় সুদিন নয়। প্রধান সাহিত্য বলতে বোঝাত বটতলার বই আর কবিওয়ালাদের গান। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের মধ্যেই বটতলাকে কেন্দ্র করে কয়েকটি বাংলা ছাপাখানা হাটখোলা, বালাখানা, দরজিপাড়া প্রভৃতি জায়গায় স্থাপিত হয়েছিল। এবং এই স্থানগুলি থেকে যে সব বই প্রকাশিত হত, তাদের নিয়মিত পাঠকদের মধ্যে মেয়েরাও ছিল। ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে 'নেটিভ ফিমেল স্কুলে'র উদ্বোধনী ভাষণে বেথুনও এই মন্তব্য করেছিলেন।[৭]

এ সব ছাপাখানা থেকে যা প্রকাশিত হত, তার এক বড় অংশ ছিল ধর্মপুস্তক। ধর্মপুস্তক মুদ্রণের অর্থ, অন্তঃপুরে তার নিয়মিত পাঠ। মুদ্রিত হত প্রধানত কৃত্তিবাসী

রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, চৈতন্য বিষয়ক বিভিন্ন কাব্য, নারদসম্বাদ, ভক্তিবিলাস, নরোত্তমবিলাস, গীতচিন্তামণি, পদকল্পলতিকা, ইত্যাদি।[৮] লক্ষ করলে দেখা যায়, রামায়ণ মহাভারত বাদ দিলে বেশির ভাগ বইই বৈষ্ণবধর্ম সংক্রান্ত। রাসসুন্দরী দেবী তাঁর আত্মকথায় ছোটবেলায় তাঁর পঠিত যে বইগুলির উল্লেখ করেছেন সেগুলিও চৈতন্য ও বৈষ্ণব বিষয়ক : 'আমার মন যেমন পুস্তক-পড়ার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল, তেমনি পুস্তক পড়িয়া পরিতুষ্ট হইয়াছে। ঐ বাটীতে যে কিছু পুস্তক ছিল, ক্রমে ক্রমে আমি সকল পড়িলাম, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, আঠার পর্ব, জৈমিনি ভারত, গোবিন্দ লীলামৃত, বিদগ্ধমাধব, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, বাল্মীকিপুরাণ এই সকল পুস্তক ঐ বাটীতে ছিল।'[৯]

এক্ষেত্রে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সব রচনাই—নতুনই হোক আর পুবনোই হোক—কোন-না-কোন সামাজিক আদর্শকে বহন করে। প্রাচীন কালের রচনা হলেও তার অব্যাহত পঠন প্রমাণ করে সমাজে তাদের অব্যাহত চাহিদা। সামাজিকভাবে যদি সেই সব আদর্শ গ্রহণযোগ্য না হত, তাহলে এতদিন ধরে তাদের পাঠও অব্যাহত থাকত না। আমরা যখন দেখি যে বৈষ্ণবীদের মাধ্যমে বৈষ্ণব-বিষয়ক সাহিত্য স্থান পেয়েছিল অন্দরমহলে, তখন মহিলাদের সামনে যেসব মূল্যবোধগুলি তুলে ধরা হত তাদেব সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা করতে পারি। অস্পষ্ট বললাম, কারণ খুব সুষ্ঠু কোন ধারণা গড়ে তোলা খুব দুরূহ। যে আদর্শকে মেয়েদের সামনে উপস্থাপিত করা হত, তা মূলত বিশ্বাসের আদর্শ, ভক্তির আদর্শ এবং তার সঙ্গে রামায়ণ-মহাভারতের চিরন্তন আদর্শ তো ছিলই। সীতা-সাবিত্রীর পাতিব্রত্য ছিল মেয়েদের কাছে দাম্পত্য জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। প্রথানুগ শিক্ষার আগে মেয়েদের সংস্কৃতি ও মানসিকপ্রস্তুতি সম্বন্ধে কিছু আন্দাজ করা যায।

এই মানসিক প্রস্তুতির দিকটি বোঝার আরও একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় যে কেবলমাত্র প্রাচীন সাহিত্যেরই পুনর্মুদ্রণ হচ্ছিল, তা নয়। এ যুগে যে সাহিত্য তৈরি হচ্ছে, তারও প্রধান উপজীব্য হিসেবে দেখতে পাই প্রাচীন সাহিত্যের অনেকগুলি বিষয়কে। সে যুগের প্রধান সাহিত্য কবিগান। কবিগানের প্রধান অঙ্গ ছিল রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক। এই গান ভদ্রলোকের বাড়িতে হত। পূজা-পার্বণ, বিয়ে বা যে কোন শুভকর্মেই বসত কবির আসর। শুধু পুরুষেরা নয়, সেই কবিগানের শ্রোতৃমণ্ডলীর এক প্রধান অংশ ছিল মহিলারাও।[১০] কবিওয়ালাদের বিভিন্ন রচনার মধ্যে অবশ্যই এক অন্তর্লীন আবেদন ছিল যার ফলে মেয়েরা উৎসাহের সঙ্গে এগুলি শুনত। বৈষ্ণব-প্রধান হলেও, কবিগানের মধ্যে বারবার এসে ভিড় করেছে এমন সব পংক্তি যা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মেয়েদের সামাজিক বাস্তবতারই দ্যোতক। যেমন :

মনে রৈল সই মনের বেদনা।

. . .

যদি নারী হোয়ে সাধিতাম তাকে।
নির্লজ্জা রমণী বোলে, হাসিতো লোকে।
সখি, ধিক্ থাক্ আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে
নারী জনম যেন করে না।[১১]

রাম বসুর (১৭৮৬—১৮২৮) গানের নায়িকার দুঃখ কি কেবল খণ্ডিতা শ্রীরাধিকার ? তাঁর তো বটেই, কিন্তু তাঁরই কি একার ? বঞ্চিতা বাঙালিনীর সঙ্গে ব্রজবাসিনীর মনোগত দুঃখ কতটা পৃথক ? চোখের সামনে কোন মর্মপীড়িতা নারীর 'কাতর অবস্থা দেখার অভিজ্ঞতা না থাকলে 'নারী জনম যেন করে না'-র মত পংক্তি রচনা কোন কবির পক্ষেই সম্ভব নয়। কিংবা হরু ঠাকুরের (১৭৩৮—১৮১২) :

> ধিক্ ধিক্ ধিক্ তার, জীবনো যৌবন।
> এমন প্রেমের সাধ করে যেই জন ॥
> সে চাহে না আমি তার যোগাই মন।
> . . . .
> হেন অরণ্যে রোদনে, ফলো আছে কি।
> এ হোতো সুখী একা যে থাকি ॥
> ধোরে বেঁধে করা কিনা প্রেমো উপার্জ্জন।[১২]

অথবা, রাসু-নৃসিংহর (জন্ম যথাক্রমে ১৭৩৪ ও ১৭৩৮) :

> কহ সখি কিছু প্রেমেরি কথা
> ঘুচাও আমারো মনেরো ব্যথা।[১৩]

এই উদ্ধৃতি থেকে কোন পূর্ণ চিত্র পাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বস্তুতপক্ষে কবিগান থেকেই পূর্ণ চিত্র পাওয়া অসম্ভব। তবে যে কবিগান বিভিন্ন স্থানে গাওয়া হত, তার মধ্যে অবশ্যই সামাজিক বাস্তবতার স্পর্শ থাকত। নইলে শ্রোতারা গ্রহণ করত কেন ? অন্তত নারী-জীবনের অসম্পূর্ণতার ছবিটি তো পাওয়া যায় : 'সে চাহে না, আমি তার যোগাই মন।' কবিগানের নায়িকারা মাঝে মাঝেই নিজেদের জীবনকে সুতীব্র ধিক্কার জানিয়েছে। উপেক্ষিতার মর্মজ্বালার এই প্রকাশ কখনই শুধু কবিকল্পনা হতে পারে না।[১৪]

অর্থাৎ কবিগানের মধ্যে পরিচিত বিষয়বস্তু ও আত্মসমীকরণের উপায় পেত বলেই বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে মেয়েরা এদের ব্যাপকভাবে গ্রহণ করত। নতুন গড়ে ওঠা শহর কলকাতাতেই মহিলা কবিরা নিয়মিত বাস করত। কৈকালা গ্রামনিবাসী কোন এক কৃষ্ণকান্ত দত্তের বাড়িতে সরস্বতী পূজো উপলক্ষে ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা থেকে গোলকমণি, দয়ামণি ও রত্নমণি নামে তিন দল 'নেড়ি কবি' গান গাইতে গিয়েছিল বলে সংবাদ *সমাচার দর্পণ*-এ বের হয়।[১৫] কলকাতা থেকে গিয়েছিল, অর্থাৎ কলকাতাই ছিল তাদের জীবিকা উপার্জনের প্রধান স্থান। এবং ঐ *সমাচার দর্পন* পত্রিকাতেই দু বছর পরে (১৮২৮) প্রকাশিত একটি খবর থেকে জানা যায় যে এই মহিলা কবির দল 'প্রায় সকল পরবে লোকের বাটীতে নাচিয়া কবি গান গাহিত'।[১৬]

শুধু কবিগানই নয়, বিভিন্ন পূজা-পার্বণ উপলক্ষে বাড়িতে-বাড়িতে বসত কথকতা পাঠ প্রভৃতির আসর। পরবর্তীকালে রচিত বহু আত্মজীবনীতে এই প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৭] যেমন, শ্রাবণ মাসে সন্ধ্যাবেলায় মনসা পুঁথি পাঠ হত। *সঞ্জীবনী* পত্রিকার সম্পাদক ও স্বদেশী আন্দোলনের নেতা কৃষ্ণকুমার মিত্র আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে

গ্রামের একটি বাড়িতে শ্রাবণ মাসে 'পদ্মপুরাণ' পাঠ শুনতে মেয়েরা যেত। সেখানে চাঁদ সদাগরের কথা, লক্ষ্মীন্দরের কথা প্রভৃতি পাঠ হত। আবার, নবীনচন্দ্র সেন-এর আত্মজীবনীতেও আমরা পাই : '. . . সন্ধ্যার সময়ে গ্রামটি মনসা-পুঁথি পাঠের উচ্চ ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইত। প্রত্যেক বাড়ী বাড়ী তাহা মহাসমারোহে পঠিত হইত। সেরূপ অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যার সময়ে সমস্ত বৎসর বাড়ী বাড়ী রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কণ পাঠ হইত। এক একজন কি মধুর কণ্ঠে কি ভাবতরঙ্গ তুলিয়া সে সকল পবিত্র কাব্য পাঠ করিতেন। নবীনা, প্রবীণা বালবৃদ্ধ দিবসের কার্য্য সারিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সে সকল উপাখ্যান শুনিতে শুনিতে শোকে ও ভক্তিতে অশ্রুবর্ষণ করিতেন, এবং প্রেমে পবিত্রিত, বীরত্বে উদ্দীপিত, পুণ্যে মোহিত, পাপে রোমাঞ্চিত হইতেন। এই মহাগ্রন্থসকল তাহাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়া, তাহাদের শোণিতে শোণিতে সঞ্চারিত হইয়া, তাহাদের শরীর ও চরিত্র গঠন করিত এবং কর্মে নিষ্কামতা, ধর্মে ভক্তি, অবিচলতা, অধমে ঘৃণার পরাকাষ্ঠা, পুণ্যে প্রবৃত্তি, পাপে নিবৃত্তি, জীবে দয়া, সত্য নিষ্ঠা, সতীত্বে সুখ, শিক্ষা দিত। এমন উচ্চ শিক্ষা, তাহার এমন সহজ উপায়, তাহার এমন দেশব্যাপী সুফল, আর কোনো দেশ কি কখনো দেখাইতে পারিয়াছে?'

॥ দুই ॥

আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা যে সর্বতোভাবে একটি নতুন বস্তু বা উনবিংশ শতাব্দীর আগে কোন মেয়ে কখনও লেখাপড়া করেনি, তা নয়। প্রাচীন যুগের কথা ছেড়ে দিলেও আমাদেব আলোচ্য সময়ের অব্যবহিত আগেও আমরা স্ত্রীশিক্ষার প্রমাণ পাই ভারতচন্দ্রের কাব্যে। সেটা অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরে'র বিদ্যা শুধু বহু বিদ্যারই অধিকারিণী ছিলেন না, তাঁর পণ ছিল, তাঁকে তর্কে যিনি পরাজিত করতে পারবেন সেই বিজয়ীকেই তিনি বিবাহ করবেন।[১৮]

শুধু বৈষ্ণবীরাই নন, আরও কিছু মহিলার লেখাপড়ার প্রমাণ পাই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। অ্যাডাম রাজশাহী জেলায় জমিদারবংশীয়াদের মধ্যে কয়েকজনকে পড়াশোনা করতে দেখেছিলেন। অ্যাডাম লিখেছেন, জমিদাররা প্রায় সকলেই তাদের মেয়েদের কিছুটা লেখাপড়া শেখাতেন, তবে তাঁরা প্রায়শই এ তথ্যটি সর্বসমক্ষে স্বীকার করতেন না। জমিদারদের এভাবে গোপনে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার কারণ সম্পর্কে তাঁর অভিমত, এই জমিদাররা তাঁদের মেয়েদের বিত্তশালী ঘরে বিয়ে দিতেন এবং লিখতে বা পড়তে না পারলে, কিংবা হিসাবপত্র না বুঝতে পারলে বৈধব্যদশায় মৃত স্বামীর সম্পত্তি বেহাত হয়ে যাওয়ার ভয় ছিল সমধিক।[১৯] আবার এ কারণে এমনও দেখা গেছে, একেবারে যে সব মেয়েরা কখনোই শিক্ষালাভ করেনি, তারাও বিধবা অবস্থায় তাদের বাপের বাড়ির কথায় লেখাপড়া শিখতে শুরু করেছে।[২০] কেবল রাজশাহী জেলাতেই অ্যাডাম লক্ষ করেছিলেন যে পঞ্চাশ-ষাটটি প্রধান জমিদারির প্রায় অর্ধেকই মহিলারা চালাতেন। এদের মধ্যে দুজনের নাম অ্যাডাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন—রানি সূর্যমণি ও রানি কমলমণি দাসী। এঁরা শুধু হিসাবপত্রের সুবিধার জন্য অক্ষরজ্ঞানসম্পন্না ছিলেন না, বাংলা ভাষাতেও ছিলেন যথেষ্ট পটু ও বিদগ্ধ।[২১]

শুধু অ্যাডামের বিবরণ নয়, আরও কয়েকটি সূত্র থেকেও আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় উচ্চশ্রেণী বা বিত্তবান ঘরের রমণীদের বিদ্যাভাসের পরিচয় পাই। ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তারিখের *সমাচার দর্পণ* থেকে জানতে পারি যে, রাজশাহীর রাজা রামাকান্ত রায়ের স্ত্রী 'মহারাণী ভবানী বিদ্যাভাস দ্বারা চিরকাল রাজশাসন করিয়াছেন[।] কাশীতে তাঁহার অন্নপূর্ণা খ্যাতি আছে[।] অদ্যাপি প্রাতঃকালে উঠিয়া লোকেরা তাঁহার নাম স্মরণ করে। এবং রাঢ়ীর ব্রাহ্মণ কন্যা হটী বিদ্যালঙ্কার নামে খ্যাতা হইয়া বৃদ্ধাবস্থাতে কাশীতে অধ্যাপনা করিয়াছেন এবং সেখানে তাঁহার সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ হইত। এবং কোটালী পাড়া গ্রামে শ্যামাসুন্দরী নামে এক ব্রাহ্মণী ব্যাকরণাদি ন্যায় পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন।'[২২] ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত *স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক* গ্রন্থে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারও 'স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাসের প্রমাণ' দিতে গিয়ে অন্যান্যদের মধ্যে *সমাচার দর্পণ*-এ উল্লিখিত বিদুষী মহিলাদের কথাও বলেন। শুধু রানি ভবানী নন, তাঁর বাড়ির অন্যান্য মহিলারাও লেখাপড়া জানতেন বলে গৌরমোহন লিখেছিলেন : '. . . তাঁহার [রানি ভবানীর] বাটীতে আর ২ যে স্ত্রী সকল আছেন, তাঁহারাও লেখা পড়াতে নিপুণ, এবং আপন ২ রাজ্যের ও অন্য ২ বিষয়ের [অর্থাৎ হিসেবপত্র বাদ দিয়ে] লেখাপড়া করিতেন।'[২৩] শুধু তাইই নয়, গৌরমোহন দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, 'কলিকাতার রাজবাটীর প্রায় সকলেই লেখাপড়া বিদিত আছেন।'[২৪] রাজা রাধাকান্ত দেব *Female Education* (১৮২১) গ্রন্থে দাবি করেন যে তাঁর পরিবারের প্রায় প্রত্যেক মহিলাই কমবেশি সুশিক্ষা লাভ করেছিলেন।[২৫] অ্যাডাম যেমন বৈধব্যাবস্থায় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিত্তশালী পরিবারের মেয়েদের মধ্যে বিদ্যা শিক্ষার প্রচলন লক্ষ করেছিলেন, তেমনি সীতানাথ তত্ত্বভূষণও সম্ভ্রান্ত কায়স্থ একটি পরিবারে পুত্রের মৃত্যুতে সান্ত্বনা লাভের উদ্দেশ্যে স্তোত্রপাঠের জন্য এক বয়স্কা রমণীর বিদ্যাভাসের উল্লেখ করেন।[২৬]

ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে যে বাঙালি সমাজে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ধীরে ধীরে দেখা দিচ্ছে তার প্রমাণ মেলে *সমাচার দর্পণ* পত্রিকায় পরিবেশিত একটি সংবাদে: 'ইদানীন্তন বিদ্যাবতী অনেক স্থানে অনেক স্ত্রী আছেন [।] এই কলিকাতা মহানগরের মধ্যে ভাগ্যবান লোকেরদিগের অনেক স্ত্রী প্রায় লেখাপড়া জানেন' (১৩ই এপ্রিল, ১৮২২)।[২৭] উদ্ধৃতির মধ্যে ব্যবহৃত 'ভাগ্যবান' শব্দটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দেই কয়েকজনের মধ্যে এই মানসিকতা গড়ে উঠছিল যে লেখাপড়া করা শুধু মেয়েদের পক্ষেই গৌরবের নয়, তাদের স্বামীদের পক্ষে সৌভাগ্যের সূচক। ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দেই স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার হয়েছিল, এমন মনে করার কোন কারণ নেই। তবে কিছু ব্যক্তির মানসিকতায় এই পার্থক্যটি লক্ষণীয়। আবার শুধু জমিদার বাড়ির মেয়েরাই যে লেখাপড়া করত তাও নয়। ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত *আধ্যাত্মিকা* গ্রন্থের ভূমিকায় প্যারীচাঁদ মিত্র (জন্ম, ১৮১৪) লিখেছিলেন যে তাঁর ঠাকুরমা, মা ও কাকীরা বাংলা বই পড়তেন, এবং বাংলা লিখতে ও হিসাব রাখতে জানতেন।[২৮]

তবে সাধারণ ভাবে বলতে গেলে, মেয়েদের লেখাপড়ার রীতি জমিদার বাড়িতেই একমাত্র না হলেও ধনাঢ্য বাড়িতেই বেশি প্রচলিত ছিল। কৈলাসবাসিনী দেবীও (জন্ম, ১৮৩৭) স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সত্যযুগে মেয়েদের লেখাপড়ার চল ধনী বাড়িতে ও কয়েকটি মধ্যবিত্ত গৃহে প্রচলিত থাকার কথা উল্লেখ করেছেন : '. . . ধনবন্ত ব্যক্তিরা জমিদারি

প্রথানুসারে আপনাপন দুহিতাগণকে বাটির রক্ষিত গুরু মহাশয়ের হস্তে শিক্ষার্থে অর্পণ করিতেন। কন্যাগণ নবম বা দশম বর্ষবয়ঃক্রমাবধি শুভঙ্করী ধারানুসারে কড়া, গণ্ডা, গুণকিয়া, চৌকিয়া ইত্যাদি অঙ্ক ও গুরুদক্ষিণা গঙ্গাবন্দনা ও চাণক্যশ্লোকের দুই এক পদ মাত্র শিক্ষা করিয়া বিদ্যার পরিসমাপ্তি করিতেন, পরে বয়োবৃদ্ধি হইলে যখন সংসারে ব্রতী হইতেন, তখন দুই একখানি সামান্য গ্রন্থপাঠ এবং প্রাত্যহিক ইষ্টপূজাকালীন শ্রীফলদলে উপাস্যদেবতার সহস্রনাম চন্দনদ্বারা অঙ্কিত করত পূজা করিতেন . . . ।'[২৯]

ধনীগৃহে যে সব মেয়েরা শিক্ষা পেতেন, তাঁরা কতদূর পর্যন্ত পড়তেন তা বোঝা যায় কৈলাসবাসিনী দেবীর রচনা থেকে। আর এঁদের সংখ্যা সমস্ত বাঙালি মেয়েদের তুলনায় ছিল নিতান্তই স্বল্প। অ্যাডাম লক্ষ করেছিলেন যে কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে মেয়েদের মধ্যে সাধারণতঃ লেখাপড়ার প্রচলনই ছিল না : 'Absolute and hopeless ignorance is in general their [womens'] lot. The notion of providing the means of instruction for female children never enters into the minds of parents; and girls are equally deprived of that imperfect domestic instruction which is sometimes given to boys.'[৩০] আরও বছর চল্লিশ আগে ক্রফোর্ডও লক্ষ করেছিলেন যে একমাত্র নাচওয়ালি ছাড়া মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার চল বিশেষ ছিল না।[৩১] হয়ত নাচওয়ালিরা পেশাগত কারণে অল্পস্বল্প লেখাপড়া করত। কিন্তু ভদ্র পরিবারের মেয়েদের সেই পেশাগত প্রয়োজন না থাকার জন্য সাধারণ বাঙালি পরিবারে শিক্ষার রেওয়াজ ছিল না। মধ্যবর্তী চার দশকে, বিশেষতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে শিক্ষিত ব্যক্তিদের কয়েকজনের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কিছু উৎসাহ দেখা দিলেও গোটা বাঙালি সমাজের তুলনায় তা আদৌ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নয়। এটাও খুবই সম্ভব যে নাচওয়ালি মেয়েরা লেখাপড়া জানত বলে সাধারণ বাঙালি পরিবারের মূল্যবোধ মেয়েদের পড়াশোনার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করত। হয়ত মেয়েদের লেখাপড়া করালে সামাজিক পদমর্যাদায় নেমে যাওয়ার ভয় ছিল। বোধহয় এই সামাজিক মূল্যবোধের জন্যই বাড়ির মেয়েদের লেখাপড়ার কথা কেউ প্রকাশ্যে স্বীকার করত না। ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে অ্যাডাম লিখেছিলেন যে মেয়েদের লেখাপড়া শেখান একটি গর্হিত অপরাধের মধ্যে গণ্য হত এবং লিখতে পড়তে পারে এমন মেয়েকে কেউ বিয়ে করতেও চাইত না। বিয়ের পর স্বামীরা দু-এক ক্ষেত্রে 'প্রতারিত' বোধ করত যখন তারা বুঝতে পারত তাদের স্ত্রীরা বিয়ের পরে স্বামীদের পক্ষে যা অশুভ বলে গণ্য হত তেমন কিছু লেখাপড়া শিখেছে।[৩২]

স্বামীরা স্ত্রীশিক্ষাকে যে 'অশুভ' বলে মনে করত, তার পেছনে ছিল অনেকগুলি সমসাময়িক বিশ্বাস। সে যুগে একটি প্রচলিত ধারণা ছিল যে মেয়েরা লেখাপড়া করলে বিধবা হয় এবং বাড়িতে দুর্দিন ঘনিয়ে আসে। কৈলাসবাসিনী দেবী লিখেছিলেন : 'তৎকালিন [তদেব] পণ্ডিতগণ কহিতেন যে সংস্কৃত শাস্ত্রে অবলা জাতির অধিকার নাই, আর স্ত্রীগণ গৃহমধ্যে কালীর [তদেব] অঙ্কপাত করিলে লক্ষ্মী ত্যাগ হয়, এবং উহারা যে কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করুক না কেন তাহাতেই উহাদিগের বিষমানিষ্টের সম্ভাবনা, আরও কহিতেন যে স্ত্রীগণ বিদ্যাধ্যয়ন করিলে অকালে বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হয়। অতএব এইরূপ নানাবিধ অসঙ্গত বাক্যের দ্বারা তাহারা বামাগণকে বঞ্চনা করিতেন . . . ।'[৩৩]

মেয়েরা লেখাপড়া করলে বিধবা হয় এই ধারণা খণ্ডন করার জন্য গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার *স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক* গ্রন্থে 'দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন' অংশে প্রশ্নকর্ত্রীর মুখ দিয়ে যা জিজ্ঞাসা করিয়েছেন, তাতেও আমরা এই বহুল প্রচলিত বিশ্বাস সম্বন্ধে জানতে পারি :

'প্র। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার কথায় বুঝিলাম যে লেখাপড়া আবশ্যক বটে। কিন্তু সে কালের স্ত্রীলোকেরা কহেন, যে লেখাপড়া যদি স্ত্রীলোকে করে তবে সে বিধবা হয়, একি সত্য কথা, যদি এটা সত্য হয় তবে মেনে আমি পড়িব না, কি জানি ভাঙ্গা কপাল যদি ভাঙ্গে।

উ। না বইন, সে কেবল কথার কথা। কারণ আমি আমার ঠাকুরাণী দিদির ঠাঁই শুনিয়াছি যে কোনে শাস্ত্রে এমত লেখা নাই, যে মেয়্যামানুষ পড়িলে রাঁড় হয়। কেবল গতর শোগা মাগিরা একথার সৃষ্টি করিয়া তিলে তাল করিয়াছে।'[৩৪]

কৈলাসবাসিনী দেবী মেয়েদের লেখাপড়া না শেখানোর জন্য দায়ী করেছিলেন পুরুষসমাজকে, আর, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের উত্তরদাত্রী স্ত্রীলোকের মতে এই মতটি চালু করেছে 'গতর শোগা মাগিরা'—অর্থাৎ অলসপ্রকৃতির মেয়েরা যারা বিদ্যাশিক্ষার পরিশ্রমের ভয়ে নানা অলীক সম্ভাবনা প্রচার করে বেড়ায়। তবে এই মত যে ব্যাপকভাবে চালু ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে তার প্রমাণ পাই প্যারীচাঁদ মিত্রের *রামারঞ্জিকা* থেকেও। এই গ্রন্থে পদ্মাবতী তাঁর স্বামীকে মেয়ের লেখাপড়া না করার কারণস্বরূপ বলছে '... *মেয়েমানুষ লেখাপড়া শিখে কি করবে ? সে কি চাকরি করে টাকা আনবে ? মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখলে বরং লোকে নিন্দা করবে।*'[৩৫]

ফলে, এমন একটা ধারণা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে যে মেয়েদের পক্ষে লেখাপড়া করা এক অত্যন্ত গর্হিত কর্ম। রাসসুন্দরী দেবীও (জন্ম, ১৮১০) বৃদ্ধ বয়সে আত্মজীবনী লিখতে বসে একই কথা বলেছেন—মেয়েদের লেখাপড়া শিখতে নেই এটাই ছিল সাধারণ নিয়ম : 'সেকালে মেয়েছেলের বিদ্যাশিক্ষা ভারী মন্দ কর্ম্ম বলিয়া লোকের মনে বিশ্বাস ছিল।'[৩৬]

এ ধারণা কেবলমাত্র গত শতাব্দীর গোড়াতেই চালু ছিল, এমন নয়। *স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক* প্রকাশিত হওয়ার (১৮২২) প্রায় চল্লিশ বছর পরেও একই ধারণা বাঙালি সমাজে প্রচলিত ছিল, হয়ত বা একটু কমে এসেছিল। *বামাবোধিনী পত্রিকার* প্রথম সংখ্যাতেই (১৮৬৩) জ্ঞানদা ও সরলার কথোপকথনে জ্ঞানদা সরলাকে পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সরলা বলছে '... *লেখাপড়ার জন্যে আগে আমার ভারী ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কি করবো পাঁচজনার পাঁচ কথা শুনে আমার মন ফিরে গেছে।*'[৩৭] অথবা, ঐ একই রচনায় সরলা বলছে : '*আমার মনে হয় মেয়েমানুষদের লেখাপড়ার দোষ আছে তাইতেই উঠে গেছে। এক ত শুনি বিধবা হয়।*'[৩৮] ১৮৬৩ সালেও যখন সরলাকে সাধারণ বাঙালি মেয়ের প্রতিনিধিস্থানীয়া হিসেবে কল্পনা করে স্ত্রীশিক্ষা সংক্রান্ত ভ্রান্ত সংশয় নিরসনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হত, তখন বোঝা যায় এই ধরনের বিশ্বাসের মূল কত গভীরে পরিব্যাপ্ত ছিল।

সমসাময়িক লেখাপত্র থেকে সামগ্রিক যে ছবি ফুটে ওঠে তা অত্যন্ত নিরাশাব্যঞ্জক। যেখানে বিধবা হওয়ার ভয় সজ্ঞানে কাজ করত না সেখানেও প্রচলিত প্রথা বা সামাজিক নিয়ম অনুসারে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই অনুভব করতেন না।

আসলে, মেয়েদের লেখাপড়া করানর ব্যাপারে এক ধরনের নিস্পৃহতা গড়ে উঠেছিল সাধারণ বাঙালির মধ্যে। লেখাপড়া শিখিয়ে কী হবে—এ ধরনের মনোভাবই হয়ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাজ করেছে। বিপিনচন্দ্র পালের (জন্ম, ১৮৫৮) মা নারায়ণী দেবী কখনও লেখাপড়া করেননি। এ সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন : 'তখনকার প্রথামত আমার মা কিন্তু লেখাপড়া জানতেন না। পুরুষেরা মেয়েদের সম্বন্ধে হিংসা করত বলে যে তারা লেখাপড়া মেয়েদের শেখাত না তা নয়। লেখাপড়ার তেমন কোন মূল্য ছিল না।'[৩৯] এখানে 'মূল্য' শব্দটির ব্যবহার লক্ষণীয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে শিক্ষার মূল্য খুব কম ব্যক্তিই বুঝতে পেরেছিলেন (যদিও সংখ্যাটা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছিল)। তার ওপর মেয়েদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে তার ব্যবহারিক মূল্য নিয়েও একটা প্রশ্ন ছিল।

'মূল্য' থাক বা না থাক, মেয়েদের লেখাপড়া করাটাই অনেকের কাছে যথেষ্ট নিন্দার বিষয় ছিল। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (জন্ম, ১৮৫০) তাঁর মায়ের কথা আমাদের শুনিয়েছেন। জ্ঞানদানন্দিনী তখন ছোট, একদিন রাত্রে ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠে মাথা তুলে দেখেন যে তাঁর মা কিছু লিখছেন বা পড়ছেন। জ্ঞানদানন্দিনীকে দেখা মাত্র তিনি সেসব ঢেকে ফেলেন—পাছে অল্পবয়সী মেয়ে কাউকে বলে দেয়। এই প্রসঙ্গেই জ্ঞানদানন্দিনী লিখেছেন: 'আমাদের এক প্রতিবেশিনী বয়স্কা আত্মীয়া লেখাপড়া জানতেন, লোক নিন্দার ভয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে হিসেব-কিতেব চিঠিপত্র লিখতেন। তবু কি রকম করে টের পেয়ে লেখাপড়া করেন বলে পাড়ার লোকে তার নিন্দা করত।'[৪০]

মেয়েদের লেখাপড়া যে নিন্দনীয় ছিল তার পেছনে শুধু বৈধব্যের আশঙ্কাই ছিল না। আরও অনেকগুলি ভয়ও কাজ করেছে, যার উল্লেখ পাই *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকায়।[৪১] বাংলাদেশে দলগতভাবে প্রথম শিক্ষা লাভ করেন 'ইয়াং বেঙ্গল'-এর সভ্যরা। বাংলাদেশের সমাজে তাঁদের আগমন অনেকটা ধূমকেতুর মত। তাঁদের কীর্তিকলাপের ফলে সাধারণের মনে শিক্ষা ও উচ্ছৃংখলতা অনেকটা সমার্থক হয়ে যায়। ফলে এক ধরনের ভয় দেখা দেয় যে ঘরে মেয়েরাও যদি 'ইয়াং বেঙ্গল'-দের মত ব্যবহার শুরু করে তবে পারিবারিক শৃংখলা রক্ষা করা আর কিছুতেই সম্ভব হবে না।[৪২] পরিবার সমাজ সমস্ত রসাতলে যাওয়ার ভীতিপ্রদ চিত্র এঁকেছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত। মেয়েরা গড়ের মাঠে জুড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছে কিংবা ধর্মের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে মদ্যপানাসক্ত হয়ে পড়ছে[৪৩]—ঈশ্বর গুপ্তের এ ধরনের আশঙ্কা ঐতিহ্যানুসারী বাঙালি সমাজেরই এক অংশের— এবং বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠদের— মানসিকতার প্রতিফলন। কৈলাসবাসিনী দেবী মন্তব্য করেছিলেন : 'তাঁহারা [পুরুষেরা] বণিতাগণকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে রাখিবার অভিপ্রায়েই তাহাদিগকে বিদ্যারসের সুধাময় মাধুর্য্য আস্বাদন করাইতে ইচ্ছা করিতেন না অথবা পাছে তাহারা বিদ্যাবলে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া পুরুষগণকে অগ্রাহ্য করে কিম্বা গৃহকার্য্যে উপেক্ষা করতঃ কেবল শাস্ত্রালাপেই রত থাকে ও অন্তঃপুর হইতে বহির্গতা হইতে ইচ্ছা করে অথবা পত্রদ্বারা আমন্ত্রণ করত অন্য পুরুষকে বরণ করিতে অভিলাষী হয়, এই প্রকার বিবিধ আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া তাঁহারা স্ত্রীগণকে নিতান্ত নির্বোধ ও বিদ্যাভ্যাসে অশক্তা বলিয়া নির্দেশ করিতেন।'[৪৪] কৈলাসবাসিনী দেবী লিখেছেন যে, যে মেয়ে পুরুষের নিষেধাজ্ঞা না শুনে পড়াশোনা করত, তাকে সবাই 'অর্ধপুরুষ বলিয়া উপহাস করিত'। এই প্রসঙ্গেই তিনি একটি অত্যন্ত কৌতুকজনক পরিস্থিতির উল্লেখ

করেন। মেয়েদের লেখাপড়া নিন্দনীয়—এই গুজব এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে শিক্ষিত মহিলারা অনেক সময়ে অশুভত্বের প্রতীক হয়ে যেত। এদের 'দেখিলে কুলকামিনীগণ আপনাদিগের তনয়া ও সুসাগগণকে সাবধানপূর্ব্বক রক্ষা করিতেন। যেমন প্রসূতিগণ স্বীয় সন্তানগণকে ডাইন যোগিনী প্রভৃতির নিকটে যাইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করেন, তেমনি ইহারাও উহাদিগকে দর্শন করিলে আস্তে আস্তে আত্মরক্ষা করিতে যত্নবতী হইতেন।'[৪৫]

॥ তিন ॥

তবে পশ্চিমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে সামগ্রিকভাবে স্ত্রীর ভূমিকা এবং বিশেষভাবে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে নতুন চিন্তাভাবনাও বিস্তৃততর হতে শুরু করে। পশ্চিমেও শিল্প বিপ্লবের ফলে মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা কমে যায়। উৎপাদন মাধ্যমের আধুনিকতা, শিল্পের প্রসার ও ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে শুরু হয় মেয়েদের অবস্থার ক্রমাবনতি। এতদিন পর্যন্ত সমাজে মেয়েদের ভূমিকা ছিল উৎপাদনমুখী। যে কাজে আগে তাদের ছিল সহজাত অধিকার, সেখানে এল যন্ত্র।[৪৬] মোটামুটিভাবে, পশ্চিমি দুনিয়ার স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে সচেতনতাও কিন্তু একই সময়ে, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করে। যেকোন দেশে স্ত্রীস্বাধীনতা অর্জনের প্রথম সোপান স্ত্রীশিক্ষা। পশ্চিমেও মেয়েরা মুক্তির পথ হিসাবে বেছে নিল শিক্ষাকে—শিক্ষার ফলে মেয়েরা পরিবর্তিত হল এক সম্পূর্ণ নতুন রমণীতে।[৪৭]

এ সংক্রান্ত বিভিন্ন লেখাপত্র নিয়মিত প্রকাশিত হত অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। অবশ্য অষ্টাদশ দশকের শেষার্ধেই যে পশ্চিমি সভ্যতা সহসা স্ত্রীস্বাধীনতার প্রশ্নে সচেতন হয়ে উঠল, এটা ঠিক নয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকেই এর তোড়জোড় চলছিল,[৪৮] কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ অর্ধে প্রকাশিত কয়েকটি বই পশ্চিমের চিন্তাশীল মহলে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল। এগুলির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য মেরী উলস্টোনক্রাফট -এর *Vindication of the Rights of Women* (১৭৯৮)।

অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ বা উনবিংশ শতকের সূচনায় যে নতুন চিন্তাভাবনা পশ্চিমের সমাজকে আলোড়িত করেছিল, বাংলাদেশের শিক্ষিত শ্রেণী তাকে উপেক্ষা করতে সক্ষম হয়নি। ইংরেজি শিক্ষায় সদ্যশিক্ষিত ছাত্রসমাজে এইসব বইয়ের কী বিপুল চাহিদা ছিল, তা বোঝা যায় একটিমাত্র তথ্য থেকে : টমাস পেইনের বই কলকাতার বাজারে ন্যায্য মূল্যের চেয়েও বেশি দামে বিক্রি হত।[৪৯] হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের মানবিকতাবাদে উদ্বুদ্ধ করতেন। এই সব জ্ঞানান্বেষী তরুণ ছাত্র বা জেরিমি বেন্থামের বন্ধু রামমোহনের কাছে পশ্চিমি দুনিয়ার নারী-সংক্রান্ত নতুন চিন্তভাবনার খবর যেমন পৌঁছে গিয়েছিল, তেমনি এইসব বইয়ের প্রভাবও ছিল তাঁদের ওপর অনস্বীকার্য। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকেই বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজের একাংশের মধ্যে এক নতুন চেতনার উন্মেষ লক্ষ করা যায়। মেয়েদের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেকেই ভাবিত হলেন। এবং এই সচেতনতার প্রথম প্রতিফলন ছিল স্ত্রীশিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে খুব কম ব্যক্তিই স্ত্রীশিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। কিন্তু এরই মধ্যে অল্প কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তি যে ধীরে

ধীরে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারছেন, তাতেই সমাজ-মানসিকতায় পরিবর্তনের দিকচিহ্নটি আবিষ্কার করা যায়।

অ্যাডামের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে সর্বপ্রথম উদ্যোগী হয়েছিল 'ক্যালকাটা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি'।[৫০] কিন্তু লিয়ার্ডের (Liard) বই থেকে জানা যায় এ বিষয়ে প্রথম উদ্যমী পুরুষ ছিলেন রবার্ট মে। মে 'লন্ডন মিশনারি সোসাইটির' পক্ষ থেকে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে।[৫১] অবশ্য এই দুই মতের মধ্যে সময়ের প্রভেদ অতি সামান্যই। তার এদেশীয়দের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে যাঁর নাম ও ভূমিকার কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ে তিনি হলেন রাজা রাধাকান্ত দেব। রামমোহন রায়ও মেয়েদের লেখাপড়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছিলেন—মেয়েরা যে বুদ্ধির অভাবে বিদ্যাশিক্ষা করতে অসমর্থ, এই প্রচলিত মতকে তিনি খণ্ডন করতে চাইতেন।[৫২] তবে রামমোহন স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে সক্রিয় উদ্যোগ নেননি। সে উদ্যোগ নিয়েছিলেন রাধাকান্ত দেব। সর্বান্তঃকরণে তিনি ছিলেন স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে। তবে রাধাকান্ত দেবও ভদ্রবাড়ির মেয়েদের বাড়ির বাইরে বিদ্যালয়ে গিয়ে লেখাপড়া করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তার পরিবর্তে অন্তঃপুরের মধ্যে নিজেদের বাড়িতে কিংবা প্রতিবেশীদের বাড়িতে কারও তত্ত্বাবধানে মেয়েরা পড়াশোনা শিখবে, এই ছিল তাঁর নীতি।[৫৩] 'স্কুল বুক সোসাইটি' পরিচালিত পরীক্ষাগুলিও নেওয়া হত তাঁর বাসভবনেই। এমনকি স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করার জন্য রাধাকান্ত দেবই গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারকে *স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক* বইটি রচনায় উৎসাহিত করেন।

তবে বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রথম দিকে খ্রিষ্টীয় মিশনারিদের ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় মিস মেরী এ্যান কুকের। ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে 'লেডিজ সোসাইটি' স্থাপন করা ছাড়াও কুক স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। ৮ই মার্চ, ১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দের *সমাচার দর্পণে* প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকে কুকের শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছুটা জানা যায় : 'প্রথমতঃ কতকদিন পর্য্যন্ত বালিকারা ক খ লিখে তাহাতে প্রস্তুতা হইলে পর বাঙ্গালি ইতিহাসের ক্ষুদ্র ২ পুস্তক পাঠ করে তাহাতে নৈপুণ্য জন্মিলে পর শিল্প বিদ্যাশিক্ষা করে এই কর্মে যত লাভ হয় তাহা তাহারদিগকে পারিতোষিকের মত দেওয়া যায় [।] সেই লাভ দেখিয়া শিল্পকর্ম করিতে অনেকের লোভ জন্মিয়াছে [।] তাহাতে ছয় পাঠশালাতে প্রায় এক হাজারখান গামছা কিনারা সিলাই হইয়াছে এবং কোন ২ পাঠশালাতে মোজা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে এখন পোনর পাঠশালাতে তিনশত বালিকা শিক্ষা পাইতেছে।'[৫৪] পারিতোষিক দেওয়ার ফলে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্রীদের মধ্যেই শিক্ষালাভে আগ্রহ জন্মায়। সদ্য উল্লিখিত *সমাচার দর্পন* -এর খবরে সে কথাও বলা হয়েছিল।

শুধু কলকাতাতেই নয়, কলকাতার ধারে কাছেও বালিকা বিদ্যালয়ে অনুরূপভাবে পারিতোষিক দেওয়া হত এবং সে সব স্থানেও মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ লক্ষ করা যায়। যেমন, শ্রীরামপুর। ১৮২৪ সালের ১০ই এপ্রিলের *সমাচার দর্পণের* সংবাদ অনুসারে শ্রীরামপুরের গোপাল মল্লিকের বাড়িতে যে পরীক্ষা নেওয়া হয় তাতে মোট তেরটি বিদ্যালয়ের দুশ ত্রিশজন ছাত্রী উপস্থিত ছিল। পরীক্ষার পর 'বিবি মার্সমন [মার্শম্যান] উঠিয়া বালিকাদিগকে বস্ত্র ও শিকি ও পয়সা ও ছবি ইত্যাদি পারিতোষিক

দিলেন অপর সকলে সন্দেস পাইয়া সন্তুষ্টা হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।'[৫৫] এইভাবে পারিতোষিক দিয়ে ছাত্রী সংগ্রহের প্রথা শতাব্দীর শেষভাগে এসেও রয়ে গিয়েছিল। আসলে যে ধারণার ফলে স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতি বারবার ব্যহত হয়েছিল, সেই ধারণাগুলিও অনেকাংশে অপরিবর্তিত রয়ে গিয়েছিল শতাব্দীর শেষে এসে তার ফলে উনিশ শতকের শেষেও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক নীলমণি চক্রবর্তী মেয়েদের জন্য শুধুমাত্র বিদ্যালয়ই খোলেননি, বই শ্লেট ইত্যাদি সব ব্যবস্থাই মজুত রাখতে হয়েছিল তাঁকে।[৫৬]

রাধাকান্ত দেব ছাড়াও, স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ দেখিয়েছিলেন রাজা বৈদ্যনাথ রায়। ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার পুরনো গির্জার কাছে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যয়স্বরূপ বৈদ্যনাথ রায় কুড়ি হাজার টাকা দান করেন।[৫৭] এছাড়া আরও দুজন স্ত্রীশিক্ষায় আগ্রহী সম্ভ্রান্ত বাঙালির নাম পাওয়া যায় *সমাচার দর্পণ* থেকে—মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুর ও কাশীনাথ মল্লিক।[৫৮]

মিশনারিদের স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের প্রয়াসের মধ্যে আন্তরিকতা ও সদুদ্দেশ্য থাকলেও তার অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতাও ছিল যথেষ্ট। বাঙালি সমাজের এক অংশের ভয় ছিল যে মিশনারিরা মেয়েদের ধর্মান্তরিত করতে পারে। তার ওপর ছিল পুরষ শিক্ষকদের দিয়ে লেখাপড়া শেখানোর বিভিন্ন অসুবিধা। কিন্তু সে কারণে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে উৎসাহীদের মধ্যে উদ্যোগে ভাটা পড়েনি কখনও। হিন্দু কলেজের ডিরোজিওর শিষ্যরা (যারা 'ইয়াং বেঙ্গল', নামে সমধিক খ্যাত) ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন, 'এ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' এঁদের অন্যতম মুখপত্র *জ্ঞানান্বেষণ* পত্রিকা ছিল স্ত্রী-শিক্ষা সহ বিবিধ সামাজিক বিষয়ে মতামত প্রকাশের বাহক। 'ইয়াং বেঙ্গল'-এর সদস্যরা স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। ১৮৩২ সালে *জ্ঞানান্বেষণ* পত্রিকায় বৌবাজারে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংবাদকে অভিনন্দন জানিয়ে জন বুল লিখেছিলেন :' 'For the whole of the fair sex being without knowledge have continued blindfold, they know nothing of what is good or evil, and have a poor support from the food and clothes bestowed upon them by their relative whilst they must perform the necessary work in the house like servants.'[৫৯] আর যারা বলত যে শিক্ষার ফলে মেয়েদের চরিত্র খারাপ হয়ে যাবে, তাদের বিরুদ্ধে জন বুল যুক্তি দিলেন যে শহরের প্রায় প্রতিটি সম্ভ্রান্ত বাড়িতেই নাচ-গানের আসর বসে এবং সে আসরে মেয়েরাও শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত থাকে। সেই সব নাচ-গানের মধ্যে শিক্ষণীয় প্রায় কিছুই থাকে না—সেই গান শুনে বা নাচ দেখে যদি সম্ভ্রান্তবংশীয়া কোন মহিলা দুশ্চরিত্রা না হয়ে থাকে, তাহলে উপকারী বিদ্যাচর্চার ফলে তারা ব্যাভিচারিণী হয়ে যাবে, এটা খুবই অদ্ভুত কথা।[৬০] 'ইয়াং বেঙ্গল'-দের মুখপত্র *জ্ঞানান্বেষণ* পত্রিকায় এই লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। সে অর্থে কিছু কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকলেও আমরা এই মনোভাবকে 'ইয়াং বেঙ্গল'-দের মনোভাবের নিকটবর্তী বলে গ্রহণ করতে পারি।

কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিদের একাংশের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে মানসিকতা পরিবর্তিত হলেও সামগ্রিক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে কজন বাঙালি মেয়ে শিক্ষালাভ করত ? রাধাকান্ত দেবই কেবল মেয়েদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করার বিপক্ষে ছিলেন না, সমসাময়িকদের মধ্যে

অনেক ব্যক্তিই চাইতেন না তাদের বাড়ির মেয়েরা বাইরে বিদ্যালয়ে গিয়ে লেখাপড়া শিখুক। ফলে সাধারণ বাঙালি পরিবারের মেয়েদের মধ্যে যে শিক্ষার প্রচলন বৃদ্ধি পাচ্ছিল, এমন নয়। *পূর্ণচন্দ্রোদয়*-এ প্রকাশিত একটি পত্রের সম্বন্ধে *বেঙ্গল স্পেকটেটর* লিখেছিল : 'ঐ পত্রপ্রেরক আরও কহিয়াছেন, এতদ্দেশের অন্ত্যজ জাতীয় স্ত্রীগণকে যে শিক্ষা প্রদত্তা হইয়াছে তাহাতে কোন উপকার হয় নাই যেহেতু তাহারা ১০/১২ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত পাঠশালায় থাকে এবং তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ যাহা শিক্ষা করে তাহাও স্বজাতীয় মূর্খ পতির সহিত বিবাহ হওয়ায় বৃথা হয়।'[৬১] পত্রপ্রেরকের উদ্দেশ্য ছিল স্ত্রীশিক্ষার ফল বর্ণনা করা—যারা শিক্ষা পাচ্ছিল তাদের বিবরণ তার লক্ষ্য ছিল না (তাহলে 'অন্ত্যজ' শব্দটির ব্যাখ্যা থাকত)। কিন্তু *পূর্ণচন্দ্রোদয়*-এর পত্রপ্রেরকেরও আগে এ বিষয়ে একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল *বঙ্গদূত* পত্রিকায়। ১৮৩১ সালের ২৫শে জুন *সমাচার দর্পণ*-এ 'বাঙ্গলা সমাচারপত্রের মর্ম্ম' অংশে *বঙ্গদূত* পত্রিকার একটি রচনার মর্ম উদ্ধার করতে গিয়ে লেখা হয় : 'মিসিনারি সাহেবরা প্রায় বিংশতি বৎসরাবধি বাজারে ২ বালিকা পাঠশালা করিয়া বহুবিধ বিত্তব্যয় ও ব্যসনপূর্বক বাগদী ব্যাধ ব্যেদে [তদেব] বেশ্যা বৈরাগি বালিকারদের বাঙ্গালা বিদ্যা বিতরণার্থ বিস্তর ব্যাপার করিতেছেন [।] কিন্তু তাহার ফল কেবল ফলা বানান পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইতেছে অধিক হওনের বিষয় কি।'[৬২]

স্পষ্ট বোঝা যায়, মিশনারিদের স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের কার্যসূচীতে শিক্ষা নিতে কোন ধরনের মেয়েরা বিদ্যালয়ে আসত। ঊনবিংশ শতাব্দীর দীর্ঘদিন পর্যন্ত ভদ্রবাড়ির মেয়েরা প্রকাশ্যে বিদ্যালয়ে পড়তে আসত না। ১৮৫০ সালের *সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, অনেক ভদ্রলোকই স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক, কিন্তু 'প্রকাশ্য স্থানে বালিকা প্রেরণ করিতে অসম্মত আছেন এবং তাহা ভদ্র পরিবারের যোগ্য এমন জ্ঞান করেন না . . .।'[৬৩] ভদ্র পরিবারে মেয়েদের পক্ষে বাইরে যাওয়া দূষণীয়, এই মূল্যবোধের ফলে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তৃতি ঊনবিংশ শতাব্দীতে বারবার ব্যাহত হয়েছে। এই মূল্যবোধ একদিনে গড়ে ওঠেনি। দীর্ঘকালব্যাপী বিজাতীয় শাসনের সময়ে মেয়েদের আব্রু বজায় রাখার তাগিদে তাদের অন্তঃপুরবাসিনী করে রাখার পরিণতিস্বরূপ এমন একটা ধারণা হয়ে যায় যে ভদ্রতার অন্যতম সূচক হল মেয়েদের বাড়ির বাইরে যেতে না দেওয়া। যে মেয়ে বাইরে যায় সে হয় নীচজাতীয়া নইলে সর্বজনগমা—এই মানসিকতার ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে মেয়েরা প্রকাশ্যে বিদ্যালয়ে যাওয়ার স্বাধীনতাও পেত না অধিকাংশ ভদ্র পরিবারে। এবং সেই কারণেই মিশনারিদের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন জায়গায় মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় খোলা হলেও ভদ্র বাড়ির মেয়েরা তাতে যোগ দিত না। যারা যোগ দিত তাদের পারিতোষিকরূপ আর্থিক প্রলোভনও হয়ত ছিল।[৬৪]

তবে ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে বেথুন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে নিঃসন্দেহে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এটি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে মিশনারিদের আওতার বাইরে থাকার ফলে এ ক্ষেত্রে ধর্মান্তরীকরণের প্রশ্ন রইল না। ধীরে ধীরে সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া মেয়েরা বিদ্যালয়ে শিক্ষা পেতে শুরু করল। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেলেও, বেথুন বিদ্যালয়েরও যাত্রাপথ খুব মসৃন ছিল না। মাঝে মাঝে এর ছাত্রী সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।[৬৫] তবে বেথুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণারঞ্জন বিদ্যালয়

নির্মাণের জন্য যে সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ড দান করেন তার তৎকালীন মূল্য ছিল বারো হাজার টাকা।[৬৬]

বেথুন বিদ্যালয় স্থাপনের পর বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিকচিহ্ন হল অন্তঃপুর-শিক্ষার প্রবর্তন। বেথুন বিদ্যালয় বহু বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল। কলকাতায় বা তার ধারে কাছে আরও দু একটি বিদ্যালয় স্থাপনের সংবাদও ইতিহাস ঘাঁটলে পাওয়া যায়। কাশীপুরে নিজের বাড়িতে কিশোরীচাঁদ মিত্রের বালিকা বিদ্যালয় বা কয়েকজন ব্রাহ্ম যুবকের মজিলপুরে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনের প্রয়াস কিন্তু প্রমাণ করে না যে বাঙালিদের মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর ক্ষেত্রে আর কোন আপত্তি ছিলনা। ভদ্র পরিবারের মেয়েদের সংখ্যা শুধু তো নগণ্যই নয়, বরং কয়েকক্ষেত্রে যেন বিরোধিতা আরও দানা বেঁধে উঠেছিল।[৬৭] এই অবস্থায় মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার একমাত্র উপায় ছিল 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা'র প্রবর্তন। এবং এ বিষয়ে সর্বপ্রথম উদ্যোগী হন ব্রাহ্মরা।

ব্রাহ্মরা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজের পক্ষে যথেষ্ট প্রাগ্রসর ছিলেন। তাঁরা 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী' চালু করেছিলেন এবং নিজেদের বাড়ির মেয়েদের শিক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হননি। বস্তুতঃপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষ ভাগ পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙালি মেয়েদের অধিকাংশই ছিল হয় খ্রিষ্টান, নতুবা ব্রাহ্ম।[৬৮] ব্রাহ্মসমাজভুক্তরা পশ্চিমি সভ্যতার মর্মকে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের অনেক আগে গ্রহণ করেছিলেন। ফলে ব্রাহ্ম বাড়ির মেয়েরা শিক্ষা লাভ করলেও, সাধারণ বাঙালি বাড়ির মেয়েদের শিক্ষা থেকে গেছে অসম্পূর্ণ। যেখানে মেয়েরা ছোটবেলায় লেখাপড়া করত, সেখানেও অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ার দরুন খুব বেশিদূর পড়তে সুযোগ পেত না: 'কেহ বোধোদয়, কেহ আখ্যানমঞ্জরী কেহ বা ১ম ভাগ চারুপাঠ অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা শেষ করেন। . . . বাল্যকালে বিবাহিত হইয়া অনেকেই শীঘ্র পুত্রবতী হইয়া পড়েন। সুতরাং বিদ্যাশিক্ষার আরও প্রতিবন্ধক হইয়া উঠে।'[৬৯] বিয়ের পরে বাড়ির বউ-এর পক্ষে প্রকাশে বিদ্যালয়ে যাওয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার ছিল। আর, শ্বশুরবাড়িতে খুব কম ক্ষেত্রেই বিদ্যাচর্চার অবকাশ ও সুযোগ মিলত। তাই বাড়িতে বসে যাতে মেয়েরা লেখাপড়া করতে পারে, এই উদ্দেশ্য নিয়েই প্রবর্তিত হয়েছিল 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা' প্রণালী। কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে শুরু হলেও 'অন্তঃপুর শিক্ষা'র ভার পরবর্তী পর্যায়ে বহন করে 'বামাবোধিনী সভা'। এই সভার মুখপত্র *বামাবোধিনী পত্রিকা* ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর মেয়েদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মাসিকপত্র। বাঙালি মেয়েদের অবস্থার সার্বিক উন্নতি ছিল এই পত্রিকার মূল লক্ষ্য। এবং এই উন্নতি স্ত্রীশিক্ষা ছাড়া সম্ভব নয়। তাই *বামাবোধিনী পত্রিকায়* বারবার প্রকাশিত হয়েছে স্ত্রীশিক্ষার ওপরে বিভিন্ন রচনা, খণ্ডন করার চেষ্টা হয়েছে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধবাদীদের মত, নির্দেশ করে দেওয়া হয়েছে স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। পরবর্তীকালে *অন্তঃপুর, বঙ্গমহিলা* বা *পরিচারিকা* প্রভৃতি মেয়েদের পত্রিকাও সেই একই কাজ করেছে। এই পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত বিভিন্ন রচনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। হয়ত এগুলির ওপর ভিত্তি করে স্ত্রীশিক্ষার কালানুক্রমিক ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সমকালীন মানসিকতার বিভিন্ন দিক বুঝতে এদের সাহায্য অপরিহার্য।

॥ চার ॥

পশ্চিমের সভ্যতার সংস্রবে আসার পরেই শিক্ষিত ব্যক্তিদের এক অংশের মধ্যে শুরু হয়েছিল আত্মসমীক্ষণের পালা। বাঙালি সমাজের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে নজর পড়ে মেয়েদের সামাজিক অবস্থার ওপরে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকে যেমন মেয়েদের উন্নতি নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়, তেমনি লক্ষণীয়, কতগুলি সামাজিক প্রতিষ্ঠান নিয়েও আলোচনার সূত্রপাত হয় মোটামুটি একই সময়ে। এদের মধ্যে বিবাহ ও তার আনুষঙ্গিক দিকগুলি শিক্ষিত ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সবচেয়ে বেশি। নতুন ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ শিক্ষিত বাঙালির কাছে দাম্পত্য জীবনের চরম আদর্শ হল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিকতা।[৭০] এই পারস্পরিকতার স্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে জোর দেওয়া হত স্বামী-স্ত্রীর মানসিকতার একমুখিনতার ওপর : 'পরস্পর পরস্পরের আত্মার অভাব মোচনের উপায় সকল অন্বেষণ করিবেন, একসঙ্গে ঈশ্বরচিন্তা, একসঙ্গে ঈশ্বরোপাসনা, একসঙ্গে ধর্ম্মালোচনা, একসঙ্গে ধর্ম্মানুষ্ঠান, একসঙ্গে শয়ন, একসঙ্গে ভোজন, একসঙ্গে অধ্যয়ন ইত্যাদি ঈশ্বরাভিপ্রেত কর্তব্যসকল নিষ্পন্ন করিয়া আপনাদিগের সম্বন্ধের যথার্থ গৌরববৃদ্ধি করিবেন।'[৭১]

লক্ষ করলেই বোঝা যায়, দাম্পত্য সম্পর্কে পারস্পরিকতার মধ্যে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে বুদ্ধিজৈবিক সমতার ওপরে। স্বামী ও স্ত্রীর যদি চিন্তাভাবনা ও জীবনদর্শনে প্রচুর ফারাক থাকে তাহলে দাম্পত্য-জীবনে যেগুলিকে 'ঈশ্বরাভিপ্রেত কর্ত্তব্য' বলে মনে করা হত, সেগুলি নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। এবং স্বামী-স্ত্রীর মানসিকতার 'গঠনে পার্থক্য কোনদিনই ঘোচান সম্ভব নয় যদি না স্ত্রী কিছুটা শিক্ষিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যেমন এই সত্যটি অনুভূত হয়েছিল যে যুগের স্ত্রীশিক্ষার সমর্থকদের কাছে, দ্বিতীয়ার্ধেও স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে সেটাই ছিল অন্যতম প্রধান যুক্তি। এর সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত ছিল মেয়েদের সামগ্রিক অবস্থার উন্নতির বাসনা। আশা করা হত, স্ত্রীজাতির অবস্থার সার্বিক উন্নতি হলে গোটা সমাজের পক্ষেই তা মঙ্গলজনক এবং স্ত্রীশিক্ষার সামাজিক তাৎপর্য সম্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কখনই অসচেতন ছিলেন না : 'দ্বেষ, হিংসা, কলহ, দ্বন্দ [তদেব], ক্রোধ, অহংকার, বিচ্ছেদ, আলস্য, মূর্খতা এবং দুঃখ প্রভৃতির এদেশে এত আধিক্য শুদ্ধ স্ত্রীজাতির দোষেই কহিতে হইবেক, কারণ আমরা যাহারদিগের উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাহারা অহরহ কেবল দ্বেষ হিংসায় প্রমত্তা। . . . বিবেচনা করুন, যাঁহারা আমাদের প্রসব করেন ও লালন পালন করেন যখন তাহারাই এরূপ হইলেন তখন আমরা কত ভাল হইব ? সুতরাং বিদ্যা দ্বারা তাঁহারদিগের ঐ কুসংস্কার বিনষ্ট হইলে অস্মৎ পক্ষে কত কুশল হওনের সম্ভাবনা।'[৭২]

এই ভাব থেকে ধীরে ধীরে দেখা দিয়েছে মেয়েদের শিক্ষিত করার বাসনা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের তুলনায় দ্বিতীয়ার্ধের লেখাপত্র পড়লে এ ধারণাটা আরও সুষ্ঠু বোঝা যাবে। বিশেষ করে ব্রাহ্মদের লেখাতেই স্ত্রীশিক্ষা সংক্রান্ত মানসিকতার প্রতিফলন পাই সবচেয়ে বেশি। স্ত্রীকে পুরুষের 'নিত্যসহচর', তাই তাকে তার নিজস্ব মর্যাদা দান করতে শিক্ষার আলোকবর্ত্তিকা হাতে ব্রাহ্মরা অন্দরমহলে প্রবেশ করতে চাইলেন : '. . . স্ত্রীশিক্ষা ব্যতিরেকে কোনক্রমেই সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিলাভ সম্ভাবিত নহে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়

লইয়াই সমাজ। সমাজের অর্দ্ধ অংশ স্ত্রী ও অর্দ্ধ অংশ পুরুষ। অর্দ্ধ অংশ যদি মূর্খ অসার ও অপদার্থ হইয়া রহিল, সমাজের স্ত্রী বৃদ্ধিলাভের সম্ভাবনা কি ?'[৭৩] অশিক্ষিত স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করে চিত্ত-নিবৃত্তি হবে কেমন করে ? অর্থাৎ, দাম্পত্য-জীবনের যে আদর্শগুলি তাঁরা অনুসরণ করতে চাইতেন, স্ত্রীশিক্ষার অভাবে তা পূর্ণ হচ্ছিল না। এবং একজন 'কৃতবিদ্য' স্বামী অশিক্ষিত স্ত্রী নিয়ে কখনই সুখে কালাতিপাত করতে পারে না—এ ধারণাও স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের অন্যতম কারণ হিসেবে ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায়।

কেবলমাত্র *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাই* নয়। আরও বহু পত্রিকাতেও একই বক্তব্য বলা হয়েছে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শিক্ষাগত পার্থক্যের সমস্যা সবচেয়ে অধিক অনুভূত হয়েছিল গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই। উনবিংশ শতাব্দীর আগে এ ধরনের কোন সমস্যাই বাঙালি সমাজকে মোকাবিলা করতে হয়নি। পুরুষরা সনাতন পদ্ধতিতে যে শিক্ষা পেত তাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মানসিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যের তেমন কোন প্রশ্ন উঠত না। গ্রামভিত্তিক জীবনে পুরুষ ও নারীর সামাজিক পরিবেশ অনেকটা একই রকম ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে শহর, বিশেষতঃ কলকাতার উত্থানের ফলে এবং নতুন ধরনের শিক্ষার প্রসারের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সাংস্কৃতিক বৈষম্য বাঙালি সমাজের একটি নতুন সমস্যা হিসেবে দেখা দিল।

এর সঙ্গে মিশে গেল এক নতুন ভাবাদর্শ। যদি স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের পরিপূরক হয়, তবে অবশ্যই উভয়ের মধ্যে মানসিক সামঞ্জস্য থাকা দরকার। সুতরাং শুধু দৈহিক চাহিদার জন্যই নয়, মানসিক তৃপ্তির জন্যও স্ত্রীকে প্রয়োজন।[৭৪] এবং দাম্পত্যরীতি সম্পর্কে নতুন চিন্তা প্রবেশের ফলে শিক্ষিত স্বামী তার স্ত্রী-কে লেখাপড়া শেখানোর প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি মাত্রায় অনুভব করতে শুরু করে। এর কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল, '. . . কৃতবিদ্য যুবকেরা এক বিষয়ে নিতান্ত অসুখী হইয়াছেন। তাহারা স্ত্রীর নিকট শান্তি পান না, তাহাদের সংসার কষ্ট যন্ত্রণায় পরিপূর্ণ। . . .এরূপ হইবার কারণ সহজেই বুঝা যায়। যেখানে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে জ্ঞান ও ধর্ম সম্বন্ধে এত অনৈক্য ও বিভিন্নতা, সেই স্থানে এইরূপ বিবাদ ও অসুখ আশ্চর্য নহে।'[৭৫] স্বামী হয়ত শেকসপিয়ার ও মিলটনের রসাস্বাদনে সমর্থ অথচ স্ত্রী অশিক্ষিতাই রয়ে গেছে। মানসিকতায় এই বিস্তর পার্থক্যের ফলে স্ত্রীশিক্ষা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আগের তুলনায় আরও জরুরি হয়ে পড়েছিল।

তত্ত্ববোধিনী বা *বামাবোধিনী* ব্রাহ্মদের পত্রিকা। সেই সব পত্রিকায় মূলত ব্রাহ্ম আদর্শই প্রতিফলিত হত। কিন্তু স্ত্রীজাতিকে মনের মত করে গঠন করার ইচ্ছা কেবল ব্রাহ্ম সমাজেই নয়, শিক্ষিত হিন্দু যুবকদের মধ্যেও দেখা দিয়েছিল। বিশেষতঃ ডিরোজিওর শিষ্যদের মধ্যে। এই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে রীতিবিরুদ্ধ কাজও করেছিলেন—যেমন, রাজা দক্ষিণরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের প্রথম স্ত্রী জ্ঞানদাসুন্দরী উন্মাদ হয়ে যাওয়ার পরে তিনি উকিল হিসেবে বর্ধমানের বিধবা রানি বসন্তকুমারীকে সদর আদালতের আদেশবলে কলকাতায় নিয়ে আসেন এবং আকস্মিক ভাবে তাঁকে বিয়ে করে ফেলেন।[৭৬] আসলে, দক্ষিণারঞ্জন একা নন, শিক্ষিত পুরুষমাত্রই চাইতেন তাঁদের স্ত্রীদের মধ্যে নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখতে। এই আকাঙ্ক্ষার উৎকেন্দ্রিকতায়

দু-একটি কাজ রীতিবিরুদ্ধ হলেও মানসিক দূরত্ব হ্রাস করার জন্য শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে অনেকেই তাদের স্ত্রীদের লেখাপড়া শেখাতে উৎসাহী ছিলেন কিংবা চাইতেন শিক্ষিত মেয়েকে বিয়ে করতে। পুরুষরা যে শিক্ষিত মেয়ে বিয়ে করতে চাইছে, সে বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে সমকালীন একটি পত্রিকায় লেখা হয়েছিল : 'এক্ষণকার যুবকেরা শিক্ষিত স্ত্রী চাহেন, কেনই বা না চাহিবেন ? যুবকদিগকে লেখাপড়া শিখাইলে স্ত্রীদিগকেও অবশ্য লেখাপড়া শিখাইতে হইবে। যুবকদিগকে মূর্খ করিয়া রাখ, তাহা হইলে স্ত্রীশিক্ষার অভাব বোধ হইবে না, কিন্তু যদি কেবল যুবকদিগেরই মাথায় বিদ্যা পুরিয়া [তদেব] দেও এবং স্ত্রীলোকদিগকে কিছুই না দেও, তাহা হইলে পাষাণ ঠিক থাকিবে না।'[৭৭]

অতএব, পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষা গুণাবলীর অন্যতম বলে বিবেচিত হতে শুরু করেছিল উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। কিন্তু উপরের অংশটি পাঠ করলে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একটি বড় প্রশ্ন মনে-হওয়া খুব স্বাভাবিক। *জ্ঞানাঙ্কুর* পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল যে পুরুষদের শিক্ষা না দিলে আর স্ত্রীশিক্ষার অভাব অনুভূত হবে না। প্রশ্ন ওঠে, তাহলে স্ত্রীশিক্ষা কি কেবল পুরুষের শিক্ষিত মনের অভাবমোচনের জন্যই প্রয়োজনীয় ছিল ? পুরুষ-নিরপেক্ষভাবে কি মেয়েদের শিক্ষা কেবল তাদেব জন্যই জরুরি বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য নয় ? তাহলে, স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য কী ছিল উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাবিদদের কাছে ? উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে স্ত্রীশিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন লেখায় মেয়েদের লেখাপড়ার উপযোগিতার দিকটি বারবার প্রাধান্য লাভ করেছে। এমনকি, স্ত্রী শিক্ষিতা হলে সাংসারিক কাজে স্বামীর ঝঞ্ঝাট কম হবে, এমন কথাও দ্বিধাহীন ও খোলাখুলিভাবে বলা হয়েছিল।[৭৮] হয়ত এর একটি প্রয়োজনীয়তা এই ছিল যে, স্ত্রীশিক্ষাকুণ্ঠিত সাধারণ বাঙালি সমাজের সামনে মেয়েদের পড়াশোনা করানোর উপকারিতাগুলি তুলে ধরলে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব কিছুটা হ্রাস পেতে পারত। কারণ, উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে মনোভাব যথেষ্ট সক্রিয় ছিল এবং গত শতকের প্রথমার্ধে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধীরা যেসব আপত্তি উত্থাপন করতেন শতাব্দীর ক্রান্তিকালেও সেগুলিই অব্যাহত ছিল। এবং দ্বিতীয়ার্ধেও তাই স্ত্রীশিক্ষার পক্ষাবলম্বীরা বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি ক্রমাগত খণ্ডন করে এসেছেন। এখানে লক্ষণীয়, স্ত্রীশিক্ষা সংক্রান্ত যে কোন আলোচনায় নারীর নিজস্ব প্রয়োজনের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে তার স্বামী, পুত্র কিংবা সমাজের প্রয়োজন।

রক্ষণশীল সমাজের আপত্তির মূল কারণগুলিকে একত্রিত করেছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। মদনমোহনের রচনা থেকে আমরা বিরোধী পক্ষের পাঁচটি প্রধান আপত্তির কথা জানতে পারি। (ক) মেয়েদের মানসিক শক্তি ও বুদ্ধির অভাব। (খ) স্ত্রীশিক্ষা শাস্ত্র ও লোকাচারসম্মত নয়। (গ) লেখাপড়া করলে মেয়েদের পতিবিয়োগ হয়। (ঘ) বিদ্যাবতী নারীরা দুর্মুখ ও স্বেচ্ছাবিহারিণী হয়। শিক্ষিতা মেয়ে নিজের ও কুলের কালিমা। (ঙ) মেয়েরা যখন ধনোপার্জন করবে না, তখন লেখাপড়া শিখিয়ে লাভ কী ?[৭৯] প্রত্যেকটি যুক্তিকে আলাদা আলাদা ভাবে খণ্ডন করেছিলেন মদনমোহন এবং পরিশেষে স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে যুক্তিস্বরূপ কয়েকটি উপযোগিতার উল্লেখ করেন তিনি — ইচ্ছে করলে মেয়েরা অর্থ উপার্জন করতে পারে, সংসারের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখতে পারে, ছেলেমেয়েদের পড়াতে পারে এবং মেয়েরা শিক্ষিতা হলে সুস্থ ও সুখী দাম্পত্যজীবন সম্ভব হয়।[৮০]

কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা বুঝতে পেরেছিলেন কজন ? গোষ্ঠীগতভাবে ব্রাহ্মরা সর্বদা স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন করে এসেছেন, হিন্দুরাও আগের চেয়ে অনেক বেশি এ বিষয়ে উৎসাহ দেখিয়েছেন গত শতকের শেষার্ধে। কিন্তু সমগ্র সমাজের পক্ষে তাদের সংখ্যা কত ? যদিও স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে ধীরে ধীরে অনেকেই মত প্রকাশ করছিলেন, কিন্তু এমন মনে করার কোন কারণ নেই যে একটা গোটা সমাজ বা একটা বড় অংশ মেতে উঠেছিল এই নতুন উদ্বোধনের যজ্ঞে। বরং, স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধবাদীদের রচনা সংখ্যায় ও কলেবরে স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষাবলম্বীদের তুলনায় অনেক বেশি ও ভারি। সমাজের রক্ষণশীল নেতারা স্ত্রী-শিক্ষার মধ্যে সামাজিক অসন্তোষ, বিশৃংঙ্খলা ও সর্বোপরি আধিপত্য হারানোর গন্ধ পেয়ে সন্দিহান ও সতর্ক হয়ে ওঠেন।

ঈশ্বর গুপ্তের স্ত্রীশিক্ষার প্রতি ব্যঙ্গাত্মক কবিতাগুলি সর্বজনবিদিত। কিন্তু তার চেয়ে অনেক নির্মম পরিহাস গত শতাব্দীতে সহ্য করতে হয়েছে স্ত্রীশিক্ষাকে। স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে সবচেয়ে অভিনব আপত্তি তুলেছিলেন নীলকণ্ঠ মজুমদার। বিদ্যাশিক্ষা যে নারীজীবনের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী, এই মত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি লেখেন : 'পুষ্পসৃজনের উদ্দেশ্য যেমন পুষ্পের আকার গঠন প্রভৃতি দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়, সেইরূপ নারীজাতির জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে হইলেও নারীদিগের আকার, গঠন, যন্ত্রসংস্থান দেহতত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনা করিতে হইবে। . . . এক্ষণে নারীর মস্তিষ্ক, বক্ষ ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে পুত্র প্রসব ও পুত্র প্রতিপালন করাই নারী জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। . . .'

'. . . নৃত্য, গীত, বাদ্য, কার্পেট-বুনা ও বেধোদয় পাঠ করা [নারীদিগের পক্ষে] এ সমস্ত উদ্দেশ্যবিহীন নিরর্থক কার্য্য ! ইহাতে কাহারও কোনরূপ উপকার বা লাভের প্রত্যাশা নাই। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষাও নারীর পক্ষে অমঙ্গলের কারণ। কেন না, ইহা দ্বারা নারীর পুত্রপ্রসবোপযোগিনী শক্তিগুলির হ্রাস হয়। বিদুষী নারীগণের বক্ষদেশ সমতল হইয়া যায়, এবং তাহাদের স্তনে প্রায়ই স্তন্যের সঞ্চার হয় না। এতদ্ভিন্ন তাহাদের জরায়ু প্রভৃতি বিকৃত হইয়া যায়।'[৮১] যুক্তিবিন্যাসের অভিনবত্ব থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায়, নীলকণ্ঠ মজুমদার সাধারণ মানুষ ছিলেন না। অসামান্য উদ্ভাবনী শক্তি না থাকলে বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে শরীরবিকৃতির এই অনিবার্য কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করা সম্ভব নয়।

হয়ত নীলকণ্ঠ মজুমদার সামান্য বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলেন, কিন্তু আমরা এ ধরনের লেখাকে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে দেখতে পারি না। এটা যে বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয় এবং সমসাময়িক স্ত্রীশিক্ষার বিরোধীদেরই বক্তব্যের ধারাকে অনুসরণ করে এসেছে, এর অজস্র প্রমাণ ছড়িয়ে আছে সমসাময়িক সাহিত্যে ও বিভিন্ন রচনায়।

নীলকণ্ঠ মজুমদারের মতো শারীরিক বিকৃতির প্রসঙ্গ না এলেও, মেয়েরা যে লেখাপড়া শিখে বিকৃতরুচি ও দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কশূণ্য হয়ে পড়েছে—এই অভিযোগ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বহুবার বহু রচনায় করা হয়েছে। গত শতকের প্রথমে যখন স্ত্রীশিক্ষার দিকে কয়েকজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল, তখন আপত্তি উঠেছিল তাব পরিণাম নিয়ে। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আর পরিণাম নিয়ে কল্পনার অবকাশ ছিল না। সামান্য সামান্য হলেও স্ত্রীশিক্ষা বেশ কিছুদিন শুরু হয়ে গেছে। তাই এসময়ের লেখাপত্রে স্ত্রীশিক্ষার ফলে সমাজের কী পরিবর্তন হয়েছে, সেটাই মুখ্য বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছিল।

বিদ্যাশিক্ষার ফলে মেয়েদের মধ্যে সাবেকি প্রথার প্রতি শ্রদ্ধা কমে যাচ্ছে ও তারা বিদেশি জীবনধারার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, এটা উনবিংশ শতাব্দীতে একটি বেশ জনপ্রিয় লেখার বিষয় ছিল। সে যুগে প্রচলিত বহু ব্যঙ্গাত্মক গানে স্ত্রীশিক্ষার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিকে ঠাট্টা করা হয়। যেমন, একটি গানে অভিযোগ করা হয়েছিল যে মেয়েরা :

ষষ্ঠী মাকাল আর মানে না,
সেঁজুতির ঘর আর আঁকে না,
আরসিতে মুখ আর দেখে না
এখন কেবলফটোগ্রাফ চায়।
এখন গাউন পরে, ঘোড়ায় চড়ে,
গঙ্গা স্নান তদেছে ছেড়ে,
গোসল খানায় খানসামাতে
টাউয়েল দিয়েগা মোছায়।[৮২]

উনবিংশ শতাব্দীতে স্ত্রীশিক্ষাকে ব্যঙ্গ বা আক্রমণ করে এত লেখাপত্র হয়েছে যে মনে হয় বুঝিবা এই শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে স্ত্রীশিক্ষার জোয়ার বযে গিয়েছিল বঙ্গসমাজে। কিন্তু পবিসংখ্যান দেখলেই বোঝা যায়, গৃহশিক্ষা বাদ দিলে বিদ্যালয়ের শিক্ষা পেয়েছিল অল্প কয়েকজন মাত্র। তাদের সংখ্যা হযত একটু-একটু বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কিন্তু গোটা বাঙালি সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সংখ্যা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত নগণ্য রয়ে গেছে। ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দের আগে তো মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার অনুমতিই পেত না। ঐ বছর এপ্রিল মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সেনেট' পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়মবিধির পরিবর্তন করে ঠিক করেন যে মেয়ে পরীক্ষার্থীবা মহিলাদের তত্ত্বাবধানে স্বতন্ত্র স্থানে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারবে।[৮৩] ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে অনুমতি মিললেও কজন মেয়ে বিশ্ববিদ্যালযের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হত ? ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দের সমাবর্তন ভাষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য হান্টারের দেওযা হিসেব অনুযায়ী ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে এন্ট্রান্স পাশ করেন তেইশজন ছাত্রী, এফ.এ. পাশ করেন চারজন এবং বি.এ. তিনজন।[৮৪] পরিসংখ্যানটি উচ্চশিক্ষার। বিদ্যালয়ে অবশ্য অনেক বেশি সংখ্যক মেয়ে লেখাপড়া করত। কিন্তু বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে কতটা বিদেশি ভাবধারার অনুকরণ করা সম্ভব যে প্রাচীনপন্থীরা সমাজধর্ম রক্ষার উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন স্ত্রীশিক্ষাকে আক্রমণ করা ? আর, বিদ্যালয়ের সংখ্যাও যে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে খুব বেশি ছিল, তা নয়। ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে গোটা বাংলায় তিপ্পান্নটি মাত্র উচ্চ প্রাইমারি বিদ্যালযে এগারোশ সত্তরজন ছাত্রী পড়ত বলে সে যুগের একটি মেয়েদের মাসিকপত্র হিসেব দিয়েছিল।[৮৫] আসলে, সংখ্যাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। কতজন মেয়ে পড়াশোনা করছে, তার চেযেও গুরুত্ব পেত স্ত্রীশিক্ষা বিষয়টি। এবং কয়েকজন শিক্ষিতা মেয়ের আচার-আচরণ নিশ্চয় পৃথক ছিল অন্যান্য মেয়েদের তুলনায়। প্রাচীনপন্থীরা অনেক ক্ষেত্রে তাকে অতিরঞ্জিত করে সামাজিক ব্যাপ্তি দিতেন। বাঙালি সমাজ যে মেয়েদের বিদ্যাভ্যাসকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এসেও খুব প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেনি, তার মূলে কিন্তু রক্ষণশীল সমাজের একটা ভীতি-বোধ সর্বদা কাজ করেছে—স্ত্রী শিক্ষিতা হলে পারিবারিক ক্ষেত্রে পুরুষের কর্তৃত্ব কমে যেতে পারে। অর্থাৎ শিক্ষার ফলে মেয়েরা

স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে যায় এবং পারিবারিক বশ্যতা স্বীকার করে না। এটি পুরনো যুক্তি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে স্ত্রীশিক্ষা-বিরোধী লেখাপত্রে এক নতুন মাত্রা সংযোজিত হল। এই সময়ের লেখায় মেয়েদের আধুনিকতা ও শিক্ষা সমার্থক করে তোলা হয়েছিল। দেখানো হয়েছে, শিক্ষার ফলে মেয়েরা উগ্র আধুনিকায় পরিণত হয় এবং এই ধরনের লেখার প্রতিপাদ্য ছিল যে শিক্ষার ফলেই মেয়েরা পশ্চিমি সভ্যতাকে অনুসরণ করে উগ্র আধুনিকা হয়ে উঠছে।

স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচুর লেখাপত্র প্রকাশিত হলেও ১৮৮০-র দশক থেকে যেন এ ধরনের লেখার সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে গিয়েছিল। হয়ত নিছকই সমাপতন, তবু মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার অনুমতি পাওয়ার পর থেকেই এই আধিক্যটি চোখে পড়ে। মেয়েরা এতদিন তবু বাড়িতে নয়ত বিদ্যালয়ে গিয়ে পড়াশোনা শিখছিল। কিন্তু তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পাবে বা উচ্চ শিক্ষায় পুরুষের সমান হবে, এটি রক্ষণশীল সমাজ খুব সহজে গ্রহণ করতে পারেনি। তাদের প্রতিক্রিয়া গত শতকের পর্যবেক্ষকেরও একই রকমভাবে চোখে পড়েছিল : 'সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা বালিকাগণকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে অধিকারিণী বলিয়া স্থির করায়, বঙ্গসামজের কোন কোনে স্থলে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। এখনকার অর্ধ শিক্ষিত বাঙালীর লক্ষণ এই যে, তাঁহাদিগের সকল বিষয়েই উপহাস করা আছে।'[৮৬] এই 'মহা হুলস্থুল' ও উপহাসের সবচেয়ে জাজ্বল্য প্রমাণ সমসাময়িক এবং শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রচিত কয়েকটি প্রহসন।

কোন নির্দিষ্ট মানসিকতার প্রতিফলক হিসেবে নাটক ও প্রহসনের বিশেষ গুরুত্ব আছে। যে প্রহসনগুলি পথ-পুস্তিকাকারে লিখিত হয়েছিল, তাদের সাহিত্যিক কৌলীন্য না থাকলেও ঐতিহাসিক বিচারে মূল্য অপরিসীম। কারণ, এই প্রহসনকারদের উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা হয়ত ছিল না ; মূলতঃ এগুলি রচিত হত একটি সুনির্দিষ্ট বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। উনবিংশ শতাব্দীতে কোন সামজিক বিষয়ে মত প্রকাশের অত্যন্ত জনপ্রিয় মাধ্যম ছিল প্রহসন-জাতীয় রচনা।[৮৭]

তবে নাটকে ও প্রহসনে যে সর্বদা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা করা হয়েছে, এটা ঠিক নয়। গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকে রচিত কয়েকটি নাটক ও প্রহসনে স্ত্রী শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ বিশেষ চোখে পড়ে না। তার একটি সম্ভাব্য কারণ এই যে, সে সময়ের উল্লেখযোগ্য নাটক ও প্রহসনকারদের মধ্যে দু-একজন শিক্ষার যথার্থ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং সে কারণেই হয়ত স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা করেননি। যেমন, মাইকেল মধুসুদন দত্তের *একেই কি বলে সভ্যতা ?* (১৮৬০) বা দীনবন্ধু মিত্রের *সধবার একাদশী* (১৮৬০)।

কিন্তু স্ত্রীশিক্ষাকে আক্রমণ করে রচিত প্রহসনের সংখ্যাই বেশি। স্ত্রীশিক্ষার ফলে মেয়েরা স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে যাবে—এ বক্তব্য তো ছিলই, এবং এর সঙ্গে আরও বলা হল, যে বাড়ির মেয়েরা শিক্ষিতা, সে বাড়িতে পুরুষেরা স্ত্রৈণ। এ ধরনের প্রহসনে শিক্ষিতা মেয়েদের মুখ দিয়ে এমন সব কথা বলানো হয়েছে বা তাদের দিয়ে এমন সব কাজ করানো হত, যা পাঠ করে সাধারণ বাঙালির মনে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি স্বতঃবিরূপতা দেখা দেয়। যেমন, রাধাবিনোদ হালদারের *পাশ করা মাগ* (১৮৮৮) প্রহসনে যখন চাতকিনী তার

বেথুন স্কুলের 'হাই প্রাইজ' পাওয়া বোন কিরণশশীকে প্রশ্ন করে যে সে তার স্বামী নিতে এলে সঙ্গে যাবে কি না, কিরণশশীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে ত্বরিত উত্তর : 'হাজব্যান্ড যদি ইনভাইট করে পাঠায় তাহলে না হয় এক ঘন্টার মতন বেড়িয়ে আসি। . . . গরুর মত শ্বশুরবাড়ী যেয়ে গোয়ালে বাউন্ড হয়ে থাক্তে পারব না।'[৮৮] এই নাটকে কিরণশশীর মুখ দিয়ে গান গাওয়ান হয়েছে :

হাজব্যান্ডে করে ডিসমিস্ হয়েছি প্রাণ নিউ মিস,
দিব আমি সুইট কিস্, ফ্রি লভ নেভার ফিয়ার।[৮৯]

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের *খণ্ড প্রলয়* প্রহসনের ঘটনাবলী আরও রোমাঞ্চকর। এই প্রহসনে শিক্ষিতা তরুবালা পুরুষদের 'pet animal' বলে গণ্য করে। আমরা তরুবালাকে প্রহসনের এক জায়গায় সঙ্গিনীদের সঙ্গে মদ্যপান করে মত্ত অবস্থায় দেখি, অন্যত্র পাঠ করি তারা প্রকাশ্য পথে গাইছে :

আমরা বেরিয়েছি সব হাওয়া খেতে,
চুরুট মুখে ছড়ি হাতে।
বেড়াব, হোটেলে যাব, সুপার খাব,
ফিরব আবার রাতে-রাতে।[৯০]

স্ত্রীশিক্ষার সমর্থকদের নিবীর্যতা ও কাপুরুষতা প্রমাণের জন্য বিহারীলাল চট্টোপাধ্যাযই ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে লিখেছিলেন *আচাভূয়ার বোম্বাচাক।* স্ত্রীস্বাধীনতায় উদ্যমী রতিকান্তবাবু তার স্ত্রীকে ট্রেনে মাতালদের হাত থেকে রক্ষা করতে অসমর্থ হওয়ায় এক শ্বেতাঙ্গ বতিকান্তবাবুকে (যাকে স্ত্রীশিক্ষার সমর্থকদের প্রতিনিধি হিসাবে দেখানো হয়েছিল) উপদেশ দেয় : 'কাপুরুষ। যদি আপনার স্ত্রীকে রক্ষা করতে না পারবি, তবে লেজে বেঁধে বাইরে বেরুস কেন ? . . . বানরের ন্যায় আমাদের অনুকরণ কি শোভা পায় ?'[৯১] সেই রতিকান্তবাবু যখন পশ্চিমি কায়দায় নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুর পরিচয় করিয়ে দিতে উৎসাহী, তখন বন্ধু রামরতন বলেন : 'আজকাল বিজাতীয় অনুকরণে আমাদের এমনি বেয়াড়া চাল হয়ে পড়েছে যে বন্ধুকে যেন মাগটী আগে দেখাতেই হবে।'[৯২]

মেয়েরা অসূর্যম্পশ্যা না হলেও, উনবিংশ শতাব্দীতে বাইরের পুরুষের সামনে বের হতনা। কিন্তু এ প্রথা পরিবর্তনের তাগিদ অনেকে অনুভব করেছিলেন *আচাভূয়ার বোম্বাচাক* প্রহসনটি প্রকাশিত হওয়ার বেশ কিছুদিন আগেই। যা রক্ষণশীল সমাজের কাছে চরম নির্লজ্জতা বলে বোধ হয়েছিল, সেটাকেই 'প্রগতিবাদী'রা (অন্তত সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে) উচিত কাজ বলে মনে করতেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বন্ধু মনোমোহন ঘোষকে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য রাত্রিবেলায় সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর অন্দরমহলে নিয়ে এসেছিলেন।[৯৩]

এই ধরনের কাজ রক্ষণশীল সমাজের কাছে অকল্পনীয় ছিল। তাই তাঁদের ক্রোধ শুধু স্ত্রীশিক্ষার ওপরেই পড়েনি, পড়েছিল তার সমর্থকদের ওপরেও। শিক্ষিতা নারী

স্বেচ্ছাচারিণী হয়, এটুকু বলেই তারা ক্ষান্ত হননি। তাদের স্বামীরাও স্ত্রৈণ বা কাপুরুষ, এই শ্লেষও স্ত্রীশিক্ষার বিরোধীদের রচনা থেকে বারবার বেরিয়ে আসে।

তৎকালীন প্রহসনকারদের আক্রমণের লক্ষ্য স্ত্রীশিক্ষা হলেও শিক্ষিতা স্ত্রীর স্বামীদের বা স্ত্রীশিক্ষার সমর্থকদের দুর্গতির চিত্র যে বারবার তুলে ধরা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য বোধহয় ছিল তাদের সতর্ক করে দেওয়া। এ কারণেই প্রায় প্রতিটি প্রহসনের শেষেই স্পষ্ট কিংবা প্রচ্ছন্ন নীতি (বা, 'মরাল') ছিল। শিক্ষিতা স্ত্রীর কার্যকলাপ বর্ণনা করে যে পরিণতি দেখানো হয়েছে, সেই পরিণতিই এই সব রচনার 'মরাল'। যেমন *স্বাধীন জেনানা* প্রহসনে নেপালের সুশিক্ষিতা স্ত্রী হেমাঙ্গিনী পরপুরুষাসক্ত। নেপালও স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতায় উৎসাহী ছিল যথেষ্ট। কিন্তু নেপাল যখন ঋণের দায়ে মন্ত্রীর কাছে টাকা চাইতে যায়, তখন হেমাঙ্গিনী কালীপদবাবুর সঙ্গে 'পবিত্র প্রণয়', সাহেবি সমাজে 'kissing' প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করতে করতে বাগানে নির্জন কুঞ্জে প্রবেশ করে।[৯৪] হেমাঙ্গিনী কালীপদবাবুর সঙ্গে পালিয়ে গেলে স্ত্রীশিক্ষার একদা সমর্থক নেপালের মোহভঙ্গ হয়।

শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েদের স্বাধীনতার এষণা কতদূর যেতে পারে, তা বোঝানোর জন্য স্ত্রী-আধিপত্যের এক চরম কাহিনী রচনা করেছিলেন অমৃতলাল বসু। *তাজ্জব ব্যাপার* (১৮৯০) প্রহসনের শিক্ষিতা মেয়েরা বাইরে ঘুরে বেড়ায়, আর পুরুষমানুষ ঘরে থাকে। স্ত্রীশিক্ষা তথা স্ত্রী-স্বাধীনতার ফলে যে সমাজবিধি পালটে যাবে (অর্থাৎ, স্ত্রীশিক্ষা যে বিধিসম্মত বা স্বাভাবিক নয়), এটা প্রমাণ করার জন্য অমৃতলাল বসু দেখিয়েছেন যে পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় মেয়েরাই পুরুষের কাজ করে, তারাই বিয়ের আসরে 'বরকর্তা', ছেলেরা এঁয়ো কাজ করছে। প্রহসনকার ঠাট্টাকে এতদূর নিয়ে গেছেন যে এর অন্যতম চরিত্র মুক্তকেশী কথাপ্রসঙ্গে বলছে, পুরুষরা পড়াশোনা অল্প-স্বল্প শিখলে কোন ক্ষতি নেই, 'কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি কিছু নয়, তাতে সংসারের ক্ষতি হয়, শুনেছি সেকালেও কোন কোন পুরুষ লেখাপড়া শিখেছিল'[৯৫] —ঠিক যেন স্ত্রীশিক্ষা প্রসার সম্বন্ধে কোন পুরুষের মন্তব্যের উলটো জবাব। এটিকে উলটো জবাব হিসেবে ধরা যেত যদি প্রহসনটি কোন মহিলার রচনা হত। কিন্তু অমৃতলাল বসুর উদ্দেশ্য ছিল স্ত্রীশিক্ষাকে ব্যঙ্গ করা। এই প্রহসনে মেয়েদের মধ্যে গুপ্ত বাসনাও দেখা দিয়েছে : 'কে বলে গোঁফে স্ত্রীলোকের শোভার হানি ঘটে। ভগ্নীগণ, মনে কর, যখন আমরা মেডিকেল কলেজে যাই, যখন হাইকোর্টে ওকালতী করিতে যাই, হাউসে অফিসে, গুদামে যে যে ভগ্নী যে যে কার্য্যে যান, সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যে গোঁফের আবশ্যক।'[৯৬]

শিক্ষা পেলে মেয়েরা পুরুষ সেজে বসবে, এ ভয়ের প্রকাশ দেখাতে গিয়ে হয়ত অমৃতলাল বসু অবশ্যই বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলেন। কিন্তু ভয়টা নতুন নয়। তবে যা লক্ষ করার তা হল উনবিংশ শতাব্দীর একদম অন্তিম কাল পর্যন্ত স্ত্রীশিক্ষা থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতির ভীতি বাঙালি সমাজে (অন্তত এক শ্রেণীর মধ্যে) বর্তমান ছিল। নইলে, অবিকল একই ভাষায় স্ত্রীশিক্ষার সামাজিক কুফল নিয়ে কথা বলতেন রাসসুন্দরী দেবীর বাল্যকালের গ্রামবৃদ্ধরাও। চোদ্দবছর বয়সের কথা প্রসঙ্গে রাসসুন্দরী দেবী (জন্ম, ১৮১০) লিখেছিলেন, 'তখনকার লোক বলিত, বুঝি কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিতে পাই, এখন বুঝি মেয়েছেলেতেও পুরুষের কাজ করিবেক। এখন মেয়ে রাজার কাল হইয়াছে। এখন বুঝি সকল মাগীরা একত্র হইয়া লেখাপড়া শিখিবে।'[৯৭] ১৮২৪-২৫ খ্রিষ্টাব্দে

মেয়েরা লেখাপড়া করবে, এটা গ্রাম্য বৃদ্ধ ব্যক্তিরা হয়ত বিশ্বাস করতে পারতেন না। তাই যখন প্রথম স্ত্রীশিক্ষার কথা শোনা গেল, অনেকেই হয়ত চমকিত হয়েছিলেন। কিন্তু গত শতাব্দীর শেষে এসেও স্ত্রীশিক্ষার বিরোধীদের বিভিন্ন লেখাপত্র থেকে রক্ষণশীল সমাজের ভীতিবিহ্বল মানসিকতাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের দু-একটি লেখায় আমরা পড়ি যে কনে দেখতে গিয়ে মেয়ের লেখাপড়া বিষয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে। বিয়ের পাত্রী কিছুটা লেখাপড়া জানবে, এ সচেতনতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শ্রীনাথ ঠাকুরের মেয়ে ইন্দিরাকে দেখতে এসেছিলেন পাত্র (প্রিয়নাথ শাস্ত্রী) স্বয়ং। ইন্দিরা দেবী লিখেছিলেন, '.পরে তিনি (পাত্র) উপরে আসিলেন, দিদিমা আমাকে লইয়া সেইখানে গেলেন, তিনি আমাকে দুএকটি পদ্য ও গদ্য পড়িতে দিলেন, এবং আর দু একটি প্রশ্ন করিবার পর আমি অব্যাহতি পাইলাম।'[৯৮] রবীন্দ্রনাথের 'সমাপ্তি' (অগ্রহায়ণ, ১৩০০ বঃ) গল্পের নায়ক অপূর্ব পাত্রী দেখতে গিয়ে মেয়ে কী পড়ে জিজ্ঞাসা করায় মেয়ে এক নিঃশ্বাসে তার পাঠ্য তালিকার লম্বা ফিরিস্তি দিয়েছিল : 'চারুপাঠ (দ্বিতীয় ভাগ), ব্যাকরণসার (প্রথম ভাগ), ভূগোল বিবরণ, পাটিগণিত ও ভারতবর্ষের ইতিহাস।'[৯৯]

কিন্তু যুবকেরা যে শিক্ষিতা মেয়েদেরই বিয়ে করতে চাইছে, তা ১৮৭০-এর দশকেই স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল। সমকালীন একটি পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল যে মেয়েদের শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হল বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষিত বা বিলেত ফেরতদের বিয়ে করা।[১০০]

এই ভাবেই স্ত্রীশিক্ষাও একটু একটু করে বিস্তারলাভ করেছিল। স্ত্রীশিক্ষার বাস্তব অসুবিধাগুলি সবই ছিল, এ সম্বন্ধে রক্ষণশীলদের সমস্ত বিশ্বাসও অটুট ছিল—কিন্তু, কোন বাড়িতে মেয়েকে লেখাপড়া করাতে হলে অত্যন্ত গোপনে করাতে হবে বা মেয়ের পক্ষে লেখাপড়া করাটা অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ, এই ধারণাটা বাঙালির (অন্তত পক্ষে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত বাঙালির) মন থেকে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছিল। এবং মেয়েদের শিক্ষার সপক্ষেও এ সময়ে বহু রচনা প্রকাশিত হয়। মেয়েরা লেখাপড়া জানলে কী কী উপকার হবে, সে সম্বন্ধে অনেকেই সজাগ ছিলেন। বিশেষতঃ, ব্রাহ্মরা। ১৮৬০, ১৮৭০ এবং ১৮৮০-র দশকে বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে ব্রাহ্মদের নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। রক্ষণশীল বাঙালি সমাজের সমস্ত যুক্তিকে খণ্ডন করে ব্রাহ্মরাই স্ত্রীশিক্ষার অনুকূল মনোভাব তৈরি করে দিয়েছিলেন। এ কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করে *বামাবোধিনী পত্রিকা*, *পরিচারিকা*, *অন্তঃপুর* প্রভৃতি মেয়েদের মাসিক পত্রিকাগুলি।

স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে খৈপাড়া-নিবাসিনী কামিনী দত্ত লিখেছিলেন যে মেয়েদের সামাজিক দুর্গতির মূল কারণ তাদের বিদ্যার অভাব : 'অস্মদ্দেশীয় মহিলাগণের জীবন, পশুজীবন তুল্যই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যেহেতু তাহারা কেবল কতকগুলি জঘন্য নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া বন্য পশুর ন্যায় আহার বিহারেই রত থাকিয়া কালক্ষেপণ করিতেছেন। বিদ্যাভাবে, সত্যধর্মাভাবে উহারা কি না নীচ কর্ম করিতেছেন?'[১০১] স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা দেখিয়েছিলেন যোগমায়া দেবীও। যোগমায়া দেবীর প্রধান বক্তব্য ছিল যে মা শিক্ষিতা হলে সন্তানেরাও শিক্ষিত হয় এবং সংসারের কর্ত্রী শিক্ষিতা হলে সব দিক বিবেচনা করে সকলের প্রতি সমান ভালবাসা

ও স্নেহ দেখিয়ে চলা সম্ভব।[১০২] কুমারহট্ট থেকে নিস্তারিণী দেবী ইংরেজদের সঙ্গে তুলনা করে দেখিয়েছিলেন যে ইংরেজরা যে এত সভ্য হয়েছে, তার মূলেই ছিল বিদ্যার অনুশীলন। পৃথিবীতে বিদ্যার সমান বন্ধু নেই, কারণ অন্য সব বন্ধু দুঃসময়ে মানুষকে পরিত্যাগ করে চলে যায়, একমাত্র বিদ্যাই কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করে না।[১০৩] মেয়ের প্রতি মায়ের উপদেশের মাধ্যমেও স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা প্রমাণ করা হত—বিদ্যাকে মানুষের চোখের সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়েছিল যে চোখ না থাকলে যেমন মানুষ অন্ধ, তেমনি 'বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত না হইলে কিসে অকল্যাণ হয় তাহা বুঝিতে পারা যায় না।'[১০৪] মেয়েদের পারিবারিক কর্তব্যের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা অন্যতম বলে গণ্য করার কথাও বলেছিলেন দু-একজন।[১০৫]

এই যে লেখাপড়া করার বিষয়টি মেয়েদের 'প্রকৃত কার্য্য' বলে বিবেচিত হচ্ছিল কয়েকজনের চিন্তায়, এটাকে আমরা মানসিকতায় পরিবর্তনের এক সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। এই পরিবর্তিত মানসিকতার আরও সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় যখন আমরা পড়ি যে এর দ্বারা বহু বাস্তব উপকারিতা সাধন হওয়া ছাড়াও একটি অমূল্য লাভ হয়—নানা দুঃখভাবনার মধ্যে মানসিক শান্তি আসে।[১০৬] তার চেয়েও বড়, বিদ্যার অভাবে মেয়েদের দুরবস্থা যে কেবল স্ত্রীজাতির পক্ষেই ক্ষতির কারণ হচ্ছে, তাই নয়, মেয়েদের অশিক্ষার অর্থ যে দেশেরই অকল্যাণ, এই সচেতনতারও প্রতিফলন ঘটেছে দু একটি সমসাময়িক লেখায়। *হিন্দু মহিলা নাটক*-এর নায়ক প্রসন্ন স্বদেশকে সম্বোধন করে বলেছে : 'হা ভারতভূমি, তোমার কি দুরবস্থা, — কি আশ্চর্য্য। কতকালে এতদ্দেশীয় স্ত্রী লোকেরা বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া হিতাহিত বিবেচনা করিতে ও জ্ঞানলাভে পারক হইবে।'[১০৭] এই আর্তিই উনবিংশ শতাব্দীর মনস্কামনার স্বরূপ।

॥ পাঁচ ॥

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার বাড়ছে ও সমাজের অনেকেই এর উপকারিতা উপলব্ধি করতে পারছেন এবং একই সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে আপত্তিও প্রচুর —এ দুটো চিত্রই আমরা দেখেছি। উনবিংশ শতাব্দীতে এই দুই মনোভাবই পাশাপাশি সহাবস্থান করেছে। ছবিটি এমন নয় যে বাঙালিরা তাদের মতাদর্শে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে সে রকম একটা ছবি ফুটে উঠলেও স্ত্রীশিক্ষার প্রতি বাঙালি সমাজের মনোভাব ছিল এর চেয়ে ঢের জটিল। আসলে শুধু স্ত্রীশিক্ষা নয়, এই মনোভাব, মেয়েদের প্রতি সমাজের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলক।

উনবিংশ শতাব্দীতে স্ত্রীশিক্ষা বলতে কী বোঝানো হত? এ প্রশ্নটির উত্তর পেতে হয়ত বাঙালি সমাজের মনোভাবের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন সমস্যা দেখা দিল—এর পরিণতি নিয়ে। এই পরিণতির কথা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধীরা বহুদিন আগেই বলেছিলেন কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আমরা দেখি এর সমর্থকরাও এ নিয়ে ভাবিত হয়ে পড়েছিলেন।

একটি প্রধান অভিযোগ ছিল এই যে স্ত্রীশিক্ষার ফলে গৃহে অশান্তি দেখা দিচ্ছে। এই অভিযোগ বারবার নানাভাবে উত্থাপিত হয়েছে বিভিন্ন লেখায়—এবং তা সব সময়ে

স্ত্রীশিক্ষাবিরোধীদের দ্বারা নয়। বিল্বগ্রাম থেকে কুন্দমালা দেবী 'বঙ্গীয় ভগিনীগণ'-কে সম্বোধন করে জানতে চেয়েছিলেন যে মেয়েরা সামান্য লেখাপড়া শেখার ফলেই কি আর ঘরের কাজকর্ম করতে চান না? শিক্ষিতা মেয়েরা লজ্জা, ধৈর্য, বিনয়, নম্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ পরিত্যাগ করেছে, এমন অভিযোগ এনে কুন্দমালা দেবী লিখেছিলেন : 'আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি কত কত নব্য সম্প্রদায়িনী বালা গৃহকর্ম্মে এত অনাদর প্রকাশ করেন যে তাহা মনে হইলে শোণিত শুষ্ক হয়। তাহারা দুই একখানি পুস্তক পাঠ করিতে শিখিয়া সংসারধর্ম্মে ও গুরুজনে অশ্রদ্ধা করেন। . . . কোন কোন মহিলা ফুলবাবুটির মত বেশ ধারণ করিয়া বিজাতীয় হাস্য আমোদ করেন অথবা ক্ষণে ক্ষণে এক একখানি পুস্তক হস্তে অট্টালিকার গবাক্ষ দ্বারে কখন দণ্ডায়মান কখন উপবেশন করিয়া আপনাকে ধন্যা ও প্রধানা জ্ঞান করেন।'[১০৮] এটি কোন বয়স্কা রমণীর রচনা নয়। কারণ, রচয়িত্রী এক জায়গায় লিখেছেন, 'এরূপ আচার ব্যবহার দেখিলে আমরাই লজ্জিত হই প্রাচীন সম্প্রদায় ত ঘৃণা প্রকাশ করিতেই পারেন।'[১০৯] অতএব, প্রহসনকারদের স্থানে স্থানে অত্যুক্তি সত্ত্বেও এটা মেনে নিতে হবে যে সাধারণ বাঙালির নিস্তরঙ্গ জগতে স্ত্রীশিক্ষা যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। যে ধরনের অভাব অভিযোগ করা হয়েছে তার প্রকৃত চরিত্র নির্ধারণ করা আমাদের পক্ষে কষ্টকর। এই অভিযোগগুলি অনেকাংশে আপেক্ষিক। কোন ধরনের চ্যুতিকে গৃহকর্মে শৈথিল্য বলা হত তা আমাদের পক্ষে সুস্পষ্ট অনুধাবন করা সম্ভব নয়। রাসসুন্দরী দেবী তাঁর আত্মকথায় বলেছিলেন যে সংসারে খাওয়া-দাওয়া সেরে তাঁকে পরিবারের প্রধানের সামনে অত্যন্ত নম্রভাবে দণ্ডায়মান থাকতে হত, '. . . যেন মেয়েছেলের গৃহকর্ম্ম আর কোন কর্ম্মই নাই'।[১১০] এই মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে সামান্যতম পুস্তকপাঠেরও অর্থ গৃহকর্ম থেকে অন্যত্র মনোনিবেশ এবং ঘরের কাজে 'অনাদর প্রকাশ'।

কিন্তু সমস্যাটির একটি বাহ্যিক রূপও ছিল। নির্ম্মলা ও প্রমদার এক কল্পিত কথোপকথনের মাধ্যমে *বামাবোধিনী পত্রিকায়* স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধ মতবাদকে খণ্ডন করা হয়েছিল। কিন্তু সেই কথোপকথন থেকেই একটি তথ্য অভ্রান্তভাবে বেরিয়ে আসে। প্রমদা যখন অভিযোগ করে যে 'বিবিরা মাথায় ঘোমটা দেয় না, পুরুষের সঙ্গে হঠ হঠ করিয়া বেড়ায় সুতরাং লজ্জা নাই', তখন নির্ম্মলা বলে, 'মাথার ঘোমটা না থাকিলেই যে লজ্জা থাকে না তাহা নহে। লজ্জা ঘোমটায় নহে, লজ্জা মনে।'[১১১] এক্ষেত্রে শিক্ষিতাদের নির্লজ্জা হওয়ার অভিযোগকে খণ্ডন করা হচ্ছে বটে, কিন্তু যে ঘটনাগুলির ওপর ভিত্তি করে প্রমদা অভিযোগ এনেছিল সেগুলিকে কিন্তু তথ্যগতভাবে অস্বীকার করা হয়নি। এই ঘটনার মধ্যে রক্ষণশীল ব্যক্তিরা লজ্জাহীনতার উপাদান খুঁজে পেতেন, কিন্তু নির্ম্মলা নব্য-শিক্ষিতা রমণীর প্রতিনিধিরূপে কল্পিতা। তাই সে লজ্জার প্রকৃত স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে বেশি উৎসাহী।

এ সত্ত্বেও, অস্বীকার করার উপায় নেই যে কেবলমাত্র রক্ষণশীল ব্যক্তিরাই নন, স্ত্রীশিক্ষার সমর্থকরাও শিক্ষিতা মেয়েদের ব্যবহারে কয়েকটি ত্রুটি খুঁজে পেতেন। তাঁদের মতে, 'শিক্ষিত মহিলাদিগের নামে অভিযোগ প্রধানতঃ তিনটি—(১) তাঁহারা ইংরাজানুকরণপ্রিয়, (২) গৃহকর্ম্মে অপটু, অতএব (৩)অপরিমিতব্যয়ী। অভিযোগগুলি সম্পূর্ণ অমূলক নহে।'[১১২] এই প্রবন্ধে স্বীকার করা হয়েছিল যে স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহী ব্যক্তিরা প্রথম দিকে

আগ্রহাতিশয্যে ঘরের কাজের দিকে নজর দেননি।[১১৩]

বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত এই মন্তব্যের আরও সবিস্তার প্রতিধ্বনি পাই গত শতকের অন্যান্য লেখাপত্রেও। এই অভিযোগ যে শুধু ১৮৮০ বা ১৮৯০-এর দশকের, তা নয়। সন তারিখ হিসেব করলে দেখা যাবে ১৮৭০-এর দশক থেকেই মহিলাদের বিভিন্ন পত্রিকায় এ ধরনের কথা লেখা হত। অর্থাৎ, নব্য শিক্ষিতা মহিলাদের প্রতি এই কটাক্ষ কিংবা তাদের বিরুদ্ধে আনা নানা অভিযোগ কোন স্বল্পস্থায়ী বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। অভিযোগগুলি কী কী ? প্রথমত বলা হত যে, মেয়েরা সামান্য লেখাপড়া করেই 'বাবু' হয়ে উঠেছিল। তারা এত অলস হয়ে পড়ত যে তাদের শরীরের সহনক্ষমতা অত্যন্ত কমে গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, তাদের ধর্মবিশ্বাস শিথিল হয়ে গিয়েছিল। দুঃখী অনাথদের দান করলে পরলোকে পুণ্য হয়, এই বিশ্বাস না থাকায় দান-ধ্যানের প্রতি যত্ন কমে গিয়েছিল। শিক্ষিতা মহিলাদের ত্রুটির ফলে আত্মীয় কুটুম্বরা অনাহারে থাকত। পতিভক্তি কমে গিয়েছিল, কমে গিয়েছিল গুরুজনদের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধাও। তার ওপরে, ঘরের কাজে তো মন নেই-ই ; তার পরিবর্তে, তাস খেলা এবং অন্যান্য 'বৃথা আমোদ'ই মেয়েদের অধিকতর প্রিয়। আর, ঘরের কাজের মধ্যে কেশ বিন্যাসই সবচেয়ে আদরের। 'পতিপুত্রের সেবা ভিন্ন, বাটীর অন্য কাহারও সেবাতে রুচী নাই। রোগী ও বিপন্ন আত্মীয় বন্ধু এবং প্রতিবেশীদিগের সেবা শুশ্রূষায় প্রবৃত্তি নাই। এইরূপে বঙ্গমহিলাগণ স্বার্থপরতার দৃষ্টান্তস্থল হইয়া স্বাভাবিক কোমলতাকে বিনাশ করিতেছেন।'[১১৪]

অতএব, অভিযোগ অনেক। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যায় মেয়েদের লেখাপড়া শেখার ফলে যে নতুন মানসিকতা গড়ে উঠছে, তা থেকে এক ধরনের সংঘাত অনিবার্য। মেয়েরা চিরাচরিতভাবে যে কয়েকটি বিশ্বাস আঁকড়ে থাকত, শিক্ষার অনিবার্য ফল হিসেবে তারা সেই সব বিশ্বাসগুলিকে প্রশ্ন করতে শুরু করেছিল। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজে ধর্মবিশ্বাসে শৈথিল্যের সমার্থবোধকে পরিণত হয়েছিল। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, অভিযোগে বলা হয়েছে যে মেয়েরা ব্যবহারের দ্বারা তাদের 'স্বাভাবিক কোমলতাকে' বিনষ্ট করছে। অর্থাৎ ব্যবহারের স্বাভাবিক কোমলতা বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট ধারণা বাঙালি সমাজে প্রচলিত ছিল। এই ধারণাই সমাজে মেয়েদের ভূমিকার ঔচিত্য বা অনৌচিত্য নির্ধারণ করত।

বামাবোধিনী পত্রিকা লিখেছিল যে সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক প্রাচীন রীতিগুলিকে রক্ষা করা মেয়েদের অবশ্য কর্তব্য।[১১৫] সমাজের পক্ষে যে প্রথাগুলিকে তাঁরা অমঙ্গলজনক বলতেন, তা থেকে সমাজের মঙ্গল সম্বন্ধে সে যুগের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কী ধারণা ছিল, তার কিছুটা আন্দাজ করা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'মঙ্গল' বলতে বোঝাত প্রাচীন রীতির অনুবর্তন। এই ধরনের মনোভাবের ফলে শিক্ষিতা মেয়েদের কয়েকটি ব্যবহার নিতান্ত বিসদৃশ ঠেকত যে যুগে। নব্য-শিক্ষিতাদের জুতো পায়ে দেওয়া, রঙ্গীন পোষাক পরিধান করা বা পুরুষ দেখলে ঘরের কোণে না লুকানোর মধ্যে সমকালীন বাঙালি সমাজ নিদারুণ নির্লজ্জতার পরিচয় পেত এবং চিরাচরিত সমাজে যা অপ্রচলিত, তা সবই পশ্চিমি সভ্যতার অনুকরণের ফল, এমন একটি সরল সমীকরণও লক্ষ করা যায় কয়েকটি লেখায়।[১১৬]

সুহাসিনী সেহানবীশ মন্তব্য করেছিলেন যে প্রচলিত স্ত্রীশিক্ষার ফলে মেয়েদের

অবস্থার উন্নতি না হয়ে অবনতিই হয়েছে বেশি। এর কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি যা বলেছিলেন তা থেকেও মেয়েদের দায়িত্ব সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে : 'গুরুতর দায়িত্বভার স্কন্ধে লইয়া আমাদের [মেয়েদের] জন্ম। সেই গুরুভার যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে বহন করিয়া নারীজন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারি, এরূপ শিক্ষা আমাদের আবশ্যক। আপনার ভোগ স্পৃহাকে দমন পূর্ব্বক পরের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য জীবন উৎসর্গ করাই নারী জীবনের অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত।'[১১৭] মেয়েদের কর্তব্য বলতে এই যে বাসনা অবদমনের ঐতিহ্য সমাজে প্রচলিত ছিল তার ব্যত্যয় দেখলেই মনে হত ভিন্ন দেশি শিক্ষার সমস্ত নীতিবোধ জলাঞ্জলি যাচ্ছে।

বলা হত, পুরুষদের মত মেয়েরাও যে ধর্মশূন্য বিদ্যার প্রতি আসক্ত হচ্ছে তার মূলে আছে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রভাব এবং এই শিক্ষার ফলেই মেয়েদের 'পূজা অর্চ্চনা নাই, ধর্ম্ম নাই, ঈশ্বর ও পরলোকে আস্থা নাই চরিত্রে নিষ্ঠা নাই, খাওয়া পড়ার আমোদ বিলাসিতা ব্যতীত ইহারা কিছুই জানেন না। . . . এইরূপ বিদ্যাবতী হওয়া অপেক্ষা তাহাদিগের মূর্খ থাকা শ্রেয়।'[১১৮] অর্থাৎ শিক্ষার ফলে মেয়েরা এতই গর্হিত জীবনযাপন করত যে বিদ্যাহীনা অবস্থাও বেশি কাম্য ছিল।

অথচ লক্ষ করলে দেখা যায় যে মেয়েরা কিন্তু যা পড়ত তার অধিকাংশই বাংলায় এবং বিদেশের কথাও যে তাদের পাঠ্যের মধ্যে বড় অংশ জুড়ে থাকত, এমনও নয়। সে যুগের মেয়েদের পাঠ্য তালিকার যে সামান্য উল্লেখ আমরা পাই, তাতে মনে হয় না তারা পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার খুব বেশি সুযোগ পেত। যেমন, চোরবাগান বালিকা বিদ্যালয়ে ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার পরীক্ষার বিষয়সূচির মধ্যে ছিল :

সাহিত্য।	গদ্য—শকুন্তলা, পদ্য—পদ্যপাঠ, ৩য় ভাগ, ব্যাকরণ।
স্বাস্থ্যরক্ষা।	রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের 'মাতৃশিক্ষা'।
ইতিহাস।	বিদ্যাসাগরের বাঙ্গলার ইতিহাস।
ভূগোল।	ভূগোল বিবরণ—ভারতবর্ষের বিশেষ পরিচয় এবং চার খণ্ডের সাধারণজ্ঞান।
অঙ্ক।	পাটিগণিত (ত্রৈরাশিক পর্যন্ত) ও শুভঙ্করী সঙ্কেত।[১১৯]

এই পাঠ্য তালিকায় বিদেশি কোন বইয়ের স্থানই নেই। আর, নিজেরা বাড়িতে ইংরেজি শিখে বিদেশি বই পড়ার মত মেয়ের সংখ্যা উনবিংশ শতাব্দীতে বেশি ছিল না। যথেষ্ট 'আধুনিক' পরিবারেও মেয়েরা বাড়িতে ইংরেজি পড়ার মত জ্ঞান অর্জন করত না। মোক্ষদা দেবী লিখেছিলেন যে তাঁর জন্য *বঙ্গদর্শন*, *বান্ধব*, *বামাবোধিনী পত্রিকা*, *সুলভ সমাচার* প্রভৃতি কাগজ আসত। তিনি ও তাঁর মেয়ে বিনোদিনী এগুলি পড়তেন। সাহিত্যের মধ্যে পড়তেন মাইকেল, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা। এছাড়া, ইংরেজি কাগজের খবর ও কয়েকটি ইংরেজি বইয়ের গল্পাংশ তাঁর স্বামী তাঁকে বাংলায় বলে দিতেন।[১২০] এমনকি উনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে প্রাগ্রসর পরিবার ঠাকুরবাড়িতেও মেয়েরা ইংরেজি পড়তে শুরু করেছেন গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধেরও বেশ পরে। স্বর্ণকুমারী দেবী ছোটবেলায় দেখেছিলেন, বাড়ির মেয়েরা গল্প-

উপন্যাস, তন্ত্রমন্ত্র, সাংখ্য দর্শন বটতলার বই প্রভৃতি পড়তেন। অল্পবয়স্ক মেয়েরা অবশ্য উপন্যাসেরই বেশি ভক্ত ছিলেন।[১২১]

এছাড়া, আরও একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন। স্ত্রীশিক্ষার সমালোচনা ও তার আনুষঙ্গিক ফলাফল নিয়ে মত প্রকাশ শুরু হয়ে গিয়েছিল ১৮৬০-এর দশক থেকেই। কিন্তু গোটা বাংলাদেশের মেয়েদের সংখ্যার তুলনায় কজন শিক্ষিতা হত? শিক্ষা-বিভাগের ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দের পরিসংখ্যান অনুযায়ী গড়ে হাজারে একজনেরও কম মেয়ে লেখাপড়া শিখত।[১২২] অবশ্য শহরাঞ্চলে (বিশেষতঃ কলকাতায়) এই সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল এবং গত শতাব্দীর শেষের দিকে এই সংখ্যা আরও অনেক বেড়েছিল। কিন্তু শিক্ষিতা মহিলাদের সংখ্যা কখনই ১৮৮০-র দশকে এত বেশি ছিল না যে বাঙালির তথাকথিত পারিবারিক বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে স্ত্রীশিক্ষাকে বা শিক্ষাপ্রণালীকে দায়ী করা যেতে পারত।

॥ ছয় ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর স্ত্রীশিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন লেখাপত্র পড়লে একটি প্রশ্ন অনিবার্যভাবে মনে আসে : গত শতকের সমাজ-সচেতন ব্যক্তিরা কতটা স্ত্রীশিক্ষা চেয়েছিলেন? এমন কি স্ত্রীশিক্ষার সমর্থকরাও? আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, স্ত্রীশিক্ষা তথা স্ত্রীস্বাধীনতা নিয়ে যাঁরা ভাবতেন তাঁদের সোজাসুজি রক্ষণশীল ও উদারপন্থী, এই দুভাগে ভাগ করা যায় না। কারণ, একটি স্তরের পরে স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক ও বিরোধীদের বক্তব্যে এক অত্যাশ্চর্য সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। যে প্রহসনকারদের কথা আমরা আলোচনা করেছি, তাঁদের মত না হলেও স্ত্রীশিক্ষার সমর্থকদেরও সামাজিক অগ্রগতি বিষয়ে সুরটি মোটের ওপর ঐতিহ্যানুসারী বলা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধীরা মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর কল্পনাই মাথায় আনতে পারতেন না। দ্বিতীয়ার্ধে স্ত্রীশিক্ষার সুফল সম্বন্ধে যাঁরা অবহিত ছিলেন, তাঁরা অভিযোগ আনলেন স্ত্রীশিক্ষার প্রণালী সম্পর্কে। অর্থাৎ, স্ত্রীশিক্ষা যেভাবে হওয়া প্রয়োজন, সেভাবে হচ্ছে না। এ থেকেই জন্ম নিল মেয়েদের পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা।

শুধু *বামাবোধিনী পত্রিকাই* নয়, সমকালীন আরও বহু পত্রিকাই মেয়েদের শিক্ষার ধরন নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করত। তাই বারবার চোখে পড়ে, গৃহকর্ম, ধর্মশিক্ষা, নীতিশিক্ষা প্রভৃতিকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত লেখাপত্র। বিদ্যাশিক্ষার ফলে যে মেয়েদের 'প্রকৃত' উন্নতি ঘটছে না, এটা অনেকেই মেনে নিয়েছিলেন। এবং মেনে নিয়েছিলেন যে বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে ঘরের কাজে অপটুত্বের এক অনিবার্য কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে। এ অভিযোগ পুরুষরাও যেমন এনেছিলেন, মহিলারাও এনেছিলেন তেমনি। বনলতা দেবীর 'কবিরাজ মহাশয়' গল্পে একটি ছোট ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। ছেলেটির বাড়ি থেকে পাড়ার এক বয়স্কা রমণীকে ডেকে আনা হয়। এই বয়স্কা রমণীকে অল্পবয়স্কারা 'ঠাকুরমা' বলত। ঠাকুরমা মুহূর্তের মধ্যে রোগ নির্ণয় করে চুণের জল খাইয়ে ছেলেটিকে সুস্থ করে তোলেন। এরপর ঠাকুরমার মুখ দিয়ে যা

বলানো হয়েছে তার মধ্যেই এই গল্প প্রকাশের উদ্দেশ্যটি নিহিত। ঠাকুরমা বলছেন : 'লেখাপড়া শিখে কি মেয়ে মানুষকে পুরুষ মানুষ হতে হবে ছুটাছুটি করিতে হইবে ? তা নয় মেয়ে মেয়ের দরকারী গুণগুলি পাইলেই হইল। শিক্ষার গুণে যদি মেয়েরা দরকারী কাজগুলি ভাল করিয়া করিতে না পারে, প্রতিদিনকার খুঁটিনাটী নিয়ে হুলস্থুল করে, তবে শুধু দুখানা চিঠি লিখতে শিখে বেশী কি হবে।'[১২৩] ঠাকুরমার তথা লেখিকার বক্তব্য খুব স্পষ্ট। কিন্তু যা দৃষ্টি এঁড়িয়ে যায় না, তা হল ঠাকুরমার একটি কথা— 'মেয়ে মেয়ের গুণাবলী পাইলেই হইল'। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের একটি ধারাবাহিক অভিযোগ ছিল এই যে মেয়েরা লেখাপড়া শিখে পুরুষ হয়ে উঠছে। এই মনোভাব থেকে একটি প্রয়াস দেখা দিল যে মেয়েদের সেই ধরনের শিক্ষা দিতে হবে যাতে তাদের মধ্যে পুরুষালি গুণাবলীর আবির্ভাব না ঘটে। অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্রগত পার্থক্যের যুক্তি দিয়ে পাঠ্য তালিকায়ও এক ধরনের বিভাজন-নীতি প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল।

এই নীতির সপক্ষে বলা হল যে সংসারে স্ত্রী ও পুরুষ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য জন্মগ্রহণ করে এবং এই দুই দায়িত্ব যেহেতু পরস্পর পৃথক, তাই সেই শিক্ষা প্রণালী চালু করতে হবে যার দ্বারা এই দায়িত্বগুলি যথাযথভাবে পালিত হয়। স্ত্রীজাতির পক্ষে স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রণালীর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলা হল : 'গর্ভধারণ, প্রসব ও সন্তানের লালন পালনাদি করিয়া রমণীগণের শিক্ষা কার্য্যের অনেকগুলি নৈসর্গিক দুরতিক্রম প্রতিবন্ধক আছে। এজন্য দর্শন বিজ্ঞানাদির অনুশীলন স্ত্রীশিক্ষার অন্তর্নিবেশিত করা তাদৃশ আবশ্যক নহে। গুরুতর শ্রম, দৃঢ়তর অধ্যবসায় ও সাভিনিবেশ প্রবৃত্তির সাহায্য ব্যতিরেকে ঐ সকল বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। . . . তাহাদিগকে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম, ধর্ম্মনীতি, নীতি, গৃহস্থকর্ত্তব্যতা ও শিল্পাদি বিষয়ে শিক্ষাদানেই সমধিক যত্নবান হওয়া উচিত।'[১২৪] এটি ১৮৬০-এর দশকে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়* প্রকাশিত রচনা। এবং তখন থেকেই প্রকারান্তরে মেয়েদের পুরুষের সঙ্গে শিক্ষাগত সমানাধিকারের দাবি অস্বীকৃত হতে শুরু করে। উদারনৈতিক ব্রাহ্মরাও যে স্ত্রীশিক্ষা শব্দটিকে সীমিত অর্থেই গ্রহণ করেছিলেন এ তারই নিদর্শন।

শারীরিক ও প্রবৃত্তিগত পার্থক্যের কারণে স্ত্রী ও পুরুষের দুই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের শিক্ষার কথা উনবিংশ শতাব্দীতে প্রায়ই বলা হত। এবং সেই সূত্রেই বারংবার আলোচিত হয়েছে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করার বিভিন্ন পন্থা। স্বীকার করে নেওয়া হত যে শিক্ষার প্রকৃত অর্থ মেয়েরা বুঝতে পারেনি। ব্রাহ্মদের পত্রিকাতেও এমন অভিযোগ করা হত যে শিক্ষা বলতে মেয়েরা কেবল বুঝত সামান্য লিখতে-পড়তে পারার ক্ষমতা, সামান্য গান এবং ইংরেজিতে কথা বলতে পারার ক্ষমতা।[১২৫] বলা হত, মেয়েদের কেবল অঙ্ক, সাহিত্য, ইতিহাস বা ভূগোলের বড় বড় বই পড়ালেই 'প্রকৃত শিক্ষা' সম্পূর্ণ হয় না, ধর্মহীন শিক্ষার পরিবর্তে মেয়েদের পক্ষে মূর্খ থাকাও নাকি শ্রেয়।[১২৬] *বামাবোধিনী পত্রিকা*ও মনে করত যে বাংলাদেশে যে ধরনের স্ত্রীশিক্ষা চলেছে, তাতে হিতে বিপরীতই ঘটছে বেশি : 'কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সত্য কণ্ঠস্থ করিলে যে জ্ঞানবান হওয়া যায় তাহা নহে, সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মভাব ফিক্ষশিত করা এবং সমদয় জীবনের স্বাভাবিক উন্নতি সাধন করাই লেখাপডার প্রধান

উদ্দেশ্য।'[১২৭] এবং *বঙ্গমহিলা* মনে করত যে মেয়েরা লেখাপড়া যা শিখেছিল তাতে 'লেখা' 'পড়া' 'কথাদ্বয়ের শব্দার্থমাত্র সাধিত হইতেছে'। তারা লিখতে ও রচনা করতে পারে, গ্রন্থ পাঠ, পঠিত অংশের ব্যাখ্যা এবং কঠিন শব্দগুলির অর্থ ও বানান করতে পারে, ব্যাকরণের কতকগুলি নিয়ম মুখস্থ করতে, হরণ পূরণ ত্রৈরাশিক প্রভৃতি অঙ্ক কষতে এবং ভূগোল ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, এবং 'মোজা বিনামা গলাবন্ধ আসন প্রভৃতি পসমবুনন কর্ম্মে নৈপুণ্যলাভ করিতে পারে। কিন্তু এই কয়েকটি বিষয়েই স্ত্রীশিক্ষা পর্যবসিত হইয়া থাকে।'[১২৮] খুব সাধারণ মানের শিক্ষা পেত মেয়েরা, কিন্তু সে শিক্ষাও বারবার সমালোচিত হয়েছে অসম্পূর্ণতার কারণে।

আসলে, উনবিংশ শতাব্দীতে খুব কম ব্যক্তিই ধর্ম-নিরপেক্ষ স্ত্রীশিক্ষার কথা ভাবতে পারতেন। ধর্ম অর্থে এখানে ধর্মমত নয়, ব্যবহারিক বিধি ও সদাচার সম্বন্ধীয় নিয়ম কানুন বোঝানো হত। আগেই আলোচনা করা হয়েছে, মেয়েদের কর্তব্য বিষয়ে বাঙালি সমাজে একটি সুনির্দিষ্ট ধারণা ছিল। সেই ধারণানুযায়ী ব্যবহারই ধর্ম, এবং স্ত্রীশিক্ষার মাধ্যমে সেই ধর্মই প্রতিস্থাপনেব প্রয়াস দেখা যায় গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। তাই বার বাব ঘুরে-ফিরে একই প্রসঙ্গ বিভিন্ন লেখায় উত্থাপিত হয়েছে যে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলিত প্রণালীতে মেয়েরা ধর্মের সঙ্গে সংশ্রবহীন হয়ে পড়ছে। মেয়েদের নীতিশিক্ষা প্রবন্ধে বলা হয়েছিল: 'জ্ঞান বিদ্যার আলোক ফুটিয়াছে, নীতির শুভ্র জ্যোৎস্না ডুবিয়া গিযাছে। এখন মেযেবা লেখাপডা, উল বুনা, গান বাজনা ইত্যাদি বেশ শিখে, কিন্তু যে জ্ঞান সমস্ত গুণকে উজ্জ্বল করে, সেই নীতিজ্ঞানে হতাদর।'[১২৯]

এই নীতিজ্ঞানকেই সমষ্টিগত অর্থে ধর্ম আখ্যা দেওয়া হত। 'এ দেশীয় স্ত্রীলোকদিকের যে সদ্‌গুণগুলি আছে তাহার একটিও যেন অসাবধানতা ক্রমে অগ্রাহ্য বা বিলুপ্ত না হয। বিনয়, সুশীলতা, লজ্জা, দয়া, পতিভক্তি এবং গৃহকার্য্যসাধনে যত্ন এইগুলি প্রাচীনা হিন্দু মহিলাগণের প্রধান গুণ।'[১৩০] এই 'প্রধান গুণাবলীর' যথাযথ মর্যাদাদানে সক্ষম শিক্ষা-ব্যবস্থাই ছিল উনবিংশ শতাব্দীতে সবচেয়ে কাম্য।

এই প্রসঙ্গে একটি নতুন তত্ত্ব সযত্নে প্রচার করা হয়েছিল—স্ত্রী ও পুরুষের শিক্ষা কখনই এক হতে পারে না। কারণ, পুরুষের পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায় তত ক্ষতি নেই, যতটা আছে মেয়েদের বেলায়। কারণ মেয়েদের ও ছেলেদের সামাজিক দায়িত্ব পৃথক। পুরুষের তুলনায় মেয়েদের ওপরই সংসার ও পারিবারিক নীতি রক্ষার দায়িত্ব : 'বিশ্বনিয়ন্তা রমণীজাতির উপরে এই গুরুভার [পরিবার রক্ষা করা] অর্পণ করিয়া তাহাদের জীবন ধন্য করিয়াছেন।'[১৩১]

এই ধরনের 'মিথ' যে কেবল পুরুষরাই ব্যবহার করত, তা নয়। মেয়েদের বিশেষ সামাজিক দায়িত্বপালনের গৌরবময় দিকটির উল্লেখ করে স্ত্রীস্বাধীনতার গন্ডি কেটে দেওয়ার প্রয়াস মেয়েদের—বিশেষতঃ বর্ষিয়সী মহিলাদের— মধ্যেও লক্ষ করা যায়। গার্হস্থ্য-কর্তব্যের মহিমা কীর্তনের মাধ্যমে মেয়েদের চিরাচরিত কাজের মধ্যেই আটকে রাখা ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। বনলতা দেবী লিখেছিলেন, 'রমণী সংসারের দাসী হইয়াও সমাজের নেত্রী, পরিবারে মহিমাময় কর্ত্রী, স্বামীর ধর্ম্মপথের সহায় ও কার্য্যপথের উৎসাহ ও পরামর্শদাত্রী, সন্তানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিধাতৃ নির্দ্দিষ্ট পালয়িত্রী ও "শিক্ষয়িত্রী"। এই সকল গুরুতর দায়ীত্ব [তদেব] উপযুক্তরূপে বহন করিতে পারার নামই গৃহধর্ম্মপালন।'[১৩২]

কেবলমাত্র দায়িত্ব পৃথক বলেই নয়, স্ত্রী ও পুরুষের শিক্ষা তাদের প্রকৃতিগত কারণেও পৃথক হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে করতেন গত শতকের সমাজসচেতন ব্যক্তিরা। পৃথক শিক্ষার পেছনে প্রধান বক্তব্য ছিল শারীরিক ও মানসিক বিভিন্নতা। *বামাবোধিনী পত্রিকায়* লেখা হয়েছিল যে, মেয়েদের শিক্ষা কিছুটা পুরুষদের সঙ্গে সমান ও কিছুটা পৃথক হওয়া প্রয়োজনীয় : 'স্ত্রীজাতির প্রকৃতি কোমল, এই জন্য সুকুমার বিদ্যা তাহাদিগের প্রকৃতির বিশেষ উপযোগী। . . . চিত্রবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, রন্ধন, ভাস্করের কার্য্য প্রভৃতি আরও কতকগুলি সুকুমার বিদ্যা আছে তাহা যেমন তৃপ্তিকর, তেমনি উপকারী।'[১৩৩] মেয়েদের কোমল প্রকৃতির জন্য যে শিক্ষাগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার সবগুলিই অন্তঃপুরের শিক্ষা, ফলতঃ মেয়েরা শিক্ষা পেলেও নতুন কোন দায়িত্ব গ্রহণ করার পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষাদানের কথা তাদের জন্য বিবেচিত হয়নি।

স্ত্রীলোকের প্রধান কর্মক্ষেত্র পরিবার। তাই পরিবারের সুখ-শান্তির জন্য, শৃংখলা ও সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য এবং সন্তান লালন-পালনের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাই প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা। বলা হত যে পুরুষের উপযুক্ত শিক্ষা মেয়েদের দিলে তারা নিজেদেব শিক্ষণীয় বিষয়ে অশিক্ষিত থাকবে, সেটা হবে তাদের প্রকৃতির বিপরীত।[১৩৪] সুতরাং বলা হল যে শৈশবে কিছুদিন ছেলে ও মেয়ের জন্য একই শিক্ষা প্রণালী চালু থাকলেও যখনই মেয়েদের মধ্যে নারীত্বের লক্ষণ দেখা দেবে, তখন থেকেই শিক্ষা প্রণালী স্বতন্ত্র হওয়া প্রয়োজনীয়।[১৩৫]

নারীত্বের লক্ষণ প্রকাশিত হওয়ার সময় থেকে মেয়েদের জন্য পৃথক পাঠ্যসূচী প্রণয়নের দাবির অন্তর্নিহিত যুক্তি ছিল এই যে মেয়েরা শারীরিক কারণে বুদ্ধিগ্রাহ্য পাঠক্রম অনুসরণ করতে অক্ষম ; এবং সেই কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কঠিন শ্রমসাপেক্ষ পরীক্ষায় তাদের অবতীর্ণ হওয়াও অনুচিত : 'বিশ্ববিদ্যালয়ের পবীক্ষা দিবার এক আপত্তি এই দেখা দিয়াছে যে, অতিরিক্ত শারীরিক মানসিক পবিশ্রম দ্বারা অনেক সময় স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।'[১৩৬] স্ত্রীশিক্ষার অগ্রণী সমর্থক *বামাবোধিনী পত্রিকাও* মনে করত যে 'যতটুকু তাঁহাদের [মেয়েদের] জ্ঞানোন্নতির নিতান্ত অবশ্যক, সেইটুকু উপার্জ্জন করিলেই হইল। অতি কঠিন ও কঠোর বিদ্যা সকল সাধনার্থে মস্তিষ্ক বিলোড়ন করা স্ত্রী প্রকৃতি বিরুদ্ধ।'[১৩৭] এই ধরনের 'প্রকৃতি বিরুদ্ধ' কাজের ফলে মেয়েদের স্বাস্থ্য যে সত্যিই নষ্ট হয়ে যায়, এ তথ্য প্রমাণ করার জন্য 'স্ত্রীজাতির উচ্চ শিক্ষা' প্রবন্ধে দৃষ্টান্তস্বরূপ মার্কিন দেশের মেয়েদের বিদ্যাভ্যাসের ফলে ভগ্নস্বাস্থ্যের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। প্রবন্ধকারের মতে, দুটি প্রধান শারীরিক কারণে স্ত্রী ও পুরুষের শিক্ষা প্রণালী কখনই এক হতে পারে না। প্রথমত, ঋতুর সময়ে মেয়েদের 'অনুচিত পরিশ্রম' করা বিধেয় নয়। দ্বিতীয়ত, 'অনুচিত মানসিক পরিশ্রমে এক দিকে তাঁহাকে যেমন স্তন্যদানে অক্ষম করিবে, অমনই অপরদিকে তাঁহার বিকারগ্রস্ত স্নায়ুমণ্ডলী তাঁহাকে বিরক্তি প্রবণ করিয়া তুলিবে, সন্তানগণের সৎ শিক্ষা হইতে তাঁহার ভগ্নশরীর তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবে।'[১৩৮]

এ ধরনের মন্তব্য সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হত *বামাবোধিনী পত্রিকা* বা *পরিচারিকার* মত ব্রাহ্মপরিচালিত পত্রিকায়। ব্রাহ্মরা যে স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে সমসাময়িকদের তুলনায় অনেক বেশি প্রাগ্রসর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু একটি স্তরের পরে স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা নিয়ে তাঁদেরও যথেষ্ট সংশয় ছিল। তাঁরা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা কখনও করেননি, কিন্তু সমর্থন করতে পারেননি মেয়েদের উচ্চ

শিক্ষা। এ বিষয়ে মত ব্যক্ত করতে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে গোঁড়া রক্ষণশীলদের ভাষা ও বক্তব্যের এক আশ্চর্য মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এক দিকে স্ত্রীশিক্ষাবিরোধী নীলকণ্ঠ মজুমদার মনে করতেন বিদ্যাশিক্ষার ফলে মেয়েদের 'পুত্রপ্রসবোপযোগিনী শক্তিগুলির হ্রাস', অন্যদিকে *পরিচারিকার* মত স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক পত্রিকার এক প্রবন্ধকারও মনে করেছিলেন বিদ্যাবতী নারী স্তন্যদানে অক্ষম। নীলকণ্ঠ মজুমদারের মত *পরিচারিকাও* নিজেদের সমর্থনে মার্কিন দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছিলেন।

এমনও বলা হয়েছিল যে লেখাপড়া করলে মেয়েদের ঘরের বাইরে যেতে হবে এবং সেক্ষেত্রে মেয়েদের এমন অসুখ হতে পারে যা পুরুষের হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই: 'মনে করুন, কোন রমণীর ঋতুর সময় জননেন্দ্রিয়ে হঠাৎ কোন শীতল বাতাস লাগিলে নানা গুরুতর ব্যাধি হইতে পারে, পুরুষের ঐরূপ শীতল বাতাসে কোন অসুখ নাও হইতে পারে।'[১৩৯] একটা বিষয় লক্ষণীয় যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে একই কারণ দেখিয়ে স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক ও বিরোধীরা কার্যতঃ স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে মত ব্যক্ত করতেন। *নব্যভারত* পত্রিকার সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী ছিলেন ব্রাহ্ম এবং স্ত্রীজাতির অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি ব্যক্তিগত ভাবে বিশেষ উদ্যোগ নেন। তাঁর সম্পাদিত *নব্যভারত* পত্রিকায় সদানন্দ তর্কচঞ্চু (নামটা শুনে মনে হয়, এটি ছদ্মনাম) উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে শারীরিক কারণ দেখাতে গিয়ে বলেছিলেন যে 'স্তন থাকা বশতঃ স্ত্রীজাতি পুরুষজাতি অপেক্ষা অধিক ভাবপ্রবণ (emotional)'।[১৪০] এবং সেই কারণেই মেয়েদের বাহ্যানুভূতি কম। ফলে 'তীক্ষ্ণ জ্ঞানালোচনা স্ত্রী জাতির পক্ষে খাটে না'।[১৪১] যেহেতু, ঊনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত অধিকাংশ রচনাতেই লেখকের নাম থাকত না, এবং একটি বিশেষ মতকে প্রচার করার জন্য রচিত হত, তাই আমরা এগুলিকে কোন নির্দিষ্ট লেখকের মত হিসেবে গ্রহণ না করে সাধারণভাবে সেই পত্রিকার মত হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি।

এই ধরনের শারীরিক কারণ ছাড়াও স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে আরও একটি আপত্তি ছিল যে শিক্ষিতা মেয়েরা তাদের নির্দিষ্ট কাজ করছে না, ফলে পারিবারিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বলা হত, নারী হবে 'সুমাতা, সুগৃহিণী ও সুপত্নী'।[১৪২] এবং এই প্রকৃতির যথার্থ উন্মেষ ও বিকাশের জন্য যে শিক্ষা প্রয়োজন, সে শিক্ষাই সর্বোৎকৃষ্ট। শিক্ষার উদ্দেশ্য চাকরি লাভের জন্য 'সার্টিফিকেট' পাওয়া নয়, সুগৃহিণী হওয়া।[১৪৩]

এই সুগৃহিণী হওয়ার জন্য কতগুলি শিক্ষা মেয়েদের পক্ষে অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হত। মেয়েরা মানসিক শ্রম বেশি নিতে পারবে না, এ কথা ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় যেমন রক্ষণশীলরা বলতেন,[১৪৪] শেষ ভাগে এসে এই মতটি এমনকি স্ত্রীশিক্ষার সমর্থকরাও মেনে নিতেন। প্রভেদের মধ্যে এই যে, প্রথমার্ধে যারা এ সব কথা বলতেন তারা স্ত্রীশিক্ষাকে প্রসন্নভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। আর, দ্বিতীয়ার্ধে যারা এই ধরনের মতের পোষকতা করতেন তাঁরা স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক হিসেবে পরিচিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অধীতব্য বিষয়ের মধ্যে শ্রেণী বিভাগের সাহায্যে মেয়েদের অধিকার নির্ধারিত হত। যেমন, যুদ্ধবিদ্যা, 'অধিক অঙ্ক' ও রাজনীতি প্রভৃতি স্ত্রী-প্রকৃতির বিরোধী বলে গণ্য করা হত।[১৪৫] *পরিচারিকা* পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল যে অঙ্ক ও সাহিত্যের শিক্ষা কমিয়ে মেয়েদের অল্প পরিমাণে বিজ্ঞান শেখানো কর্তব্য।

আবার, অন্ধভাবে পদার্থ বিজ্ঞান অণুসরণ করাও উচিত নয়। কারণ, তাহলে সর্বভূতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয় দেখা দেবে। আর যেহেতু মেয়েদের সারা জীবন ঘরের কাজ করতে হবে, তাই সাহিত্যের পরিবর্তে ভাল রান্না শেখানো বিশেষ প্রয়োজনীয়।[১৪৬] অল্প পরিমাণে সাহিত্যপাঠের প্রয়োজনীয়তা কেউ কেউ স্বীকার করলেও বিশুদ্ধ বিজ্ঞান শিক্ষার বিরুদ্ধে মত যথেষ্ট সোচ্চারই ছিল। কঠিন অঙ্ক ও বিজ্ঞানপাঠের ফলে যে ছাত্রীদের 'দুর্বল' মস্তিষ্ক 'বিকৃত' হয়েছে শুধু তা-ই নয়, অনেক মেয়েই এই পড়ার ফলে দুরারোগ্য ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা পর্যন্ত গেছে বলে জানিয়েছিল একটি মেয়েদের পত্রিকা।[১৪৭] শিক্ষার 'বিষদুষ্ট বায়ুতে' স্ত্রী-সমাজে ম্যালেরিয়া দেখা দিচ্ছে এমন উল্লেখও করা হয়েছিল একটি গল্পে।[১৪৮] স্ত্রীশিক্ষার পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত নয় এমন বিষয়ের তালিকা প্রস্তুত করতে গিযে 'নারীজাতির কিরূপ শিক্ষা হওয়া উচিত' প্রবন্ধে বলা হয়েছিল যে শরীরতত্ত্ব, বিজ্ঞানতত্ত্ব, ভূগোলতত্ত্ব, পদার্থতত্ত্ব,সাহিত্যতত্ত্ব, ইতিহাসতত্ত্ব ইত্যাদি শিখে মেযেরা বড় বড উপাধি লাভ করবে, এমন ভাবাও 'নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ'।[১৪৯]

সুতরাং এই সব কঠিন বিদ্যার পবিবর্তে মনে করা হত যে স্ত্রীশিক্ষার পাঠ্যক্রমে 'ধর্ম্মশিক্ষা, নীতিশিক্ষা, হৃদযের মহৎ ভাবোত্তেজক কবিতা অধ্যযন ও পবিত্রভাবোদ্দীপক সঙ্গীত-শিক্ষা'[১৫০] অন্তর্ভুক্ত হওযা প্রযোজন। সেই সঙ্গে 'প্রত্যেক স্ত্রীলোকের পাকক্রিয়া, সীবন-কার্য্য প্রভৃতি নানা গৃহকার্য্যে বিশেষ রূপে শিক্ষা করিয়া তদ্বিষয়ে সুদক্ষা হওয়া কর্তব্য।'[১৫১] গুরুত্ব দেওযা হত মূলতঃ দুটি বিষয়ের ওপর—ঘরের কাজের প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও সুনীতি শিক্ষা। ঘরের কাজের প্রযোজনীয শিক্ষার কথা বহুবার আলোচিত হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীতে। অঙ্ক বা ভাষা শেখানোর যে প্রয়োজনীযতা অনুভূত হয়েছিল, তাও ঘরেব কাজেই ব্যবহৃত হোক, এটাই চাইতেন অনেকে। যেমন, হেমলতা সরকার লিখেছিলেন যে প্রত্যেক মেয়েরই স্বামীকে সাহায্য করা উচিত এবং হিসেবপত্র, চিঠি লেখাও স্ত্রীর কর্তব্য। এছাড়া প্রত্যেক মেয়েকেই সহজ বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান শেখানো দবকাব। লেখিকাব মতে মেয়েরা সূচের কাজ ও ছবি আঁকা শিখলে পারিবারিক ব্যয় সংকোচ ও ঘরেব শ্রীবৃদ্ধি হয়।[১৫২] বাড়ির লোকেদের চিকিৎসার সুবিধার জন্য মেয়েদের চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যযনের উপকারিতা সম্বন্ধে অনেকেই অবহিত ছিলেন।[১৫৩]

ঘরের কাজ বলতে শুধু রাঁধা-বাড়া-খাওয়াই নয়, সন্তানপালন, শিল্পকার্য, সবই বোঝাত। মেযেরা বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের কাজে অপটু হয়ে উঠছে কিংবা গৃহকর্মে শৈথিল্য প্রদর্শন করছে, এ অভিযোগের[১৫৪] কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল যে মেয়েরা প্রধানতঃ পুঁথিগত বিদ্যা লাভ করছে। জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করে বলা হল যে মেয়েদের বিজ্ঞান, ভূগোল প্রভৃতির মত শুকনো জ্ঞান চর্চা না করে প্রকৃত জ্ঞান অর্থাৎ যে জ্ঞানের দ্বারা সাংসারিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়[১৫৫] ও চারিত্রিক গুণাবলী প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, সেই জ্ঞানই শিক্ষালাভ করা উচিত।[১৫৬] তাই বারবার জোর দেওয়া হয়েছে নীতি বা ধর্মশিক্ষার ওপর : 'স্ত্রীগণ যদি প্রথম হইতে ধর্ম্মে দীক্ষিত না হন, যদি বিকৃত শিক্ষা বলে তাঁহাদিগের ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইয়া যায়, সমাজের কি ভয়ানক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি।'[১৫৭]

ধর্মশিক্ষার ওপরে জোর দেওয়ার প্রধান কারণ ছিল সমকালীন বিশ্বাস যে স্ত্রীশিক্ষার ফলে মেয়েরা 'স্বাধীন' হচ্ছে এবং স্ত্রীস্বাধীনতার পরিণাম শুধু সামাজিক উচ্ছৃংখলতা নয়,

দাম্পত্য জীবনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাও। উদাহরণ দেওয়া হল যে 'স্বামী কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে ছিলেন, আসিয়া দেখিলেন তাহার স্ত্রী কোন পুংবন্ধুর সহিত নির্জনে স্বৈরালাপ করিতেছেন।'[১৫৮] এখানে একটি বিশেষ মানসিকতার পরিচয় পাই আমরা। ব্রাহ্মদের *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* গোঁড়া রক্ষণশীলদের থেকে কতটা পৃথক ? কোন শিক্ষিতা মহিলা যদি পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করেন, তাহলেও তা হয় 'স্বৈরালাপ'। 'স্বৈরালাপ' শব্দটির ব্যবহার এক্ষেত্রে প্রমাণ করে স্ত্রীশিক্ষা তথা স্ত্রীস্বাধীনতার সম্বন্ধে সে যুগের 'প্রগতিবাদী'দের ধ্যান-ধারণা কতটা সীমিত ছিল।

শুধু এরকম একটি দুটি বিচ্ছিন্ন লেখা নয়, বহু লেখাতেই পারিবারিক বিশৃংখলা ও স্ত্রীর চারিত্রিক অধঃপতনের মূলে দায়ী করা হয়েছিল স্ত্রীশিক্ষাকে। মেয়েরা লেখাপড়া শিখে জ্ঞানের সদ্ব্যবহার না করে কুৎসিত উপন্যাস পাঠ করে, [১৫৯] এ অভিযোগ অনেকেই করতেন। 'নসিরাম মেলা' গল্পে একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রীকে পরীক্ষক সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তকের নাম জিজ্ঞাসা করায় ছাত্রীটি বলেছে, বিদ্যাসুন্দর।[১৬০] এও এক ধরনের পরোক্ষ প্রমাণের চেষ্টা যে মেয়েরা বিদ্যালয়ে গিয়ে বিদ্যাসুন্দরের মত আদিরসাত্মক বইকেই শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করার মত কুরুচিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এই বিকৃতরুচির অভিযোগ থেকেই এসেছে চরিত্র নষ্ট হওয়ার ভয়। এমনই ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজের মানসিকতা। পড়াশোনা করতে হলে মেয়েদের ঘরের বাইরে বা বাইরের লোকের সংস্পর্শে আসতেই হয়। কিন্তু শতাব্দীর শেষ ভাগে এসেও বাঙালির মানসিকতা মেয়েদের চিরাচরিত অভ্যস্ত ভূমিকার বাইরে অন্য কোন কাজকে খুব প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেনি। অবরোধ-প্রথায় অতিবাহিত জীবনধারার ঐতিহ্য বাঙালি সমাজে এত অনড় ছিল যে মেয়েদের বাইরের জগতের সঙ্গে ঈষৎ সংস্পর্শকেই মনে হয়েছে তাদের অধঃপতনের চূড়ান্ত প্রমাণ। বাঙালির মনের এই দৃঢ়মূল বিশ্বাস অতি সাধারণ কথাবার্তা থেকেও বেরিয়ে আসত। *সধবার একাদশী* (১৮৬৬) নাটকে দুই বেয়াই গোকুলচন্দ্র ও জীবনচন্দ্র নিজেদের মধ্যে জীবনচন্দ্রের পুত্র অটলের চরিত্র সংশোধনের উপায় নিয়ে আলোচনা করছেন। জীবনচন্দ্র বলছেন যে অটলের মা অটলকে আর্থিক সাহায্য করে বলেই অটল সংশোধিত হচ্ছে না। এর পরবর্তী কথোপকথনটি এরকম :

'গোকু। ব্যানকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন দেকি, ছেলটির জন্মের ত কোন দোষ নাই।
জীব। তোমার সেকেলে ব্যান, তার ছেলেতে সন্দ হয় না—একেলে ব্যানেরা লেখাপড়া শিখেছেন, গাউন পরেচেন, বাগানে যাচ্চেন, এঁদের ছেলেতে সন্দ হবে।'[১৬১]

অর্থাৎ, ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দের 'একেলে' মেয়েরা, যারা পড়াশোনা করছে, তাদের চরিত্র বিষয়ে আর নির্দ্বিধায় প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করা যায় না।

শিক্ষার ফলে যে মেয়েদের চরিত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এ কথাও স্ত্রীশিক্ষার সবচেয়ে অগ্রণী সমর্থকরা মেনে নিতেন। বিদ্যালয়ে গিয়ে মেয়েরা কুচরিত্র সঙ্গিনীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 'শ্লেটে' কুকথা লিখল,কদালাপ ও মন্দাচার শিখল এবং বাড়ি ফিরে আসার পথে খারাপ ছেলেদের হাসি-ঠাট্টা ও বাজে কথা শুনে এল[১৬২]—ফলে চরিত্র নষ্ট হয়ে যাওয়ার পথটি প্রশস্ত হল।

শিক্ষার ফলে চরিত্রদোষ ভীতির সবচেয়ে বড় কারণ ছিল বিদেশি ধারার অনুকরণ ও শিক্ষিতা মেয়ের গল্প-উপন্যাস পাঠ। এ দুটি ভয়ই মূলতঃ স্ত্রীস্বাধীনতার সীমা সংক্রান্ত ধারণার প্রতিফলন। তারকনাথ বিশ্বাস মেয়েদের স্বাধীনতাকে সুনীতির পরিবর্তে 'কুনীতির ফল' বলে বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর মতে মেয়েরা যখন 'স্বাভাবিক নিয়মবলে' পুরুষের অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছে, তখন শিক্ষিত হয়ে স্বাধীন হওয়ার বাসনা পোষণ করা সুশিক্ষার পরিচায়ক নয়।[১৬৩] মেয়েরা লেখাপড়া শিখে পশমের গলাবন্ধ, মোজা বা আসন বোনে,[১৬৪] এ অভিযোগ তো ছিলই তার সঙ্গে যোগ হল পোষাকে ও ব্যবহারে পশ্চিমি সভ্যতার অনুকরণের অভিযোগ : মেয়েরা নাকি বিদ্যালয়, কলেজে গিয়ে মেম সেজে ধীরে ধীরে অপরিমিত 'বিলাসীতার দাসী' হয়ে পড়ছে। ফলে তারা 'জাতির প্রধান ধর্ম্ম আত্মনিগ্রহের পরিবর্ত্তে ভোগলালসা পরিতৃপ্তির জন্য লালায়িত'[১৬৫] বা, তারা বিদেশের অনুকরণে জুতো ও বহুবর্ণবিশিষ্ট পোষাক পরে[১৬৬]—এ সবই ছিল পাশ্চাত্যধারা অনুকরণের দৃষ্টান্ত।

এই পশ্চিমি সভ্যতার অনুকরণের প্রসঙ্গেই এসেছে ব্যাভিচারের অভিযোগ। আসলে, মেয়েরা লেখাপড়া শিখে গল্প-উপন্যাস পাঠ করবে ও বিদেশি মেয়ের অনুকরণে নিজের স্বামী নিজে পছন্দ করতে চাইবে, এই ধরনের ভয় বাঙালি সমাজে দীর্ঘদিন অব্যাহত ছিল। বিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র লিখেছিলেন : 'রমণীগণের বিলাস-প্রমত্ততা, স্বেচ্ছাচারিতা, পরপুরুষের সহিত অবাধ বন্ধুতা ও অবাধভ্রমণ, পরস্পর হস্তদ্বারা পৃষ্ঠদেশ আচ্ছাদিত করিয়া স্ত্রী পুরুষের প্রকাশ্যভ্রমণ, শকট হইতে উত্তরণ-সময়ে রমণীগণের পদ-ধারণ করিয়া সাহায্য-দান ইত্যাদি যদি কেবলমাত্র রমণী-সম্মানের পরিচায়ক হয়, তবে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার্য যে, সেরূপ সম্মান প্রদর্শন করার রীতি আমাদের সমাজে নাই।'[১৬৭] নতুন শিক্ষাদর্শের মূল কথা রমণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সেই রীতি একান্ত ভাবেই ছিল পাশ্চাত্য ভব্যতার ('এটিকেট') অনুসরণকারী। এই নতুন ভব্যতার রীতিকে বাঙালি সমাজ কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি।

বাঙালি সমাজের কাছে ঘরের মেয়ের বাইরে আসা বা পুরুষকে দেখে ঘরে আত্মগোপন না করা নির্লজ্জ ব্যবহারের মূর্ত উদাহরণ হয়ে উঠেছিল। অভিযোগের একটা বড় বিষয় ছিল স্বামী ভিন্ন বাইরের পুরুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। 'প্রমিলার শিক্ষা' গল্পে শিক্ষিতা যুবতী প্রমিলার কিছু কিছু আচার আচরণ গল্পকারের পছন্দ নয়। যেমন, প্রমিলার স্বামী সুরেশের বন্ধুদের সঙ্গে প্রমিলার পরিচয়, সমাজ সংস্কারকদের প্রভাবে তাদের একত্রে আহার, ইত্যাদি।[১৬৮] *পরিচারিকা* পত্রিকায় এই গল্প প্রকাশিত হয়েছিল—এ থেকে মনে হয় *পরিচারিকার* মত ব্রাহ্মদের পত্রিকারও সমর্থন ছিল না কোন বাঙালি মেয়ের ঘরের বাইরের পুরুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। এর থেকে ব্যাভিচারের ভয়ের অন্যতম কারণ ছিল এই যে শিক্ষার ফলে মেয়েরা বুঝতে পারছে যে পুরুষ ও নারী সমান। এটা যদি মেয়েরা বুঝতে পারে, তাহলে পুরুষ ব্যাভিচারী হলে মেয়েও স্বেচ্ছাচারিণী ও ব্যাভিচারিণী হয়ে উঠবে।[১৬৯] ব্যাভিচারের আরও ভয় ছিল এই কারণে যে শিক্ষিতা মেয়েকে কাজের জন্য বাড়ির বাইরে যেতে হবে, স্বামীরও কাজের জন্য অন্য জায়গায় যাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। স্ত্রী এই বিচ্ছেদ বেশিদিন সহ্য না করতে পেরে বিপথগামিনী হতে পারে।[১৭০] এতদিন পর্যন্ত এই আশঙ্কা একমাত্র পুরুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু স্ত্রী শিক্ষিতা

হলে উভয়েরই চরিত্র নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। সমাজ সচেতন ব্যক্তিরা স্ত্রীর এই অধঃপতনকে কোন ভাবেই সমর্থন করতে পারেননি।

তাই নানা লেখায় শিক্ষিত স্ত্রীর বিভিন্ন আচরণ দেখিয়ে পাঠকদের এ বিষয়ে সচেতন করে দেবার প্রয়াস লক্ষ করা যায় সে যুগের অনেক লেখকদের মধ্যেই। মেয়েরা পশ্চিমের মেয়েদের অনুকরণ করতে গিয়ে বিদেশি পোষাক পরছে, এ নিয়ে অনেকেই আপত্তি তুলেছিলেন। মেয়েদের অন্তর্বাস ব্যবহারের রীতি চালু হওয়ায় অনেকেই ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন।[১৭১] মেয়েদের মোজা ব্যবহারেও একই রকমের অশান্তি দেখা দিয়েছিল। ১৮৮০-র দশকে প্রকাশিত অতি জনপ্রিয় একটি উপন্যাসে পড়ি একটি 'এষ্টাকিন' পরিহিত মেয়ের কথা। এখানে 'এষ্টাকিন' লক্ষ করার পরেই কিন্তু দেখি যে লেখকের ভাষা পাল্টে গেছে—এতক্ষণ যে রমণী ছিল, এক নিমেষে সে 'মাগী' হয়ে গেল।[১৭২]

লেখাপড়া শেখা মেয়েরা বহু পুরুষাসক্ত হয়ে পড়ে, উপন্যাসের মাধ্যমে এ কথাও প্রচার করা হত। *মডেল ভগিনী* উপন্যাসের কমলিনী শিক্ষিতা মেয়ে। সে গরম লাগলে টেবিলের ওপর রাখা বরফজল খায়, কখনও শেকসপিয়ার কখনও শেলী পাঠ করে। এই ধরনের শিক্ষিতা মেয়ে কমলিনী তার শিক্ষক ও পরিচিত ডাক্তারের সঙ্গে নিয়মিত প্রেমপত্র বিনিময় করে।[১৭৩] কিংবা *অন্তঃপুর*-এ প্রকাশিত একটি গল্পে আমরা তিনটি মেয়ের কথা পড়ি যাদের বয়স উনিশ, আঠার ও ষোল। এরা মাসিক পত্রিকা পাঠ করে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে, প্রেমের কোন বাস্তবভূমি আছে কি না। মেয়ে তিনটির মধ্যে যে প্রেমের জন্য আকুলতা দেখা দিয়েছে, তা তারা সফল করতে পারছে না। শেষে তারা পরস্পরকে বলছে : 'আয় ভাই আমরা প্রেম প্রেম খেলি।'[১৭৪]

শুধু প্রেমতৃষ্ণা নয়, অতিরিক্ত সাহিত্য পাঠের ফলে মেয়েরা কল্পনা ও বাস্তব জগতের মধ্যে পার্থক্য ভুলে যেতে পারে—এটাও স্ত্রীশিক্ষার অন্যতম দোষ বলে বিবেচিত হত। 'নবেলিয়ানা' গল্পে আমরা পড়ি, জনৈক লেখকের স্ত্রীর বান্ধবীরা সাহিত্যপাঠের ফলে পরস্পরের নাম পালটে সাহিত্যের নাম ব্যবহার করছে, মুখের ভাষাও হয়ে উঠেছে সাহিত্যঘেঁষা।[১৭৫] অমৃতলাল বসুর *বৌমা* নাটকেও মেয়েদের অদ্ভুত চরিত্র ও ব্যবহার প্রদর্শনের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এই নাটকে শিক্ষিতা পুত্রবধূ কিশোরীকে তার শাশুড়ী বাড়িতে কাজের লোক না আসার জন্য রান্নঘরে গিয়ে উনুনের আঁচের দিকে নজর রাখতে বললে কিশোরী জানতে চায় তার শাশুড়ী পাগল হয়ে গিয়েছে কি না। রান্নাঘরে না যাওয়ার কারণ হিসেবে কিশোরী বলে যে তার আলমারিতে যত উপন্যাস আছে তার কোন নায়িকাই—তিলোত্তমা, মৃণালিনী, মনোরমা, সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনী, শান্তি, ভ্রমর, শ্রী, মাধবীকঙ্কণ—কখনও রান্নাঘরে যায়নি, এমনকি বিছানাটা পর্যন্ত পাতেনি। কিশোরীর মতে এই চরিত্রগুলিই হল এখনকার 'বাঙ্গালী কুলবালার আদর্শ রমণী। তোমাদের সীতা সাবিত্রীকে এঁরা অন্ধকারে ফেলে দিয়েছেন।'[১৭৬] *ছবি* প্রহসনের নায়িকা গল্প-উপন্যাসাদি এত পড়েছে যে সে ভাবতেই পারে না তার সাধারণ মেয়েদের মত বিয়ে হবে। বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে শুনে সে ঠাকুমাকে জিজ্ঞাসা করে বরের নাম হেমচন্দ্র না জগৎসিংহ? গল্প উপন্যাসের নায়িকাদের মত বিয়ে ছাড়া অন্য কোন ধরনের বিয়ে তার মনঃপূত নয়। সে তার বৌদিকে বলে : 'আমার সকল আশা ভস্ম হলো। . . . বল দেখি আমার কি কিছু প্রণয় হলো? প্রণয়ে যুদ্ধ হলো না, বিদ্রোহ হলো না, বিচ্ছেদ

হলো না, বিরহ হলো না, আমার হিস্টিরিয়া হলো না আমার সহজ বিবাহ হবে।'[১৭৭] এই ধরনের আর একটি প্রহসনের নায়িকা রুক্মিণী এত বেশি 'নভেল' পড়ে যে তার অসুস্থা শাশুড়ী জল চাইলে পর্যন্ত তার জল দেওয়ার সময় হয় না—সে বন্ধুদের সঙ্গে উপন্যাস পাঠই করে চলে। রুক্মিণী তার স্বামীকে চাকরি ছেড়ে দিতে মন্ত্রণা দেয়, পরিবর্তে উপন্যাস লিখলে অনেক লাভ হবে। 'নভেল' পড়ে পড়ে রুক্মিণী 'নভেলের' কলা-কৌশল এত আয়ত্ত করেছে যে প্রস্তাবিত উপন্যাসটি সম্বন্ধে সে স্বামীকে বলছে : 'এক একখানা নভেলের মধ্যে চারিটি করিয়া গান আর ছয়খানি করিয়া হাফ্‌টোন ছবি দেবে। ছবিগুলির স্ত্রীমূর্ত্তিগুলি সযৌবনা ও উন্মুক্তবক্ষা ও অস্ত্রধারিণী হইবে। পুরুষ অমনি তাহাকে স্থির করিবার জন্য জড়াইয়া ধরিবে—কিন্তু স্তন দুইটির উপর দিয়া যেন হাতখানা পড়ে।'[১৭৮] শিক্ষিতা মেয়েরা গল্প-উপন্যাস পাঠ করে যে কতদূর বিকৃতরুচি হয়ে পড়েছে, কেবলমাত্র এই তত্ত্ব প্রচারের জন্যই এ ধরনের বই লেখা হত।

যেহেতু স্ত্রীশিক্ষার ধারণা প্রথম এসেছিল পশ্চিম থেকে, তাই মেয়েদের স্ত্রীশিক্ষাজনিত সমস্ত 'অধঃপাতে'র জন্য দায়ী করা হত পশ্চিমি সভ্যতাকেই। *বাঙ্গালী চরিত* গ্রন্থে শ্রীমতী চঞ্চলা তার স্বামীকে বলছে, লেখাপড়া শিখে মেয়েরা দিনরাত 'উচ্চ বিজ্ঞান' চিন্তায় রত। ঘরের যে কাজ পাঁচ টাকা মাইনের চাকর দিয়ে করানো যায়, সে কাজ শিক্ষিতা মেয়েরা করবে কেন! এমনকি শিশু সন্তানকে দুধ খাওয়ানোর জন্য ন টাকা মাইনে দিয়ে 'দুধেলা-বৌ' রাখলেই যথেষ্ট। কারণ, চঞ্চলা মনে করে : 'এখন সভ্যতার সাদা ফুল ফুটিয়াছে।'[১৭৯] এখানে 'সভ্যতার সাদা ফুল' শব্দ তিনটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। 'সাদা' শব্দটির ব্যবহারের দ্বারা বিদেশি সভ্যতার অনুকরণের প্রতি (শ্বেতচর্ম অর্থে) ইঙ্গিত করা হয়েছে। বাঙালি মেয়েরা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে অনুকরণ করতে শিখেই ধীরে ধীরে ঘরের কাজ বা গৃহিণীপণাকে অনাদর করে বিজাতীয় বিলাসকে বড় করে দেখেছিল এটাই ছিল অভিযোগ।

শুধু প্রেমতৃষ্ণা জাগ্রত হওয়া বা ঘরের কাজে অনাদর দেখানো নয়, শিক্ষিতা মেয়েদের ব্যাভিচারের বিষয় নিয়েও গত শতকে বহু লেখা হয়েছে। অনেক সময়ে গল্প-উপন্যাসে এ বিষয়টি তির্যকভাবেও ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে। যেমন, *মডেল ভগিনী* উপন্যাসের নায়িকা কমলিনী তার অসুস্থ স্বামীর জন্য পুরুষ বন্ধুদের কাছে শোক জ্ঞাপন করছে। কমলিনীর কলকাতা শহরে একশ আটজন বাছাই বন্ধু ছিল। শুধু সংখ্যাধিক্য দেখানোই উদ্দেশ্য নয়, একশ আট সংখ্যাটিও বিশেষ লক্ষণীয়। এটি সহজেই শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের কথা মনে করিয়ে দেয়। এর নিগূঢ়ার্থ হল, আধুনিকা ও শিক্ষিতা মেয়ে অষ্টোত্তর শতনামের মত পরপুরুষের নাম জপ করে যায়। সেই কমলিনী স্বামীর অসুস্থতায় শোক জ্ঞাপন করতে এসেছে বিদেশি রীতি অনুসারে সর্বাঙ্গে কালো কাপড় পরে, কেবল মুখ বাদে। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মন্তব্য করেছেন : 'ওহো, এতক্ষণে বুঝিয়াছি, পতি রোগগ্রস্ত, —অর্থাৎ এখনও জীবিত,—তাই কমল সর্ব্বাঙ্গ কালো-কাপড়ে আবৃত করিয়াও মুখটী সাদা রাখিয়াছেন,—বুঝি পতি মরিলেই তিনি মুখটীতে কালি মাখিবেন।'[১৮০] নিছক ব্যঙ্গের ছলে বলা হলেও, ইঙ্গিতটি সুস্পষ্ট। মুখে কালি মাখা—অর্থাৎ বৈধব্যদশায় কদাচারের ইঙ্গিত করে লেখক শিক্ষিতা মেয়েদের চরিত্রস্খলনের দিকটিই বোঝাতে চেয়েছেন।

যেখানে শিক্ষিতা মেয়েরা পরপুরুষাসক্ত হয়ে ওঠেনি, সেখানে তারা ব্যবহারের দ্বারা

তাদের স্বামীদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলত, এমন অভিযোগও দুর্লভ ছিল না গত শতকে। আমরা আগেই দেখেছি, শিক্ষিতা মেয়েদের জীবনযাত্রায় বিলাসিতার সমালোচনায় অনেকেই মুখর ছিলেন। এমনকি স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক পত্রিকাগুলিও অনেক সময়ে হয় প্রবন্ধে এই জীবনযাপনের সমালোচনা করেছে, কিংবা এমন গল্প প্রকাশ করেছে যা পাঠ করলে সহজেই স্ত্রীশিক্ষার প্রতি মন বিমুখ হয়ে ওঠে। *বৌমা* নাটকের 'পুরুষোচিত শিক্ষাপ্রাপ্ত' স্ত্রী হিড়িম্বা তার স্বামী বামাদাসকে দিয়ে কান ধরায়।[১৮১] অমৃতলাল গুপ্তর 'দেবী' গল্পের নরেন বলছে : 'পাশ করা স্ত্রী, কাজেই ঘাড়ে চেপে বসেছেন। যে আদেশ করেন, তা পালন করতে না পারলে আর রক্ষা নেই, যে ধুয়া ধরবেন, তার মত কাজ না হলে আর গৃহে শান্তি থাকবে না। . . . এই দেখুন না কেন, আমার অজ্ঞাতসারে হ্যামিলটনের বাড়ী সাত হাজার টাকার গয়নার ফরমাস করে বসে আছেন।[১৮২] যে সময়ের রচনা এটি তখন স্বামীর অজ্ঞাতসারে সাত হাজার টাকার গয়নার ফরমাস খুব অল্প বাড়ির স্ত্রীর পক্ষেই করা সম্ভব ছিল। কিন্তু সেটা বিচার্য বিষয় নয় এখানে। মেয়েরা লেখাপড়া শিখে যে কত বিলাসী হয়ে যায়, এ বিষয়ে গল্প ছাপতে স্ত্রীশিক্ষার সমর্থকরাও উৎসাহ বোধ করতেন। অথচ অমৃতলাল গুপ্তই জানতেন যে সমস্ত শিক্ষিতা স্ত্রী এত অবুঝ হত না।[১৮৩] কিন্তু বাস্তব জীবনে মেয়েরা বিলাসিতা করার সুযোগ কতটা পেত রক্ষণশীলদের কাছে তার চেয়েও প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছিল শিক্ষিতা মেয়েদের বিলাসিতার দিকটি লোকের সামনে তুলে ধরা। অনেকেই প্রমাণ করতে ব্যস্ত ছিলেন যে মেয়েরা বিলাসী জীবনযাপনের সুযোগকে বর নির্বাচনের ক্ষেত্রে বেশি প্রাধান্য দেয়। *লা-বাবু* প্রহসনের স্বাধীন কুমারীদের মুখ দিযে গাওয়ানো হয়েছিল :

মাছি মারা কেরাণীর মাগ হবো না লো হবো না।
সাজিয়ে গুজিয়ে তোয়াজেতে রাখতে পারবে না লো পারবে না।
ফ্যাসন চাই ফাস্ট ক্লাস বোর্ডিংতে করব বাস,
রাখবো পেতে প্রেমের ফাঁস, প'ড়বে ফাঁদে কত জনা॥
লভার থাকবে সাথে সাথে, ছেলাম দেবে হুকুমেতে
থার্টি রুপিজ স্যালারিতে মাগ পোষা
আর চলবে না লো চলবে না।[১৮৪]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে পৌঁছে আমরা লক্ষ করি যে একটি বিশেষ স্তরের পরে স্ত্রীশিক্ষাকে সর্বান্তঃকরণে খুব বেশি ব্যক্তি সমর্থন করেননি। মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া যে কেবল শিক্ষার দরকারে, এটি উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজ স্বীকার করতে সম্মত ছিলনা। মেয়েদের শিক্ষার উদ্দেশ্য পরিবারে শৃংখলা রক্ষা। পুরুষের হাতে যেহেতু সংসারের নৈতিক দায়িত্ব থাকে না বলে গত শতকের বিশ্বাস ছিল, তাই মেয়েদের ওপর অর্পিত হয়েছিল সমগ্র সমাজকে অধঃপতন থেকে উদ্ধার করার দায়িত্ব। তাই এমন কোন শিক্ষা মেয়েদের দেওয়া উচিত নয় যা তাদের মনকে বহির্মুখী করে তোলে। উপন্যাস ও বটতলার বই পুরুষ পড়তে পারে। কিন্তু মেয়েরা নয় কারণ, 'পুরুষ অধঃপাতে যাইতেছে বলিয়া কি রমণীগণকেও যাইতে হইবে ? রমণী ভিন্ন এ সংসারে আমাদের আর

কে আছে ? তাঁহাদের কোমল সুন্দর প্রকৃতি অবিকৃত না থাকিলে পুরুষের তাপ দগ্ধ হৃদয় কিসে জুড়াইব ?"[১৮৫] এ রকম লেখা ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রচুর প্রকাশিত হয়েছে মেয়েদের সামনে এক মহিমাময় ভূমিকার গৌরবজনক দায়িত্বের দিকটি তুলে ধরে তাদের জন্য কতগুলি বিশেষ শিক্ষার গুরুত্ব প্রায় সবাই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সম্প্রতি মালবিকা কার্লেকর মন্তব্য করেছেন যে যুক্তিগতভাবে মেয়েদের উদারনৈতিক শিক্ষা দেবার একটা বিপদ ছিল। শিক্ষিতা মেয়েরা সমাজের বিভিন্ন বৈষম্য নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারত। এর ফলে অত্যন্ত যত্ন করে গড়ে তোলা পুরুষ ও নারীর জন্য পৃথক শ্রম ও নৈতিক মানদণ্ডের বিভাজনের ভিত্তিটাই নষ্ট হয়ে যেত। এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে মেয়েদের জন্য এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা, পাঠ্যসূচী, পাঠ্যবই নির্বাচন করা হয়েছিল যা একই সঙ্গে তাদের মৌলিক মূল্যবোধগুলিকে অপরিবর্তিত রাখবে, আবার তাদের অভিজ্ঞতা ও সুযোগের এক নতুন জগতের সন্ধান দেবে'—তা সে অভিজ্ঞতা ও সুযোগ যতই সীমাবদ্ধ হোক না কেন।[১৮৬]

এই বিশেষ শিক্ষাটি ছিল মূলতঃ চরিত্র গঠনের শিক্ষা। যে চারিত্রিক গুণাবলীকে চিরাচরিত বাঙালি সমাজের বাঁধনের জন্য দরকারি মনে হত, তাই-ই শেখানোর প্রয়াস আগাগোড়া লক্ষ করা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে। মেয়েরাও যদি পুরুষের সমান শিক্ষা পায়, তাহলে পারিবারিক কাজ ব্যাহত হবে এবং মেয়েরা দাবি করতে শুরু করবে পুরুষের সমান অধিকার। এই 'বিপর্যয়' রোধের জন্য দরকার ছিল ভক্তি, ধর্ম, নীতি ও ঘরের কাজ শেখানো। দরকার ছিল এমন শিক্ষার যার ফলে 'দয়া, প্রেম, সৌজন্য, উদারতা, নম্রতা, বিনয়, পরোপকার, পবিত্রতা ইত্যাদি সকল সদভাবে উৎপন্ন হয়'।[১৮৭] এবং ১৮৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত 'আর্য্যনারী সমাজ' 'সামাজিক ও গৃহকর্মের মধ্যে সেই কাজগুলির ওপরেই গুরুত্ব আরোপ করেছিল যার সাহায্যে শিক্ষিতা মেয়েরা যা করত বলে অভিযোগ আনা হত, তা যেন আর তারা না করতে পারে।

মেয়েরা যে শুধু কয়েকটি বিষয় পড়বে না বা বিশেষ রুচির বই পড়া থেকে নিরস্ত থাকবে, তাই-ই নয়। মেয়েদের পরীক্ষার পাঠ্য তালিকায় পর্যন্ত যে সব বইয়ের নাম উল্লিখিত হত, তাতে দৃষ্টি থাকত তাদের চরিত্রের কয়েকটি গুণ বিকশিত করার দিকে। মেয়েরা সাধারণ বিদ্যালয়ে কী শিক্ষাক্রমে পড়ত, সেটা মুখ্য নয়। সেই শিক্ষার অসারত্ব প্রমাণ করে তার পরিবর্তে যে শিক্ষাক্রমের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, তা থেকে সমাজে মেয়েদের ভূমিকা সম্বন্ধে কী ধারণা ছিল, তার কিছুটা অনুমান করা যায়। 'ভারত সংস্কারক সভা' (কেশবচন্দ্র সেন এই সভার সভাপতি ছিলেন) ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে মেয়েদের পরীক্ষার জন্য যে পাঠ্যক্রমের প্রস্তাব দিয়েছিল, তার মধ্যে কয়েকটি ছিল :

১। ইংরেজী — (ক) 'হ্যামলেট' - ১ম অঙ্ক - ৩য় গর্ভাঙ্ক, ৩য় অঙ্ক - ১ম গর্ভাঙ্ক, ৩য় অঙ্ক- ৩য় গর্ভাঙ্ক—যথাক্রমে, ল্যারেটিসের প্রতি পোলোনিয়াসের উপদেশ, হ্যামলেটের স্বগতোক্তি এবং রাজার স্বগতোক্তি। 'ভিনিসের বণিক' ('মার্চেন্ট অব ভেনিস') — ৪র্থ অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক — বিচারদৃশ্য। (খ) ঈশার পর্বতোপরি উপদেশ এবং রূপকোক্তি, মথু ৫ম, ৭ম অধ্যায়, মথু ১৩ ও ২৫ অধ্যায়, লুক ১৪ অধ্যায়। (গ) ব্যাকরণ ও রচনা।

২। বাংলা— (ক)মহাভারতের বনপর্ব—শ্রীবৎসরাজার উপাখ্যান, নলদময়ন্তীর উপাখ্যান, যুধিষ্ঠির ও ধর্মের কথোপকথন। শান্তিপূর্ব—ভীষ্মের যোগ বিষয়ে উপদেশ। (খ) রচনা।
৩। গণিত।
৪। ইতিহাস ও ভূগোল।
৫। প্রাকৃতিক ধর্মবিজ্ঞান।
৬। স্বাস্থ্য রক্ষা।
৭। সঙ্গীত, ইত্যাদি।[১৮৯]

আরও কযেকটি বিষয় পরীক্ষার পাঠ্যক্রমের মধ্যে ছিল, কিন্তু ওপরের তালিকাটি থেকেই বেরিযে আসে ত্নারা কী ধরনের স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। বাইবেলের সুস্পষ্ট ধর্মশিক্ষার অংশটি বাদ দিযেও, দেখা যায যে সাহিত্যের পাঠ্যসূচীও সে ভাবেই চয়ন কবা হযেছিল যার দ্বারা কতগুলি সাধারণ সুনীতিবোধ মেয়েদের মধ্যে জাগ্রত হয়। 'হ্যামলেট' নাটকে ল্যারেটিসের প্রতি পোলোনিয়াসের উপদেশ হল মূলতঃ জীবনের ও সততার কযেকটি মৌলিক দিক সংক্রান্ত। ঐ নাটকেই তৃতীয় অঙ্কে রাজার স্বগতোক্তির মাধ্যমেও সেই নীতিশিক্ষাই প্রধান লক্ষ্য ছিল। 'মার্চেন্ট অব ভেনিসে'র বিচার দৃশ্যের মাধ্যমে শিক্ষণীয বিষয ছিল পোর্শিযার সেই বিখ্যাত ভাষণ যার মূল উদ্দেশ্য দয়ার উপকারিতা প্রদর্শন। এই ভাবে বাংলা ভাষাতেও পাঠ্যসূচীতে জোর দেওয়া হয়েছিল কতগুলি মৌলিক চারিত্রিক গুণাবলীব অনুশীলনের ওপর। মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্মের আসক্তি ত্যাগ ও অজগরব্রত বিষয়ে উপদেশ, বনপর্বে নলদময়ন্তী উপাখ্যানে দময়ন্তীর পাতিব্রত্য, যুধিষ্ঠির-ধর্মের কথোপকথনের মাধ্যমে দয়া, দান, অভিমান, ত্যাগ ও জীবনের অনিত্যতা বিষযে উপদেশ শিক্ষা দেওয়ার জন্যই এই বিষয়গুলি পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। আর ছিল ধর্মবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিধির ওপর গুরুত্ব।

এই পুরো পাঠ্যসূচীটি লক্ষ করলেই বোঝা যায় মেয়েদের দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্বন্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যারা স্ত্রীশিক্ষা সমর্থন করেছিলেন, তাদের কী ধারণা ছিল। তারা স্ত্রীশিক্ষার মাধ্যমে কী উদ্দেশ্য সাধিত করতে চেয়েছিলেন, তা বোঝা যায় স্ত্রীশিক্ষার ওপর তাদের বিভিন্ন লেখাপত্র থেকে। পড়ার বিষয়ের মাধ্যমে যাতে রমণীসুলভ গুণাবলী প্রস্ফুটিত হয়, সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল স্ত্রীশিক্ষার লক্ষ্য। এইভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে একটি নতুন শব্দ প্রবর্তিত হয়েছিল—'স্ত্রীজনোচিত শিক্ষা'[১৯০] অর্থাৎ,সাধারণ শিক্ষা বলতে যা বোঝায়, তা নয—যে শিক্ষা মেয়েদের পক্ষে 'উচিত', সেই শিক্ষাপদ্ধতিই আবিষ্কার করা ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর উদ্দেশ্য। রক্ষণশীল ব্যক্তিরা যেমন স্ত্রীশিক্ষাকেই ভয় পেতেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর 'উদারপন্থী'রা সে রকম ভয় পেতেন 'বিকৃত' শিক্ষাকে।[১৯১] 'বিকৃত' শিক্ষা অর্থে তাঁরা বুঝতেন 'ধর্মহীন শিক্ষা'। বলা হত, শিক্ষিতা মেয়ে পড়বে ধর্মগ্রন্থ। হিন্দুর স্ত্রী বিদ্যাভ্যাস থাকলেও 'যেন কখনই রহস্যগ্রন্থ লজ্জা ধর্ম্মের হানিকর নাটক নভেলাদি পাঠ' করে নিজের চরিত্রের 'অপকর্ষতা সাধন' না করে, সে বিষয়েও সতর্ক করে দেওয়া হত।[১৯২]

চিরাচরিত দায়িত্বের বাইরে মেয়েদের নতুন কোন ভূমিকা ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্বীকৃত

হয়নি। এবং স্ত্রীশিক্ষার সমর্থকরাও এই লক্ষ্যেই শিক্ষার উদ্দেশ্যকে নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছিলেন। 'শিক্ষাপ্রাপ্ত স্ত্রীরা কন্যা, ভগিনী, ভার্য্যা ও মাতার পদের উপযুক্ত হইয়া সকল সম্বন্ধে কর্তব্য সাধন করিতে সক্ষম হইবেন এবং জন সমাজে তাঁহাদের নির্দিষ্ট ব্রত পালন করিবেন। . . . সাধারণ স্ত্রীজাতির পক্ষে অল্প উন্নতিতে সন্তুষ্ট থাকাই প্রকৃতির নিয়ম।'[১৯] 'সমাজে তাঁহাদের নির্দিষ্ট ব্রত'-ই ছিল তাদের দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্বন্ধে অপরিবর্তনীয় ধ্যান-ধারণা। উনবিংশ শতাব্দীতে মেয়েদের মাসিক পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা খুঁটিয়ে পড়লেও বোঝা যায় যে তাদের দায়িত্ব বলতে শুধু মেয়েলি দায়িত্বের কথাই বলা হত। স্ত্রীজাতির দুরবস্থা যে স্ত্রীশিক্ষার সমর্থকদের মনকে আলোড়িত করেনি, তা নয়। কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের কাজের ক্ষেত্রগত বিভিন্নতার বিষয়ে তাঁরা এত সচেতন ও সতর্ক ছিলেন যে স্ত্রীজাতির সামাজিক উন্নতির সীমাও অলক্ষ্যে নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। চার দেওয়ালের চৌহদ্দির বাইরে যে তারা মেয়েদের সাধারণ শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না, তা স্বতঃই স্পষ্ট।

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে উনিশ শতকের উদার আবহাওয়া ও ধ্যান-ধারণায় স্ত্রীকে মানসিক সঙ্গী হিসেবে পাবার তাগিদ অনুভব করেছিলেন নব্য শিক্ষিতরা। স্ত্রীজাতির শিক্ষা ব্যতীত সেটি সম্ভব ছিল না। তাই শুরু হল স্ত্রীশিক্ষা। রক্ষণশীলরা পুরনো স্ত্রী-পুরুষ ও পারিবারিক সম্পর্ক নিয়েই তুষ্ট ছিলেন, স্ত্রীকে সঙ্গী হিসেবে পাবার তাগিদ অনুভব করেননি। এইখানেই স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে সংঘাতের সূত্রপাত। গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা ছিল ব্রাহ্মদের। পারিবারিক ও সামাজিক নানা গোলযোগের যে অভিযোগ রক্ষণশীল ব্যক্তিরা আনতেন, স্ত্রীশিক্ষার সমর্থকবা সেগুলিকে খুব জোরের সঙ্গে খণ্ডন করেননি কখনও। বরং অনেক সময়ে তাঁদের সুরটিও রক্ষণশীলদের মতই ছিল।

আসলে, উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি সমাজই সাধারণভাবে রক্ষণশীল ছিল, অন্তত রক্ষণশীলতাই সমাজের প্রধান ধারা ছিল। এবং স্ত্রীশিক্ষাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে যে এত প্রচুর লেখাপত্র দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হয়েছিল, এর থেকে মনে হয় যে বাঙালি সমাজ এই ধরনের লেখার প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে স্বীকার করে নিত। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দেওয়ার প্রবণতা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এসে অনেক কমে গিয়েছিল। কিন্তু তার পরিবর্তে সমাজের পক্ষে ক্ষেমঙ্করী বলে যে শিক্ষা নির্দিষ্ট হয়েছিল, তার সীমাবদ্ধতা এত স্পষ্ট ও সহজবোধ্য যে অনেক সময়ে সন্দেহ জাগে, স্ত্রীশিক্ষার কোন অর্থে তারা বিশ্বাসী ছিলেন?

এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে পুরুষের দাক্ষিণ্যের অঞ্জলির ফাঁক দিয়ে যা বেরিয়ে এসেছে, বাঙালি মেয়েদের ঠিক ততটা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। গত শতকের গোড়ায় সাধারণভাবে পুরুষরাই মেয়েদের শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। তার মধ্যে ছিল কিছুটা মানবিকতা, কিছুটা মানসিক অতৃপ্তি। তারপরে আবার পুরুষরাই, এমন কি স্ত্রীশিক্ষার সমর্থকরাই, লক্ষ্মণের মত গণ্ডি দিয়ে এঁকে দিয়েছিলেন মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিচরণের সীমা। বর্তমান আলোচনার গোড়ায় বাঙালি মেয়েদের সঙ্গে সীতার এক অলক্ষ্য আত্মসমীকরণের প্রয়াস করা হয়েছিল। শতাব্দীর শেষ দিকে এসেও সেই অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে গিয়েছিল বললে সে যুগের সমাজ-সংস্কারকদের কৃতিত্বকে

একেবারে ধূলিস্যাৎ করা হয়। পশ্চিমি সভ্যতা আমাদের স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে সজাগ করেছে, বুঝিয়েছে মেয়েদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পুরুষেরই। কিন্তু সেই কাজে পুরুষ তাকে রক্ষা করতে চেয়েছি সীতার মত ঐ গন্ডির মধ্যেই, যখন রাম ছুটেছে পশ্চিমি সভ্যতার স্বর্ণমৃগের সন্ধানে। সীতার গন্ডিটি কিন্তু বৃহত্তর পরিসরে অবিকৃতই রয়ে গিয়েছিল।

উল্লেখপঞ্জী

১। চিত্রা দেব, *পুঁথিপত্রের আঙিনায় সমাজের আলপনা,* (কলকাতা, ১৯৮১), পৃ ৩৬

২। সুকুমার সেন, *মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী,* (কলকাতা, ১৩৫২ বঃ), পৃ ৪৪
বাংলা সাহিত্য থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে আনিসুজ্জামান দেখিয়েছেন যে সীমাবদ্ধ হলেও মধ্যযুগে স্ত্রীশিক্ষার চল ছিল, দ্র. 'বাঙালি নারী', *এক্ষণ* (শারদীয় সংখ্যা), ১৪০১ বঃ, পৃ ২-৩

৩। Anath Nath Basu (ed.), *Adam's Report on the State of Education in Bengal,* (Calcutta, 1941), p.189

৪। দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, *আত্মজীবনী,* (কলকাতা, ১৯৬২), পৃ ২৫২-২৫৩

৫। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, *জ্যোতিবিন্দ্র নাথেব জীবনস্মৃতি* (১৩২৬ বঃ), (কলকাতা, ১৩৮৯ বঃ), পৃ ২৫

৬। *বঙ্কিম রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৬১ বঃ), পৃ ২২১-২২২

৭। *The Calcutta Review,* vol. XI, Jan - June, 1849, Miscellaneous Notes, p. XXVIII.

৮। সুকুমার সেন, *বটতলাব ছাপা ও ছবি,* (কলকাতা, ১৯৮৪), পৃ ৫০-৫১

৯। 'আমার জীবন', নরেশচন্দ্র জানা, মানু জানা ও কমল কুমার সান্যাল (সম্পা.), *আত্মকথা* (প্রথম খণ্ড) (কলকাতা, ১৯৮১), পৃ ৪১ (রাসসুন্দরী দেবীর আত্মকথা)

১০। 'কবিব গান', *জন্মভূমি,* শ্রাবণ, ১৩০৩ বঃ, পৃ ২২৬

১১। প্রফুল্ল চন্দ্র পাল, *প্রাচীন কবিওয়ালার গান,* (কলকাতা, প্রকাশ সন অজ্ঞাত), পৃ ২০৬

১২। ঐ, ৯৫-৯৬

১৩। ঐ, ৭২

১৪। কোন সামাজিক পরিস্থিতিতে এবং কী মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে মেয়েরা কবিগান, নিধুর টপ্পা প্রভৃতির মধ্যে তাদের পছন্দের ক্ষেত্রটি খুঁজে পেত, তার বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্র. বর্তমান গ্রন্থের 'দাম্পত্য-ভাবনা' অধ্যায়।

১৫। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), *সংবাদপত্রে সেকালের কথা* (প্রথম খণ্ড), (কলকাতা, ১৩৭৭ বঃ), পৃ ১২৭

১৬। ঐ

১৭। যেমন. দ্র. কৃষ্ণকুমার মিত্র, *আত্মচরিত* (১৩৪৩ বঃ), (কলকাতা, ১৩৮১ বঃ) পৃ ৩৪
নবীনচন্দ্র সেন, *আমার জীবন,* (কলকাতা, ১৩১৪ বঃ), পৃ ৯৩-৯৪

১৮। *ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী,* (কলকাতা, ১৩৫৭ বঃ), পৃ ১৮৬

১৯। *Adam's Report on the State of Education in Bengal,* op. cit, pp. 187-188.

২০। ঐ, ১৮৯

২১। ঐ
২২। *সংবাদপত্রে সেকালের কথা* (প্রথম খণ্ড), (পূর্বোক্ত), পৃ ১৩
২৩। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.) *পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন* (দ্বিতীয় খণ্ড), (কলকাতা, ১৯৮১), পৃ ১১২
২৪। ঐ, ১১৩
২৫। Sitanath Tattvabhushan, *Social Reform in Bengal* (1904), (Calcutta, 1982), p. 70
২৬। ঐ
২৭। *সংবাদপত্রে সেকালের কথা* (প্রথম খণ্ড), (পূর্বোক্ত), পৃ ১৩
২৮। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), *প্যারীচাঁদ রচনাবলী*. (কলকাতা, ১৯৭১), পৃ ৪৯৯
২৯। কৈলাসবাসিনী দেবী, *হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি*, (কলকাতা, ১৭৮৭ শক), পৃ ২৩-২৪
৩০। *Adam's Report on the State of Education in Bengal*, op. cit, p. 187.
৩১। Q. Craufurd, *Sketches Chiefly relating to the History, Religion, Learning And Manner of the Hindoos*, vol. II, (London, 1792), p. 47
৩২। অ্যাডাম লিখেছেন, '. . . it is considered highly improper to bestow any education on women and no man would marry a girl who was known to be capable of reading; . . . the husbands are sometimes deceived, and find on receiving their wives that, after marriage they have acquired that sort of knowledge which is supposed to be most inauspicious to their husbands.' Rev. James Long (ed.), *Adam's Reports on Vernacular Education in Bengal and Bihar*, (London. 1868), p.76
৩৩। *হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি*, (পূর্বোক্ত), পৃ ৭
৩৪। *পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন* (দ্বিতীয় খণ্ড), (পূর্বোক্ত), পৃ ৯৯
৩৫। টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র), *রামারঞ্জিকা*, (কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩১৯ বঃ), পৃ ১-২
৩৬। 'আমার জীবন', নরেশচন্দ্র জানা, মানু জানা ও কমল কুমার সান্যাল (সম্পা.), *আত্মকথা* (প্রথম খণ্ড), (কলকাতা, ১৯৮১), পৃ ৩০ (রাসসুন্দরী দেবীর আত্মকথা)
৩৭। ভাদ্র, ১২৭০ বঃ, পৃ ২
৩৮। ঐ, ৪
৩৯। বিপিনচন্দ্র পাল, *আমার জীবন ও সমকাল* (প্রথম পর্ব), (শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত), (কলকাতা, ১৯৮৫), পৃ ৯৫
৪০। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী (সম্পা.), *পুরাতনী*, (কলকাতা, ১৮৭৯ শক), পৃ ৯
৪১। 'স্ত্রীবিদ্যা', *সংবাদ প্রভাকর* (৭.৫.১৮৪৯), পৃ ২
৪২। *'বর্তমান ব্যবহার'*, অক্ষয়কুমার দত্ত, *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, (কার্তিক, ১৭৭১ শক), পৃ ৮৪
৪৩। উদাহরণস্বরূপ ঈশ্বর গুপ্তর ব্যঙ্গাত্মক কবিতা 'দুর্ভিক্ষ' থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করা যায়:

আগে মেয়েগুলো ছিল ভাল
ব্রত-ধর্ম কোর্ত্তো সবে।
একা "বেথুন" এসে শেষ করেছে,
আর কি তাদের তেমন পাবে।
যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে,
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।

তখন "এ বি" শিখে, বিবি সেজে,
বিলাতি বোল কবেই কবে।

. . .

ও ভাই! আর কিছুদিন বেঁচে থাক্‌লে,
পাবেই পাবেই দেখতে পাবে,
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে ॥
আছে গোটা কতক বুড়ো যদিন
তদিন কিছু রক্ষা পাবে।

ঈশ্বরচন্দ্র· গুপ্তের গ্রন্থাবলী, (কলকাতা, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, প্রকাশ সন নেই), পৃ ১৬৪।

পাঠ করলেই বোঝা যায, নিছক পরিহাসের জন্য এটি লেখা নয়। এখানে লক্ষণীয়, যে ঈশ্বর গুপ্ত *সংবাদ প্রভাকব*-এর পাতায স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে জন্য এত উৎসাহী, তাঁরই কলম থেকে শিক্ষিত স্ত্রীর ভবিষ্যৎ ব্যবহারের এমন 'বৈপ্লবিক' ছবি বেরিয়েছে। এই বৈপরীত্য কেবল ঈশ্বর গুপ্তব একারই নয়। সেযুগে অনেকেই স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা প্রভৃতির মত সামাজিক প্রশ্নে বিভিন্ন ধরনেব পরস্পর- বিরোধিতার টানাপোড়েনের মধ্যে ছিলেন।

৪৪। *হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি*, (পূর্বোক্ত), পৃ ১১-১২

৪৫। ঐ, ১৫

৪৬। Patricia Branca, *Women in Europe since 1750*, (London, 1978), p. 11

৪৭। Sheila Rowbotham, *Women : Resistance and Revolution*, (London, 1972), p. 31

৪৮। ১৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে মেরী অ্যাস্টেল লিখেছিলেন *A Serious proposal to the Ladies*। আরও সতেরো বছর আগে (১৬৭৭) নর-নারীর সাম্য নিয়ে Roger L'Estrange লিখেছিলেন *The Woman as good as the Man or the equality of both sexes.*

৪৯। A.F. Salauddin Ahmed, *Social Ideas and Social Change in Bengal, 1818 - 1830*, (Calcutta, 1976), p. 42

৫০। A. Bose (ed.), *Adam's Reports on the State of Education in Bengal*, op. cit., p. 46

৫১। M.A. Liard, *Missionaries and Education in Bengal*, (Oxford, 1972), p. 134

৫২। *রামমোহন বচনাবলী*, (হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮০ বঃ), পৃ ২০২

৫৩। *Vide : A Rapid Sketch of the Life of Raja Radhakanta Deva Bahadur, with some notices of his Ancestors and the Testimonials of his Character and Learning*, (Calcutta, 1859), p. 19

৫৪। *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, (প্রথম খণ্ড) (পূর্বোক্ত), পৃ ১৪

৫৫। ঐ, ১৫

৫৬। নীলমণি চক্রবর্তী, *আত্মজীবনস্মৃতি* (১৩২৭ বঃ ?) (কলকাতা, ১৩৮২ বঃ), পৃ ১৬

৫৭। *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, (প্রথম খণ্ড), (পূর্বোক্ত), পৃ ১৫

৫৮। ঐ, ১৫-১৬

৫৯। 'Bowbazar School and Female Education' quoted in Sooresh Ch.

Moitra (ed.), *Selections from Jnanannesan*, (Calcutta, 1979), p. 33

৬০। ibid, 34

৬১। 'স্ত্রী-শিক্ষা', *Bengal Spectator*, January 1, (1843), p. 10

৬২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), *সংবাদপত্রে সেকালের কথা* (দ্বিতীয় খণ্ড), (কলকাতা, ১৩৮৪ ব), পৃ ৯১-৯২

৬৩। বিনয় ঘোষ (সম্পা.), *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র* (তৃতীয় খণ্ড), (কলকাতা, ১৯৮০), পৃ ৬৭

৬৪। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার বাংলাদেশে যে তিনটি উপায়ে হয়েছিল, সে বিষয়ে লিখতে গিয়ে অ্যাডাম প্রথমেই উল্লেখ করেছিলেন, '. . . .institutions in which they are not only taught, but bred, clothed and lodged.' *Vide: Adam's Reports on the State of Education in Bengal* op. cit., p. 452,
শুধু ছাত্রীদের খাওয়া পরা বা বাসস্থানের সংস্থান করাই নয়, অনেক সময়ে ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে যেতে উৎসাহিত করার জন্য পয়সাও দেওয়া হত (দ্র.ঐ, ৪৫৩)। এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন বেথুনও। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন বড়লাট লর্ড ডালহৌসিকে লেখা চিঠিতে বেথুন মন্তব্য করেছিলেন যে প্রত্যেক ছাত্রীকে মাসিক পাঁচ-ছ টাকা করে পারিতোষিক দিলে তাঁর বিদ্যালয়ে কখনও ছাত্রীর অভাব হবে না। দ্র. J.A. Richey (ed.), *Selections from Educational Records, Pt. II,* 1840-1850, (New Delhi, 2nd ed. 1965), p. 53
সুতরাং হয় পারিতোষিক নয়ত অর্থকরী প্রলোভনের জন্য বহু দরিদ্র পরিবারের মেয়ে বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে যেত। তার ফলে কয়েক ক্ষেত্রে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও তা স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সমাজের সামগ্রিক মানসিকতা পরিবর্তনের সাক্ষ্য দেয় না।

৬৫। *Vide : J.A. Richey (ed.) - Selections from Educational Records, Pt. II,* 1840 - 1850, op. cit. p. 435
প্রকৃতপক্ষে বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল, এবং ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের শেষে এই বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৯৩। দ্র. Kalidas Nag (ed.), *Bethune College & School Centenary Volume*, 1849-1949, (Calcutta, 1949), p. 24

৬৬। মন্মথনাথ ঘোষ, *রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়* (১৯১৭) (কলকাতা, ১৯৮২), পৃ ৪৭

৬৭। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে ব্রাহ্ম যুবকদের চেষ্টায় কলকাতার কাছে মজিলপুরে ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে এক ডাক্তারের বাড়িতে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরেই তাঁদের স্থানীয় জমিদারের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। জমিদারের আদেশে কোন শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের ঘর তৈরির জন্য কাঠ বহন করতে সম্মত হয়নি। জমিদারের আদেশে ঘরামিরা ঘর নির্মাণ করেনি। ব্রাহ্ম যুবকরা নিজেরাই সারাদিন পরিশ্রম করে খুঁটি পুঁতে যাওয়ার পর রাত্রিবেলায় জমিদারের ভৃত্য সে খুঁটি তুলে ফেলে। ব্রাহ্মরা আদালতে ভৃত্যের নামে মামলা দায়ের করার পর জমিদারের নির্দেশে ঐ বিদ্যালয়ের জমির এক জাল দলিল তৈরি হয়। মামলায় অবশ্য শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্ম যুবকদেরই জয় হয়েছিল। তখন জমিদার বাড়িতে বাড়িতে লোক পাঠিয়ে বালিকা বিদ্যালয়ে মেয়ে পাঠাতে নিষেধ করেন। ভয় দেখান, মেয়ে পাঠালে একঘরে করবেন, ফলে, অধিকাংশ গৃহস্থই বিদ্যালয়ে মেয়ে পাঠানো থেকে নিরস্ত থাকে, কেবল শিবনাথ শাস্ত্রীর বাবা-মা এ আদেশ অমান্য করে তাঁদের দুই মেয়েকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিলেন। এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিল ঐ দুজনই। শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি স্ত্রীশিক্ষার প্রতি বাঙালি রক্ষণশীল সমাজের বিরোধিতা কী প্রচণ্ড ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী, *আত্মচরিত*

(কলকাতা, ১৩৫৯ বঃ) পৃ ৫৮-৫৯

৬৮। 'স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থা', *বামাবোধিনী পত্রিকা*, শ্রাবণ, ১২৭৪ বঃ, পৃ ৫৫৫

৬৯। *বামাবোধিনী পত্রিকা*, ভাদ্র, ১২৭৪ বঃ, পৃ ৫৭৬-৫৭৭

৭০। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে 'দাম্পত্য-ভাবনা' অধ্যায়ে।

৭১। 'স্ত্রী ও স্বামীর পরস্পর সম্বন্ধ', *বামাবোধিনী পত্রিকা*, আশ্বিন, ১২৭১ বঃ, পৃ ১৮৪

৭২। 'স্ত্রী বিদ্যা', *সংবাদ প্রভাকর*, ৭.৫.১৮৪৯, পৃ ২
আরও পরবর্তী কালের রচনাতেও আমরা প্রায় একই কথার প্রতিধ্বনি শুনি। আক্ষেপ করে বলা হয়েছিল যে শিক্ষার অভাবের জন্য মেয়েদের কথাবার্তায় মার্জিত রুচির ছাপ পাওয়া যেত না।। দ্র. — Shib Chunder Bose, *Hindoos As They Are : A Description Of The Manvers, Customs And Inner Life Of Hindoo Society In Bengal,* (Calcutta, 1881), p. 8

৭৩। 'কি কি উপায়ে এদেশের উন্নতি হইতে পারে ?' *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, ফাল্গুন, ১৭৮৩ শক, পৃ ১৮১

৭৪। 'বঙ্গসংসার', *বামাবোধিনী পত্রিকা*, আষাঢ়, ১২৮৮ বঃ, পৃ ৭৫-৭৬

৭৫। 'এদেশে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ব্যবহার', *বামাবোধিনী পত্রিকা*, বৈশাখ, ১২৮০ বঃ, পৃ ১৫-১৬

৭৬। সদর আদালতের আদেশ পাওয়ার আগে বর্ধমানের বিধবা রানি বসন্তকুমারীকে নিয়ে গোপনে কলকাতা চলে আসার সময়ে রাজবাড়ির কর্মচারীরা পথের মধ্যে রানিকে ধরে ফেলে ও আবার রাজবাড়িতে ফেরত নিয়ে যায়। দ্র. *রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়* (পূর্বোক্ত), পৃ ৪২

৭৭। 'স্ত্রী-শিক্ষা' *জ্ঞানাঙ্কুর*, আশ্বিন,১২৮২ বঃ, পৃ ৫২৪

৭৮। ঐ, ৫২৪-৫২৫

৭৯। মদনমোহন তর্কালঙ্কার, 'স্ত্রী শিক্ষা' ; *সর্ব্বশুভরী পত্রিকা*, আশ্বিন, ১৭৭২ শকাব্দ, পৃ ১১-১২

৮০। ঐ, ১৭-১৯

৮১। নীলকণ্ঠ মজুমদার, 'নারীধর্ম্ম', *বেদব্যাস*, বৈশাখ, ১২৯৬ বঃ, পৃ ৪

৮২। দ্র. জয়ন্ত গোস্বামী, *সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন*, (কলকাতা, ১৯৭৪) ; পৃ ৯০১

৮৩। *Hundred years of the University of Calcutta, 1857 - 1956*, (Calcutta, 1957), p. 122

৮৪। Ibid, 147

৮৫। 'স্ত্রী-শিক্ষার ব্যয়', *অন্তঃপুর* ,ফাল্গুন, ১৩০৭ বঃ, পৃ ৪৭

৮৬। 'নারীজাতি', *সাধারণী*, ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৪ বঃ, পৃ ৮৫

৮৭। উনবিংশ শতাব্দীতে স্ত্রীশিক্ষাকে বিদ্রুপ করে প্রকাশিত প্রহসনের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। তাদের মধ্যে কয়েকটির নাম দেখলেই উদ্দেশ্য বোঝা যায়। যেমন, কেদারনাথ মণ্ডল, *বেহদ্দ বেহায়া বা রং তামাসা*(১৮৯৪), অজ্ঞাতনামার *কলির মেয়ে ও নব্যবাবু*(১৮৮৫), অনুকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *দেশাচার* (১৮৭২) ; সিদ্ধেশ্বর রায়, *বৌবাবু* (১৮৮৯), বিপিনবিহারী দে, *অবলা কি প্রবলা*(১৮৮৯), অমৃতলাল বসু, *বৌমা*(১৮৯৭), প্রভৃতি। এই ধরনের প্রহসনের চরিত্র নির্মাণের কৌশল লক্ষ করলে দেখা যায়, আচারবিরুদ্ধ কাজগুলি করানো হয়েছে শিক্ষিতা মেয়েদের দিয়ে। এর থেকেও প্রহসনকারদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট বোঝা যায়।

৮৮। *পাশ করা মাগ*, (কলকাতা, ১২৯৫ বঃ), পৃ ২

৮৯। ঐ, ৮

৯০। *খণ্ড প্রলয়*, (কলকাতা, ১৮৭৮), পৃ ১৪

৯১। *আচাভূয়ার বোম্বাচাক,* (কলকাতা, ১৮৮০) পৃ ১৫
৯২। ঐ, ২৬
৯৩। জ্ঞানদানন্দিণী দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন : 'ওঁরা দুজন [সত্যেন্দ্রনাথ ও মনোমোহন] পরামর্শ ক'রে একদিন বেশি রাতে সমান তালে পা ফেলে বাড়ীর ভেতরে এলেন। তারপরে উনি মনোমোহনকে মশারির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজে শুয়ে পড়লেন। আমরা দুজনেই মশারির মধ্যে জড়োসড়ো হয়ে বসে রইলুম, আমি ঘোমটা দিয়ে একপাশে, আর তিনি ভোম্বলদাসের মত আর এক পাশে।' দ্র. ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী (সম্পা.), *পুরাতনী* (কলকাতা, ১৮৭৯ শক), পৃ ২৪-২৫
৯৪। রাখালদাস ভট্টাচার্য, *স্বাধীন জেনানা* (কলকাতা, ১৮৮৬), পৃ ৪৭
৯৫। *অমৃতলাল গ্রন্থাবলী* (২য় খণ্ড), (কলকাতা, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, আখ্যাপত্র বিনষ্ট), 'তাজ্জব ব্যাপার', পৃ ৫
৯৬। ঐ, ১০
৯৭। 'আমার জীবন' (পূর্বোক্ত), পৃ ২২-২৩ (রাসসুন্দরী দেবীর আত্মকথা)
৯৮। ইন্দিরা দেবী, *আমার খাতা,* (কলকাতা, ১৩১৯ বঃ), পৃ ৪৫-৪৬
৯৯। *রবীন্দ্ররচনাবলী* (সপ্তম খণ্ড), (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৬১), পৃ ১৯৪
১০০। 'স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিক্ষা', *পবিচারিকা,* চৈত্র, ১২৮৬ বঃ, পৃ ২৪১
১০১। 'স্ত্রীশিক্ষা', *বামাবোধিনী পত্রিকা,* ভাদ্র, ১২৭৪ বঃ, পৃ ৫৮৪
১০২। *বামাবোধিনী পত্রিকা,* ফাল্গুন, ১২৭৭ বঃ, পৃ ৩৩৫
১০৩। 'বিদ্যার সমান বন্ধু নাই', *বামাবোধিনী পত্রিকা,* মাঘ, ১২৭৮ বঃ, পৃ ৩২২ - ৩২৩
১০৪। *বামাবোধিনী পত্রিকা,* জ্যৈষ্ঠ, ১২৭১ বঃ, পৃ ১২৯
১০৫। 'স্ত্রীশিক্ষা', *বঙ্গমহিলা,* ভাদ্র, ১২৮২ বঃ, পৃ ৯৯।
১০৬। 'স্ত্রীশিক্ষার সুফল', *পরিচাবিকা,* আশ্বিন, ১২৯৭ বঃ, পৃ ১২৯
১০৭। বিপিনমোহন সেনগুপ্ত, *হিন্দু মহিলা নাটক,* (কলকাতা, ১৮৬৮), পৃ ৯৬
১০৮। 'বিদ্যা শিখিলে কি গৃহকর্ম করিতে নাই?' *বামাবোধিনী পত্রিকা,* আশ্বিন,১২৭৭ বঃ, পৃ ১৭৮
১০৯। ঐ
১১০। পূর্বোক্ত, পৃ ২১, (রাসসুন্দরী দেবীর আত্মকথা)
১১১। 'স্ত্রীজাতির সদ্‌গুণ বিষয়ে কথোপকথন' *বামাবোধিনী পত্রিকা,* মাঘ, ১২৮৮ বঃ, পৃ ৩১০
১১২। 'শিক্ষিতা মহিলা দিগের ত্রুটী', *বামাবোধিনী পত্রিকা,* বৈশাখ, ১২৯৪ বঃ, পৃ ২৪
১১৩। ঐ, ২৫
১১৪। 'বঙ্গমহিলা', *বামাবোধিনী পত্রিকা,* বৈশাখ, ১২৮১ বঃ, পৃ ১২
১১৫। ঐ, ১৪
১১৬। 'শিক্ষিতা বঙ্গমহিলা', *পরিচারিকা,* ভাদ্র, ১২৯৮ বঃ, পৃ ১০৫
১১৭। 'আমাদের জাতীয় জীবনে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব', *অন্তঃপুর,* মাঘ, ১৩১০ বঃ, পৃ ২২৮
১১৮। 'পুরাতন ও অধুনাতন স্ত্রীশিক্ষা', *পরিচারিকা,* কার্তিক, ১২৮৬ বঃ, পৃ ১২৮
১১৯। *বঙ্গমহিলা,* চৈত্র, ১২৮২ বঃ, পৃ ২৮৫-২৮৬
১২০। *কল্যাণ প্রদীপ,* (কলকাতা, ১৩৩৫ বঃ), পৃ ৯৫-৯৬
মোক্ষদা দেবীর জন্ম ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি বইটির 'ভূমিকা'য় বলেছেন যে বইটির প্রকাশকালে তাঁর বয়স ৮০ বছর ছিল। অর্থাৎ তাঁর জন্ম ১২৫৫ বঙ্গাব্দে। দ্র. ঐ
১২১। 'আমাদের গৃহে অন্তঃপুরশিক্ষা ও তাহার সংস্কার', *প্রদীপ,* ভাদ্র, ১৩০৬ বঃ, পৃ ৩১৪-৩১৬
১২২। 'স্ত্রী শিক্ষার প্রতি গবর্ণমেন্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য', *ভারত সংস্কারক,* ১৯শে পৌষ, ১২৮০ বঃ, পৃ ৪৩৬

১২৩। *অন্তঃপুর,* জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩০৬ বঃ, পৃ ৭৩
১২৪। 'কি কি উপায়ে এদেশের উন্নতি হইতে পারে', *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,* ফাল্গুন, ১৭৮৩ শকাব্দ, পৃ ১৮১
১২৫। 'এ দৃশ্য অসহ্য', *পরিচারিকা,* আষাঢ়, ১২৮৬ বঃ, পৃ ৩৯
১২৬। 'প্রকৃত স্ত্রী শিক্ষা', *পরিচারিকা,* মাঘ, ১২৮৭ বঃ, পৃ ১৯৫।
১২৭। 'স্ত্রী শিক্ষা প্রণালী' *বামাবোধিনী পত্রিকা,* জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০ বঃ, পৃ ৫৫
১২৮। 'স্ত্রীশিক্ষা' *বঙ্গমহিলা,* ভাদ্র, ১২৮২ বঃ, পৃ ১০০
১২৯। *বামাবোধিনী পত্রিকা,* আশ্বিন, ১২৯৮ বঃ, পৃ ১৭৪
১৩০। 'স্ত্রীলোকদিগেব বিদ্যাশিক্ষার সহিত ধর্ম—শিক্ষার আবশ্যকতা', *বামাবোধিনী পত্রিকা,* জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৭ বঃ, পৃ ৩১
১৩১। 'স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে দুই এক কথা', *বামাবোধিনী পত্রিকা,* অগ্রহায়ণ, ১২৯১ বঃ, পৃ ২৬০
১৩২। 'গৃহধর্ম', *অন্তঃপুর,* মে - জুন, ১৮৯৯, পৃ ৬৯
১৩৩। 'স্ত্রী জাতির বিশেষ শিক্ষা', *বামাবোধিনী পত্রিকা,* শ্রাবণ, ১২৭৯ বঃ, পৃ ১০০
১৩৪। 'স্ত্রী ও পুরুষের শিক্ষা প্রণালী একরূপ হওয়া উচিত কি না', *পরিচারিকা,* ফাল্গুন, ১২৮৭ বঃ, পৃ ২৩৪-২৩৫
১৩৫। ঐ, ২৩৬
১৩৬। 'উচ্চশ্রেণীর স্ত্রী শিক্ষা এবং ভিকটোবিযা কলেজ', *পবিচারিকা,* শ্রাবণ, ১২৯৭ বঃ, পৃ ৮০
১৩৭। 'স্ত্রী শিক্ষা প্রণালী', *বামাবোধিনী পত্রিকা,* আষাঢ় ১২৮০ বঃ পৃ ৭৯।
১৩৮। *পরিচারিকা,* শ্রাবণ, ১২৯৩ বঃ, পৃ ৭৭-৭৯
১৩৯। 'স্ত্রীস্বাধীনতা ও শিক্ষা', *বেদব্যাস,*অগ্রহায়ণ, ১২৯৭ বঃ, পৃ ১৭৭-১৭৮
১৪০। সদানন্দ তর্কচঞ্চু, 'সমাজ সমন্বয়', *নব্যভাবত,* আষাঢ়, ১২৯১ বঃ, পৃ ১২৮
১৪১। ঐ, ১২৯
১৪২। 'নারী কি নবের সমকক্ষ ?' *মহিলা,* ভাদ্র, ১৩১০ বঃ, পৃ ৪৩-৪৪
১৪৩। 'সুগৃহিণী', *মহিলা,* মাঘ, ১৩১০ বঃ, পৃ ১৮৮
১৪৪। মেয়েবা যে বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক শ্রমের পক্ষে উপযুক্ত নয়, এ ধরনেব মনোভাব রক্ষণশীলদের মনে দীর্ঘদিন পর্যন্ত বদ্ধমূল ছিল। এটি বুঝতে পারি একটি পরোক্ষ প্রমাণের সাহায্যে। রামমোহন রায় লিখেছিলেন : 'স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পবীক্ষা কোনকালে লইযাছেন যে অনায়াসেই তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন ? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়। আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয, ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন ?' দ্র. *রামমোহন রচনাবলী* (হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮০ বঃ), পৃ ২০২। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, স্ত্রীশিক্ষার বিরোধীবা মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন।
১৪৫। 'স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী', *পরিচারিকা,* বৈশাখ, ১২৮৯ বঃ, পৃ ১২
১৪৬। *পরিচারিকা,* মাঘ, ১২৮৭ বঃ, পৃ ১৯৫
১৪৭। *মহিলা,* ভাদ্র, ১৩১০ বঃ, পৃ ৪৪
১৪৮। 'বেণীবাবুর পরিবর্তন', *পরিচারিকা,* আশ্বিন, ১২৮৯ বঃ, পৃ ১৩৫
১৪৯। 'নারী জাতির কিরূপ শিক্ষা হওয়া উচিত', *মহিলা,* মাঘ, ১৩০৪ বঃ, পৃ ১৬৬
১৫০। 'প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা', *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,* চৈত্র, ১৮০২ শক, পৃ ২২৯
১৫১। ঐ, ২৩০।
১৫২। 'নারীজাতির শিক্ষা', *ভারত-মহিলা,* আষাঢ় ১৩১৪ বঃ, পৃ ৪৯-৫০
১৫৩। 'স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসা শিক্ষা', *বামাবোধিনী পত্রিকা,* মাঘ ১২৯৪ বঃ পৃ ২৯৫, বা

বসন্তকুমারী বসু, *নারী জীবনের কর্তব্য,* (কলকাতা, ১৩১৯ বঃ), পৃ ৩২

১৫৪। *জ্ঞানাঙ্কুর,* আশ্বিন, ১২৮২ বঃ, পৃ ৫২৬ ; *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,* অগ্রহায়ণ, ১৮০০ শক, পৃ ১৫৭ ; 'স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দুই এক কথা', *বামাবোধিনী পত্রিকা,* অগ্রহায়ণ, ১২৯১ বঃ, পৃ ২৫৯-২৬০, 'আমাদের জাতীয় জীবনে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব', *অন্তঃপুর,* মাঘ, ১৩১০ বঃ, পৃ ২২৯ ; 'বিবি আর বউ', *বান্ধব,* অগ্রহায়ণ, ১২৮১ বঃ, পৃ ১৪৫ ; 'স্ত্রীশিক্ষার অন্তরায় ও তদ্দূরীকরণের উপায়', *অন্তঃপুর,* বৈশাখ, ১৩১১ বঃ, পৃ ১৮ ; 'স্ত্রীশিক্ষার ফল', *মহিলা,* ফাল্গুন, ১৩১১ বঃ, পৃ ২২১-২২২ ; 'শিক্ষিতা বঙ্গমহিলা', *পরিচারিকা,* ভাদ্র, ১২৯৮ বঃ, পৃ ১৩৫ ; 'মেয়েদের নীতি শিক্ষা', *বামাবোধিনী পত্রিকা,* আশ্বিন, ১২৯৮ বঃ, পৃ ১৭৩, প্রভৃতি

১৫৫। *পরিচারিকা,* ফাল্গুন, ১২৮৭ বঃ, পৃ ২৩৪

১৫৬। *অন্তঃপুর,* মাঘ, ১৩১০ বঃ, পৃ ২২৮

১৫৭। 'স্ত্রীগণের ধর্মহীন শিক্ষা সমুচিত কি না', *বামাবোধিনী পত্রিকা,* বৈশাখ, ১২৮০ বঃ, পৃ ৪-৫

১৫৮। 'স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতা', *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,* অগ্রহায়ণ, ১৮০০ শক, পৃ ১৫৯

১৫৯। মৃন্ময়ী সেন, 'ভারত মহিলার শিক্ষা', *অন্তঃপুর,* ভাদ্র, ১৩০৯ বঃ, পৃ ৯২

১৬০। *বসন্তক,* ২য় পর্ব, ৯ম সংখ্যা, ১২৮১ - ১২৮২ বঃ, পৃ ১১২

১৬১। *দীনবন্ধু রচনাবলী* (সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৮১), পৃ ১২৮
গোলাম মুরশিদের মতে, এই মন্তব্যটি এতো 'ক্যাজুয়াল' (casual) যে, একে সেকেলে মনোভাবের অকৃত্রিম দলিল হিসেবে অবশ্যই মনে করা যেতে পারে। দ্র. গোলাম মুরশিদ, *সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক* (ঢাকা,১৯৮৪), পৃ ২৯৮

১৬২। *বামাবোধিনী পত্রিকা,* আশ্বিন, ১২৯৮ বঃ, পৃ ১৭৪

১৬৩। *বঙ্গীয় মহিলা,* (কলকাতা, প্রকাশ সন অজ্ঞাত), পৃ ৪৯

১৬৪। *বঙ্গমহিলা,* ভাদ্র, ১২৮২ বঃ, পৃ ১০০ ;
বসন্তক পত্রিকায় 'নসিরামের মেলা' গল্পে পরীক্ষক বিদ্যালযের ছাত্রীকে জিজ্ঞাসা করছেন 'বিদ্যানুশীলন কাকে বলে ?' ছাত্রী উত্তর দিচ্ছে : 'কেতাব পড়া, মাসিক পত্রিকা পড়া, কার্পেট বোনা', ঐ গল্পেই পরীক্ষক যখন জানতে চাইলেন 'আহার কোরে কি করবে ?' ছাত্রী উত্তর দিয়েছে, 'কার্পেট বুনব'। দ্র. *বসন্তক,* ২য় পর্ব, ৯ম সংখ্যা, ১২৮১ - ১২৮২ বঃ, পৃ ১১১

১৬৫। *অন্তঃপুর,* মাঘ, ১৩১০ বঃ, পৃ ২২৮

১৬৬। *পরিচারিকা,* ভাদ্র, ১২৯৮ বঃ, ১১০

১৬৭। 'হিন্দু রমণীগণের অবস্থা ও শিক্ষা', *জন্মভূমি,* মাঘ, ১৩০১ বঃ, ১৩৪

১৬৮। *পরিচারিকা,* চৈত্র, ১২৮৭ বঃ, পৃ ২৪৯

১৬৯। 'স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতা', *সমাজ-দীপিকা,* ভাদ্র, ১২৯২ বঃ, পৃ ৭৫

১৭০। ঐ, ৮২।

১৭১। স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছিল : 'শিক্ষা দেওয়ার অর্থে কি তাঁহারা বড়িতে বড়ি ঢাকিয়া, মোজা জুতা পায় দিয়া, গাড়ী চড়িয়া, শিক্ষকের মুখে স্বরের অ, স্বরের আ, হইতে সায়েন্স (Science) এম.এ. পর্য্যন্ত, এই বুঝেন ?'
ঐ, ৭৪

১৭২। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, 'মডেল ভগিনী', (প্রথম প্রকাশ ১২৯৩ বঃ), *যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), (কলকাতা, ১৯৭৬), পৃ ১৬১

১৭৩। কমলিনী তার ইংরেজি শিক্ষক নগেনকে লিখছে : 'আমি আপনাকে গুরুর মত দেখি। এ নারী জন্মের আপনিই আমার শিক্ষক। . . . আমি আপনার রূপ কল্পনা করিয়া, আপনার মূর্ত্তি গড়িয়া, হৃদয়-রাজ্যে বসাইব। সেই মূর্ত্তিকেই গুরুদেব বলিয়া প্রণাম

করিয়া, আমি শেলী পাঠ আরম্ভ করিব।' আবার, কমলিনী ডাক্তার মহেন্দ্রকে লিখছে: 'আপনিই এ জগতে আমার একমাত্র পরম বন্ধু। প্রকৃত শান্তি, সুখ,স্বাচ্ছন্দ আপনিই আমাকে প্রদান করিলেন। কিন্তু এরূপ অনুগ্রহ দৃষ্টি চিরদিন থাকিবে কি ? ভগবন। আমায় অভয় দিন।'
ঐ, ১৬৪-১৬৫

১৭৪। প্রবাসিনী দেবী, 'দৈবের তামাশা', *অন্তঃপুর,* আষাঢ়, ১৩০৯ বঃ, পৃ ৫৪

১৭৫। যেমন, গল্পের চরিত্র অনুপমা তার বন্ধু আভার সম্বন্ধে আভার স্বামীকে জিজ্ঞেস করছে, 'অনসূয়া কেমন আছেন ? তাঁহার সহিত আপনার পরিণয়ের পর তাঁহাকে আমি আজ কতদিন হইল দেখি নাই ! ! আহা ! কোথায় আমাদের সেই পবিত্র প্রমোদময় সময়, সেই সুখের সাহচর্য্য ! আহা কোথায় সেই পুণ্যভূমি বিদ্যালয়ের তপোবন এখন !' এরপর অনুপমা বাংলার পরিবর্তে প্রাকৃত ভাষায় কথোপকথন শুরু করেছে। তাবপর সে জর্জ ইলিয়ট ও বীকনসফীল্ডের অনেকগুলি 'নবেল উদরস্থ ও অভিনয়' করল। শুধু তাই নয়, অনুপমা *স্বর্ণলতা* পাঠ কবে এত অনুপ্রাণিত যে সকালবেলায় সে চা খেতে পর্যন্ত রাজি নয়।
জন্মভূমি, ফাল্গুন, ১২৯৮ বঃ, পৃ ১৯৫-১৯৮

১৭৬। *অমৃতলাল গ্রন্থাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), (বসুমতী সাহিত্য মন্দির সংস্করণ, কলকাতা), পৃ ১৫-১৬

১৭৭। দুর্গাদাস দে, *ছবি,* (কলকাতা, ১৮৯৬) পৃ ৪

১৭৮। *নভেল নায়িকা বা শিক্ষিতা বৌ* (কলকাতা, লেখক ও প্রকাশ সন অজ্ঞাত) পৃ ৯

১৭৯। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, বাঙ্গালী চরিত (১২৯২ বঃ), *যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বচনাবলী,* (প্রথম খণ্ড), (কলকাতা, ১৯৭৬), পৃ ১৪৪

১৮০। ঐ, ৩৯০-৩৯১

১৮১। *অমৃতলাল গ্রন্থাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), (পূর্বোক্ত) পৃ ১১

১৮২। অমৃতলাল গুপ্ত, 'দেবী', *ভারত-মহিলা,* অগ্রহায়ণ, ১৩১২ বঃ, পৃ ৮১

১৮৩। অমৃতলাল গুপ্ত, *পুণ্যবতী নারী,* (কলকাতা,১৯২৩), পৃ ১৬

১৮৪। দুর্গাদাস দে, *ল-বাবু* (কলকাতা, ১৩১০ বঃ), পৃ ৩২

১৮৫। তারকনাথ বিশ্বাস, *বঙ্গীয় মহিলা অর্থাৎ নারীজাতির শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব,* (কলকাতা, ১২৯২ বঃ), পৃ ৩৫

১৮৬। Malavika Karlekar, *Voices from Within : Early Personal Narratives of Bengali Women (1991,)* (Delhi, 1993), p. 74
স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল মেয়েদের মধ্যে পারিবারিক শৃঙ্খলার জন্য প্রয়োজনীয় গুণগুলির বিকাশ ঘটানো। ভিন্ন প্রসঙ্গে হলেও দ্র. Partha Chatterjee, 'Nationalist Resolution of the Women's Question in Kumkum Sangari and Sudesh Vaid (ed), *Recasting Women : Essays in Colonial History,* (New Delhi, 1989), p. 247

১৮৭। *বামাবোধিনী পত্রিকা,* কার্তিক, ১২৯০ বঃ, পৃ ২২২ - ২২৩

১৮৮। 'আর্য্য নারীকুলের উন্নতি', *পরিচারিকা,* জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৬ বঃ, পৃ ১৮

১৮৯। 'স্ত্রী গণের পরীক্ষা বিষয়ে নিয়মাবলী', *পরিচারিকা,* শ্রাবণ, ১২৮৯ বঃ, পৃ ৯৫-৯৬

১৯০। *বামাবোধিনী পত্রিকা,* পৌষ, ১২৯৮ বঃ, ২৮০

১৯১। *বামাবোধিনী পত্রিকা,* বৈশাখ, ১২৮০ বঃ, ৫

১৯২। সারদা প্রসাদ হাজরা চৌধুরী, *সংস্কার-ধর্ম্ম ও বিষয় কর্ম্ম* (প্রথম খণ্ড), (কলকাতা, ১৩১৩ বঃ), পৃ ৪০

১৯৩। *বামাবোধিনী পত্রিকা,* আষাঢ়, ১২৮০ বঃ, পৃ ৭৮-৭৯

৩

দাম্পত্য-ভাবনা

'এইরূপে চারু তাহার সমস্ত ঘরকন্না তাহার সমস্ত কর্তব্যের অন্তঃস্তরের তলদেশে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া সেই নিরালোকে নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে অশ্রুমালা সজ্জিত একটি গোপন শোকের মন্দির নির্মাণ করিয়া রাখিল। সেখানে তাহার স্বামীর বা পৃথিবীর আর-কাহারও কোন অধিকার রহিল না। সেই স্থানটুকু যেমন গোপনতম, তেমনি গভীরতম, তেমনি প্রিয়তম। তাহারই দ্বারে সে সংসারের সমস্ত ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজের অনাবৃত আত্মস্বরূপে প্রবেশ কবে এবং সেখান হইতে বাহির হইয়া মুখোশখানা আবার মুখে দিয়া পৃথিবীর হাস্যালাপ ও ক্রিয়াকর্মের রঙ্গভূমির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়।' —'নষ্টনীড়'

নষ্টনীড় গল্পটির প্রকাশ বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮ বঙ্গাব্দে। ইংরেজি বর্ষগণনার হিসাবে সেটি বর্তমান শতকের সূচনাকাল। রবীন্দ্রনাথ তখন সদ্য চল্লিশের কোঠায় পা দিয়েছেন। বর্তমান আলোচনার সময়সীমা উনবিংশ শতাব্দী, এবং এর কুশীলবরাও গত শতকের। রচনার তারিখ যা-ই হোক-না-কেন, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে চাবুলতা গত শতকের নাযিকা। চারুলতার চরিত্র সৃষ্টির সময়ে রবীন্দ্রনাথের সামনে ছিল গত শতকের নাযিকারাই। বিত্তবান পরিবারের বধূদের প্রতিভূ হিসাবে চারুর ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্যক পরিচয় ছিল। চারুলতা চরিত্রটি বোধহয় ঠাকুরবাড়ির কনিষ্ঠ তনয়ের পুরোপুরি মানস-কল্পনা নয়। চারুকে তিনি লক্ষ করেছিলেন। অন্দরমহলের মেয়েদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ অনুভব করেছিলেন অন্তঃপুরের একটি বিশেষ দিক—স্বচ্ছলতার আড়ালে মুখ লুকিয়ে থাকা অনির্দিষ্ট এক অভাববোধ, যা সে যুগের বহু ব্যক্তিরই নজর এড়িয়ে গিয়েছিল। 'নষ্টনীড়' গল্পের ভূপতিও এর কোন খোঁজ রাখত না।

এই আলোচনাব নায়িকারা অসূর্যম্পশ্যা নয়, তবে সূর্যের খর রৌদ্র যে খুব প্রবলভাবে চিকের আড়ালে প্রবেশ করেছে, তা-ও বলা যাবে না। উনিশ শতকের অন্তঃপুরেরই এ একটি বিশেষ দিক। বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল সমাজে নর-নারীর জীবনের একান্ত অন্তরঙ্গ ঘাত-প্রতিঘাতের একটি দিক আমরা আলোচনার চেষ্টা করব। ইংরেজদের আগমনের ফলে বাঙালি সমাজে যে কটি পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল, তার অন্যতম ছিল অন্তঃপুর সম্বন্ধে নতুন ধারণা। যে চিন্তাধারা পাশ্চাত্য শিক্ষাদর্শের মাধ্যমে বাংলাদেশের অচলায়তন সমাজের বুকে আছড়ে পড়েছিল, তার অনিবার্য ফল এই নতুন ভাবাদর্শ। গত শতকের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সাহিত্যের মুখ্য একটি আলোচ্য বিষয়ই ছিল নর-নারীর সম্পর্ক। সেই উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এই বিষয়ে কয়েকজন মহিলার রচনাও আমাদের উপরি-পাওনা। ফলে, শুধুমাত্র সরকারি-ফাইলবন্দী কাগজপত্র যা লেখ্যাগারে সঞ্চিত হয়ে পেশাদারি ঐতিহাসিকের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তার অতিরিক্ত কিছু উপকরণ আমাদের হাতে আছে। আবার, বাড়তি অসুবিধা হল—উপাদান হিসাবে

যা ব্যবহৃত হবে তার সবটাই ব্যক্তিগত রচনা। তাই প্রথাসিদ্ধ ঐতিহাসিক 'দলিলের' তথাকথিত নিরপেক্ষতা সব সময়ে মেলে না। অনেক ক্ষেত্রেই তা হয় লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় সীমাবদ্ধ, নয় তো তারই আদর্শ আর বিশ্বাসের রঙে রঙিন। তাছাড়া, এ আলোচনার কালানুক্রম নেই, তথ্য কয়েক ক্ষেত্রে অনুমান-নির্ভর এবং সেই তথ্যসঞ্জাত সিদ্ধান্ত অভিব্যাপ্তি-দোষে দুষ্ট। তবে আমাদের অনুসৃত পদ্ধতির ক্ষেত্রে বোধহয় এসবই অনিবার্য। কারণ, একটা গোটা শতক জুড়ে দুটি মানুষের সবচেয়ে নিভৃত সম্পর্কের ছবি আঁকার কোন সংখ্যাতাত্ত্বিক বা কালানুক্রমিক ভিত্তি নেই, এবং থাকতেও পারে না। আর মনের কথার সবটুকু কে কবে ভাষায় প্রকাশ করতে পেরেছে?

॥ এক ॥

বাংলা সাহিত্যের যে-কোন মনস্ক পাঠকের পক্ষে এ-রকম মনে হওয়া হয়ত অসংগত নয় যে, বাঙালি-জীবনে 'দাম্পত্য' সম্পর্ক বলতে যা বোঝায়, উনবিংশ শতাব্দীর আগে তার অস্তিত্ব খুব ক্ষীণ ছিল। অবশ্য এখানে মনে রাখা দরকার যে দাম্পত্যবোধ সম্পর্কে ধারণাও যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। সুতরাং বিংশ শতাব্দীর শেষ-পদের ধ্যান-ধারণার আলোকে অতীতের মানসিকতাকে বিচার করা সুপ্রযুক্ত নয়, এবং তাতে কালানৌচিত্য দোষ ঘটারও সম্ভাবনা থাকে। তবু, আলোচ্য বিষয়ের বাতাবরণ হিসাবে বাঙালি জীবনে স্বামী-স্ত্রীর চিরাচরিত সম্পর্কের একটি অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় হয়ত উনবিংশ শতকের দাম্পত্য-সম্পর্ক বুঝতে আমাদের সাহায্য করবে।

খুব বেশি পেছনে গিয়ে লাভ নেই। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই আমরা শুরু করতে পারি। অষ্টাদশ শতকে বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে বিখ্যাত কাব্য ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'। ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে[১] রচিত এই কাব্যে আমরা নদীয়া রাজের প্রতিষ্ঠাতা এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের দুই স্ত্রী চন্দ্রমুখী ও পদ্মমুখীর কাহিনী পাই। ভবানন্দ প্রবাস থেকে ফিরে এলে রাত্রিবেলায় তাঁর দুই স্ত্রীই শয্যাসঙ্গী হিসাবে স্বামীকে চায়:

শুনি মজুন্দার বড় উন্মনা হইল।
কার ঘরে আগে যাবে ভাবিতে লাগিল॥
যাইতে ছোটর ঘরে বড় মনোরথ।
বড় কৈলা বাদহাটা আগুলিয়া পথ॥
এক চক্ষু কাতরায়ে ছোট ঘরে যায়॥
আর চক্ষু রাঙা হয়ে বড় জনে চায়॥[২]

প্রায় বাধ্য হয়ে ভবানন্দ বড় বউ-এর কাছে আত্মসমর্পণ করেন:

ছেলেপিলে নিদ্রা গেলা   চন্দ্রমুখী লয়ে খেলা
রাত্রি হইল দ্বিতীয় প্রহর।

যাইতে ছোটর কাছে মনের বাসনা আছে
সমাপিলা বড়র বাসর।[৩]

দ্বিপত্নীক স্বামীর দোলাচলচিত্ততার এ এক নিখুঁত বর্ণনা। একই রাতে একাধিক স্ত্রীতে উপগত স্বামীর সঙ্গে তার স্ত্রীদের আর যাই হোক, 'দাম্পত্য' সম্পর্ক বলতে যা বোঝায়, তা গড়ে ওঠে না।

কিন্তু সব পরিবার সম্বন্ধেই এ বর্ণনা সত্য ছিল, এমন মনে করার অবশ্যই কোন কারণ নেই। দুই স্ত্রী ভবণ-পোষণের সামর্থ্য সব স্বামীর ছিল না। তবে বাল্যবিবাহ ছিল ভদ্রসমাজের সর্বত্র বহুলপ্রচলিত, বহুবিবাহকারী পুরুষের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। এই সব প্রথা পুরুষ ও নারীর মধ্যে অব্যভিচারী দাম্পত্য-সম্পর্ক গড়ে তোলার পথে প্রায়ই অন্তরায়স্বরূপ হয়ে উঠত। একটা প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠতে পারে,—চিরাচরিত বাঙালি সমাজে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কী ধরনের সম্পর্ক ছিল? দাম্পত্য-সম্পর্কের দুটো প্রচলিত নমুনা (যাকে পরিভাষায় বলে 'প্রোটোটাইপ') ছিল : রাম-সীতা এবং কালকেতু-ফুল্লরা। রাম-সীতার গল্প বাঙালি সমাজে বহুল প্রচলিত হলেও ঠিক সেই আদর্শ বাস্তব জীবনে বোধ হয় বহুলভাবে রূপায়িত হয়নি। বরং ফুল্লরার বারমাস্যা সে তুলনায় সাধারণ জীবনের আরও কাছাকাছি। কিন্তু ফুল্লরার বারোমাসের সেই নিরবচ্ছিন্ন দুঃখকষ্ট আর টিঁকে থাকার লড়াই-এর মধ্য দিয়ে স্ত্রীর মনের সম্পর্কটি খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন, হয়তো বা অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক চিরাচরিত বাংলা সাহিত্যে ততটা প্রতিফলিত হয় নি। বোধহয দাম্পত্য-সম্পর্ক নিয়ে তেমন কোন চিন্তা-ভাবনাই প্রাক্-আধুনিক বাঙালি সমাজে বা সাহিত্যে ছিল না।

সাহিত্য-ঐতিহাসিকদের কাল বিভাজন অনুযায়ী মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অবসান ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর (১৭৬০) সঙ্গে-সঙ্গে হয়েছিল। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের জন্য অপেক্ষা করতে হয় আবও সত্তর-বাহাত্তর বছর ; মধ্যবর্তী সময় অপেক্ষাকৃত গৌণ কবি বা কবিওয়ালাদের যুগ।[৪] এই মধ্যবর্তী পর্যায়ের কবিওয়ালারা তাঁদের বিষয়বস্তু হিসাবে শাক্ত, পৌরাণিক, বৈষ্ণব বা শাক্ত সাহিত্যের বিভিন্ন ভাবধারা ও তাদের সঙ্গ-অনুষঙ্গকে বেছে নিয়েছিলেন। ফলে আমরা তেমন সমাজ-সচেতন বা সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলক সাহিত্যের পরিচয় পাই না। ভারতচন্দ্র বা এইসব গৌণ কবিদের রচনা থেকে টুকরো-টুকরো যে-সব ছবি ভেসে ওঠে, তার সাক্ষ্যে আমরা অষ্টাদশ শতকের শেষে বা উনবিংশ শতকের গোড়ায় নরনারীর সম্পর্ক সম্বন্ধে অত্যন্ত অস্পষ্ট একটা ধারণা করতে পারি। গদ্য সাহিত্য গড়ে ওঠার আগে এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার কোন উপায় নেই।

আমার স্বামীরে লয়ে মানুষ করিয়া।
আনন্দে রাখিলা তারে তিন নারী দিয়া॥
স্বামী হীনা আমি ফিরি কান্দিয়া কান্দিয়া।
এত দুঃখ দেহ মোরে কিসের লাগিয়া॥
আপনিত জান স্ত্রীলোকের ব্যবহার।
সতিনী হইলে পতি বড়ই প্রহার॥

বরঞ্চ শমনে লয় তাহা সহে গায়।
সতিনী লইলে স্বামী সহা নাহি যায় ॥[৫]

সেই সময়ে বহুবিবাহ একটি বহু প্রচলিত প্রথা ছিল। ফলে, যেখানে 'সতিনী লইলে পতি বড়ই প্রহার,' সেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেমন সম্পর্ক দাঁড়াত, তা অনুমান করা খুব কষ্টকর নয়।

অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে কলকাতায় শোভাবাজারের রাজবাটী, কলুটোলার শীলেরা, বাগবাজারের বসুরা, হাটখোলার দত্তরা বা দর্জিপাড়াব মিত্ররা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে জনপ্রিয় লোকপ্রমোদ-মাধ্যম হিসেবে কবিগানের পৃষ্ঠপোষকতা করলেও কবিদের আখড়া গজিয়ে উঠেছিল আরও আগে গঙ্গার দু-কূল বরাবর কাশিমবাজার, হুগলী, চন্দননগর, চুচুঁড়া, শ্রীরামপুর, সপ্তগ্রাম, সিউড়ি প্রভৃতি স্থানে।[৬] এই কবিয়ালরা প্রধান উপজীব্য হিসেবে বৈষ্ণব বা শাক্ত পদাবলীর বিষয় গ্রহণ করলেও শ্রোতৃবৃন্দের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন তাঁদের কবিগানে একেবারে ঘটেনি এমন হতে পারে না। বাধা বা কৃষ্ণের মুখে কখনো কি স্থান পায়নি সামাজিক নর-নারীর ব্যক্তিগত অনুভূতি?
রাসু-নৃসিংহেব নায়িকা যখন প্রেমের আর্তি জানিয়ে বলে :

কহ সখি কিছু প্রেমেরি কথা
ঘুচাও আমারো মনেরো ব্যথা
করিলে শ্রবণো, হয দিব্যজ্ঞানো,
হেন প্রেমধনো, উপজে কোথা।[৭]

তখন আমরা অলৌকিক রাধার বদলে লৌকিক মানবীর মনের কথাই পড়ি। কিংবা বিখ্যাত কবিয়াল রাম বসুর :

আজ শুনলাম সই
প্রাণনাথের প্রাণনাথ আছে একজন। . . .
নতুন কুমুদ পেয়ে সুখে
আমোদ করেন তিনি
আমার প্রাণ চকোবের হোলো হুতাসে মরণ।[৮]

এও তো সেই গৃহের একাকিনী গৃহবাসিনী রমণীর খেদোক্তি। পড়লেই বোঝা যায়, এটি স্বামীর ঔদাসীন্য সম্বন্ধে কোন স্ত্রীর বিলাপ এবং বাংলাদেশের তৎকালীন পারিবারিক বাস্তবতার মধ্যেই এ ধরনের আক্ষেপের উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। হয় সপত্নীভীতি নয় তো পরদারাসক্তি সে যুগের দাম্পত্য-সম্পর্ক বিকাশের ক্ষেত্রকে উষর করে তুলেছিল। অনিবার্যভাবে তাই সেই যুগের বহু গানে নায়িকার মুখে ভীড় করেছে এমন সব কথা সামাজিক পরিস্থিতিতে যার মূল প্রোথিত ছিল।

হোলো তো এই সুখ, সতীত্ব রাখায়।
ভূপতি ধর্মহীন, স্বপতি পরাধীন,
যুবতী কার কাছে প্রাণ জুড়ায়, . . .[৯]

এক মহিলা কবিওয়ালার রচনায় আরও স্পষ্ট করে নারীমনের পরিচয় পাই। যজ্ঞেশ্বরী ছিলেন রাম বসুর সমসাময়িক। যেহেতু মহিলার রচনা, পতি-বিরহিণী নারীর মনোবেদনার পরিচয়টুকু তাই আরও অন্তরঙ্গ :

আমি কুলবতী নারী,
পতি বই আর জানি নে,
এখন অধিনী বলিয়ে ফিরে নাহি চাও,
ঘরের ধন ফেলে প্রাণ—
পরের ধন আগুলে বেড়াও।
নাহি চেন ঘর বাসা, কি বসন্ত কি বরষা।
সতীরে করে নিরাশা অসতীর আশা পুরাও।[১০]

শুধু মনোবেদনাই নয়, উপেক্ষিতার যৌবনের জ্বালাও কি কম ?

তিনি প্রাণ লয়ে হে হলেন স্বতন্তর,
মদন তা বুঝে না, বল্‌লে শুনে না,
আমার ঠাঁই চাহে রাজকর।[১১]

বারবার বিভিন্ন কবিগানে স্বামী-উপেক্ষিতা স্ত্রীর এই পুনরাবৃত্ত হতাশ্বাস থেকে স্বতঃই মনে হয় যে সমসাময়িক সমাজে নিশ্চয়ই এর সত্যতা স্বীকৃত ছিল, নইলে এত দীর্ঘদিন কবিগানের এত জনপ্রিয়তা থাকত না। আর, তাই-ই যদি হয়, তবে অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ বা উনিশ শতকের প্রথম ভাগে (এই কবিওয়ালাদের অনেকেরই জন্ম অষ্টাদশ শতকের শেষে এবং পরবর্তী শতাব্দীর এক-পাদ পর্যন্ত অনেকেরই জীবৎকাল প্রসৃত) দাম্পত্য জীবনের খুব সুখী চিত্র আমাদের সামনে ভেসে ওঠে না। স্বামী-স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের পরিবর্তে আমরা বারবার পড়ি স্ত্রীর দুঃসহ একাকিত্বের আক্ষেপ। এমনকি, অপ্রধান কবিওয়ালদের রচনাতেও এই সুর ধরা পড়ে। যেমন, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্যের 'বিরহ' বিষয়ক গানে :

পতির বিচ্ছেদে প্রাণ সই,
অধৈর্য হলে কি হবে।
থাক নাথেরে ভাবিয়ে আশাপথ চাহিয়ে,
আমি যার জ্বালা সেই তোমার জুড়াবে।

পুজ বিল্বদলে সতীশঙ্করে,
ঘুচিবে পতির দুখ, হেরিবে পতির মুখ,
জুড়াবে তাপিত অন্তরে।[১২]

শুধু কবিগান নয়, আমরা সমসাময়িক আরও একজন সঙ্গীত রচয়িতার গানে দাম্পত্য বা নর-নারীর সম্পর্কের কোন ছবি বেরিয়ে আসে, তা অনুসন্ধান করতে পারি। রামনিধি গুপ্ত (জন্ম, ১৭৪১) বাংলার সঙ্গীতজগতে নিধুবাবু নামে সমধিক খ্যাত। তাঁর রচিত টপ্পা আঙ্গিকের গান সে যুগে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।[১৩] নিধুবাবুর গানে অধিনী বা অধিনীজন-এর বিরহ-বেদনা বিস্ময়কর সারল্যে প্রতিফলিত হয়েছে। নিধুবাবু প্রচুর প্রেমের গান লিখেছেন, কিন্তু যা সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য তা হল এই যে প্রেমের গান লিখতে বসে তিনি রাম-কৃষ্ণের চিরাচরিত কাহিনী বা ভাবের আশ্রয় নেননি। এ বিষয়ে রমাকান্ত চক্রবর্তী লিখেছেন, 'নিধুবাবুর গানের বিবাহবিচ্ছেদজাত দুঃখ ছিল বাস্তব ও সামাজিক। . . . যে সমাজ বহু পত্নীক পুরুষকে অনুমোদন দেয়, সেখানে স্বভাবতই প্রত্যাখ্যাতা ও অবহেলিতা পত্নীদের বিচ্ছেদবেদনা সামাজিক বাস্তব অবস্থারই প্রতিচিত্রণ।[১৪] *গীতরত্ন*- তে সঙ্কলিত অনেক গানে 'প্রত্যাখ্যাতা ও অবহেলিতা পত্নীদের' মনোবেদনার স্বরূপ ফুটে ওঠে।[১৫]

যে বিরহানলে প্রজ্বলিত অবহেলিতা পত্নীর ছবি এখানে বাববার আঁকা হয়, সে প্রোষিতভর্তৃকাই হোক আব 'খণ্ডিতা'ই হোক, একটা জিনিস স্পষ্ট যে সমসাময়িক সমাজে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হত খুব কম। স্ত্রী যখন অভিমান করে বলে :

গণিতে গণিতে তারা, প্রকাশিল সুখ তাবা,
আমার নয়নতারা সহিত বারি।
প্রভাতে আসিয়ে কেন করিতেছ জ্বালাতন,
যাও ছিলে যার পুরী[১৬]

তখন মনোবেদনার কারণটা সুস্পষ্ট হয়ে আসে। পৌনঃপুনিক এই নৈরাশ্যবেদনার চিত্রকল্পের শিকড়টি যে রয়ে গিয়েছিল সেই কালের খণ্ড-দাম্পত্যের অভিশপ্ত ব্যবস্থার মধ্যে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

॥ দুই ॥

অবশ্য এটাও মানতে হবে যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য-সম্পর্ক গড়ে ওঠার পক্ষে অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থাও উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ছিল-না। সারাদিনে স্বামী-স্ত্রীর দেখা হত না। এর কারণ কিন্তু স্বামীর কর্মব্যস্ততা কিংবা সচেতন অবহেলা নয়। সে যুগের সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধে স্বামী-স্ত্রীর দিবালোকে সাক্ষাৎ হওয়া অত্যন্ত গর্হিত বলে বিবেচিত হত। রেভঃ লালবিহারী দে লিখেছিলেন, '. . . এতদ্দেশীয় বামাগণ রজনী ব্যতীত ভর্ত্তার সহিত নিশ্চিন্তে কথা কহিবার আর সুযোগ পান না। দিবসে পাকাদি ও

গৃহকার্য্যে নিযুক্তা থাকেন আর অবসর পাইলেও লজ্জা-প্রযুক্তা স্বামীর সহিত একত্রে বসেন না ও অধিক কথাও কহেন না। যে তরুণী দিবাভাগে পতির সহিত কথোপকথন করেন তাহাকে প্রতিবাসীরা বিশেষত স্থবিরাগণ শিথিলা কহেন।'[১৭] সুতরাং পরস্পরের দেখা-সাক্ষাতের সময় যখন রাত, তখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কী ধরনের দাম্পত্য-প্রণয় গড়ে উঠত তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে দিনের বেলা দেখা হওয়াকে গর্হিত বলে গণ্য করার ঐতিহ্য আরও দীর্ঘ সময় ধরে উনবিংশ শতাব্দীতে অব্যাহত ছিল। গত শতকের তিন চতুর্থাংশ অতিক্রম করার পরও আমরা একটি প্রহসনে পাই যে শাশুড়ী পুত্রবধূকে দিনের বেলা স্বামীর সঙ্গে কথা বলার 'অপরাধে' অপরাধী করে বলছে : 'ও মা। এমন বেহায়া মেয়ে তো আমি বেহ্মাণ্ডে দেখিনি। ও কিনা স্বচ্ছন্দে বসে ভাতারের সঙ্গে গল্প কর্চ্চে ? ও মা কি ঘেন্না। আমার এই তিন কাল গেছে এক কালে ঠেকেছে, তাঁর [স্বামী] সঙ্গে চোকোচোকী কতা কইতে আজও আমার লজ্জা করে। আঁ্যা এ কালে কালে হলো কি। কলি কি না ? কোথা থেকে এক বেবিশ্যের মেয়ে ঘরে এনেছেন . . . লজ্জা সরমের লেশ মাত্তোর নেই।'[১৮]

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে নিকট সম্পর্ক গড়ে ওঠার পক্ষে যে কটি প্রতিকূলতা ছিল, তার মধ্যে বাল্যবিবাহ অন্যতম। উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বাল্যবিবাহ নিয়ে প্রচুর লেখা হয়েছে। তা থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, যে বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হত তা স্বামী-স্ত্রীর প্রকৃত সম্পর্ক অনুধাবনের বয়স নয়। অনেক ক্ষেত্রে স্বামীর বয়স স্ত্রীর তুলনায় ঢের বেশি হত। অন্য সব কিছু ছেড়ে দিলেও, তাদের মানসিক জগতেই ছিল দুস্তর ফারাক। এই প্যার্থক্যটা যে কী গভীর ছিল, তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে গত শতকের বিভিন্ন রচনায়।

বাল্যবিবাহের ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যথার্থ প্রণয়-সম্পর্ক যে থাকতে পারে না এ বিষয়ে সবচেয়ে দৃঢ় মতবাদ ব্যক্ত করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত *সর্বশুভকারী পত্রিকার* প্রথম সংখ্যাতেই বিদ্যাসাগর 'বাল্যবিবাহের দোষ' শীর্ষক রচনাকে আমরা পরিবর্তিত মানসিকতার প্রথম প্রতিফলন হিসাবে গণ্য করতে পারি। এর আগে বাল্যবিবাহের পরিণতি নিয়ে সমাজে সচেতনতা বিশেষ লক্ষ করা যায় না। কৃষ্ণনগরে 'চক্রবর্তী দেওয়ান' পরিবারের কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় (জন্ম, ১৮২০) তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন, 'বাল্যবিবাহের ইষ্টানিষ্ট কিছুই জানিতাম না, তদ্বিষয়ে কোন আন্দোলনও শুনিতে পাইতাম না এবং সকলকেই বালক বালিকার পরিণয়ের জন্য ব্যস্ত দেখিতাম।'[১৯] তবে আন্দোলন শুরু না হলেও অসন্তোষ হয়ত ছিল, বা বাল্যবিবাহের কুফলগুলি আস্তে আস্তে অনুভূত হতে শুরু করেছিল, অবশ্যই প্রথম যুগে তা নজরে পড়েছিল কেবল কয়েকজন অত্যন্ত সমাজমনস্ক ব্যক্তিদেরই। বাল্যবিবাহের শারীরিক, সামাজিক বিভিন্ন দিক নিয়ে পরবর্তী কালে বহু লেখা হলেও, কেবল পারিবারিক জীবনের পক্ষেও যে এই প্রথা অশুভ এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্ক গড়ে ওঠার পথেও যে তা বাধাস্বরূপ, তার দ্ব্যর্থহীন প্রমাণ পাওয়া যায় বিদ্যাসাগরের রচনাতে : 'এই সংসারে দাম্পত্য নিবন্ধন সুখই সর্বাপেক্ষা প্রধান সুখ। এতাদৃশ অকৃত্রিম সুখে বিড়ম্বনা ঘটিলে দম্পতির চিরকাল বিষাদে কালহরণ করিতে হয়। হায়, কি দুঃখের বিষয়। যে পতির প্রণয়ের উপর প্রণয়িণীর সমুদায় সুখ নির্ভর করে, এবং যাহার সচ্চরিত্রে যাবজ্জীবন সুখী

ও অসচ্চরিত্রে যাবজ্জীবন দুঃখী হইতে হইবেক, পরিণয়কালে তাদৃশ পরিণেতার আচার ব্যবহার ও চরিত্র বিষয়ে যদ্যপি কন্যার কোন সম্মতির প্রয়োজন না হইল, তবে সেই দম্পতির সুখের আর কি সম্ভাবনা রহিল।

'মনের ঐক্যই প্রণয়ের মূল। সেই ঐক্য বয়স, অবস্থা, রূপ গুণ, চরিত্র বাহ্যভাব ও আন্তরিক ভাব ইত্যাদি নানা কারণের উপর নির্ভর করে। অস্মদ্দেশীয় বালক দম্পতিরা পরস্পরের আশয় জানিতে পারিল না, অভিপ্রায়ে অবগাহন করিতে অবকাশ পাইল না, আলাপ পরিচয় দ্বারা ইতরেতরের চরিত্র পরীক্ষার কথা দূরে থাকুক, একবার অন্যন্য নয়নসঙ্ঘটনও হইল না, কেবল একজন উদাসীন বাচাল ঘটকের প্রবৃত্তিজনক বৃথা বচনে প্রত্যয় করিয়া পিতামাতার যেরূপ অভিরুচি হয়, কন্যাপুত্রের সেই বিধিই বিধিনিয়োগবৎ সুখ-দুঃখের অনুল্লঙ্ঘনীয় সীমা হইয়া রহিল। এই জন্যই অস্মদ্দেশে দাম্পত্যনিবন্ধন অকপট প্রণয় দৃষ্ট হয় না, কেবল প্রণয়ী ভর্তাস্বরূপ এবং প্রণয়িনী গৃহপরিচারিকাস্বরূপ হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে।'[২০]

উদ্ধৃতি থেকে একটি কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে দাম্পত্য-সম্পর্ক নিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে খুব সামান্য হলেও কয়েকজন ব্যক্তি চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করেছিলেন। পূর্ববর্তী সময়ে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের পরোক্ষ প্রতিফলন ঘটেছে সাহিত্যে— আমরা পড়ি নায়িকার মনোবেদনার কথা, শুনি বিরহযন্ত্রণাব আর্তি। কিন্তু দাম্পত্যও যে মানুষের অনেকগুলি সম্পর্কের অন্যতম, এ নিয়ে গত শতকের মধ্যভাগের আগে কাউকে তেমন চিন্তা করতে আমরা দেখি না। বস্তুতঃ, এ ধরনের চিন্তাভাবনা মূলতঃ পশ্চিমি শিক্ষার ফল। ইংরেজি ভাষায় ব্যুৎপত্তি আমাদের প্রতীচ্যের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পরিচিত ও তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে সাহায্য করেছিল।[২১] বিদেশি নীতি-আদর্শের আলোয় তৎকালীন অনেকেই বিচার করেছেন আমাদের সমাজের বিভিন্ন নিয়মকে। সতীদাহ প্রথা নিবারণ, বহুবিবাহ রদ, স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত প্রভৃতি বড় বড় সামাজিক আন্দোলনের তুলনায় অলক্ষ্যে থেকে অনেকেরই নজর এড়িয়ে গেছে আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন যা সমসাময়িক কালে পশ্চিমি শিক্ষার ফলে পারিবারিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এনেছিল। স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক যে আগের চেয়ে আরও ব্যক্তিগত হয়ে উঠছিল, সে বিষয়ে অনেকেই সম্যক অবহিত ছিলেন না।

এই পারস্পরিক সম্পর্ক যে সে যুগের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি ধীরে ধীরে আকর্ষণ করছিল, তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে সমসাময়িক অনেক পত্র-পত্রিকায়। আরও পরবর্তীকালে ব্রাহ্ম আন্দোলনের সময়ে, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক একটি মুখ্য আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হলেও, এর সূত্রপাত লক্ষ করা যায় উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই। যা লক্ষণীয় তা হল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্বাধীন সম্পর্কের অভাব সাময়িক পত্রে লেখার অন্যতম বিষয় হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। গত শতকের চিন্তার জগতে এটা এক বড় পরিবর্তন। দাম্পত্য-সম্পর্কে প্রকৃত পরিবর্তন যত বিলম্বিতই হোক, সে সম্পর্কের তদানীন্তন রূপ নিয়ে যে চিন্তা করা হচ্ছে, বাঙালি-জীবনের চিরাচরিত দাম্পত্য-সম্পর্কের ঐতিহ্যে এ এক অভিনব ঘটনা। বাল্যবিবাহ ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্বাধীন সম্পর্ক গড়ে ওঠার পথে আরও যে দু একটি বাধা ছিল সে বিষয়েও সচেতনতা আগের তুলনায় বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রে 'অহং কৌতুকদর্শক' স্বাক্ষরিত এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি, একটি সামাজিক ব্যাধির উল্লেখ করলেন : 'আমি পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে স্ত্রী পুরুষে প্রায় অধিক প্রণয় থাকে না, তাহার কারণ এতদ্বিষয়ে পুরুষেরা প্রায় লম্পট, সমস্ত নিশি পরের ঘরে আমোদ-প্রমোদে থাকেন, এমত ব্যবহার স্ত্রীলোকদিগের সহ্য হয় না এবং সেইজন্য প্রায় পরস্পর দেখা হয় না। পুরুষ যদ্যপি গুণযুক্ত হয় তবে সে ব্যক্তি তাহার অগুণযুক্তা স্ত্রীর সহিত কখনই আন্ত্রিক [আত্মিক ?] আমোদ-প্রমোদ করিতে পারে না, তবে কি করিবে, মন রাখিবার নিমিত্তে হা হুতেই কাল ক্ষেপণ করে।'[২২] পুরুষের লাম্পট্য, ঘরের বাইরে রাত কাটানো, বা এই জাতীয় আরও ঘটনা হয়ত আগেও ঘটত, কিন্তু এগুলি যে দাম্পত্য-সম্পর্ক বিকাশের পথে অন্তরায়, এ ধারণাটাই নতুন ছিল।

যা প্রথমে ছিল একটি-দুটি প্রক্ষিপ্ত রচনা মাত্র, তা ১৮৬০—৭০-এর দশকগুলি থেকে নিয়মিতভাবে বাংলা সাহিত্যে, বিশেষতঃ বাংলা প্রবন্ধে স্থান করে নিতে শুরু করে। এ বিষয়ে এত লেখা হয়েছে ও এত বেশিদিন ধরে তা চলেছিল, যে আমরা এর থেকে দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি : প্রথমত, শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নরনারীর দাম্পত্য-সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা পরিবর্তিত হচ্ছে, এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের বিভিন্ন লেখা থেকে তা বোঝা যায়। দ্বিতীয়ত, যে সামাজিক ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কয়েকজনকে মাত্র উদ্বিগ্ন করেছিল, তা শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসেও পুরোপুরি অপসৃত হয় নি। ঘরে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও পুরুষ বাইরে রাত কাটাচ্ছে এবং তার অনিবার্য ফলস্বরূপ দাম্পত্য-সম্পর্ক ব্যাহত হচ্ছে, শুধুমাত্র এটার দ্বারাই আমরা সমস্যার গভীরতা অনুধাবন করতে পারব না। এই সমস্যার শিকড় যে সমাজে কতটা বিস্তৃত হয়েছিল তার কিছুটা আন্দাজ করা যায় *সংবাদ প্রভাকর*-এ প্রকাশিত একটি খবরে : 'আমরা কোন বন্ধু বিশেষের প্রমুখাৎ অবগত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে ১২/১৩ বর্ষ বয়স্ক কোন বালক গত সোমবার রজনীযোগে মেছুয়াবাজার নিবাসিনী কোন বার-বিলাসিনীর ভবনে গমন করত তাহার সহিত রঙ্গ রসাদি করে, এবং এক বরফি খাইতে দেয় . . .।'[২৩] যে সমাজে বারো বছরের ছেলে গণিকাপল্লীতে যাতায়াত করত, তার নৈতিক বাঁধন বোধ হয় খুব দৃঢ় ছিল না।

কেবলমাত্র এই ধরনের সমাজ বন্ধনের শিথিলতাই নয়, সমাজ-সংস্কারকদের জেহাদ সত্ত্বেও কতগুলি প্রথা দীর্ঘদিন ধরে প্রায় অপরিবর্তিতভাবে সমাজে চলে এসেছে এবং দাম্পত্য-বোধের বিকাশকে করেছে বিলম্বিত, যেমন, বাল্যবিবাহ বা বহুবিবাহ প্রথা। সন্দেহ নেই, অনেক লেখালেখির ফলে ও সমাজের আরও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর শিক্ষার সঙ্গে নিবিড়তর পরিচয়ে মেয়েদের বিবাহের বয়স কিছুটা বেড়েছিল বা বহুবিবাহের সংখ্যাও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের তুলনায় দ্বিতীয়ার্ধে কমে এসেছিল। কিন্তু লক্ষ করলে বোঝা যায়, বাল্যবিবাহ বা বহুবিবাহ সম্বন্ধে এই নতুন চেতনা বেশি ফলবতী হয়েছিল সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীতে মাত্র—মূলতঃ ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী পরিবারে আর শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে, যারা উনবিংশ শতাব্দীর যুগচেতনার সঠিক ধারণাটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এদের সংখ্যা নগণ্য, তাই স্বভাবতই এই সব প্রথা অব্যাহত রয়ে গিয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত। এর এক তুলনামূলক আলোচনা হয়ত বিষয়টি অনুধাবনের পক্ষে সহায়ক হবে। ধরা যাক, বহুবিবাহ। ১২৪৩ বঙ্গাব্দের

১২ই বৈশাখ, 'ইয়াং বেঙ্গল'দের মুখপত্র *জ্ঞানান্বেষণ* বহুবিবাহকারী কয়েকজন কুলীনের নাম, বাসস্থান ও বিবাহের সংখ্যা উল্লেখ করেছিল।[২৪] সেই তালিকার কয়েকটি নাম :

নাম	ধাম	বিবাহের সংখ্যা	
রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	মায়াপাড়া	৬২	
নিমাই মুখোপাধ্যায়	জয়রামপুর	৬০	
রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	আড়ুয়া	৬০	
দিগম্বব চট্টোপাধ্যায়	মালগ্রাম	৫৩	
খুদিরাম মুখ	নগর	৫৪	ইত্যাদি।

এটা ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দেব হিসাব। এর সঙ্গে আমরা পরবর্তী কালের দু-একটি সাক্ষ্য মিলিয়ে দেখতে পারি। ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে বামাসুন্দবী দেবী কুড়ি পাতার একটি ছোট পুস্তিকা লিখেছিলেন। তার এক জায়গায় তিনি লেখেন, 'কৌলিন্যপ্রথা এদেশ হইতে অন্তর্হিত হইলে এ দেশের অশেষ মঙ্গল সাধন হইতে পারে[।] কুলীন ব্রাহ্মণেরা যত ইচ্ছা ততই বিবাহ করিতে পারেন। অশীতিপর বৃদ্ধ হইলেও তাহাদের বিবাহের ব্যাঘাত হয না। শ্রোত্রীয় অথবা বংশজেরা যে কোন প্রকাবেই হউক না কেন তাহাদিগকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিলেই কৃতার্থ হযেন। পঞ্চম বর্ষীয়া বালাকে ৬০ বৎসরের পাত্রেব হাতে সমর্পণ করিতেছেন। শুনিতে পাওযা যায় যে কত কত কুলীন ব্রাহ্মণেরা না কি ৪০/৫০/৬০/৭০/৮০ এবং একশত পর্যন্ত বিবাহ করিয়া থাকেন।'[২৫] শোনা কথা হলেও, তৎকালীন বহু রচনা এই প্রথা-প্রচলনেরই সাক্ষ্য বহন করে। মোটামুটি একই ছবি পাওয়া যায় ব্রাহ্মসমাজেব মুখপত্র *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়* ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে।[২৬] তার ওপর আবার অধিকাংশ কুলীনই প্রায কোন কাজ করত না, কিন্তু অন্নসংস্থানের অভাব তাদের বিবাহে নিরস্ত করত না।[২৭]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কোন একজনের একশটি পর্যন্ত বিবাহের সংবাদ দিলেও, ঈষৎ পরবর্তী যুগের একটি পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধ অনুসারে দেড়শটি বিবাহও অনেক সময়ে সমাজে প্রচলিত ছিল। তবে প্রবন্ধকার নিজেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে তিনশ ষাটটির বেশি বিয়ে তিনি শোনেননি। '. . . কেহ পঞ্চাশৎ, কেহ অশীতি, কেহ শত, কোন ব্যক্তি, সার্দ্ধশত, কিন্তু তিন শত ষষ্টি বিবাহের অধিক শ্রুত হয় নাই।'[২৮] শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রাপ্ত একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে যে (১৮৮৮ নাগাদ) পূর্ববঙ্গে বারো জন কুলীনের মোট পত্নী-সংখ্যা ছিল ছশ বাহান্ন। এদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে বড় কুলীনের বয়স সত্তর ও সবচেয়ে ছোটর বয়স চল্লিশ।[২৯] বহুবিবাহের ব্যাপকতা গত শতাব্দীর সূচনায় যা ছিল তার তুলনায় শতাব্দীর শেষে কিছুটা কমলেও তখনও তা অন্যতম কুপ্রথা হিসেবে পরিগণিত হত।[৩০]

বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত প্রচলিত থাকলেও চিন্তার জগতে একটা পরিবর্তন কিন্তু চোখে পড়ে। এবং, এই চিন্তা যে বিদ্যাসাগরের মত দু-একজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তা বোঝা যায় ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দের একটি রচনা থেকে। এই রচনায় স্পষ্ট বলা হয়েছিল : 'যেরূপ অবস্থায় সচরাচর বিবাহ হইয়া থাকে

তাহাতে এই সকলের [বন্ধুত্ব, মনোমিলন ও প্রণয়ের] সম্ভাবনা নাই। পাঁচ বা দশ বৎসরের বালিকা অথবা দশ বারো বৎসরের বালক যখন বিবাহসূত্রে গ্রথিত হয়, তাহারা যে বিবাহের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারে ইহা বোধহয় কেহই বলিবেন না। . . . প্রণয় বন্ধুতা উহাতে স্থান পায় না, . . . শরীরের মিলন বিবাহ নহে, দুই আত্মার মিলনই বিবাহ। যতদিন না ঐরূপ মিলন হয় ততদিন মনুষ্য ও স্ত্রী পরস্পর বিবাহ করিবে না, ততদিন প্রকৃত বিবাহ হইতে পারে না।'[৩১] আরও কুড়ি বছর পর বাল্যবিবাহ বিরোধী একটি পুস্তক রচনা করেন রামচন্দ্র দত্ত। তিনি স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব বোঝানোর জন্য বলেছিলেন, '. . . যে ব্যক্তি যে পর্যন্ত আপনাকে আপনি বুঝিতে না পরিবে সে পর্যন্ত উদ্বাহ শৃঙ্খলে তাহার আবদ্ধ হওয়া অনুচিত।'[৩২]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে রচিত বিভিন্ন লেখাপত্র থেকে আমরা সমকালীন বাঙালি সমাজে প্রচলিত বিবাহ সংক্রান্ত আরও একটি বিষয় ও তার ফলাফল বিষয়ে জানতে পারি— অসম বিবাহ। বহু ক্ষেত্রেই দেখা যেত পাঁচ বছরের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে অশীতিপর বৃদ্ধের।[৩৩] অসম বিবাহ যে শুধু স্বামী-স্ত্রীর বয়সের পার্থক্যের জন্যই হত তা নয়—পাত্র ও পাত্রী এবং তাদের পরিবারের সাংস্কৃতিক পার্থক্য কিংবা জীবনবোধ সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যও ঊনবিংশ শতাব্দীতে দাম্পত্য-সম্পর্ক বিকাশকে বিলম্বিত করেছিল। অসম বিবাহ থেকে উদ্ভূত সমস্যা যে গত শতকে কত প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল, তার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যায় সে যুগে রচিত কয়েকটি নাটক ও প্রহসনের নাম থেকে। যেমন, সেখ আজিমন্দী লিখেছিলেন *কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে* (গরাণহাট, ১৮৬৯), অজ্ঞাতনামা প্রহসনকারের *বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা* (কলকাতা, ১৮৭৪), ফেলুনারায়ণ শীলের *সাধের বিয়ে* (১৮৭৩), অতুলকৃষ্ণ মিত্রর *বুড়ো বাঁদর* (কলকাতা, ১৮৯৩), শম্ভুনাথ বিশ্বাসের *ফচ্‌কে ছুঁড়ীর গুপ্ত কথা* (১৮৮৩), ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়ের *রাঙ্গা বৌয়ের গোদা ভাতার* (১৮৮৭), উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের *অযোগ্য পরিণয়* (কলকাতা, ১৮৮০) প্রভৃতি।[৩৪]

এ সমস্যাগুলি যে গত শতকের শেষ ভাগে নতুন করে সৃষ্টি হয়েছিল, তা নয়। এগুলি দীর্ঘকাল ধরে বাঙালি সমাজে প্রচলিত ছিল। উল্লিখিত রচনাগুলির সন তারিখ থেকে আমরা এটুকুই অনুমান করতে পারি যে গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ধীরে-ধীরে এই প্রথাগুলির সামাজিক কুফল সম্বন্ধে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তার অর্থ এই নয় যে, যারা লিখতে শুরু করেছিলেন, তারা সবাই সমাজ-সংস্কারক বা 'প্রগতিশীল'। এ ধরনের রচনা আসলে এই সব প্রথার অনিষ্টকর ব্যাপ্তিরই প্রমাণ। পূর্বোল্লিখিত প্রহসনধর্মী রচনাগুলির এক বড় অংশ জুড়ে থাকত দাম্পত্য-জীবনের ওপর এই প্রথাগুলি কী প্রভাব ফেলেছিল, তারই বিশ্লেষণ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রাতীচ্যের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সূত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চিরাচরিত সম্পর্কের বাইরেও যে এক ভিন্নতর সম্পর্ক থাকতে পারে, তার কল্পনা কিছু ব্যক্তির মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করেছিল। দাম্পত্য সম্পর্কের সমালোচনা করে লেখা বিভিন্ন রচনা থেকে এই সমস্যার রূপ ও সমাধানের পন্থা সম্পর্কে চিন্তাভাবনার পরিচয় পাই।

॥ তিন ॥

উনবিংশ শতাব্দীর দাম্পত্য-সম্পর্কের প্রকৃত স্বরূপটি বোঝা সম্ভব নয় যদি আমরা প্রচলিত বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও অসম বিবাহ থেকে উদ্ভূত সমস্যার জটিলতাগুলি আলোচনা না করি। চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য (ইনি নিজের নামের পাশে তাঁর স্নাতক উপাধি বি.এ. লিখেছিলেন। এটি গুরুত্বপূর্ণ—কারণ, আমরা এ থেকে বুঝতে পারি কাদের মধ্যে সমাজ-সচেতনতার উন্মেষ ঘটেছিল। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চিন্তা করার মত শিক্ষা যাদের ছিল, তারাই এ ধরনের সমস্যাগুলি নিযে ভাবিত হতেন) *বঙ্গবিবাহ* গ্রন্থে অন্যান্য বিষয়েব মধ্যে বহুবিবাহের একটি দিক নিযে আলোচনা করেছিলেন। বহুপত্নীক স্বামী শুধুমাত্র বিয়ে করেই তাঁর দায়িত্ব শেষ করত এবং স্ত্রীর সঙ্গে হযত আব সারা জীবনে তার দেখাই হত না। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কহীনতা ছাড়া এর একটি অন্য দিকও ছিল : 'সেই কন্যা। [অর্থাৎ যার খুব ছোটবেলায বিয়ে হযেছিল এবং তাবপব যার সঙ্গে আর তাব স্বামীর দেখাশোনা নেই] ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। ক্রমে বিবাহের বসাস্বাদনের জন্য তাহার মন চঞ্চল হইতে লাগিল। এ বিপদে [তাহাকে] কে রক্ষা করিবে ? পতি ভিন্ন এ বিপদে কে সহায হইবে ? কিন্তু পতি কোথায ? তাহার জীবদ্দশায় দেখা হইবে কী-না সন্দেহ। যদি কখন সেই কামিনীর বিষয় মনে উদয় হয তবে তিনি অনুগ্রহ করিযা পত্নীসমীপে গমন করিবেন। সে দর্শনও অনেক সাধনেব ফল। স্ত্রীমুখ দর্শন তাহার উদ্দেশ্য নয—ধন সঞ্চয় তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। যেখানে আগমন, ভোজন ও শযনেব দক্ষিণা দিতে [কন্যার] পিতামাতা অক্ষম সেখানে কামিনীর ভাগ্যে পতি সহবাস ঘটিয়া উঠে না।'[৩৫] লক্ষণীয়, লেখক কোন বিশেষ ঘটনার কথা বলেননি—ক্রিয়াপদের 'বর্তমান' রূপ ব্যবহারের দ্বারা সমাজে প্রচলিত সাধারণ প্রথার কথাই বুঝিয়েছেন।

এই ধরনের নামে মাত্র বিবাহিতা ও স্বামীসঙ্গবঞ্চিতা মেয়েদের 'বিবাহের রসাস্বাদনের' জন্য উন্মুখতার পরিচয় আমরা সমসাময়িক আরও কয়েকটি রচনাযও পাই। যৌবনের এই অনন্ত সমস্যাও কিন্তু পরোক্ষে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কেরই একটি বিশেষ দিককে প্রকাশ করে। উনবিংশ শতাব্দীর পারিবারিক ইতিহাস মানেই অবশ্যই ব্যভিচারের ইতিহাস নয়। কিন্তু বিবাহ-বহির্ভূত কদাচার এবং আনুষঙ্গিক ঘটনার এত সুপ্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায় তৎকালীন বিভিন্ন রচনায় যে এদের উপেক্ষা করলে উনবিংশ শতাব্দীর দাম্পত্য-সম্পর্কের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

বামাবোধিনী পত্রিকায় কানপুর থেকে নিস্তারিণী দেবী 'নারীজীবনের উদ্দেশ্য' প্রবন্ধে প্রচলিত দাম্পত্য-সম্পর্ক সম্বন্ধে লিখেছিলেন : 'কত দম্পতি সুখময় উদ্বাহ শৃংখলে আবদ্ধ হইয়াও অহরহ বিষম যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইতেছে, ইহার কারণ অবধারিত করিতে হইলে প্রস্তাবের বহির্ভূত হইয়া উঠে . . . কত ধর্ম্মপরায়ণা সাধ্বী সুরাপায়ী বেশ্যাসক্ত মুর্খ নরাধম স্বামীর অত্যাচারে দিবানিশি অশ্রুবিগলিত নেত্রে কালযাপন করিতেছেন, কোথায় বা কোমলস্বভাব ধার্ম্মিক পুরুষ অসতী ভার্য্যা লইয়া জ্বালাতন এবং কতশত বিদ্বান জ্ঞানশীল স্বামী কোপনস্বভাবা কলহপ্রিয়া বিলাসিনী স্ত্রী লইয়া আন্তরিক গভীর যাতনা ভোগ করিতেছেন। সংসারের বিচিত্র গতি।'[৩৬]

বিচিত্রগতি সংসারের যে ছবি নিস্তারিণী দেবী এঁকেছিলেন, তার মধ্যে পুরুষ ও

স্ত্রীপক্ষীয় ব্যভিচারের আভাসমাত্র পাই। উল্লেখ্য, ব্রাহ্মদের পত্রিকা বলেই বোধহয় বাস্তবতার চিত্রাঙ্কনে *বামাবোধিনী পত্রিকায়* থাকত এক সূক্ষ্ম আবরণ। *বামাবোধিনীর* মত সংযতলেখনী পত্রিকায় যার চকিত আবির্ভাব, সে সমস্যাকে উপজীব্য করে রচিত হয়েছিল বহু নাটক ও প্রহসন। তবে প্রহসনের সাম্য নির্বিচারে গ্রহণ করার বিপদ দ্বিবিধ: প্রথমত, যেহেতু এগুলি কাল্পনিক কাহিনী, চরিত্রদের আচরণ নির্ভর করত প্রহসনকারের ওপর এবং দ্বিতীয়ত, প্রহসনকারেরা অনেক সময়ে মুখরোচক বিষয় বলেই বোধহয় অতিরঞ্জনের লোভ সংবরণ করতে পারতেন না। অবশ্য এ কথাও স্বীকার্য যে প্রহসনের ভূমিকায়, বিজ্ঞাপনে বা উপসংহারে, যেখানে কাহিনীকার তার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন, আমরা অনেক ক্ষেত্রে সেই মন্তব্যগুলির সাধারণ কৃতির সাহায্যে সামাজিক পরিস্থিতির মোটামুটি একটি নির্ভরশীল চিত্র পেতে পারি।

বঙ্কিমচন্দ্রের *দেবী চৌধুরাণী* (প্রথম প্রকাশ, ১৮৮৪) উপন্যাসের বৃদ্ধা ব্রহ্ম ঠাকুরাণী তাঁর পৌত্র ব্রজেশ্বরকে বলেছিলেন, 'তোর ঠাকুরদাদার তেষট্টিটা বিয়ে ছিল—কিন্তু চৌদ্দ বছরই হোক—আর চুয়াত্তর বছরই হোক—কই কেউ ডাকলে ত কখন না বলিত না।'[৩৭] ব্রহ্ম ঠাকুরাণীর সপত্নীদের মত সকলের স্বামীভাগ্য হয়ত সমান ছিল না। তেষট্টিজন স্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার মতো সদাপ্রস্তুত পত্নীবৎসল স্বামী অত্যন্ত বিরল ছিল। অন্তত সমসাময়িক রচনাপত্র সে সাক্ষ্য দেয়। বরঞ্চ আমরা দাম্পত্য-সম্পর্কের যে ছবিটা পাই তাতে উলটো ধারণাটাই মনে হওয়া সংগত : 'শুভ বিবাহে দারুণ গরল উৎপন্ন হয়। গৃহে অশান্তির আগুন [তদেব] জ্বলিয়া উঠে। স্বৈরিণীর দল পুষ্ট হয। লম্পটতার পঙ্কিল স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে।'[৩৮]

বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ বা অসম বিবাহ--কারণ যাই হোক, বিবাহিত পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রায়শই লক্ষিত হত এক ধরনের সম্পর্কহীনতা। এই সম্পর্কহীনতা কখনও শারীরিক, কখনও মানসিক। যেখানে শারীরিক সম্পর্কের অভাব, সেখানে পুরুষের বিবাহ-বহির্ভূত স্বেচ্ছাচারের অনেক নির্দশন আমরা পাই। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে যে অতৃপ্তি থাকত, তার অনিবার্য প্রকাশ ঘটত বহু বিচিত্রভাবে। মেয়েদের কারও কারও মধ্যে অতৃপ্ত যৌবনের বাসনা বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের মাধ্যমে চরিতার্থ করার প্রবণতা থাকলেও তাদের অধিকাংশেরই জীবন কেটেছে অপরিসীম মনোবেদনায়। দেখা দিয়েছে তাদের মধ্যে দায়িত্ব এড়িয়ে-যাওয়া স্বামীর প্রতি ঘৃণা। উনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন রচনায় স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ব্যবহার সংক্রান্ত দীর্ঘ উপদেশাবলী বারংবার প্রকাশিত হলেও পতিসঙ্গ-বঞ্চিতা স্ত্রীদের এক বিরাট অংশ তাদের স্বামীদেরই আজীবন অপরাধী করে গিয়েছে, আজীবন দায়ী করেছে নিজেদের মন্দ ভাগ্যকে।

মেয়েদের বিরহযন্ত্রণা যে কতটা প্রকট হয়ে উঠত, তা কিছুটা অনুমান করতে পারা যায় তারকচন্দ্র চূড়ামণির *সপত্নী নাটক*-এর দুই বোনের কথোপকথন থেকে।[৩৯] নিতম্বিনী ও চঞ্চলা কুলীনের ঘরের বউ। স্বামীর সঙ্গে তাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়না। ফলে অবরুদ্ধ দৈহিক ও মানসিক কামনার প্রকাশ পায় যখন নিতম্বিনী বলে, 'একটা পুরুষের পঞ্চাশটা, ষাটটা, একশটা মাগ, আর কেউ কোণী আর আপনি, লোটা আর সোটা নিয়ে ঘুরে ঘুরে মরুক। . . . বাবাকে আর বলব কি, একটা পরমান্নচাটা নেশাখোর বায়াত্তুরের হাতে পড়্যে জন্ম কালটা মিথ্যা নষ্ট কল্লেম বোন। ইহকাল পরকাল দুটো কালই খোয়ালেম।'

আরও ইঙ্গিতবহ হচ্ছে নিতম্বনীর এ কথা শুনে তার ভগ্নী চঞ্চলার উক্তি। চঞ্চলা এ কথা শুনে তার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী কাদম্বিনীকে সম্বোধন করে বলছে, 'দিদি। শুনলি, নিতু যেন এক্‌কালে খেপে উঠলো মা, ওর আগুন জলে উঠ্যেছে, ও আর থাকতে পারে না, ওমা। চেনা দায়।'[৩৯]

১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত *মাগ-সর্ব্বস্ব* নাটকের নায়ক পামর কোম্পানির কেশিয়র গণিকাসক্ত পুরুষদের উদ্দেশ করে যা বলছে, তাতে নিতম্বিনীর প্রজ্বলিত অগ্নির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় : 'এই পাড়ার কতগুলো আহাম্মোক্‌দের কথা সর্ব্বদাই শুনতে পাই, যে তারা রাঁড় নিয়েই আমোদপ্রমোদ করে থাকেন, কিন্তু মেগের [মাগ, অর্থাৎ স্ত্রী] সঙ্গে ভাসুর ভাদ্রবৌ সম্পর্ক। . . . আরে ব্যাটারা, তোরা রাঁড়ের বাড়িতে লোচ্চাম করতে যাস, সমস্ত রাত কাটিয়ে আসিস, বাড়ীতে তোদের মাগকে ঠাণ্ডা করে কে ? তারাও তো লোচ্চা খুজে বেড়ায় ?'[৪০] *সপত্নী নাটক*-এর সমস্যা বহুবিবাহ আর, *মাগ সর্ব্বস্ব* নাটকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল পুরুষের গণিকাসক্তি থেকে উদ্ভূত সমস্যার প্রতি। কিন্তু দাম্পত্য-সম্পর্কের ক্ষেত্রে ফল উভয়েরই এক। বেশ্যাসক্তির বিরুদ্ধে প্রচারধর্মী রচনা *চক্ষুদান* প্রহসনেও গনিকাসক্ত নিকুঞ্জবিহারীকে তার স্ত্রী বসুমতী তিরস্কারের সুরে যা বলে তার থেকে আমরা মেয়েদের অতৃপ্তির দিকটি বুঝতে পারি। বসুমতী তার স্বামীকে বলছে : 'কেন। আমি কি মানুষ নই। আমার রক্ত মাংসের শরীর নয়। আমার মন নাই। ইন্দ্রিয় নাই, সুখ দুঃখ নাই।'[৪১] অনুরূপভাবে, *বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক নাটক*-এর শশিমুখীর স্বামী শ্যামাচরণ লম্পট ও রাতে বাড়ি থাকেনা। শশিমুখীর এ নিয়ে মনোবেদনার অন্ত নেই। তার ওপরে আছে শারীরিক কামনা-বাসনা—সে নিজের সম্বন্ধে 'মদনের কোপানল' এ জ্বলার কথা বলে। পুরুষের শারীরিক সান্নিধ্যের জন্য যে তার দেহ উন্মুখ হয়ে থাকে, তা বোঝা যায় তার ননদ বিনোদিনীকে উদ্দেশ্য করে বলা কবিতা থেকে :

> কি কহিব ঠাকুর ঝি কহিবার নয় লো।
> কান্ত বিনে মোর প্রাণ অন্ত বুঝি হয় লো ॥
>
> ফুটিল যৌবনপদ্ম কোথা মধুকর লো।
> পয়োধর শুষ্ক হয় না পাইয়া কর লো ॥[৪২]

শশীমুখী এই যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তার নন্দাই মদনকৃষ্ণকে ব্যভিচারের জন্য আহ্বান জানায়।

১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত একটি উপন্যাসেও আমরা 'আগুন' এর প্রসঙ্গ পাই, পাই স্বামীসুখহীনা সদ্যযুবতীর বর্ণনা, এবং বুঝতে পারি দাম্পত্য-সম্পর্কের কোন অবস্থায় ব্যাকুল যুবতী স্ত্রী পরপুরুষসঙ্গ কামনা করে : '. . . ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলে যুবতী কখনই প্রকৃতাবস্থা থাকিতে পারে না। . . . তাহার চারিদিকে অধঃপতন বহ্নি জ্বলিতেছে, ষোড়শী পতঙ্গের মত তাহাতে প্রবেশ করিবার জন্য কতই ব্যাকুল। সেই অগ্নি কেমন সুন্দর।

'ক্রমশঃ আমি ষোড়শ বর্ষে পড়িলাম ও আমার সর্ব্বনাশের দিন নিকটবর্ত্তী হইল।

. . . বিবাহের পর আমার হৃদয় শান্তি কি তাহা একদিনের জন্যেও জানে নাই . . .।'[৪৩] এখানেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্বন্ধের অভাবের জন্য স্ত্রীর হৃদয়ে অশান্তির কথা বলা হয়েছে। এই পত্রিকারই পরবর্তী সংখ্যায় (উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনৈক্যের একটি কারণও স্পষ্ট বলা হয়েছিল—বাল্যবিবাহ। লক্ষ করার মত, পাত্র-পাত্রীর ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন এই বিবাহ-প্রথার বিরুদ্ধে মেয়েদের সচেতনতা ধীরে-ধীরে কীভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল : 'ভাবিলাম একবার যে আপনার মন বিক্রয় করিয়াছে তাহাতে তাহার আর অধিকার নাই সত্য, কিন্তু আমি মন বিক্রয় করিলাম কবে ? হিন্দু মহিলা কোন্ কালে আপনার মন বিক্রয় করিয়া থাকে ? বালিকার হৃদয়ে জ্ঞানস্ফূর্ত্তি না হইতে, অভিলাষ সঞ্চার না হইতে হইতে, আর একজন আসিয়া তাহার মন বিক্রয় করিল। তিনি পিতা হউন, মাতা হউন অথবা অন্য কোন পরমাত্মীয় হউন, তথাপি তিনি পর। মন বিক্রয় করিবার ক্ষমতা তাহার ত নাই। . . . কালক্রমে বালিকার জ্ঞানস্ফূর্ত্তি হইল, অভিলাষ সঞ্চার হইল, সে জানিল তাহার মন তাহার নহে, —বহুদিন অবধি আর একজনের হইযাছে। বালিকা তাহাই স্বীকার করিল, স্বীকার করিয়া হৃদয়ের অগ্নি হৃদয়ে নিবাইবার চেষ্টা পাইতে লাগিল। সেই চেষ্টায় যদি সে কৃতকার্য্য হইল তবেই রক্ষা, নচেৎ দুর্গতির আর সীমা রহিল না। . . . উত্তাল তরঙ্গে নৌকা ডুবিবে না একথা কে বলিতে পারে ? বালিকা অকৃতকার্য্য হইল, তাহার ধর্ম্মতরী পাপসাগরে ডুবিল, তাহার কলঙ্ক রাখিবার স্থান পৃথিবীতে রহিল না। কিন্তু সে দোষ কাহার ? যিনি রমণীহৃদয়াভিজ্ঞ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব সে দোষ কাহার ? তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন— হিন্দু মহিলার ব্যভিচার প্রকৃত ব্যভিচার নহে, তাহার অসতীত্ব প্রকৃত অসতীত্ব নহে।'[৪৪]

অনেক ক্ষেত্রে বিয়ের নাম করে বা বিয়েকে উপলক্ষ্য করে অভিভাবকরা কিছু মুনাফা লুটে নিত। 'বঙ্গীয় বিবাহপ্রথা' নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিতও আছে। সেখানে বাঙালি পিতামাতার বাল্যবিবাহ অনুমোদন করার পেছনে তিনটি কারণের উল্লেখ করা হয়েছিল—কিছু আমোদ-প্রমোদ, ছেলেকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করা এবং 'সেই সঙ্গে কিছু লাভ'।[৪৫] এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি অবহেলিত হত স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্বন্ধ। যা লক্ষ করার মত, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অর্ধে যখন পশ্চিমি ভাবধারার সঙ্গে বাঙালি সমাজের অনেকেরই বেশ খানিকটা পরিচয় ঘটেছে, যখন সমাজের এক শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তি বিবাহসংস্কার, স্বামী, ও স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতি নিয়ে অত্যন্ত মুখর, তখনও সাধারণ ছবি বলতে যা ফুটে ওঠে তা কিন্তু স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্কের পারস্পরিকতা অস্বীকারেরই নামান্তর মাত্র। ফলে দাম্পত্য-প্রণয় দূরে থাক, দাম্পত্য-সম্পর্কই অনেক সময়ে গড়ে উঠত না।

এক দিক থেকে বিচার করলে দাম্পত্য-সম্পর্ক গড়ে ওঠার পক্ষে প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রটিও খুব উর্বর ছিল না গত শতকের বাংলাদেশে। অন্ততপক্ষে, পারিবারিক, শিক্ষাগত এবং চেতনাগত পরিবেশ যে এর অনুকূল ছিল না, তা আমরা অনুমান করতে পারি নবীনচন্দ্র সেনের আত্মজীবনী থেকে। কেবল নিজেদের আর্থিক প্রলোভনই নয়, সমগ্র বিবাহব্যবস্থার মধ্যেই বোধহয় লোভ বস্তুটা সে যুগে খুব প্রাধান্য পেত এবং সঙ্গে সমানুপাতিক হারে উপেক্ষিত হত স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পর্কের দিকটি।

নবীনচন্দ্র সেন (জন্ম, ১৮৪৬) : তাঁর আত্মজীবনীতে ১৮৬০-এর দশকের গোড়ার দিকের একটি কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। তখন তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্র। একবার কলেজের ছুটিতে বাড়ি গিয়েছেন। তাঁর কাকা তাঁর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ আনলেন রূপহীনা এক কন্যার। মেয়েটির 'গুণের' মধ্যে এটুকুই যে সে অতুল বিত্তের অধিকারিণী। নবীনচন্দ্র সেনের তখন পশ্চিমি শিক্ষার মাধ্যমে অনেক আধুনিক ধারণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ার বয়স। তিনি কেন রাজি হবেন এই বিয়েতে ? আমরা নবীনচন্দ্রের নিজের জবানিতে শুনি: 'স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, বাল্যবিবাহ, প্রণয়মূলক বিবাহ, তদ্দারা ভারত উদ্ধার প্রভৃতিতে [সে বয়সে] মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ। তাহাতে কোথায় না একটী "টাকার থলে" আনিয়া নির্বোধ মাতা পিতা গলায় বাঁধিয়া দিবেন। আমি [বিবাহে] অসম্মত হইলাম। পিতৃব্য মহাশয় বুঝাইলেন যে আমি মূর্খ। তাঁহার নির্বাচিত কন্যা রূপগুণহীনা হইলেও তাহার এক যুবতী ও অসামান্য গুণবতী বিধবা ভ্রাতৃজায়া আছে। এক গুলিতে দুই পাখি মারিতে পারিব। এমন সুযোগও ছাড়িতে আছে। তিনি এই দুই নাল চাপিয়াও আমার ব্রহ্মজ্ঞান-স্ফুরিত বিবাহনীতি ধ্বংস করিতে পারিলেন না।'[৪৬]

নবীনচন্দ্রের ব্রাহ্মপ্রভাবজাত বিবাহ-বিষয়ক নতুন ভাবাদর্শ পরাভূত না হলেও এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে বহু ক্ষেত্রেই আর্থিক মুনাফালাভের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত থাকত এক ধরনের নীতিশূন্যতা। আমরা সমসাময়িক বহু প্রহসনে বাড়িব বউ বা বিধবা যুবতীর সঙ্গে অন্য পুরুষের বিবাহ-বহির্ভূত যে সম্পর্কের উল্লেখ পাই, তা বোধহয় এতটাই স্বীকৃত ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল যে কাকা পর্যন্ত তাঁর ভাইপোকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করতেন এবং কাকার মন্তব্যটি এত আলগোছে করা হয়েছে যে এমন অনুমান করা অসংগত হবে না হয়ত সে এটা তৎকালীন সমাজে অন্তত কিছু পরিমাণে গৃহীত প্রথা ছিল, এবং তৎকালীন পারিবারিক নিয়মে অনেকের কাছেই এমন কিছু অস্বাভাবিক মনে হত না। ফলে বিবাহ-সংস্কারের অনেক ঢক্কানিনাদ সত্ত্বেও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে যে খুব বেশি পরিবর্তন এসেছিল, উপস্থিত তথ্য-প্রমাণাদি সে সাক্ষ্য দেয় না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে আর একটি প্রসঙ্গ বহুলভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে, সেটি অসম বিবাহের প্রসঙ্গ। বস্তুত এই সমস্যাটিকে ঊনিশ শতকের বাঙালি দাম্পত্য-জীবনের অন্যতম বাস্তবতা হিসাবে গ্রহণ করা যায়। কেবল কেচ্ছাধর্মী পথ-পুস্তিকা নয়, অনেক ক্ষেত্রে ভারি প্রবন্ধে বা পরিশীলিত ছোট গল্পেও এই বিষয়টির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যেমন, 'বিড়ম্বনা' নামে একটি গল্প। অপেক্ষাকৃত স্বল্পখ্যাত একটি পত্রিকায় গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে গল্পকারের নাম দেওয়া হয়নি। গল্পটিও বাংলা সাহিত্যের বহু আলোচিত গল্পের অন্যতম নয়। অথচ গল্পটির সামাজিক তাৎপর্য্য অবশ্য বিচার্য। এ গল্পেব নায়িকা ইন্দুলেখা আকুল হয়ে প্রতীক্ষা করে তার স্বামীর, কামনা করে স্বামীসঙ্গ। কিন্তু স্বামীর সে দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপও নেই। গল্পকার ইন্দুলেখার একাকিত্বের ছবি আঁকতে গিয়ে তার শারীরিক ও মানসিক, দুটো দিকই তুলে ধরেছেন : 'দিন দিন ইন্দুলেখার মন কাতর ও চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল। অতুল রূপ ও যৌবন তাহার বুকের ভিতর মুখ রাখিয়া গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিত। জীবনের বসন্তে, যৌবনের পূর্ণ বেলায, স্বামীসঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া একাকিনী সেই ক্ষুদ্র গৃহে বাস করিতে তাহার বড়ই কষ্ট হইত।' গল্পের বক্তব্য পরিষ্কার বোঝানোর জন্য এক আশ্চর্য গঠনগত নির্মাণ-

কৌশলের পরিচয় পাই আমরা—বারবার প্রকৃতি কে ব্যবহার করা হয়েছে, বিশ্বপ্রকৃতির পূর্ণতাকে ব্যবহার করা হয়েছে ইন্দুলেখার একাকিত্বের পটভূমিকায়। ইন্দুলেখার স্বামী রামদয়ালের চরিত্রের ওপর এতটুকু কলঙ্ক আরোপ না করেও 'বিড়ম্বনা' গল্পের লেখক এক পূর্ণ যৌবনা নারীর দুঃসহ নিঃসঙ্গতা ফুটিয়ে তুলেছেন। সেই কারণে গল্পটি উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘ প্রবাসের পর ঘরে ফিরে রামদয়াল পতিপদসেবায় নিযুক্ত ইন্দুলেখাকে কেবল দায়সারা প্রশ্ন করে : 'ইন্দু এতদিন ভাল ছিলে ত ?' এদিকে 'ইন্দুলেখার চিত্তে অশান্তির প্রবল বায়ু দিন দিন বহিতে লাগিল। তাহার হৃদয় সরোবরের নির্ম্মল সলিলরাশি বায়ু প্রবাহোৎপন্ন তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে দিন দিন পঙ্কিল ও কলুষিত হইয়া উঠিল। তারপর সহসা একদিন তাহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল।'[৪৭]

এভাবে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙা কি সত্যিই বাঁধ ভাঙা না নিছক প্রবৃত্তির তাড়না—সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে এ দুয়ের সীমারেখা কখনই খুব স্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়নি। তবে দাম্পত্য-সম্পর্কের পরিধির মধ্যে থেকেও যেখানে অতৃপ্তিজনিত হাহাকার শোনা যায়, সেখানে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও বিবাহের প্রতি সমাজের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে আমরা কিছুটা আন্দাজ করতে পারি।

মেয়েরা যে তাদের স্বামীদের কাছ থেকে ভালবাসা পাবার জন্য কতটা উন্মুখ হয়ে থাকত, তা বোঝা যায় তাদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা থেকে। অসীম অবহেলা সহ্য করেও তারা অনেক সময়ে নামমাত্র বিয়েকেই জীবনপণ করে আঁকড়ে পড়ে থেকেছে। গত শতকের প্রহসনে মেয়েদের যৌন ব্যভিচারের যে ছবি অনেক সময়ে পাওয়া যায়, তা অবশ্যই অতিরঞ্জিত। কারণ, সাধারণভাবে ঘর ভেঙে মেয়েরা যাবে কোথায় ? তবে প্রত্যক্ষ ব্যভিচার না করলেও হয়ত অনেক ক্ষেত্রে পরোক্ষেই এই সাধ পূর্ণ করত তারা। খুব বেশি এগোতে যারা সাহস পেত না, তারা কিছুটা আবরণ রক্ষা করত। *সপত্নী নাটক*-এ মা ও মেয়ের একটি কথোপকথন খুব আশ্চর্য। এই নাটকে হরিপ্রিয়াকে তার মেয়ে হরমণি বলছে যে হরমণির ভ্রাতৃবধূর 'গুরু' পছন্দ হয়নি। হরমণির বক্তব্য, অতশত বাছ-বিচার করলে চলে না। এই প্রসঙ্গে সে বলছে তার নিজের গুরুর কথা : 'এই যে আমি তাঁকে [গুরুকে] নিয়ে কত রাত্রি পর্যন্ত কত মন্তর শিখি, কত উপকথা কই, তাঁর মুখের পানে চেয়ে কত শাস্তরের কথা শুনি এত কি ঢল্য়ে থাকি ? কর্ব্বো কি বল ? "খাট ভাঙ্গিলেই ভুঁই শয্যা" ডাকের কথাই পড়্যে রয়েছে, তা হলেই কি এত ঢলাতে হয় গা। না, এত লোক হাসাতে হয়। আমরাও তো সব হল্যেম কুলীনের মাগ, স্বামী কেমন সামিগ্রী, কাল কি ধল ভাল করে চক্ষেও দেখি নি। আমরা কি আর পোঁদে কাপড় দি না গা। না কাল কাটাই না।'[৪৮] বুঝতে অণুমাত্র অসুবিধা হয় না গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণের আসল উদ্দেশ্য কী ছিল এবং অধিক রাত পর্যন্তই বা গুরুর কাছে 'কুলীনের মাগ' কী মন্তর' নিত। কিন্তু এর সীমা হরমণি বেঁধে রেখেছিল লোক না-হাসানো পর্যন্ত।

রামনারায়ণ তর্করত্নের *কুলীনকুলসর্বস্ব*, নাটকের ঘটক 'চূড়ামণি' অনৃতাচার্য তো স্পষ্টই জানিয়েছে যে কুলীন-কন্যার বিয়ের দিন স্থির করতে গিয়ে কোনও নির্দিষ্ট দিনে বিয়ে হলে মেয়ে বিধবা হবে কী-না এ বিচারের প্রয়োজন নেই, কারণ, কুলীনের মেয়ে সর্বদাই বিধবার জীবনযাপন করে।[৪৯] অথচ, ঐ একই নাটকে অধর্মরুচি মুখোপাধ্যায় তার ছেলেকে বলেছিল যে ছেলের মায়ের সঙ্গে অধর্মরুচির বিয়ের পর আর সাক্ষাৎ হয়নি,

তা সত্ত্বেও অধর্মরুচির স্ত্রীরপুত্র হয়েছে কারণ, কুলীনের ঘরে ওরকম হয়েই থাকে।[৫০] *চপলাচিত্তচাপল্য* নাটকের একটি চরিত্রের সংলাপ থেকে জানতে পারি যে অল্প বয়সী মেয়েদের পেট বাঁধা (অর্থাৎ, গর্ভসঞ্চার) মোটামুটি নিয়মিত ঘটনা ছিল।[৫১] অধিকাংশ সময়ে মুখ রক্ষার জন্য জামাইকে টাকা দিয়ে বশ করা হত,[৫২] কিংবা জামাই শ্বশুরবাড়িতে এসে রাত কাটিয়ে গিয়েছিল, পাড়ায় এমন রটনার সাহায্যে অবৈধ সন্তানকে বৈধ করা হত।[৫৩] আর, যে কুলীন-স্ত্রীরা প্রবৃত্তি উপশমের জন্য বিবাহের বৃত্তের বাইরে পা বাড়াত না, তাদের অধিকাংশকেই সারা জীবন বিবাহের আনন্দহীন দায়ভাগ বহন করে যেতে হত। কতখানি অসন্তোষ যে তাদের মনে পুঞ্জীভূত ছিল তা আমরা বুঝি যখন *সপত্নী নাটক*-এর কুলীন ঘরের বউ চঞ্চলা তার স্বামী সম্বন্ধে বলে: 'ঈস। কুলীনের ঘরে আবার ভাতারের নাম ধত্তে নেই? মবুক গ্যে, কি আমার পরকালের ভাতার রে। মল্যে সাক্ষী দেবে? . . . সে ব্যে ভুল্যে গেছি যা।'[৫৪]

শুধু একজন দুজন নয়, এ ধরনের অসন্তোষ বুকে চেপে দিন কাটাতে হত উনিশ শতকের অনেক বাঙালি স্ত্রীকেই। তাদের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া দেখা যেত ভিন্ন ভিন্ন রকম। যেমন, বাল্যবিধবারা নিজেদের মধ্যে অশালীন গল্প আলোচনা করে বিকৃতভাবে তাদের কাম চরিতার্থ করত।[৫৫] আবার অনেক সধবারও দশা হযেছিল সে রকমই। তারা অবরুদ্ধ কামের জ্বালায় প্রতিবেশীর ঘরে গবাক্ষ দিয়ে উঁকি মারত—পাশের বাড়ির বড় ছেলে তার আগের দিন বাড়ি এসেছে। অতএব তার শোবার ঘরের দাম্পত্য-দৃশ্যেই তাদের কৌতূহল সবচেয়ে বেশি।[৫৬]

স্বামীসঙ্গবঞ্চিতা কামিনীদের কৌতূহল যে কেবলমাত্র দৃষ্টিসম্ভোগেই নিবৃত্ত হত, তা নয়। তারা ভিন্নতর পথেও যৌন বাসনার তৃপ্তি সাধন করতে প্রয়াসী হত। এটা বিশেষভাবে লক্ষ করা যেত বিবাহ-বাসরে। সমসাযযিক বিভিন্ন রচনার সাক্ষ্য থেকে মনে হয় যে বিয়ের রাতে স্ত্রী-মহলের কথাবার্তায় হয়ত আদিরসের প্রাধান্য থাকত, রঙ্গ-রসিকতা অনেক সময়ে শালীনতা ও সুরুচির উপকূল ছুঁয়ে যেত। 'স্ত্রীলোকদিগের পাঠোপযোগী পুস্তকের অভাব দূরীকরণার্থে' প্রকাশিত *স্ত্রীর সহিত কথোপকথন* গ্রন্থে স্বামী ও স্ত্রীর কথোপকথন থেকে এটি আঁচ করা যায়। ফুলশয্যার রাতে স্বামী স্ত্রীকে তার অবিবাহিতা 'সইদের' বাসরঘরে 'বদ ইয়ারকি' ও অশ্লীল বাক্য ব্যবহারের অভিযোগ জানায়।[৫৭] এই ধরনের অশ্লীল আমোদ-প্রমোদের পরিচয় অন্য সমসাময়িক রচনা থেকেও পাওয়া যায়। *বাল্যোদ্বাহ নাটক*-এর অন্যতম চরিত্র বিদ্যাহীনের মুখ দিয়ে পয়ার ছন্দে যে কবিতা বলানো হয়েছে, তা থেকেও আমরা বালক বরকে নিয়ে যুবতী নারীদের আনন্দের ধরণটা বুঝতে পারি। বিদ্যাহীনের মতে বাল্যবিবাহ খুব সুখের। কারণ :

আদর করিয়া কত শালী লয় কোলে।
বড় বড় মাছ খায় ঝোলে আর ঝালে॥
কত মত কথা শেখে নানা রঙ্গ রস।
যাহাতে করিতে পারে রমণীরে বশ॥

ঘুম পাড়াইতে আসে কত কুল নারী।
রতি শাস্ত্র শিখাইতে বসে সারি সারি ॥
কোমল কামিনী কর গাত্রেতে বুলায়।
কি কহিব স্মরণেতে দুঃখ দূরে যায় ॥[৫৮]

উনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন রচনায় মেয়েদের বিবাহ-বহির্ভূত শারীরিক সম্পর্কে প্রবেশের উল্লেখ থেকে স্বামী ও স্ত্রী-র সম্পর্কের মধ্যে ব্যবধানের পরিমাণ বোঝা যায়। আমরা এর আগে 'শ্যাম—' নামের একজনের কলমে পড়েছি ; 'হিন্দু মহিলার ব্যাভিচার প্রকৃত ব্যাভিচার নহে, তাহার অসতীত্ব প্রকৃত অসতীত্ব নহে।' যে পরিপ্রেক্ষিতে এ বাক্যটি লেখা হয়েছিল, তা চোখের সামনে রাখলে বোঝা যায়, হয়ত ব্যভিচারকে সমর্থন করা লেখিকার উদ্দেশ্য ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল সমমর্মিতায় ব্যভিচারিণীর অসতীত্বের কারণ ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। অনেক ক্ষেত্রেই স্ত্রীর ব্যভিচারের মূলে ছিল দাম্পত্য-সম্পর্কের অবনতি বা সম্পর্কহীনতা। সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপত্তা আরও একটু বেশি পেলে হয়ত অনেক মেয়েরই জীবন অন্যরকম হতে পারত। বিগত যুগের নামকরা অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসীর স্মৃতিকথা পড়ে তাই মনে হয়। বিনোদিনী জীবনে অনেক কিছু পেয়েছিলেন—যেমন খ্যাতি-যশ-অভিনন্দন, তেমনি বঞ্চনাও। স্মৃতিচারণ করতে বসে সে সব কথা মনে ভীড় করে এসেছিল, এসেছিল ঘটনাবহুল জীবনের উত্থান-পতনের কাহিনী। কিন্তু ঘর ? সেটা স্মৃতি নয়, নিছকই শ্রুতি: 'শুনিয়াছি আমারও বিবাহ হইয়াছিল এবং এ কথাও মনে পড়ে যে আমার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় একটি সুন্দর বালক ও আমার ভ্রাতা, বালিকা ভ্রাতৃবধূ আর তার প্রতিবেশিনী বালিকা মিলিয়া আমরা একত্রে খেলা করিতাম। সকলে বলিত ঐ সুন্দর বালকটি আমার বর। কিন্তু কিছুদিন পরে আর তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই।'[৫৯] যে বয়সে একটি বালিকা বুঝতেই পারত না বিয়ে কী, কে তার বর, সে বয়সের পর আর তার সঙ্গে তার 'স্বামী'র সাক্ষাৎ হয়নি। বিনোদিনী দাসীর তবু মনে ছিল যে একটা সুন্দর বালকের সঙ্গে তিনি খেলতেন ছোটবেলায়, যে নাকি ছিল তাঁর স্বামী। অনেক মেয়ে স্বামীর মুখই ভুল যেত। অমৃতলাল বসুর *খাসদখল* প্রহসনে গিরিবালা গাইছে :

ও গো কেউ বল না গো ভাতার কেমন মিষ্টি।
আমার শুধু হয়েছিল ছেলে বেলায়
ছেলে-খেলা ক'রে শুভদৃষ্টি।[৬০]

এই ধরনের মেয়েরা বিবাহিতা বটে, কিন্তু বিবাহিত জীবনের স্বাদ তারা পায়নি। এবং সমসাময়িক লেখা-পত্র থেকে উনবিংশ শতাব্দীর নৈতিক মানের যে পরিচয় আমরা পাই তাতে এই সব মেয়েদের সামনে প্রলোভনের যে খুব অভাব ছিল, তা মনে হয় না। নিজের পঙ্কিল জীবনের যন্ত্রণার কথা বলতে গিয়ে বিনোদিনী দায়ী করেছেন গত শতকের বিবাহ প্রতিষ্ঠানটির কিছু রীতি-নীতিকে। নিজের পরিণামের কথার পরিপ্রেক্ষিতে যখন তিনি অন্য মেয়ের কথাও টেনে আনেন, তখন আমরা সমস্যাটির বৃহত্তর সামাজিক রূপ সম্বন্ধে

সচেতন হতে পারি : '. . . আমরাও রমণী। এ সংসারে যখন ঈশ্বর আমাদের পাঠাইয়াছিলেন তখন নারী হৃদয়ের সকল কোমলতায় তো বঞ্চিত করিয়া পাঠান নাই। সকলই দিয়াছিলেন, ভাগ্যদোষে সকলই হারাইয়াছি। কিন্তু ইহাতে কি সংসারের দায়িত্ব কিছুই নাই, যে কোমলতায় একদিন হৃদয় পূর্ণ ছিল তাহা একেবারে নির্মূল হয় না, তাহার প্রমাণ সন্তান পালন করা। পতি-প্রেম সাধ আমাদেরও আছে, কিন্তু কোথায় পাইব ? কে আমাদের হৃদয়ের পরিবর্তে হৃদয় দান করিবে ? . . . আমরা প্রথমে প্রতারণা করিয়াছি, কি প্রতারিতা হইয়া প্রতারনা শিখিয়াছি, কেহ কি তাহার অনুসন্ধান করিয়াছেন ?'[৬১] এই যে 'পতি-প্রেম সাধ'এর উল্লেখ বিনোদিনী করেছেন, তা বোধ হয় লেখিকার একার কথা নয়। কারণ, উদ্ধৃত-অংশের উত্তম পুরুষের শব্দগুলি বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে, তিনি সাধারণভাবে রমণী-হৃদয়ের বঞ্চনার কথা বলেছেন, বারবার বলেছেন মেয়েদের সাধ-আহ্লাদ, তাদের কামনা-বাসনার কথা।

উনবিংশ শতাব্দীর নাটকে, প্রহসনে, স্মৃতিচারণে মেয়েদের সাধ আহ্লাদের প্রতি পুরুষের অবজ্ঞা, অবহেলা ও পারস্পরিক অনৈক্যের চিত্রটি ফুটে উঠেছে। স্ত্রী তার অবুঝ স্বামীকে বলেছে : '. . . আমাদের অল্প বয়স, আমরা একটু হাসব না, আমোদ করবো না ? তোর পান ছেচঁলে স্বর্গে যাব নাকি ?'[৬২]

আসলে, মেয়েদের সাধ-আহলাদ বা মনকে ধর্তব্যের বিষয় বলে গ্রাহ্য করা বাঙালি ঐতিহ্যে ছিল না। তাই পলিতকেশ বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে বালিকাবধূর পরিণয় নিয়ে বহুদিন পর্যন্ত কেউ প্রশ্ন করেনি। *অযোগ্য পরিণয়* নাটকের অন্যতম চরিত্র বৃদ্ধ নন্দদুলাল মুখোপাধ্যায় স্ত্রীর মৃত্যুর তিন মাসের মধ্যেই আবার বিয়ে করছেন এবং ভাবী-স্ত্রীর মন জানেন কি-না জিজ্ঞাসা করায় বলছেন : 'আমরা তো আর সাহেব হইনি যে বিয়ের আগে কনের মন জানতে হ'বে ? বাঙালীর ঘরে কে কবে কনের মন জেনে বিয়ে ক'রে থাকে ভাই ?'[৬৩] এমন এক ধারণা গড়ে উঠেছিল যে বিয়ের কনের 'মন জানা' হল বিদেশি সভ্যতার লক্ষণ (অতএব, নিন্দনীয়) এবং বিবাহের ফলে স্বামী ও স্ত্রীর মনের মিল হল কি না, তার প্রতি গুরুত্ব আরোপের কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। বিনোদিনীর ভাষায়, 'মেয়েরা কত আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্ত বাসনা, যাতনার জ্বলন্ত জ্বালা লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে।'[৬৪]

অবশ্যই উনবিংশ শতাব্দীতে মেয়েরা নিজেদের মনের কথা বিনোদিনী দাসীর মত এত খোলামেলা ভাবে খুব বেশি বলেনি। গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে যে মহিলারা লিখতে শুরু করেছিলেন তাঁদের এক বড় অংশ ছিলেন ব্রাহ্ম[৬৫] এবং তাঁদের অনেকেরই রচনার মধ্যে শিক্ষাদানের প্রবণতা বেশি রকম চোখে পড়ে। গৃহিণীর কর্তব্য-অকর্তব্য, সুগৃহিণীর সংজ্ঞা, আদর্শ পত্নীর কৃত্যাকৃত্য এইসব নিয়েই তাঁরা বেশি ভাবিত ছিলেন। কিন্তু দাম্পত্য-সম্পর্কের অন্তরঙ্গ চিত্র তাঁদের রচনায় বিশেষ পাওয়া যায় না। রুচিগত পার্থক্য হয়ত এর জন্য কিছুটা দায়ী। বিশেষত ব্রাহ্ম-পরিচালিত পত্রিকায়, দৈনন্দিন জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে তৃপ্তির অভাব, তাদের অনৈক্যের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি প্রভৃতির বর্ণনায় ব্রাহ্ম-আদর্শে অনুপ্রাণিত মহিলারা এক ধরনের 'আবরণ' ব্যবহার করতেন। কিন্তু সাহিত্যিক দিক থেকে অনেক কম মূল্যের, অনেক স্থূল রচনায় প্রকাশ পেয়েছে এমন সব পারিবারিক ছবি, যা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বোঝাব পক্ষে

অপরিহার্য। বাড়ির ভৃত্যের সঙ্গে গুপ্ত প্রণয়ের কাহিনীও বহু পাওয়া যায় সমকালীন সাহিত্যে।[৬৬] গত শতকের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 'সুখী-দম্পতি' শব্দ দুটো বারবার ব্যবহৃত হয়েছে, অথচ দাম্পত্য-সুখের চিত্র বেশি পাওয়া যায় না। উলটো, মনে হয় যেন এই সুখের অভাব ছিল বলেই দাম্পত্য-জীবন প্রসঙ্গে 'সুখ' শব্দটির ওপর এত জোর দেওয়া হয়েছে এবং এত বহুভাবে দম্পতিদের সুখী হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

যেসব ক্ষেত্রে সামাজিক প্রথাগুলি অন্তরায় সৃষ্টি করেনি, এক অদ্ভুত ধরনের পারিবারিক অলিখিত কানুন স্বামী-স্ত্রীর স্বাধীন সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করত। আমরা রেভঃ লালবিহারী দে-র *চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান*-এ দেখেছি যে দিনের বেলা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দেখা হওয়া কতটা লজ্জাকর বলে গণ্য হত। আরও পরবর্তীকালের একটি রচনায় ফুলশয্যার রাতে স্বামী ও স্ত্রীর কথোপকথন থেকে বোঝা যায় এ বিষয়ে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ পরিবর্তিত হয়নি। দাম্পত্য-জীবনের প্রথম রাত কথা বলতে বলতে ভোর হয়ে যাওয়ায় স্বামী-স্ত্রীকে বলছে : 'এ কি ভোর হইয়া গিয়াছে যে। দেখ দেখি দেশের রীতি কত খারাপ। যদি দিনের বেলায় তোমাদের ঘোমটা দিয়া থাকিতে না হয় তবে কি রাত জাগিয়া এত কষ্ট পাইতে হয় ?. . .তুমি দিনের বেলায় অত লজ্জা করিও না, [লোকে] নিন্দা করে করুক, বয়ে গেল।'[৬৭] যে সমাজে দিনের বেলায় স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎ হওয়া নিন্দনীয় বলে গণ্য করা হত, সেখানে স্বাধীন দাম্পত্য-সম্পর্ক বিকাশ করতে পারে না। পুরুষের বাইরের জগৎ ছিল, মেয়েদের ঘেরা টোপের আড়ালে অতিবাহিত জীবনে সংসারের হাজারো সমস্যার মধ্যেও সবচেয়ে মহার্ঘ ছিল স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক। সে সম্পর্কে ছিন্নতা দেখা দিলে তাদের পেতে হয় অসীম মনঃকষ্ট। বিবাহিতা মেয়েদের সাধারণ অবস্থার প্রতিফলক হিসাবে সে যুগের অন্যতম প্রধান মহিলা পত্রিকা *পরিচারিকায়* 'Younger sister' স্বাক্ষরিত এক কনিষ্ঠা ভগিনীর একটি চিঠির কথা উল্লেখের দাবি রাখে। আজীবন কুমারী থাকার সঙ্কল্প নিয়ে এই পত্রলেখিকা চিঠির এক জায়গায় লিখেছিলেন : 'I will never marry, but die as an old maid, unless I see married girls more happy with their husbands.'[৬৮] কোন ব্যক্তি বা পরিবার বিশেষকে উদ্দেশ করে এ চিঠি লেখা হয়নি, বহুবচনে ব্যবহৃত 'ম্যারেড গার্লস' কথাটির সর্বজনীনতা বোধহয় উনবিংশ শতাব্দীর দাম্পত্য-সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করে।

তবে উনবিংশ শতাব্দীর সমস্ত দম্পতিই যে অসুখী ছিল, এমন নয়। এটি তথ্যগতভাবেও যেমন ভুল, তেমনি বুদ্ধিগ্রাহ্যভাবে অসম্ভব। উনবিংশ শতাব্দীতে দাম্পত্যপ্রেম সম্বন্ধে নতুন ধারণা প্রচলিত হওয়ার আগে প্রাচীন অসংস্কৃত পরিবারেও সুখী দাম্পত্য-জীবনের ইতিহাস পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের *ইন্দিরা* উপন্যাসের সুভাষিণী ও তার স্বামী রমণবাবু বা *বিষবৃক্ষ* উপন্যাসের কমলমণি ও তার স্বামী শ্রীশচন্দ্রের চরিত্র-সৃষ্টি থেকে মনে হয় যে সুখী দাম্পত্য-জীবনের কল্পনা যখন লেখকের মনে এসেছিল, তখন অবশ্যই এরও কোন বাস্তব ভিত্তি ছিল। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় *স্বর্ণলতা* (১৮৭৪) উপন্যাসের সরলা ও বিধুভূষণের জীবনে ভাগ্যের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দাম্পত্য-সুখের অভাব ছিল না। শুধু একটি দুটি নয় বহু সুখী দম্পতির কথা সাহিত্যে পাওয়া যায়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন লেখাপত্রে দাম্পত্য-অসন্তোষের চিত্র এত বেশিবার

পাওয়া যায় যে মনে হয় গত শতকে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে সুখের চেয়ে সুখের অভাবই ছিল প্রধান সুর।

॥ চার ॥

উনবিংশ শতাব্দীতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যে গোড়া থেকে শেষ অবধি একই রকম ছিল, এটা ভাবা ঠিক নয়। দাম্পত্য-সম্পর্ক বিকাশের পথে যে সব প্রথা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল গত শতকের প্রথম ভাগে, সেগুলি অনেকাংশেই অবিকৃতভাবে অব্যাহত ছিল শেষ পর্বেও। তবু শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে কিছু কিছু পরিবর্তন চোখে পড়তে শুরু করে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে লেখাপত্র বিশেষ হয়নি। আমাদের জ্ঞান অনেক ক্ষেত্রেই অনুমান-নির্ভর। এ বিষয়ে লেখা হয়েছে গত শতকের শেষার্ধে, অঙ্কিত হয়েছে দাম্পত্য-জীবনের অসুখী চিত্র।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বিভিন্ন রচনা থেকে দাম্পত্য-সম্পর্কে এক ধরনের পরিবর্তনহীনতার কথা যেমন আমরা জানতে পারি, আবার অনুসন্ধান করলে এর মধ্যেই কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায় একটা পরিবর্তনের উৎস। এক যুগে স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক আলোচনার যোগ্য বিষয়বস্তু হিসেবেই বিবেচিত হত না। তাই সে যুগের দাম্পত্য-সম্পর্কের জটিলতাগুলিও পরবর্তীকালের পাঠকের কাছে খুব স্পষ্ট নয়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দাম্পত্য-বোধ সম্বন্ধে মানুষের মনে সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করল। এর পেছনে শিক্ষার বিস্তার, প্রতীচ্যের সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়তর সংযোগ প্রভৃতি অনেকগুলি কারণ সম্মিলিতভাবে কাজ করেছিল। ফলে বিভিন্ন রচনায় দাম্পত্য-জীবনের ছবি কেবল স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কেরই প্রতিফলক নয়, মানসিকতায় এক পরিবর্তনেরও সূচক। স্বামী-স্ত্রীর বর্তমান সম্পর্ক সুখের নয়, অন্তত বহুক্ষেত্রে তো বটেই—এটা যে মুহূর্তে চিন্তার জগতে স্বীকৃতি পেল, প্রায় তার সঙ্গেই সমানুপাতিকভাবে সূচিত হল এক ভিন্নতর দাম্পত্য-সম্পর্ক অনুসন্ধানের প্রয়াস। বাস্তবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে পরিবর্তন এসেছে অনেক ধীর লয়ে (বহু ক্ষেত্রে এত ধীর লয়ে যে মাঝে মাঝে মনে হয়, বুঝি প্রকৃতপক্ষে কোন পরিবর্তনই আসেনি)। কিন্তু এই সম্পর্ক সম্বন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে যে ধ্যান-ধারণা পরিবর্তিত হতে শুরু করেছিল, এটা অস্বীকার করলে গত শতকের দাম্পত্য-সম্পর্ক সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনা স্পষ্ট বোঝা যাবে না।

কোথাও পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা না হলেও এটা বোঝা যায় যে চিরাচরিত দৃষ্টিতে বিবাহ ছিল প্রকৃতপক্ষে দুই পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম। সেখানে পাত্র ও পাত্রীর ব্যক্তিগত মিলন প্রধান ছিল না—অন্তত সেটা লক্ষ্য নয়, ছিল উপলক্ষ্য মাত্র। পাত্র ও পাত্রীকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হত। বাংলাদেশের চিরন্তন ঐতিহ্যে এটা এতই স্বাভাবিক ও স্বীকৃত ছিল যে এ নিয়ে কাউকে খুব চিন্তিত দেখা যায়নি। এর প্রধান কারণ বোধ হয় এই ছিল যে চোখের সামনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ভিন্নতর কোন রূপ বাঙালিদের কাছে ছিল না। ফলে আবহমান কালব্যাপী সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে বিবাহের উল্লেখ থাকলেও, আমরা 'বিবাহ' বিষয়কে কেন্দ্র করে কোন লেখা পাই না। কারণ, তার কোন প্রয়োজনই বাঙালি-মানসে অনুভূত হয়নি।

ধীরে ধীরে মানসিকতায় পরিবর্তন দেখা দিল। ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে বাঙালি পেল পাশ্চাত্য সাহিত্যের স্বাদ, পরিচিত হল বিদেশি ভাবধারার সঙ্গে। যেহেতু উনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা বিস্তারের সময়ে বাংলা ভাষায় গ্রন্থের সংখ্যা ছিল নগণ্য, স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষিত মন মুক্তি খুঁজত বিদেশি গ্রন্থে। বিদেশি সাহিত্যিকদের মধ্যে কলকাতায় সবচেয়ে বেশি আলোড়ন তুলেছিলেন শেকসপিয়ার। ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংসের ব্যক্তিগত উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালা 'ক্যালকাটা থিয়েটারে' যে নিয়মিত শেকসপিয়ারের নাটক অভিনীত হত, তা বোঝা যায়, *হিকিজ বেঙ্গল গেজেট অব ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভারটাইজার* পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন অভিনয়ের বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা থেকে।[৬৯] অতএব, অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই শেকসপিয়ারের সঙ্গে কলকাতার পরিচয়। উনবিংশ শতাব্দীতে 'এথেনিয়াম থিয়েটার' (১৮১২) ও 'চৌরঙ্গী থিয়েটার'-এর (১৮১৩) প্রতিষ্ঠার পর শেকসপিয়ারের রচনার সঙ্গে কলকাতার শিক্ষিত ব্যক্তিদের সম্পর্ক নিবিড়তর হয়েছিল। তবে কলকাতার শিক্ষিত মহলে শেকসপিয়ারের জনপ্রিয়তার সূত্রপাত হয়েছিল ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে। ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের মুদ্রিত নিয়মাবলী অনুসারে এই কলেজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল '[to] instruct the sons of the Hindoos in the European and Asiatic languages and sciences.[৭০] সুতরাং শুধু শেকসপিয়ার নন, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অন্য ইংরেজ সাহিত্যিকদের রচনার সঙ্গেও বাঙালি ছাত্রদের পরিচয়ের সুযোগ ঘটেছিল। তবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগের ছাত্ররা শেকসপিয়রের দ্বারাই সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। হিন্দু কলেজের ১৮২০-র দশকের ছাত্রদের (যারা সমষ্টিগতভাবে 'ইয়াং বেঙ্গল', নামে সমধিক পরিচিত) শেকসপিয়ার পড়াতেন স্বয়ং ডিরোজিও।[৭১] ১৮৩০-র দশকে কলকাতার বিভিন্ন স্থানে একটির পর একটি শেকসপিয়ারের নাটক অভিনীত হয়েছিল,[৭২] এবং এর অধিকাংশ অভিনয়েই হিন্দু কলেজের ছাত্রদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। শুধু হিন্দু কলেজের ছাত্ররাই নন, সাধারণভাবে কলকাতার শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে শেকসপিয়রের রচনার প্রতি ছিল অসীম আগ্রহ। ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত *Scenes and Characteristics of Hindustan* গ্রন্থের লেখিকা এমা রবার্টস কলকাতার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে শেকসপিয়ারের নাটকের অভিনয়, বিশেষত বিয়োগান্ত নাটকের প্রতি তাঁদের তীব্র আসক্তি লক্ষ করেছিলেন।[৭৩] এটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। কারণ, ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু যখন হিন্দু কলেজে ভর্তি হন, তখন হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণীর পাঠ্য তালিকায় শেকসপিয়রেব চারটি নাটক পড়তে হত—'ম্যাকবেথ', 'কিং লীয়র', 'ওথেলো' ও 'হ্যামলেট'।[৭৪] ইংরেজি শিক্ষক ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের অধ্যাপনাগুণে ছাত্ররা উদ্দীপিত হয়ে শেকসপিয়ার পড়তেন এবং রিচার্ডসন তাঁর ছাত্রদের রঙ্গালয়ে গিয়ে শেকসপিয়রের নাটকের অভিনয় দেখতেও উৎসাহিত করতেন।[৭৫] ১৮৩৭—১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে অবস্থানের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে রচিত এমিলি ইডেন-এর *Letters from India* গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে কলকাতায় 'ম্যাকবেথ' নাটকের একটি অভিনয়ে সমগ্র দর্শকমণ্ডলি এক-তৃতীয়াংশ ছিলেন বাঙালি।[৭৬]

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে শিক্ষিত বাঙালির শেকসপিয়ার-চর্চার এত বিশদ উল্লেখের অন্তর্নিহিত একটি তাৎপর্য আছে। সাহিত্য তো শুধুমাত্র কল্পিত কাহিনী নয়—একটি চলমান জনসমাজের সামগ্রিকতার ছবি। সে অর্থে যে সাহিত্য রচিত হচ্ছে এবং যে সাহিত্য সমাজ গ্রহণ করছে, দুইই গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশি সাহিত্য সম্ভোগের মাধ্যমে আহৃত বিদেশি সমাজের পাত্র-পাত্রীর সংলাপ, চিন্তাদর্শ, রোমান্স—এ সব কিছুরই আকর্ষণ ছিল বাংলার অচলায়তন সমাজের পক্ষে অপ্রতিরোধ্য। বিদেশি ভাবধারায়, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি মন যে শুধু অনুপ্রাণিত হয়েছিল, তা নয়—বাঙালি সাহিত্য জগতেও দেখা দিতে শুরু করল কতগুলি নবীন মূল্যবোধ। অনেক নতুন প্রশ্ন উঠতে লাগল। ইংরজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালির মনে বিদেশি সাহিত্য, বিশেষত শেকসপিয়ার পাঠের ফলে রোমান্স ও ভালবাসার প্রতি আগ্রহ জাগ্রত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই প্রেমতৃষ্ণা সমাজসংস্কার ও নারীমুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। এর অনিবার্য পরিণতি হিসাবে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শুরু হল স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে অনুসন্ধান। ইংরেজ সমাজে তখন ভিকটোরীয় নীতি-আদর্শের যুগ। গ্রহিষ্ণু বাঙালিমনের ওপর সহজেই ছায়াপাত করেছিল বিভিন্ন নতুন মূল্যবোধ। মানব জীবনের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক যা এ পর্যন্ত উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে বারংবার অবহেলিত হয়ে এসেছে, তা আকর্ষণ করল কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তির দৃষ্টি। পরে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই বিদেশি ভাবাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তার যথেষ্ট প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে সমসাময়িক বিভিন্ন রচনায়।

দাম্পত্য-সম্পর্ক সম্বন্ধে গত শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে এমন এক নতুন ধারণা দেখা দিয়েছিল, যা বাঙালি জীবনে একান্তই আকস্মিক না হলেও নতুন তো বটেই। এবং যেহেতু ব্রাহ্মরা একক গোষ্ঠীগতভাবে সে যুগের বাঙালি সমাজে সবচেয়ে 'আধুনিক' ছিলেন, সবচেয়ে বলিষ্ঠভাবে সামাজিক প্রথাগুলির বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণা করেছিলেন এবং বিবাহ বিষয়ে নতুন মূল্যবোধের পক্ষে ছিলেন সবচেয়ে বেশি মুখর, অনেকেরই অবচেতন মনে ব্রাহ্মধর্ম ও নতুন চিন্তাভাবনাগত পরিবর্তন সমার্থক হয়ে গিয়েছে। সমাজ-সংস্কারে, বিশেষত বিবাহ বিষয়ে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার পরিবর্তনে, ব্রাহ্ম মূল্যবোধ ও ব্রাহ্ম-পরিচালিত বিভিন্ন পত্রিকার ছিল সর্বাধিক অগ্রণী ভূমিকা। বিবাহ সম্বন্ধে ব্রাহ্ম ভাবাদর্শের যেটা গোড়ার কথা, তা হল এই যে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের পরিপূরক। বাঙালি সমাজে এই চিন্তা সম্পূর্ণ নতুন বললে অত্যুক্তি হয়না। প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে 'অর্ধনারীশ্বর' পরিকল্পনা নিশ্চয় ছিল এবং সেই পৌরাণিক ভাবাদর্শও বাঙালি সমাজে অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু সর্বসাধারণের ধারনায় এই কল্পনা কেবল প্রাচীন ধর্মাচরণের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। নিজেদের যুগে সাধারণ নর-নারীর জীবনে দেবদেবীর এই আদর্শ যে রূপায়িত হতে পারে, সে কথা অষ্টাদশ শতকে তো বটেই, এমন কি উনবিংশ শতাব্দীরও বহু দিন পর্যন্ত কেউ ভাবতে পারত না। কিন্তু দেবদেবীদের বাদ দিয়ে ব্রাহ্ম চিন্তাবিদরা সাধারণ মানব-মানবীর জীবনেই পারস্পরিক পরিপূরকতার আদর্শ রূপায়ণের কথা ভাবতে শুরু করে মনোজগতে এক বিশাল পরিবর্তন এনে ফেললেন। সাধারণ হিন্দুরা তার সবটা নিশ্চয়ই গ্রহণ করেনি, কিন্তু আগের তুলনায় নিঃসন্দেহে বেশি

সচেতন হয়ে উঠছিল। রাম ও সীতার আদশ দাম্পত্য-সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে যে সব ব্যাখ্যা এই সময় থেকে পাওয়া যায়, তা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে হিন্দু সমাজের চেতনাও আরও ব্যাপকভাবে আলোড়িত হয়েছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে ব্রাহ্মরাই ছিলেন পথিকৃৎ।

ব্রাহ্ম-পরিচালিত বিভিন্ন পত্রিকায় স্বামী-স্ত্রীর আদর্শ সম্পর্ক সম্বন্ধে বহুবার লেখা হয়েছে। যেমন, বাল্যবিবাহের কুফল দেখাতে গিয়ে বলা হয়েছিল যে এধরনের বিয়ে প্রকৃতপক্ষে বিয়েই নয়, কারণ বিবাহ বলতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সর্ব বিষয়ে যে অভিন্নতার ও পারস্পরিকতার কথা বোঝানো হয়ে থাকে, বাল্যবিবাহের মধ্যে তার কোন সম্ভাবনা নেই। বাল্যবিবাহে পাত্র-পাত্রী বিবাহের তাৎপর্য অনুধাবন করতেই পারে না : 'কি ভয়ানক কথা! যাহারা নূতন জীবনে প্রবৃত্ত হইতেছে তাহারাই জানে না। ভবিষ্যতে ঐ যোগ দ্বারা তাহাদের মঙ্গল হইবে কি অমঙ্গল হইবে তাহারা কিছুই অবগত নহে। ... লোকে বিবাহ করিয়া থাকে, এবং বিবাহ করিলে সন্তানাদি হয় উর্দ্ধকল্প তাহারা এই জানে।'[৭৭] সুতরাং নিতান্ত দেশাচারের অধীন হয়ে পুত্র-কন্যার বাল্য বয়সে বিবাহ দিলে, বিবাহের যা প্রকৃত অর্থ—দুই আত্মার মিলন—তাই ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য।

বামাবোধিনী পত্রিকায় মেয়েদের জন্য লিখিত এই রচনার উদ্দেশ্য যাই হোক না, লক্ষণীয় হল একটি নতুন ভাবাদর্শ—দুই আত্মার মিলনই বিবাহ। যে সমাজে স্বামী-স্ত্রীর দেখা-সাক্ষাৎই হত না, মানসিক ব্যবধান ছিল অসীম, সে সমাজে জোর দেওয়া হতে শুরু হল এক নতুন ধারণার ওপর—স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের পরিপূরক। পার্থিব মিলনের চেয়েও স্বতন্ত্র একটি মিলনক্ষেত্রে তাদের অভেদাত্মক দিকটির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল: 'বিবাহের সম্বন্ধ অতি পবিত্র সম্বন্ধ। এই হেতু, স্ত্রী ও স্বামীর সম্বন্ধ কোন প্রকার অস্থায়ী সাংসারিক সম্বন্ধ নহে। তাহাদিগের সম্বন্ধ পরম বিশুদ্ধ সম্বন্ধ।. . .স্ত্রী ও স্বামী এক সঙ্গে বিশুদ্ধ ধর্ম্মশৃংঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যসাধন করিবে ইহাই তাহাদিগের যথার্থ সম্বন্ধ। পরস্পর পরস্পরের আত্মার অভাব মোচনের উপায় সকল অন্বেষণ করিবেন, এক সঙ্গে ঈশ্বরচিন্তা, এক সঙ্গে ঈশ্বরোপাসনা, এক সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা, এক সঙ্গে ধর্ম্মানুষ্ঠান, এক সঙ্গে শয়ন, এক সঙ্গে ভোজন, এক সঙ্গে অধ্যয়ন ইত্যাদি ঈশ্বরাভিপ্রেত কর্ত্তব্যকর্ম্ম সকল নিস্পন্ন করিয়া আপনাদিগের সম্বন্ধের যথার্থ গৌরব বৃদ্ধি করিবেন।'[৭৮] চিরাচরিত বাঙালি ঐতিহ্যে দাম্পত্য-সম্পর্কে এ ধারণা একেবারে নতুন। এর মধ্যে আমরা পাই স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ইহলৌকিকতার উর্ধ্বে ঈশ্বরাভিপ্রেত কয়েকটি উদ্দেশ্য সাধনের আহ্বান। অর্থাৎ, বিবাহের উদ্দেশ্য হল যুগল জীবনযাত্রার মাধ্যমে ঈশ্বরের অভিপ্রেত কাজগুলি সুসম্পন্ন করা। এর মধ্যে ধর্মীয় সুর চড়া ঠেকলেও, আমরা এ থেকেই পরবর্তীকালের দাম্পত্য-ধারণায় পরিবর্তনের একটি প্রধান সূত্র আবিস্কার করতে পারি—বারবার 'এক সঙ্গে' শব্দ দুটির ব্যবহারের দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সম্বন্ধে এক পরিবর্তিত মানসিকতাই নির্দেশিত হয়েছে। স্পষ্টই বোঝা যায়, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আগের তুলনায় অনেক বেশি ব্যক্তিগত হচ্ছে—অন্ততপক্ষে, কিছু ব্যক্তির চিন্তার জগতে তো বটেই।

'দাম্পত্য প্রেমতত্ত্ব ভাবিলে তাহার ভিতর সাক্ষাৎ ভগবানের হস্ত দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন ও অবাক হইতে হয়, কিন্তু ইহা স্বাভাবিক হইলেও ইহাকে নিয়মিত ও পবিত্র

করিবার জন্য সাধন চাই।'[৭৯] এখানে যে 'সাধনার' কথা বলা হয়েছে, তা পারস্পরিকতার সাধনা, একে অন্যের 'দুঃখসুখের সাথী সঙ্গী দিনরাত্তি' হওয়ার সাধনা। এখানে উদ্দেশ্যসিদ্ধির বাতাবরণ থাকলেও পারস্পরিক সাহচর্যের প্রসঙ্গটি নজর এড়িয়ে যায়না।

এই সাহচর্য একই সঙ্গে বুদ্ধিজৈবিক ও মানসিক। 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে স্বামী ও স্ত্রীর মানসিক দূরত্বের সমস্যাটি আলোচিত হয়েছিল : 'স্বামী যখন পৃথিবী হইতে সূর্য্য ও নক্ষত্রের দূরত্য [তদেব] মাপেন, স্ত্রী তখন একটা বালিশের ওয়াড়ের দৈর্ঘ্য প্রস্থ (সেলাই করিবার জন্য) মাপেন। স্বামী যখন কল্পনা[র] সাহায্যে আকাশে গ্রহ নক্ষত্রমালাবেষ্টিত সৌরজগতে বিচরণ করেন, সূর্য্য-মণ্ডলের ঘন ফল তুলাদণ্ডে ওজন করেন এবং ধূমকেতুর গতি নির্ণয় করেন, স্ত্রী তখন রন্ধনশালায় বিচরণ করেন, এবং রাধুনীর [তদেব] গতি নির্ণয় করেন।'[৮০] স্বামী ও স্ত্রীর একত্রে ভোজন, ধর্মালোচনা, একই চিন্তা প্রভৃতি শর্তগুলি এই মানসিক ব্যবধানের ফলে পূর্ণ হচ্ছিল না। স্বামী ও স্ত্রী—দুজনে দুই ভিন্ন জগতের অধিবাসী। ফলেই স্বামীর জীবনের 'অর্ধাঙ্গী' সর্ব অর্থে একাঙ্গীভূত হচ্ছে না। কারণ, '. . .দেখা যায় কন্যাকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় না যাহাতে সে স্বামীর ছায়াতুল্যা সহচরী হইতে পারে।'[৮১] স্বামী-স্ত্রীর মানসিক অভাব দেখিয়ে তাদের পারস্পরিকতার অভাব দূর করাই ছিল এ ধরনের রচনার প্রধান লক্ষ্য। দম্পতির মধ্যে সর্ববিষয়ে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা যে কেবলমাত্র সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধেই গুরুত্ব পেত, তা নয়। ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গাত্মক কবিতা 'নবদম্পতির প্রেমালাপি'-তে স্ত্রী ও স্বামীর শিক্ষাগত ও সংস্কৃতিগত পার্থক্যের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[৮২]

স্বামী ও স্ত্রীর একাত্মীকরণের প্রকৃত রূপও পাওয়া যায় গত শতকের রচনায় : 'স্ত্রী পুরুষ পরিণয়সূত্রে গ্রথিত হইল—প্রাণে প্রাণে, হৃদয়ে হৃদয়ে মিশিল, প্রণয় জন্মিল, উভয়েরই এক আশা, এক আকাঙ্ক্ষা, এক ধ্যান, এক জ্ঞান, সকলই এক। স্ত্রীতে স্বামী, স্বামীতে স্ত্রী মিশিয়া গেল। দুইটী পৃথগাঙ্গ মিলিয়া এক নূতন ও প্রিয়দর্শন যুগলমূর্ত্তি হইল। এইরূপ ও পবিত্র মিলনের নামই দাম্পত্যপ্রণয়।'[৮৩]

শুধু, পরিবর্তনের পরিমাণই বর্তমান আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতটা বোঝার জন্য আমরা দুটো ছবি পাশাপাশি রেখে তুলনা করতে পারি। নতুন নৈতিক আদর্শে অদীক্ষিত এবং বাল্য ও বহুবিবাহ প্রথানুগত সমাজে (যাদের সংখ্যা অবশ্যই দাম্পত্য-বিষয়ে নতুন আদর্শে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিদের তুলনায় বহুগুণ বেশি ছিল) একদিকে লক্ষ করা যায় অসুখী স্ত্রীর খেদ, অন্যদিকে, সমাজের আর এক অংশ তখন আন্দোলিত হচ্ছে সংস্কার-বাসনায়। বাঙালি সমাজের চিরাচরিত বিবাহরীতির আনুষঙ্গিক হিসাবে ভ্রষ্টাচার, লাম্পট্য, স্বামী-স্ত্রীর অনৈক্য ও অসাম্য সব কিছুর বিরুদ্ধেই তখন সংস্কারকদের সংগ্রাম। ব্রাহ্মপন্থীরা যে নীতি-আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তার মূল লক্ষ্য ছিল পারিবারিক জীবন থেকে সব ধরনের 'অপবিত্রতা'র অবসান। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা এই সময়ের বিভিন্ন লেখায় মেয়েদের প্রতি এক বিশেষ দায়িত্ব বর্তাতে দেখি। বিভিন্ন পুস্তকে ও পত্রিকায় (বিশেষত মহিলাদের জন্য চালিত পত্রিকাগুলিতে) পারিবারিক পবিত্রতা রক্ষায় স্ত্রীর ভূমিকা খুব বেশি ভাবে আলোচিত হযেছে : 'বলিতে গেলে পারিবারিক সুখ কেবল স্ত্রী-জাতির উপরেই নির্ভর করে। যে গৃহে স্নেহশীলা জননী প্রফুল্লাননা কন্যা এবং স্নেহপরায়ণা ভগিনী বিরাজ করিতেছেন সে

গৃহ যে আনন্দ ও শান্তির চির আবাসভূমি হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি ?'[৮৪] এই যুক্তির মূল বক্তব্য হল এই যে গৃহকে আনন্দময় করে তোলার দায়িত্ব মেয়েদেরই এবং উলটোভাবে দেখতে গেলে, ঘরে আনন্দহীনতার জন্যেও মেয়েরাই দায়ী। *বামাবোধিনী পত্রিকার* এক সংখ্যাতে পরিষ্কার বলা হয়েছিল যে স্ত্রীদের অশিক্ষার জন্যই দিনান্তে কর্মক্লান্ত পুরুষেরা ঘরে না ফিরে অন্যত্র আনন্দ পেতে যায়।[৮৫] পুরুষ ও নারীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অভাবের জন্যই যে পুরুষ ভ্রষ্টাচারী হচ্ছে, এ বিশ্বাসও ব্যক্ত করা হয়েছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছিলেন : 'নারীগণ অন্তঃপুরেই আবদ্ধ, বহিঃপুরে পদার্পণ করিবার অধিকার নাই। ইহার ফল এই হইয়াছে—এরূপ দৃষ্টান্তও অপ্রাপ্য নহে যে পতি বহিঃপুরে বাজারের স্ত্রীলোক বা রঙ্গভূমির অভিনেত্রীকে আনিয়া আমোদ করিতেছেন।'[৮৬]

উনবিংশ শতাব্দীতে নতুন মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিদের ধারণা ছিল যে ভ্রষ্টাচার, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক স্থাপন, বহুবিবাহ, লাম্পট্য প্রভৃতি যদি দূর করতে হয় তবে দাম্পত্য-জীবনে এ সবের চেয়ে আকর্ষণকারী এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সদ্ভাব বৃদ্ধির মাধ্যমেই একমাত্র তা করা সম্ভব। দাম্পত্য সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতনতার এটি অন্যতম প্রধান লক্ষণ।

শুধু ব্যভিচার বা লাম্পট্যই আক্রমণের লক্ষ্য ছিল না। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে সন্দিগ্ধতাও অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীন দাম্পত্য-সম্পর্ক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করত। এমনকি, বৃদ্ধ ব্যক্তিকেও তার বর্ষিয়সী স্ত্রী সন্দেহ করত। বঙ্কিমচন্দ্রের *ইন্দিরা* উপন্যাসে আমরা পড়ি যে বাড়ির বৃদ্ধ খেতে বসলে তাঁকে খাবার পৌঁছে দিত বৃদ্ধা বামনী ঠাকুরাণী—গৃহিণী কোনও সমর্থা মেয়েকে খাবার নিয়ে ঐ বৃদ্ধের কাছে যেতে দিতেন না।[৮৭] এই পারিবারিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে অভিন্নতা বা 'পবিত্রতা'-র কথা বারবার বলা হয়েছে। এখানেই পরিবর্তিত আদর্শবোধের নতুনত্ব।

তবে, এ রকম মনে করা অবশ্যই অযৌক্তিক হবে যে দাম্পত্যবোধে পরিবর্তন আনতে গিয়ে সাধারণভাবে নতুন মূল্যবোধের ধারক ও বাহকরা, এবং বিশেষত ব্রাহ্মরা, পারিবারিক ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সমানাধিকারের দাবি তুলেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে দাম্পত্য-সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণায় কতটা পরিবর্তন এসেছিল, তা আমরা নিরূপণ করতে পারি বিবাহিতা নারীদের উদ্দেশে লিখিত বিভিন্ন উপদেশাবলী থেকে। স্ত্রীর প্রধান কর্তব্য ছিল স্বামীর মনোরঞ্জন ও স্বামীর বশ্যতা স্বীকার : 'যৌবনে স্বামিসেবা এবং গৃহিণীপণাই রমণীর প্রধান কর্তব্য। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রগাঢ় প্রেম, অকপট ভক্তি ও বিশ্বাস এবং অবিচলিত শ্রদ্ধা থাকার একান্ত প্রয়োজন।. . .স্বামী রমণীর দেবতা, স্বামি সেবা দ্বারা রমণীগণ ইহপরকালে পরমশ্রেয় প্রাপ্ত হয়েন।'[৮৮]

স্বামী-সেবার দ্বারা পরকালের এক অনির্দিশ্য ও অনির্দিষ্ট স্থানে স্ত্রীদের অস্তিত্ব শ্রেয়স্কর হয়ে উঠবে, উনবিংশ শতাব্দীতে মেয়েদের জন্য রচিত বিভিন্ন লেখাপত্রে এই আশ্বাসবাণী বারবার উচ্চারিত হয়েছিল। যুক্তিটা ছিল অনেকটা এ রকম : ধর্মাচরণের দ্বারা মানুষ ইহলোকে ও পরলোকে অক্ষয় সুখ লাভ করে। স্বামী-সেবা নারীর জীবনের প্রধান ধর্ম, অতএব স্বামী-সেবা করলে মেয়েদের ইহ ও পরকালের সুখলাভের সম্ভাবনা। স্বামী-সেবা যে মেয়েদের প্রধান ধর্ম, তা বোঝাতে গিয়ে *বামাবোধিনী পত্রিকায়* বলা হয়েছিল : 'স্বামী কুরূপ, নির্গুণ, দরিদ্র যে প্রকার হউন না কেন, স্ত্রীলোকের পূজনীয়,

চিরদিন তাহার শুভাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া আন্তরিক প্রীতিপূর্ব্বক সেবা করতঃ কালাতিপাত করাই [মেয়েদের] প্রধান ধর্ম্ম ও একান্ত প্রার্থনীয়।'[৮৯] এটি কোন পুরুষের রচনা নয়, কানপুর থেকে নিস্তারিণী দেবী লিখে পাঠিয়েছিলেন। কোন মহিলা যখন 'নির্গুণ' স্বামীর পূজা করাকেও একান্ত প্রার্থনীয় বলে গণ্য করেন, তখন অনুমান করা যায়, দাম্পত্য-সম্পর্ক সম্বন্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীতে কী ধরনের ধারণা প্রচার করা হত।

শুধু পাতিব্রত্য নয়, গত শতকের বিভিন্ন লেখায় গুরুত্ব পেত স্ত্রীর আচরণীয় সেই ব্যবহারাবলী যার মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বামীর সন্তোষবিধান। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এমন ধারণা গড়ে উঠেছিল যে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক নৈকট্য থাকলে সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে। সমসাময়িক নানা পত্র-পত্রিকায় স্বামী-স্ত্রীর যুগল ধর্মাচরণের ও ঈশ্বরের অভিলাষ পূরণের যে উল্লেখ পাওয়া যায়, আপাতদৃষ্টিতে তাতে ধর্মীয় বিশ্বাসের সুরটি সহজে লক্ষ করা গেলেও তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ঘরে-ঘরে ধর্ম সংস্থাপন ছাড়াও হযত এর ভিন্নতর উদ্দেশ্য ছিল। ব্রাহ্ম-পরিচালিত *মহিলা* পত্রিকায় প্রকাশিত 'একটি সুপত্নী' প্রবন্ধে সুপত্নীর সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়েছিল : 'যিনি পতিব ধর্ম্মপথে সহায়, তাঁহার চরিত্রের সমুন্নতিবিধান ও অধ্যাত্মিক কল্যানসাধনে সর্বদা নিরত, বিপথগামী দুশ্চরিত্র স্বামীকে যিনি স্বীয় চরিত্র প্রভাবে ও ধর্ম্মবলে সংশোধিত করিয়া ভগবানের চরণতলে আনিয়া স্থাপন করেন, তাহাকে সুপত্নী বলা যায়।'[৯০]

শুধু যে বিভিন্ন ব্রাহ্ম পত্র-পত্রিকায প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিরই এই উদ্দেশ্য ছিল, তা নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মেযেদের চর্যাচর্য, কৃত্যাকৃত্য নির্দেশ করে অনেকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হযেছিল ; এবং এই পুস্তক রচয়িতারা সবাই ব্রাহ্ম ছিলেন না। এ রকম বহু গ্রন্থের উদ্দেশ্য ছিল রমণীকে স্বামীর মনোরঞ্জনের উপায়গুলি শিখিয়ে দেওয়া। স্বামীর মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্য ছিল একটাই—স্বামী যাতে আনন্দানুসন্ধানে ঘরের বাইরে না যায়। *গৃহিণীর কর্তব্য* গ্রন্থে আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত স্ত্রীকে 'পতির সুখ সন্তোষার্থে কি কি করিতে হইবে,' তার একটি সুদীর্ঘ তালিকা পেশ করেছিলেন। তার মধ্যে কয়েকটি ছিল :

(ক) পতির প্রিয় দ্রব্যসামগ্রী যত্নের সহিত রক্ষা করিবে এবং তাঁহার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যতদূর সম্ভব স্বহস্তে প্রদান করিবে। তাঁহার দৈনিক প্রয়োজনীয় যে কিছু তিনি চাহিবার পূর্ব্বেই তাহা যথাস্থানে রক্ষা করিবে।
(খ) স্বয়ং অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করাইয়া স্বামীকে ভোজন করাইবে।
(গ) শয়ন-গৃহ এবং শয্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিবার ভার অন্যের উপর না দিয়া নিজে তাহা সম্পন্ন করিবে। . . . পতির রুচির অনুসারে দ্রব্যাদি সে গৃহে রক্ষা করিবে।
(ঘ) সাংসারিক কোন কিছুর অভাব হইলে, যখন তখন তাহা জানাইয়া পতির বিরক্তি উৎপাদন করিবে না। সময় ও অবস্থা বিবেচনায় ঐ সকল বিষয় তাঁহাকে জানাইবে।
(ঙ) পতি কোন কারণে তোমার প্রতি রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইয়া ন্যায় কি অন্যায়রূপে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলে, কিম্বা রাগত হইয়া কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার করিলেও, তখন তাহা অম্লানবদনে সহ্য করিবে।
(চ) এক জাতীয় স্ত্রীলোক আছেন যাহারা প্রায় সর্বদাই বকিয়া থাকেন। এইরূপ বদ্‌মেজাজের স্ত্রীলোক হইতে পতি কখনও শান্তি সুখের আশা করিতে পারেন না।

(ছ) পতির সহিত রহস্যালাপ করিয়া তাঁহার সন্তোষসাধন করা কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহারও সময় অসময় আছে।

(জ) বৃথা অভিমান করিয়া যৎসামান্য কারণে কাঁদিতে কাঁদিতে বসনাঞ্চল ভিজাইয়া পতির ভালবাসা বা দয়া আকর্ষণের চেষ্টা করা নির্ব্বোধের কার্য্য। প্রায় সর্বদাই ইহাতে বিপরীত ফল হয়।

(ঝ) সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে চেষ্টা করিবে। কেবল নিজে ফুলবাবু সাজিয়া থাকিলে চলিবে না, গৃহের প্রত্যেক দ্রব্যসামগ্রী এবং পুত্রকন্যাগণকে সতত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে।[৯১]

স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিকতার সোচ্চার দাবির মধ্যে স্ত্রী-সত্তা ততটা মর্যাদা পায়নি, যতটা পেয়েছে সংস্কার মানসিকতা। এমনকি পতির মনোহরণও যেন স্ত্রীর কর্তব্য ছিল। ব্রাহ্ম মহিলাদের দ্বারা চালিত মাসিক পত্রিকা *অন্তঃপুর*-এর একটি প্রবন্ধ 'মহিলার স্বাস্থ্য'-তে সমসাময়িক দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করে বলা হয়েছিল যে মেয়েদের গান বাজনার চর্চার মাধ্যমে স্বামীদের ঘরে আটকে রাখা যায় : 'আমার ত বোধহয় এখনকার মেয়েরা পরচর্চ্চাতে পটু না হইয়া যদি একটু সুকুমার বিদ্যা আরম্ভ করেন [অর্থাৎ একটু আধটু গান বাজনা শিক্ষা] তাহা হইলে তাঁহারা অনেকটা পতিদের মনোরঞ্জন করিতে পারেন, কিন্তু কেমন যে আমাদের দেশাচার[· !]ভালটুকুর দিকে কোন মতেই দেশের লোকের নজর পড়ে না। গৃহে যদি বৌ-ঝিরা পতির সহিত গান বাজনা ইত্যাদি আমোদ প্রমোদ করিতে থাকে, তাহা হইলে শাশুড়ী ও অন্যান্য গুরুজনদের তীব্র বাক্যবাণে তাহাদিগকে একেবারে নাকের জলে চোকের [তদেব] জলে হইতে হইবে। ছেলে বাহিরে গিয়া রাশি রাশি অর্থ উড়াইবে, নৈতিক চরিত্র হারাইবে, তাহা প্রাণে সহ্য হয়, কিন্তু বৌ যদি ছেলেকে বাধ্য বশ করিতে পারে তাহা হইলে মহা বিপদ।'[৯২] অতএব পত্নীর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল স্বামীর মনোরঞ্জনের দ্বারা তাকে গৃহাভিমুখী করে তোলা।

উনবিংশ শতাব্দীর ষাট-সত্তরের দশক থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন লেখায় 'পতিব্রতা' ও 'পাতিব্রত্য' শব্দ দুটির ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হত। স্ত্রীর অন্যতম গুণাবলীর মধ্যে 'পাতিব্রত্য' গত শতকের নতুন আবিষ্কার নয়। আবার বাংলা সাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের আগে এ বিষয়ে লেখালেখিও খুব বেশি হয়নি। স্ত্রীর আনুগত্য বাংলার চিরাচরিত পারিবারিক ব্যবস্থায় এতটাই স্বীকৃত ও স্বতঃসিদ্ধ ছিল যে লেখার উপজীব্য হিসাবে এ বিষয়টি কখনোই খুব প্রাধান্য পায়নি। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিদেশি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত বাঙালির মানসে যখন পাশ্চাত্য ধরণে 'প্রেম', 'কোর্টশিপ' প্রভৃতির উন্মেষ ঘটছিল, তখন তারই পাশাপাশি প্রাধান্য দেওয়া হল আরও একটি আদর্শকে—পাতিব্রত্য ও সতীত্ব।[৯৩] শতাব্দীর শেষে এসে হিন্দু স্ত্রীর পাতিব্রত্য বোঝাতে গিয়ে সতীদাহকে পর্যন্ত মহিমান্বিত করার প্রয়াস চোখে পড়ে। বলা হয়েছিল স্বামীর মৃত্যুর পর সহমরণের মধ্যে আত্মত্যাগ, ভক্তি ও প্রেমের এমন সংমিশ্রণ দেখা যায় যা অন্য কোনও জাতির ইতিহাসে পাওয়া যাবে না।[৯৪] এই ধরণের লেখাপত্র বিশেষভাবে প্রকাশিত হত মেয়েদের পত্রিকায়।

শুধু যে পুরুষরাই মেয়েদের পাতিব্রত্য শিক্ষা দিত, তা নয়। বহু মহিলাও এই

বিষয়টিকে গত শতকে তাদের রচনার উপজীব্য করে নিয়েছিলেন। মেয়েদের নতুন করে নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে দেওয়ার প্রয়াসও দেখা দিয়েছিল। এক 'হিন্দু মহিলা' পাতিব্রত্যের মহিমা-কীর্তন করতে গিয়ে লিখেছিলেন :

> পতিপদ ভক্তিভাবে সেবে যেই নারী,
> পতিরে যে ভাবে সদা পারের কাণ্ডারী।
> পতি জ্ঞান পতি ধ্যান যপ তপ পতি,
> এমন যে নারী তার হয় স্বর্গে গতি।[৯৫]

ছন্দ ও ভাবের সাদৃশ্য শুনলে মনে হয় বুঝিবা 'লক্ষ্মীর পাঁচালী' পড়ছি। অথচ, এটি প্রকাশিত হয়েছিল *বঙ্গমহিলা* পত্রিকায় এবং *বঙ্গমহিলা* ব্রাহ্ম-পরিচালিত পত্রিকা। উদ্ধৃত কবিতার রচয়িত্রীর নাম জানা যাচ্ছে না, তবে কোন পত্রিকায প্রকাশিত কোন একটি রচনার সঙ্গে সেই পত্রিকার ভাবগত বা নীতিগত সাযুজ্য থাকবে, এটা ধরে নেওয় যায়। সেই হিসাবে এই কবিতাটি মুদ্রণের ক্ষেত্রেও যে এর কেন্দ্রীয় ভাবের প্রতি সম্পাদকের আদর্শগত সমর্থন ছিল, তাও ধরে নেওয়া যায়। বিবাহ-বিষয়ে যে পরিবর্তিত ধারণার সঙ্গে আমরা পরিচিত হই, যে পরিবর্তিত ধারণার ফলে আমরা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের আত্মার মিলনের বা একত্র ধর্মাচরণের মাধ্যমে ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য সম্পন্ন করার কথা পড়ি, তার সঙ্গে পতিপদ ভজনার ধ্যান-ধারণার পার্থক্য কী বিরাট তার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

আসলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী দুটো দাম্পত্য-বিষয়ক নীতি সহাবস্থান করত। পাতিব্রত্যকে যে বিদেশি জ্ঞানলব্ধ 'প্রেমের' পাশাপাশি স্থান দেওয়ার চেষ্টা করা হত, তারও সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে শরচ্চন্দ্র ধরের একটি রচনাতে: 'এখনকার মেয়েরা মনে করেন স্বামী যেন তাহাদের একচেটিয়া ও খেলার পুতুল, তাঁহাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই করা যায়। ইহারা পতিকে বড় ভক্তির চক্ষেও দেখিতে চাহেন না। ইহা বড়ই দোষের কথা।'[৯৬] একদিকে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার যে সম্পর্কের ওপর জোর দেওয়া হত, তার লক্ষ্য ছিল স্বামী-স্ত্রীর পার্থক্য ঘুচিয়ে নৈতিক স্খলনের সম্ভাবনাকে অবরুদ্ধ করা। আবার, পরিবারের সবার দাবির ঊর্ধ্বে স্বামীর ওপর স্ত্রীর দাবিই সবচেয়ে বড় যাতে না হয়—সে দিকেও সমাজের সজাগ দৃষ্টি ছিল। পত্নীর কর্তব্য স্বামীকে ভক্তি করা—এ কথায় কোন নতুনত্ব নেই। যা নতুন, তা হল এই ভক্তি নিছক গৃহদাসীর ভক্তি নয়। স্ত্রী তার দাম্পত্য কর্তব্য পালন করে স্বামীকে সর্ব অর্থে পরিতুষ্ট রেখে তাকে উন্মার্গগামিতার পথ থেকে উদ্ধার করার সামাজিক দায়িত্ব পালন করবে।

স্বামী-স্ত্রীর সর্ব বিষয়ে যৌথাচরণের যে প্রতিশ্রুতি নতুন দাম্পত্য-বোধের প্রথম শর্ত ছিল বলে আমরা উল্লেখ করেছি, তাতে কি সত্যই স্ত্রীর নিজস্ব সত্তা স্বীকৃত হয়েছিল? 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ' থেকে প্রকাশিত *পরিচারিকা* পত্রিকায় 'আদর্শ পত্নী' প্রবন্ধে পত্নীর জীবনের অন্যতম আদর্শ হিসাবে তাকে 'বৈরাগিণী' হতে বলা হয়েছিল। বলা হয়েছিল একত্র ভোজন, একত্র শয়ন, একত্র ধর্মালোচনা, একত্র অধ্যয়ন প্রভৃতির আদর্শ সম্পর্কে স্ত্রীর কর্তব্য নিজের সব কিছু 'স্বামীর সম্মুখে বলিদান' করা।[৯৭] একই সঙ্গে

গুরুত্বপ্রাপ্ত দুটি আদর্শ—স্বামী-স্ত্রীর যুগলজীবন এবং স্ত্রীর আত্মোৎসর্গ—আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী মনে হলেও, আসলে আদর্শগতভাবে এরা একই মূল্যবোধ থেকে সঞ্জাত। আদর্শ পরিবারের ভিত্তি ছিল পতির কাছে পত্নীর নিঃশর্ত আনুগত্য স্বীকার : 'আদর্শ পত্নীর জীবনের প্রধান কাজ পতির সেবা।'[৯৮] অথচ, বারবার বলা হচ্ছে যে বিবাহ হল ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রকাশ এবং নারীর জীবনের সার্থকতাই হল 'পতির সহিত মিলিত হইয়া পরমপ্রভুর দাসী হইয়া তাহার সেবা করা'।[৯৯] অতএব স্বামী-সেবা হল ঈশ্বর-সেবার প্রথম উপায়। *দেবী চৌধুরাণী* উপন্যাসে প্রফুল্ল ও নিশির মধ্যে পতিভক্তি ও ঈশ্বরভক্তি বিষয়ক কথোপকথনের পর বঙ্কিমচন্দ্র নিশিকে দিয়ে অনুভব করালেন যে ঈশ্বরভক্তির প্রথম সোপান পতিভক্তি।[১০০] এ যেন নিশির বকলমে বঙ্কিমচন্দ্রেরই সিদ্ধান্ত। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ব্রাহ্মরা যেমন মনে করতেন যে পতিভক্তি ভিন্ন ঈশ্বরভক্তি সম্ভব নয়, আবার, বঙ্কিমচন্দ্রের মত গোঁড়া হিন্দুও ঐ একই মত পোষণ করতেন। পাতিব্রত্য বিষয়ে উদারনৈতিক ও সংরক্ষণশীল ব্যক্তিদের মধ্যে এক অখণ্ড সাদৃশ্য ছিল গত শতাব্দীতে।

উনবিংশ শতাব্দীতে দাম্পত্য-সম্পর্ক বিষয়ে এত লেখা হয়েছে, কিন্তু তার প্রধান সুর স্ত্রীকে পূর্ণ মর্যাদা দান ছিল না—উলটে বলা হত যে স্ত্রীকে স্বামীর উপযুক্ত হতে হবে। সবক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় যে স্ত্রীর আচরণীয় রীতি-নীতি হিসাবে লিখিত উপদেশাবলীর প্রধান সুর ছিল স্বামীর উন্নতিবিধান। আদর্শ পত্নীকে শুধু সর্বস্ব দিয়ে স্বামীর পদপ্রান্তে আত্মসমর্পণ করলেই চলবে না, তার জীবনকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে স্বামী প্রাত্যহিকতার মূল আকর্ষণের মধ্যে বদ্ধ না হয়ে পড়ে : 'এই সেবার সঙ্গে যদি উচ্চ ধর্ম্মের যোগ না থাকে, তাহা যদি কোন শারীরিক ও সাংসারিকভাবে হয, তদ্দ্বারা পতির জীবনের উন্নতি ও কল্যাণ হওয়া দূরে থাকুক ববং প্রভূত অধোগতি ও অকল্যাণ হওযারই ভূযসী সম্ভাবনা। পত্নীর এইবূপ সেবা শুশ্রুষায় পতি অধিকতর সংসারাসক্ত ভোগানুরাগী ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইয়া উঠিতে পারেন। মোহান্ধ হইয়া সংসারকে সর্বস্ব ও তাঁহাকে [সেবিকা পত্নীকে] হৃদয়ে দেবতা করিয়া প্রাণ মন তাহার চরণে সমর্পণ করিতে পাবেন।'[১০১]

এখানে একটা জিনিস স্পষ্ট যে স্বামীর তৃপ্তি সাধনের মাধ্যমে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের পথ বন্ধ করে পরিবার তথা সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করাই স্বামী ও স্ত্রীর ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কের শেষ কথা নয়, স্ত্রীকে এমনভাবে পতিসেবা করতে হবে যেন স্বামী সাংসারিক কলুষতা থেকে মুক্তি পায়। এখানে স্ত্রীর দ্বৈত ভূমিকা পালনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে: প্রথমত, স্বামীর সঙ্গে নিবিড়তর সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে ও স্বামীকে অধিকতর সুখী করার দ্বারা সংসারে নীতি-প্রতিষ্ঠা, এবং দ্বিতীয়ত, স্বামী সেবার দ্বারা স্বামীর ব্যক্তিগত 'মুক্তির' উপায় সহজসাধ্য করা। এখানে কিন্তু স্ত্রীর মর্যাদা, ঘনিষ্ঠতর দাম্পত্য-সম্পর্ক বা স্ত্রীর-সত্তার বিকাশ—সব কিছু ছাপিয়ে প্রাধান্য পাচ্ছে স্বামীর জীবনের শেষতম লক্ষ্য লাভের উপায়-মাধ্যম হিসেবে স্ত্রীর ভূমিকা। সংস্কারকরা মনে করতেন যে স্বামী যাই হোক, স্ত্রী তার আত্মোৎসর্গের দ্বারা নিজের মুক্তি নিজেই অর্জন করে নেবে স্বামী নিরপেক্ষভাবে, এবং একই সঙ্গে স্বামীর মুক্তিলাভের পথও প্রস্তুত করবে। এই দায়িত্ব যথাযথ পালনের মধ্যেই ছিল 'সুপত্নী'[১০২] হওয়ার যথার্থ পরীক্ষা।

বলা হয়েছিল যে সুপত্নী যেন স্বামীকে 'নীচ ইন্দ্রিয় সুখভোগে আসক্ত' করে না

তোলেন। এই উল্লেখ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। স্ত্রী যে কেবল স্বামীর পদতলে সর্বস্ব সমর্পণ করবে, তা নয়। স্বামী-স্ত্রীর একান্ত ব্যক্তিগত দৈহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এক ধরনের সীমা বেঁধে দেওয়ার প্রয়াস দেখা যায়। স্বামীকে নীচ ইন্দ্রিয় সুখভোগের আসক্তির হাত থেকে উদ্ধার করতে বলার অর্থই হল দাম্পত্য-জীবনে স্বামী যাতে উচ্চতর আদর্শের কথা বিস্মৃত হয়ে যৌন জীবনকেই প্রাধান্য না দেয়। *বামাবোধিনী পত্রিকায়* বলা হয়েছিল : 'যদি স্বামীকে ভালবাসিবে—প্রকৃত স্ত্রী হইবে, তবে নিজের সুখদুঃখের দিকে আদৌ লক্ষ করিও না।'[১০৩]

উনবিংশ শতাব্দীতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও ব্রাহ্মধর্মের বিকাশ সমাজে নারীর স্থান সম্বন্ধে একটি নতুন মূল্যবোধের সৃষ্টি করেছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও ইংরেজি শিক্ষা ও ব্রাহ্ম ধর্মের বিকাশের সঙ্গে একটি নতুন নীতি আদর্শ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সূত্রে ভিকটোরিয় যুগের বিশুদ্ধ নীতিবাদের দ্বারা উনিশ শতকের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ভিকটোরিয় যুগের মতই উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নব্য নীতিবাগীশরা (যাদের অধিকাংশই ছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী) সমাজকে যৌন দুর্নীতিমুক্ত করার অভিলাষী ছিলেন। সমাজে যৌন অনাচারের যে প্রবল স্রোত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে একটি সাধারণ লক্ষণ হিসাবে দেখা দিয়েছিল, অংশত তারই বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই বিশুদ্ধ নীতিবাদের সূচনা। এটা আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায় এই থেকে যে সমাজ-সংস্কারকরা যে প্রথাগুলিকে সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর বলে গণ্য করতেন, সেগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামই ছিল তাদের নবনৈতিকতাব মূল ভিত্তি—পানাসক্তির বিরুদ্ধে, লাম্পট্যের বিরুদ্ধে, বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক স্থাপনের বিবুদ্ধে ছিল তাদের সংগ্রাম। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাঙালি সমাজে সমাজ-সংস্কারকবা, বিশেষতঃ ব্রাহ্ম মতাবলম্বীরা, পবিত্রতা ও দুর্নীতিহীনতার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

এই নৈতিক বিশ্বাসের মূল ভিত্তির ওপরই দাঁড়িয়েছিল স্ত্রীমুক্তির বা বিবাহ-বিষয়ক নতুন মূল্যবোধ। বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক দূর করার জন্য অস্বাভাবিক জোর দেওয়া হত পারিবারিক সম্পর্কের ওপর। বারম্বার বলা হয়েছে যে একটি সমাজের ভালমন্দ নির্ভর করে নারীর গুণের ওপরেই : 'বলিতে গেলে পারিবারিক সুখ কেবল স্ত্রীজাতির উপরই নির্ভর করে',[১০৪] বা 'নারীর প্রধান নাম স্ত্রী, এবং এই স্ত্রীই মানবজীবনের প্রস্রবণ, ইহার ধাত্রী, ইহার পরিপালক, ইহার গুরু, ইহার পরিচালক, ইহার রক্ষক, ইহার উপদেষ্টা, ইহার মন্ত্রী, ইহার সহাধ্যায়ী, ইহার সহযোগী, ইহার বন্ধু, ইহার আশ্রয়, ইহার সহায়,'[১০৫] কিংবা, 'রমণী পরিবারে সুশীতল ছায়ারূপিণী হইয়া সকলের আরাম ও শান্তি প্রদাত্রী হইবেন,'[১০৬] অথবা 'স্ত্রীজাতির সৎশিক্ষার অভাবই সমাজে নানারূপ অশান্তির কারণ।'[১০৭] ধরে নেওয়া হত যে স্বামীকে ইন্দ্রিয়াসক্তি থেকে উদ্ধার করা সাধ্বী ও চরিত্রশীলা নারীর অন্যতম কর্তব্য : 'যাহার জীবনের মূলে ঈশ্বরপ্রেম নাই, পবিত্রতা নাই, সাংসারিক বিলাসিতা ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষ অভিমানাদি জঘন্য ভাব বিরাজ করিতেছে, সে নারী পতি পরায়ণা হইলেও সতী নাম গ্রহণের কোনরূপ উপযুক্ত নহে।'[১০৮]

এখানে আমরা সতীত্ব সম্বন্ধে একটা নতুন ধারণার সঙ্গে পরিচিত হই। চিরাচরিত ধারণা অনুসারে কেবলমাত্র এক পুরুষে আসক্ত হওয়াই সতীত্বের প্রধান কথা নয়—সতীর *'ইন্দ্রিয় সুখাভিলাষের'* মত *'জঘন্য ভাব'*ও থাকা চলবে না। এটি গত শতকের একটি

নতুন ধারণা। সতীত্বের সংজ্ঞা হিসাবে বলা হয়েছিল : 'সৎ শব্দের যে অর্থ তদনুরূপ হইলে পূর্ণ সৎ বা সত্য ঈশ্বর, সুতরাং পূর্ণ সদ্ভাব বা সদাচার যে জীবনে আছে সেটি সতীত্বের আদর্শ হইবার উপযুক্ত।'[১০৯] এবং যেহেতু নতুন নীতি-আদর্শের মাপকাঠিতে 'ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষ' সদাচারের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপযুক্ত নয়, অতএব তা সতীর পক্ষে বর্জনীয়। ঈশানচন্দ্র বসু 'সতীত্বের লক্ষণ' নির্দেশ করতে গিয়ে স্ত্রীর যে কটি ব্যবহারের উল্লেখ করেছিলেন, তারও কয়েকটির মধ্যে শারীরিক কামনা-শূন্যতার ইঙ্গিত ছিল। যেমন, 'স্বামীকে কেবল আপনার সুখের নিমিত্ত নিয়োজিত করিবে না' বা 'কেবল আত্মসুখ ভোগের উপলক্ষে স্বামীকে চিন্তা বা স্মরণ কবিবে না।'[১১০] এখানেও দাম্পত্য-সম্পর্কের মধ্যে স্ত্রীর নিজস্ব সুখাভিলাষকে সতীত্বের গুণ হিসাবে ধরা হয়নি। এভাবে একটি ধারণা খুব সযত্নে গড়ে তোলা হয়েছিল যে সাধ্বী নারী হবে শারীরিক স্পৃহাশূন্য এবং স্বামী-স্ত্রীর শারীরিক সম্পর্ক স্ত্রীর কামনার বস্তু নয়, নেহাৎই কর্তব্য মাত্র। স্ত্রী শুধু শারীরিক কামনাশূন্য হবে না, মেয়েদের কথাবার্তার মধ্যেও শারীরিক প্রসঙ্গের উল্লেখ দূষণীয় বলে গণ্য করা হত। ভিকটোরিয় আদর্শে লালিত শিক্ষিত বাঙালির নবনৈতিকতায় মেয়ে-মহলের, এমনকি বিবাহ-বাসবেরও আদিরসাত্মক রঙ্গ-রসিকতাকে নিতান্ত অশোভন বলে মনে করা হত।[১১১]

এই নীতিবোধের অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ এক আত্মঘাতী পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে। যে আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই নীতি প্রচার করা হয়েছিল, ঠিক সেই আদর্শগুলিই কিন্তু পবাজিত হযেছিল বহু ক্ষেত্রে। যে সামাজিক রীতির বিরুদ্ধে ছিল নব্য নৈতিক মূল্যবোধের সংগ্রাম, অনেক জাযগায় সেগুলি অব্যাহত রয়ে গিযেছিল। ভিকটোরিয ইংল্যান্ডের সঙ্গেই সাদৃশ্য এনে দেখানো যায় যে ইংল্যাণ্ডে যেমন ভিকটোরিয় বিশুদ্ধতার মধ্যে এক ধরনের নৈতিক দ্বৈধ (অর্থাৎ ঘরের স্ত্রী হবে কামনাবাসনা শূন্য নৈতিকতার এক মূর্তিমতী প্রতিমা, তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক কেবল পুত্রার্থে, আর শারীরিক আনন্দলাভের জন্য থাকবে কামনিপুণা দেহপসারিণী) কাজ করেছে,[১১২] ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ সম্বন্ধেও সেটি প্রযোজ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পতিপরায়ণা, সতীসাধ্বী নারীমূর্তি নির্মাণের ফলে পুরুষের আদিম প্রবৃত্তির নিরসন হয়নি। গৃহ শান্তিনিকেতন হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা শেষ পর্যন্ত রমণীয় হয়ে ওঠেনি। ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে যে শিক্ষিত বাঙালি প্রমোদানুসন্ধানে ঘরের চেয়ে বাইরেকেই বেশি মনোরম মনে করত, তার প্রমাণও আছে: 'লোকে স্ত্রী বর্তমানেও পরনারীর নিকট গমন করে কেন ? বোধহয় বার-বিলাসিনীর নিকট যে সকল আমোদ লাভ করে স্ত্রীর নিকট তাহা পায় না বলিয়া।. . .যে মোহন হাসিতে গুণরাজ মোহিত হয়েন স্ত্রীকে সেই মোহন হাসি হাসিতে হইবে।'[১১৩] প্রবন্ধকার হয়ত 'নিদান' স্বরূপ সঠিক ওষুধই ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু পতিব্রতা রমণীর পক্ষে অপরিহার্য বলে এতক্ষণ যে গুণাবলীর আলোচনা করা হয়েছে, সদ্যোদ্ধৃত অংশের প্রবন্ধকারের নির্দেশিত পথ তাদের থেকে স্বতন্ত্র।

শুধু তাই-ই নয়। পুরুষ ও নারীর কর্মক্ষেত্র পৃথক্‌করণের মধ্যেও নীতিগত দ্বৈধতার পরিচয় পাওয়া যায়। এটা আরও স্পষ্ট বোঝা যায় যদি আমরা মেয়েদের প্রতি প্রদত্ত উপদেশাবলী পাঠ করি, সযত্নে লালিত কর্তব্য-অকর্তব্যের সীমারেখাটি মনে রাখি এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনের বিভাজন-সূত্রের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণতাটি লক্ষ করি।

যদিও বারবার বলা হত যে সমাজে নারী ও পুরুষ, দুজনের কাজই সমান গুরুত্বপূর্ণ ('ইহারা পরস্পরে সাহায্য ও সুখবৃদ্ধি করিতেছে এবং নূতন জীব সকল উৎপাদন করিয়া ঈশ্বরের অভিপ্রায় সাধন করিতেছে')[১১৪] কিন্তু তাদের কাজের ক্ষেত্রটি যে মূলত পৃথক এ বিষয়ে কোন সংশয়ের অবকাশ রাখা হয় নি : 'সমুদয় কঠিন গুণে মনুষ্য সুসজ্জিত, সমুদায় কোমল ভাবে বামাগণ ভূষিত। ইহাদের পরস্পরকে বৃক্ষ ও লতার ন্যায় তুলনা করা যায়। পুরুষেরা দৃঢ়কায় বৃক্ষের ন্যায়, স্ত্রীলোকেরা তাহার শোভা পুষ্পিত লতাস্বরূপ। যখন লতা বৃক্ষকে আবেষ্টন করিয়া থাকে তখনই সে সরল হইয়া উঠিতে পারে এবং মনোহর কুসুম ধারণ করিয়া দিক সকল উজ্জ্বল করে, বৃক্ষ লতার সহযোগে পরম মনোহর হয়।'[১১৫] স্ত্রীকে লতার সঙ্গে তুলনা করার অর্থই হল দাম্পত্য-জীবনে স্ত্রীর নিজস্ব সত্তা অস্বীকার করা। এই বৃক্ষ ও লতার উপমা বোধহয় উনবিংশ শতাব্দীতে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। কারণ, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ বোঝাতে গিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই তুলনা বেশ কয়েকবার চোখে পড়ে। যেমন ১২৯২ বঙ্গাব্দে *সমাজ-দীপিকা* পত্রিকায় প্রকাশিত 'ভার্য্যা' প্রবন্ধে।[১১৬]

শুধু বৃক্ষ-লতার উপমার ক্ষেত্রেই নয়, অন্যভাবেও স্ত্রীর-নিজস্ব সত্তা অস্বীকার করে তাকে পুরুষ-সাপেক্ষ হিসেবে দেখানো হত। 'নর-নারীর ঐশ্বরিক কার্য্য-নির্দেশ' করতে গিয়ে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* পুরুষকে সূর্য ও মেয়েদের চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করেছিল।[১১৭] অর্থাৎ চন্দ্রের মতন স্ত্রীরও জ্যোতি নেই, সে সূর্যের [স্বামীর] প্রতিফলিত আলোয় উজ্জ্বল। হয়ত খুব সচেতনভাবে এ ধরনের উপমা ব্যবহৃত হত না। কিন্তু এ ধরনের বচনা থেকে স্ত্রীর সামাজিক ও পারিবারিক ভূমিকা সম্বন্ধে পুরুষের কী ধারণা ছিল, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। শতাব্দীর শেষ ভাগে এসেও নারীর নিজস্ব সত্তা এতটাই অস্বীকৃত রয়ে গিয়েছিল। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে 'নিরপত্রপ' বা একক নারী মানেই যে সংসারের কালিমা বা কুলের অঙ্গার হবে, পূর্বোক্ত 'ভার্য্যা' প্রবন্ধে প্রকাশিত এ ধরনের মানসিকতা মূলত নারী-চরিত্রের প্রতি গভীর অবিশ্বাস থেকেই সঞ্জাত।

উনবিংশ শতাব্দীতে দাম্পত্য-সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রগত পার্থক্য সুনিশ্চিত করার জন্য এক ধরনের 'মিথ' ব্যবহার করা হত। 'মিথ'টা এই যে মেয়েরা যা করে, তা পাতিব্রত্য, সতীত্ব প্রভৃতি গুণে বিভূষিত এবং বিভিন্ন লেখায় এর ওপর এত অস্বাভাবিক জোর দেওয়া হত যে বলা হত, ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ আদর্শের মাপকাঠিতে রমণীর স্থান পুরুষের অনেক উঁচুতে। বারংবার প্রচারিত এ ধরনের তত্ত্ব বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিরূপণের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ মানসিকতা ব্যক্ত করে : 'নারী পুরুষের অধীন হইয়াও তাহার প্রভু। নারীর জন্যই গৃহ এবং নারীই গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। গৃহই নারীর কর্মক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থল। গৃহের বহির্ভাগে নারী প্রকৃতপক্ষে অবলা।'[১১৮] (নিম্নরেখা আমার)। পাতিব্রত্য যে নারীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, এমন লেখাও পাওয়া যেত।[১১৯] সে যুগের বহু শিক্ষিত ব্যক্তিরই এ রকমই বক্তব্য ছিল—ব্রাহ্ম অথবা অব্রাহ্ম। সমাজে ও দাম্পত্য-জীবনে নারী তথা স্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে এধরনের 'মিথ'-এর ব্যবহার ছিল উনবিংশ শতাব্দীতে মহিলা-সংক্রান্ত লেখাপত্রের অন্যতম সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

বিবাহ-সংক্রান্ত নতুন নীতি প্রণয়ন, দাম্পত্য-সম্পর্ক সম্বন্ধে নতুন ধারণার উদ্ভব এবং সর্বোপরি এই 'মিথ'-এর পৌনঃপুনিক ব্যবহার থেকে মনে হয় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে

তত্ত্বগত পারস্পরিকতার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যবহারগত আদর্শের প্রণয়ন। স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর সম্পর্ক যে আগের তুলনায় অনেক বেশি নিকট ও ব্যক্তিগত হচ্ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এর পাশাপাশি নতুন মূল্যবোধের প্রতিফলক হিসেবে বিভিন্ন লেখা পড়লে মনে হয় যে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই ঘনিষ্ঠতার সামাজিক উপযোগিতার দিকটা যেন বেশি প্রাধান্য পেত।

তাই স্ত্রীর ক্ষেত্রে যেমন কৃত্যাকৃত্যের সীমা নির্ধারণের প্রয়াস দেখা যায়, স্বামীর ক্ষেত্রে তার ঝোঁকটা অবশ্যই কম। ১২৯৪ বঙ্গাব্দে লেখা 'হিন্দুবিবাহ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন যে, 'বিবাহের যত কিছু আদর্শের উচ্চতা যে কেবল পত্নীর বেলায়, পতিকে সে আদর্শ স্পর্শ করিতেছে না।'[১২০] যদিও নতুন মূল্যবোধে বিশ্বাসীরা স্বামী ও স্ত্রী, উভয়কেই বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক পরিহার করতে বলত, কিন্তু স্ত্রীর ক্ষেত্রে এই প্রয়াসটি অস্বাভাবিক রকম বেশি ভাবে চোখে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীর উপযোগিতার কথা খুব খোলাখুলি বলা হয়েছে। যেমন, 'নারীগণ স্বাভাবিক দুর্ব্বল হইলেও, সংসারক্ষেত্রে পুরুষের সম্যক সহায়তা করে বলিয়া, মনুষ্য কোন নির্দ্দিষ্ট অবলাকে চিরকালের জন্য গলগ্রহ করত ভার্য্যাত্বে অভিষেক করে।'[১১২] আবার অন্যত্র নব্য নীতি-আদর্শের মূল সুর থেকে স্ত্রীর পাতিব্রত্য ও সংযত জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে স্বামীর ইহলৌকিক ও পরলৌকিক অভীষ্ট পূরণের প্রয়োজনীয়তাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ফলতঃ ভ্রষ্টাচার ও সামাজিক রীতি পরিবর্তনের যে তাগিদ থেকে নতুন মূল্যবোধে বিশ্বাসীরা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের নিবিড়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতেন, পাতিব্রত্য ও সতীত্বের ওপর প্রাধান্য স্থাপন এবং স্ত্রীকে সর্বপ্রকার পার্থিব কামনাশূন্য সতীর আদর্শে গড়ে তোলার ফলে সেই পরিবর্তনের গতি বারবার ব্যাহত হয়েছিল। স্ত্রীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক তো ছিল ধর্ম ও বংশরক্ষার জন্য এবং নব্য নীতিবিদদের বক্তব্য অনুসারে স্ত্রীরও স্বামীকে 'নিচ ইন্দ্রিয়াসক্ত' করার কথা ছিলনা। ব্যভিচারের বিরুদ্ধে এত লেখা সত্ত্বেও উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যভিচার তো নির্মূল হয়ই নি, বরং সমসাময়িক কয়েকটি পথ-পুস্তিকা বা প্রহসনের নাম থেকে এর ব্যাপকতা সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।[১২২] সে যুগের নীতিবাদের প্রবক্তারা নিজেরাও বোঝেন নি যে তাঁদের যুক্তিই পরোক্ষে সামাজিক ভ্রষ্টাচারের নির্বাধ আনুকূল্যের কাজ করছিল। *হিন্দু মহিলা নাটক*-এর একটি চরিত্রকে বলতে শুনি যে, 'স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমালাপ সাতিশয় সুখোৎপাদক' কিন্তু পরনারী সম্ভোগ করে 'কোন ব্যক্তির স্ত্রী-সম্ভোগ ইচ্ছা করে।'[১২৩]

কেবল গৃহ আশানুরূপ আনন্দদায়ক নয় বলেই পুরুষ পরনারীসঙ্গ কামনা করত, এই উক্তির মধ্যে কিন্তু সমগ্র পরিস্থিতির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। যে-কোন ধরনের বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কই ছিল নব্যনৈতিক আদর্শের বিরুদ্ধে। অথচ, এই নীতিবাগীশদের যুক্তির ফাঁকেই পাওয়া যায় ঘরে অসুখী পুরুষদের পরনারীতে আসক্ত হওয়ার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা। ফলে এক অদ্ভুত ধরনের সমন্বয়-সাধনের প্রয়াস লক্ষিত হয় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। একটা তত্ত্ব প্রচারিত হল যে বারাঙ্গনা-গমন করেও চারিত্রিকভাবে নিষ্কলঙ্ক থাকা যায় : 'কোন কোন ব্যক্তির এইরূপ সংস্কার আছে যে, স্ত্রীবিয়োজিত বা অবিবাহিত পুরুষ যদি কাহারও নিষ্কলঙ্ক কূলে কলঙ্কারোপ না করিয়া বেশ্যালয় গমন করেন, তবে তাঁহার দোষ গ্রাহ্য হইতে পারে না।'[১২৪] এ থেকে প্রমাণিত হয় যে এ ধরনের যুক্তি তখন সমাজে প্রচলিত ছিল, এবং পরবর্তী বাক্যে স্বয়ং লেখকও এ যুক্তির সারবত্তা সমর্থন করে নিয়েছেন : 'আমরাও এ কথা স্বীকার

করি বটে. . .।'

দাম্পত্য-সম্পর্কিত পরিবর্তিত মূল্যবোধের মানদণ্ডে বিবাহ-বহির্ভূত সমস্ত সম্পর্ককে দূষণীয় বলে গণ্য করা হত এবং সেই মূল্যবোধের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাগুলি সেই সব সম্পর্ককেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রেখেছিল বা রাখার পক্ষে এক সুবিধাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। এর ফলে আরও একটি বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছিল—ব্যক্তিগত রক্ষিতা ও 'বাগানবাড়ি' রাখার নিয়মের প্রবর্তন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে ভদ্রলোকদের এক শ্রেণীর মধ্যে ভিকটোরিয় ইংল্যান্ডের 'Grande Cocote'-এর মত রক্ষিতা পালনের রীতি প্রচলিত হয় এবং কালক্রমে তা সামাজিক পদমর্যাদার সূচক হিসেবেও ব্যবহৃত হতে থাকে। বহু সম্পদশালী ব্যক্তি, যাদের বিবাহ-অতিরিক্ত সম্পর্ক স্থাপনের বিপক্ষে নৈতিক বাঁধন ছিল না, তাদের অনেকেই ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রক্ষিতা পোষণ করত। ধীরে ধীরে রক্ষিতার সংখ্যা সামাজিক পদমর্যাদার মানদণ্ডে পরিণত হয়। এটা আগেও ছিল। কারণ, রাজনারায়ণ বসুর *সে কাল আর এ কাল* গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে 'সে কাল' সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে 'সে কালে' 'বেশ্যা রাখা বাবুগিরির অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত . . .।' অনুমান করি 'সে কাল' বলতে গত শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকের বাঙালি সমাজের বর্ণনাই দিয়েছেন লেখক। শুধু রাজনারায়ণ বসু নন, গত শতকের উল্লিখিত সময়ে ধনী সম্প্রদায়ের চরিত্র বর্ণনার আরও নির্ভরযোগ্য দলিল পাওয়া যায়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *নববাবু বিলাস* (১৮২৫) গ্রন্থে আমরা স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কহীন ধনাঢ্য ব্যক্তিদের 'দশ এয়ার ও রাঁড়' দ্বারা পরিবেষ্টিত জীবনের ছবি পাই।

'বাগান বাড়ি' যাওয়ার হুবহু বর্ণনা পাই ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় : 'দুই চারিজন এয়ার সঙ্গে লইয়া অপূর্ব্ব চেরেট গাড়ীতে আরোহণ করিয়া হাস্যবদনে হৃষ্টান্তঃকরণে বাগানে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে পরমবেশা শ্বেতকেশা গলিতমাংসা গলিতযৌবনা ভগ্নদশনা রতিপণ্ডিতা বহুমানিতা মধুরভাষিণী নিবিড় নিতম্বিনী বারাঙ্গনাপ্রধানা বকনাপেয়ারী কোঁকড়াপেয়ারী দামড়াগোপী ঝানঝাড়া রাধামণি, ছাড়ুখাগি মণি জয়বিবি প্রভৃতি আপন আপন সহচারিণী অর্থাৎ ছুকরী সঙ্গে লইয়া খালিপা সমভিব্যাহারে বাগানে আগমন করিলেন।'[১২৭] এটা একজন লেখকের কল্পিত কাহিনীমাত্র নয়, কারণ, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে ছিল ইংরেজ আগমনের ফলে হঠাৎ ধনস্ফীত কয়েকটি পরিবারের 'বাবু' সংস্কৃতির অমিতাচার প্রদর্শন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 'কালো জমিদার' গোবিন্দরাম মিত্রর রক্ষিতাদের নাম ছিল রতন, ললিতা, হরতন বিবি প্রভৃতি।[১২৮] কোন ব্যক্তির রক্ষিতাদের নাম যখন জানা যাচ্ছে, তখন বোঝা যায় যে অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি প্রকাশ্যেই রক্ষিতার পোষণ করতেন।

গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সমাজের ছবি প্রথমার্ধের থেকে অনেক পরিবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু সে সময়েও রক্ষিতা পালনের নীতি সমাজে বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত *হুতোম প্যাঁচার নকশায়* কালীপ্রসন্ন সিংহ দুর্গাপূজার শেষ দিনে অনুষ্ঠিত বাই ও খেমটা নাচের আসরে বহু ধনাঢ্য ব্যক্তির সপরিবার উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেছিলেন।[১২৯] ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *সমাজ কুচিত্র* প্রহসনে 'নিশাচর' ছদ্মনামের আড়ালে প্রহসনকার আলিপুরের কৃষিপ্রদর্শনীর বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন যে সেদিন

মেলা দেখতে অনেক ভদ্রলোক গিয়েছিলেন বলে গণিকালয়গুলি শূন্য পড়ে ছিল।[১৩০]

উনবিংশ শতাব্দীতে 'বড়মানুষের' রক্ষিতা পালন যে সামাজিক মর্যাদার মানদণ্ডে পরিণত হয়েছিল, তার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনায় : 'কোন ধনী কোন প্রসিদ্ধ বাঈজীর জন্য কত সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছেন সেই সংবাদ সহরের [কলকাতার] ভদ্রলোকদিগের বৈঠকে বৈঠকে ঘুরিত এবং কেহই তাহাকে দোষাবহ জ্ঞান করিত না। এমনকি বিদেশিনী ও যবনী কুলটাদিগের সহিত সংসৃষ্ট হওয়া দেশীয় সমাজে প্রাধান্য লাভের একটা প্রধান উপায় স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল,'[১৩১] এবং অন্যত্র তাঁর লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে 'কোন নবাগত ভদ্রলোকের নিকট পরস্পরকে পরিচিত করিয়া দিবার সময়ে—"ইনি ইহার রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকা বাড়ী করিয়া দিয়োছেন" এই বলিয়া পরিচিত করিতেন। রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকা বাড়ী করিয়া দেওয়া একটা মানসম্ভ্রমের কারণ ছিল।'[১৩২]

এই সামাজিক অবস্থার একটা সম্ভাব্য কারণ বোধহয় এই যে স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কহীনতা বা মানসিক দূরত্ব ছাড়াও রূপোপজীবিনীর বাহ্যিক চাল-চলন অনেক সময়ে পুরুষদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় বোধ হত, যা তারা ঘরের স্ত্রীর কাছে পেত না। তৎকালীন নাটকে, প্রহসনে এই ব্যাখ্যা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।[১৩৩] অনেক পুরুষ যারা 'খানকির বাড়ী গিয়ে টাকা নষ্ট' করত না, তারাও মাঝে মধ্যে ঘরের বউকে গণিকাদের মত সাজিয়ে তাদের সুপ্ত বাসনা পূর্ণ করত।[১৩৪]

স্ত্রীর সঙ্গে মানসিক দূরত্ব যেমন এর অন্যতম কারণ, সে রকম এই ঘটনাগুলি স্ত্রী-পক্ষীয় অসন্তোষ বৃদ্ধি করত। *সধবার একাদশী* (১৮৬৬) নাটকে দীনবন্ধু মিত্র ননদ-ভ্রাতৃবধূর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে এটি দেখিযেছিলেন।[১৩৫] কী ১৮২৫-এর *নববাবুবিলাস*-এ, কী তার চল্লিশ বছর পরে লেখা *সধবার একাদশী-তে,* কিম্বা আরও পরবর্তীকালের কোন রচনাতে, একই ছবি বার বার ফুটে ওঠে। বোঝা যায়, দাম্পত্য সম্পর্কের চেহারা গত শতকের বাঙালি সমাজের একটা স্তরে দীর্ঘদিন অপরিবর্তিত থেকে গিয়েছিল। এই ঠুনকো দাম্পত্য-সম্পর্ক নিয়ে স্ত্রীসমাজে হাস্য রসিকতা এতই চালু হয়ে গিয়েছিল যে একজন ননদ অনায়াসে তার ভ্রাতৃবধূকে দুদিনের জন্য নিজের স্বামী 'ধার' দেওয়ার প্রস্তাব দিতে পারত (যেমন, *সধবার একাদশী* নাটকে সৌদামিনী দিয়েছিল কুমুদিনীকে)।

॥ পাঁচ ॥

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে দাম্পত্য-বোধ সম্পর্কে স্পষ্ট কোন রীতি গড়ে উঠতে অস্বাভাবিক দীর্ঘ সময় লেগেছে। ওপরের আলোচনা থেকে এর কারণগুলি স্পষ্ট বোঝা যায়। যে সমাজে দাম্পত্য-সম্পর্কের ভিত্তি ছিল এত নড়বড়ে, সে সমাজের সাহিত্যে যে তার প্রতিফলন বিলম্বে পড়বে, তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু দাম্পত্য-সম্পর্ক বিষয়ে চিন্তাভাবনা থেমে থাকেনি এবং সাহিত্যেও এই চিন্তাভাবনার অনুপ্রবেশ ধীরে ধীরে ঘটেছিল। এটা বিশেষভাবে সত্য সাহিত্যের 'উচ্চ শ্রেণীর' রচনায় প্রতিফলিত দাম্পত্য-সম্পর্ক সম্বন্ধে।[১৩৬] শিক্ষিত শ্রেণীর রচনায় এবং সর্বোপরি তাদের জীবনবোধে এই নতুন চেতনার উন্মেষ সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। নায়ক-নায়িকার পূর্বরাগ, অনুরাগ, মিলন-বিরহ, মানভঞ্জন—এ সবই ছিল প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে। সুতরাং বিষয়বস্তুগত খুব যে একটা

পরিবর্তন হয়েছিল, তা নয়। তবে লক্ষণীয় হল যে উনবিংশ শতাব্দীতে ধীরে ধীরে নারী চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য বাংলা সাহিত্যে একটু একটু করে পরিস্ফুট হচ্ছিল। সামগ্রিকভাবেই, উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগীয় সাহিত্যাদর্শের বিধি-নির্দিষ্টতা থেকে মুক্তির ফলে চরিত্ররা অনেক বেশি স্বকীয়তা লাভ করেছিল।[১৩৭] এই প্রভেদ সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে নারীসত্তার জাগরণের ক্ষেত্রে। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজে মেয়েদের দুরবস্থা যতই সুদূর ব্যাপ্ত হোক না কেন, 'নারী' সম্বন্ধে ধারণা যে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই নারীসত্তার জাগরণের পরিচয় মেলে গত শতকের কয়েকটি লেখায়, মেলে কয়েকজন ভদ্রমহিলার আত্মকথনে। ফলত, আমরা পরিবর্তনের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করতে পারি। তবে, সে ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা প্রচুর।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে বাঙালি সমাজে প্রতীচ্যের প্রভাব কেবলমাত্র কয়েকটি ধার-করা নীতি-পুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না—এ প্রভাব পড়েছিল সমগ্র জীবনবোধে। জীবন সম্পর্কে এক নতুন ধারণা, এক নতুন মূল্যবোধ, দৈবের পরিবর্তে মানবত্বের প্রতি সতৃষ্ণ এক আকর্ষণবোধ— এইসব থেকে ধীরে ধীরে উন্মেষিত হয়েছিল নারী-সত্তার বিকাশ।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে পারস্পরিকতার দিকটি চমৎকার ফুটে উঠেছিল মেয়েদের প্রতি উপদেশমূলক একটি পুস্তকে। পুস্তকের এক জায়গায় মেয়েদের উদ্দেশে বলা হয়েছিল যে মেয়েরা যেন মনে না করে যে তারা তাদের স্বামীর বিলাসের দ্রব্য, আরামের স্থান বা গর্বের বিষয়, 'পরন্তু তুমি [স্ত্রী] তাঁহার [স্বামীর] সন্তানের জননী, গৃহের গৃহিণী, ক্ষুধাতৃষ্ণায় তৃপ্তিদায়িনী, সুখালাপে পরিতোষিণী, মর্য্যাদাপালনে কুটুম্বিণী, উপদেশে অন্তেবাসিনী, সেবায় আজ্ঞাকারিণী, বিষয়কর্মে মন্ত্রিণী, সৎকর্মে সহকারিণী, উৎপথগমনে বন্ধনী, বিপদ তরঙ্গে তরণী, শোক ব্যথায় সন্তাপহারিণী, রোগশয্যায় স্বাস্থ্যবক্ষিণী, ক্লেশ পরম্পরায় শান্তিবিধায়িনী, গুরু-পিতৃ-মহাজন-সমীপে ঋণশোধিনী, দেবগৃহে শুভার্থিনী, এবং সমস্ত জীবনপথে সহায়িনী।'[১৩৮] এই যে স্ত্রীকে 'সমস্ত জীবনপথে' 'সহায়িনী' রূপে কল্পনা, এর মধ্যেই দাম্পত্য ব্যাপারে উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালি মানসের বিপুল পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে।

একজন পুরুষ একজন নারীকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে পেতে চাইছে—নিছকই ভালবাসা, ভাললাগার কারণে, এটা উনিশ শতকের সমাজকর্তাদের কাছে যতই অবাস্তব ও অসম্ভব মনে হোক, নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালির কাছে তা ছিল একান্ত কাম্য। পশ্চিম থেকে আমদানি করা নতুন এই প্রেম-চেতনা উনিশ শতকের বাঙালির ব্যক্তিগত জীবনে যে রোমান্টিকতা এনেছিল, চিরাচরিত বাঙালি সমাজের তাব সঙ্গে কোন পরিচয়ই ছিল না। শুধু সাহিত্যে নয়, ব্যক্তিজীবনেও এর প্রভাব লক্ষণীয়। একটি ফুটফুটে গৌরবর্ণা কন্যার কাহিনী শুনিয়েছেন শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্মজীবনীতে। সে মেয়েটি এলেই বালক শিবনাথের পড়াশোনা মাথায় উঠত। তার বাড়ি ছিল শিবনাথের বিদ্যালয়ের পথে, সারাদিন লেখাপড়ার পর শিবনাথ ঐ পথ দিয়ে আসতেন, একটু খেলা করে।[১৩৯] এ নেহাৎই ছেলেবেলার কথা। এটিকে প্রেম-চেতনার আভাসমাত্র বলা যেতে পারে—তবে, শিবনাথ শাস্ত্রী যে পরবর্তী জীবনে এ বিষয়টিকে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তা থেকে আমরা বাঙালির মানসিকতায় পরিবর্তনের দিকটি অনুমান করতে পারি।

উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষার সূত্রপাতের যুগে যথার্থ 'প্রেম'-এর ঘটনাও অপ্রাপ্য নয়। 'ইয়াং বেঙ্গল' দলের অন্যতম সদস্য দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁর মন্ত্রগুরু ডিরোজিওর বোন

এমিলিয়াকে বিয়ে করবেন বলে কলকাতায় প্রচুর উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল।[১৪০] এই সূত্রে, পরবর্তীকালে দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে বর্ধমানের বিধবা মহারাণি বসন্তকুমারীর প্রেম ও পরে কলকাতায় তাঁদের বিবাহও উল্লেখযোগ্য ঘটনা।[১৪১] কিন্তু তার চেয়েও এক অসাধারণ প্রেম-কাহিনী শুনিয়েছেন নবীনচন্দ্র সেন। একটি মেয়ের ভালবাসার কাহিনী। মেয়েটির নাম বিদ্যুৎ। সে ভালবাসত নবীনচন্দ্রকে। নবীনচন্দ্র তখন কলকাতায় ছাত্র। একবার ছুটিতে বাড়ি এসে দেখেন, সেই বিদ্যুতের বিয়ে হয়ে গিয়েছে এক ঘরজামাইয়ের সঙ্গে। এই ঘর-জামাইটির সঙ্গে তার বিয়ে আরও আগেই হতে পারত, বিদ্যুৎ রাজি হচ্ছিল না। কিন্তু তা হলে সে শেষ পর্যন্ত রাজি হল কেন ? নবীনচন্দ্র তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করায় সে পালটা প্রশ্ন করেছিল, 'সে কথা শুনিয়া কি হইবে ?' নবীনচন্দ্রের পীড়াপীড়িতে বিদ্যুৎ উত্তর দিয়েছিল : 'এখানে ত আপনাকে এক একবার দেখিতে পাইব। সেখানে বিবাহ হইলে [নবীন তাঁর এক সহপাঠীর সঙ্গে বিদ্যুতের বিবাহের সম্বন্ধ এনেছিলেন] তাহাও যে হইত না।' এরপর নবীনচন্দ্র লিখছেন : 'জগতের এই চরম সুখ দুঃখ ভরা, এই স্বর্গ মর্ত্ত্য ভরা, এই উগ্র বিষামৃত ভরা, এই আত্মবলিদানের সংবাদ আমার মরমের মরমে পহুঁছিল। আমি এই উত্তরের গভীর অর্থ, প্রেমের প্রথম তত্ত্ব মরমের মরমে অনুভব করিলাম। এতদিন পুস্তকে পড়িয়াছি, হৃদয়ে অনুভব করি নাই। . . . আমি আত্মহারা হইলাম।'[১৪২]

নবীনচন্দ্র সেনের জন্ম ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর বয়স যখন কুড়ি, সেটা উনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের মধ্যভাগ। তখনও মেয়েদের বাড়ির বাইরে আসার স্বাধীনতা ছিল না, স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে বাঙালি-সমাজে তমুল দ্বন্দ্ব চলেছিল। এরকম যুগে কোন মেয়ের মুখ থেকে প্রেমের এত স্পষ্ট স্বীকারোক্তিতে 'আত্মহারা' হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বিদ্যুৎই একা নয়। নবীনচন্দ্রের জীবনে সেটাই হয়ত প্রেমের প্রথম 'মেঘদূত', কিন্তু গত শতকে আরও বহু প্রেমের কাহিনী পাওয়া যায়।

কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুচারুর সঙ্গে ময়ূরভঞ্জের মহারাজার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। রাজপরিবারের হস্তক্ষেপে পরিণয়ের পথে কাঁটা দেখা দিল বটে, কিন্তু প্রেমের ফুল তাতে শুকিয়ে যায়নি। সুচারু দেবীর বোন সুনীতি দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন যে সুচারুকে অন্যত্র বিয়ের জন্য জোর করলেও 'কিছুতেই তার [সুচারুর] মন থেকে তার প্রেমিকের স্মৃতি দূর করে দেওয়া সম্ভব হয়নি।'[১৪৩] এই স্মৃতি অনেকেই বুকে আঁকড়ে বসেছিলেন শেষ পর্যন্ত। কেউ সফলকাম, কেউ ব্যর্থ। কেবলমাত্র মেয়েরাই যে প্রেমাস্পদদের স্মৃতি রোমন্থন করে দিন কাটাত তা নয়। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) কিশোর বয়সে প্রমদা নামে একটি মেয়েকে ভালবাসতেন। হেমচন্দ্র-প্রমদার প্রেম ছিল যুগপৎ ও পারস্পরিক। কিন্তু পিতামাতা মেয়েটিকে অন্যত্র বিয়ে দেওয়ার ফলে তাঁদের স্বপ্ন সফল হয়নি। বিয়ে না হওয়ার জন্যে হেমচন্দ্র দেশাচারকে দোষ দিয়েছিলেন। 'হতাশের আক্ষেপ' কবিতায় তাকে বলতে শুনি :

কৌমার যখন তার বলিত সে বারংবার,
সে আমার আমি তার, অন্য কারো হবো না।
ওরে দুষ্ট দেশাচার কি করিলি অবলার
কার ধন কারে দিলি, আমার সে হলো না।[১৪৪]

এতো গেল প্রাক্-বৈবাহিক হৃদয়-দৌর্বল্যের কথা। কিন্তু জায়া-পতি সম্পর্কে প্রণয়হীনতার উল্লেখ উনবিংশ শতাব্দীর বহু রচনাতেই পাওয়া যায়।[১৪৫] উনবিংশ শতাব্দীর বিয়ের কনের মানসিক প্রস্তুতি কেমন থাকত নিস্তারিণী দেবী কিম্বা রাসসুন্দরী দেবীর রচনায় তার পরিচয় পাই। নিস্তারিণী দেবী (১৮৩২/৩৩-১৯১৬) তাঁর আত্মকাহিনী *সেকেলে কথায়* নিজের বিয়ের কথা বলতে গিয়ে আলোচ্য অংশের শিরোনামই দিয়েছিলেন, 'আমার আইবুড়ো নাম খণ্ডে গেল'। নিস্তারিণী দেবীর আত্মজীবনীতে বিয়ের কথা মাত্র সাত-আট পংক্তি—ঠিক এক অনুচ্ছেদ। অথচ উনবিংশ শতাব্দীতে মেয়েদের জীবনেব সবচেয়ে বড় ঘটনা ছিল বিয়ে। সেই বিয়ে সম্বন্ধে কী অসীম ভাবলেশশূন্যতা: 'বিবাহ হ'ল, বর চলে গেলেন, স্বপ্নের মত আমার আইবুড়ো নাম খণ্ডে গেল।' তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হল ঈশ্বর চট্টোপাধ্যায় নামে একজনের যে ছিল পৈতের সময় ন্যাড়া মাথায় কুল ভেঙে বিয়ে করে যারা বেড়াত, তাদেরই একজন। তবু এ ধরনের বিয়েকেও নিস্তারিণী দেবীর মতন মহিলারা কতটা শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন তা বোঝা যায় তাঁর রচনা থেকে : 'আমাদের স্বামী ভগবান, সর্ব্বস্ব।' নিস্তারিণী দেবীর স্বামী মাঝে মধ্যে অর্থলোভে শ্বশুরবাড়ি এলেও, অনেকে তাও আসত না।[১৪৬]

বিবাহের প্রকৃত অর্থ বোঝার মত বয়স হয়নি রাসসুন্দরী দেবীরও। আর, বিয়ে বলতে রাসসুন্দরী দেবী জানতেন লোকজন, বাজনদার, শঙ্খধ্বনী ও হুলুরব। এত আনন্দের আশ্বাস এক মুহূর্তে ফুৎকারে নিবে গেল যখন শ্বশুরবাড়িতে পাঠানোব জন্য বাপের বাড়ির লোকেরা তাঁকে পাল্কীতে তুলে দিলেন। সেই 'বিপদ সাগরে' পড়ে রাসসুন্দরী দেবীব মনে হয়েছিল, তাঁর অবস্থা যেন দুর্গাপুজো-শ্যামাপুজোর আগে দেখা বলির পাঁঠার মত। শ্বশুববাড়িতে গিয়ে নিজেই বলছিলেন, 'কোন গাছেব বাকল কোন গাছে লাগল।'[১৪৭]

হিন্দু সমাজের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী গত শতকে মেয়েদের বিয়ে এত অল্প বয়সে হত যে অধিকাংশ মেয়ের কাছে বিয়ে ছিল স্বপ্নের মত। শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসেও মেয়েদের বিয়ের বয়স নিযে সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিরই মানসিকতা বোধ হয় খুব একটা পরিবর্তিত হয়নি। 'সহবাস সম্মতি আইন' প্রণয়নের সময়ে (১৮৯১) যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল, সেই সংক্রান্ত রচনাও এই সাক্ষ্যই দেয়।[১৪৮] সমাজের বিপুলায়তন সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর বিবাহ-সম্পর্কিত নীতিজ্ঞানের সঙ্গে আমরা পরিচিত। কিন্তু সংখ্যাভিত্তিক হিসেবের বাইরে অত্যন্ত স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও পরিবর্তন যে ঘটছিল তার পরিচয়ও পাওয়া যায় সমকালীন রচনায়।

কেবল তাত্ত্বিক রচনা নয়, দাম্পত্য-জীবনে সম্বন্ধে ধর্মীয় বাতাবরণ (বিবাহ ঈশ্বরের অভিলাষের প্রকাশ) বাদ দিয়েও, বিবাহের মধ্যে নর-নারীর স্বাতন্ত্র্য আলাদা করে মর্যাদা পাচ্ছিল। নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত,নতুন ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ বাঙালির মনে প্রেম-চেতনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছিল মানবিকতার আলোকে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে বিচার করার মানসিকতা। খুব কম ক্ষেত্রে হলেও, কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য।

শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্মজীবনীতে প্রথমা পত্নী প্রসন্নময়ীর কথা লিখেছেন। বৈদিক কুলপ্রথা অনুযায়ী শিবনাথ শাস্ত্রী ও প্রসন্নময়ী দেবীর বিয়ের কথা স্থির হয়েছিল যখন তাদের বয়স যথাক্রমে দু বছর ও এক মাস। বিয়ে অবশ্য হয়েছিল আরও দশ বছর পরে। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে প্রসন্নময়ী খুব সমাদর লাভ করেননি। একবার (আনুমানিক

১৮৬৬ নাগাদ) প্রসন্নময়ী ও তার বাপের বাড়ির ওপর রাগ করে শিবনাথ শাস্ত্রীর বাবা ঘরের বৌকে পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দিলেন চিরতরে এবং তিনি ঠিক করলেন যে বংশরক্ষার জন্য শিবনাথ শাস্ত্রীর আবার বিয়ে দেবেন। উনিশ বছরের তরুণ শিবনাথ তখন 'কবিতারসে নিমগ্ন' তখন তার মন বিবাহ-বিষয়ক নতুন ভাবাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রসন্নময়ীর প্রতি অবিচার হচ্ছে। তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ মেনে নেবেন কীভাবে ?

তখনও শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেননি। তবে, মূল প্রশ্ন ধর্ম নিয়ে নয়, এটি মানসিকতায় পরিবর্তনের প্রশ্ন। শিবনাথের প্রাচীনপন্থী পিতা পুত্রের মনোজগতের তথা নতুন আদর্শের সুলুকসন্ধান রাখতেন না। বাবার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মতো সাহস ও সম্বল ছেলের ছিল না। ফলে দ্বিতীয়া স্ত্রী বিরামমোহিনীকে বিয়ে করতে হল বটে, কিন্তু 'নিরাপরাধা' প্রসন্নময়ীর সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। এটা ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের কথা। সে যুগে একজন পুরুষ তার স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইছে, এটা আজগুবি ব্যাপার ছিল। কিন্তু এর চেয়েও আশ্চর্য সঙ্কল্প নিয়েছিলেন শিবনাথ। তিনি স্থির করেছিলেন : 'দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনীকে আনিয়া পুনরায় তাঁহার বিবাহ দিব। তখনও আমি বিরাজমোহিনীকে পত্নীভাবে গ্রহণ করি নাই।'[১৪৯] এই সঙ্কল্প তিনি কতটা রক্ষা করতে পেরেছিলেন, তা বর্তমান আলোচনার পক্ষে অদরকারি। যা লক্ষ করার তা হল, কী গভীর নির্বেদ থাকলে একজন ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে অন্যের সঙ্গে বিবাহ দিতে সঙ্কল্প করতে পারে। *আত্মচরিত* পড়লে মনে হয় শিবনাথ শাস্ত্রী নিজেকে ক্ষমা করতে পারেননি দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্য। যদিও তিনি পিতৃ-আজ্ঞার 'বলি' হয়েছিলেন, তবু অস্বীকার করতে পারেননি যে এই 'অন্যায় কার্য্যে'র তিনিই প্রধান পুরুষ। ঘন বিষাদে নিমগ্ন হয়ে সে সময়ে নিজের অবস্থার কথা তিনি লিখেছেন : 'পা ফেলিবার সময় মনে হইত যেন কোন নীচের গর্তে পা ফেলিতে যাইতেছি। রাত্রি আসিলে মনে হইত আর প্রভাত না হইলে ভাল হয়।'[১৫০] শিবনাথ শাস্ত্রীর এই অনুতাপ একটি বিশেষ যুগের একটি বিশেষ মানসিকতার প্রতিফলন। গত শতকের ষাটের দশকের মধ্যভাগে তাঁর বন্ধুদের মধ্যে কেউ পড়ছিলেন মিলের রচনা, কেউ ভাবছিলেন সমাজ-সংস্কারের কথা। ব্রাহ্মধর্ম শহরের অতি সীমিত পরিধি অতিক্রম করে আকর্ষণ করছিলেন বৃহত্তর জনমণ্ডলীকে। তার সঙ্গে গড়ে উঠেছিল দাম্পত্য-বোধ সম্পর্কে নতুন ধ্যান ধারণা।

সামাজিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিবাহ বিষয়ে নতুন মূল্যবোধের প্রসার যে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তা বোঝা যায় দীনবন্ধু মিত্রের *জামাই বারিক* (১৮৭২) নাটকে বিজয়বল্লভের উক্তি থেকে। বিজয়বল্লভ তার পৌত্রীর বিবাহের সময় 'আদ্যরস'[১৫১] করতে চেয়েছিলেন। বিজয়বল্লভের ইচ্ছা ছিল মনোনীত পাত্রের সঙ্গে একটি কুলীনের মেয়ের বিবাহ দিয়ে তারপর তার পৌত্রীকে সেই পাত্রের হাতে সম্প্রদান করার। কিন্তু সেই পাত্রটি দুবার বিয়ে করতে চায় না, যদিও পাত্রের বাবার অমত ছিল না। এ বিষয়ে বিজয়বল্লভ বলেছিলেন: 'এ কালে ছেলে কি বাপকে মানে ? বাপের নিতান্ত ইচ্ছা আমার সঙ্গে এ ক্রিয়া করেন, কিন্তু ছেলে বাপের নয়, কোন মতে দুই বিয়ে করতে স্বীকার হয় না।'[১৫২] বিজয়বল্লভের উক্তি থেকে দুই প্রজন্মের মধ্যে মানসিকতার ব্যবধান সুস্পষ্ট ! আমরা এই পাত্রকে বিবাহ-সংক্রান্ত নব্য নৈতিকতার প্রতিভূ হিসাবে ধরে নিতে পারি, যার পক্ষে কুল রক্ষার চেয়ে

অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল নতুন মূল্যবোধ ও স্ত্রীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য।

স্ত্রীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি মর্যাদাদান প্রকৃতপক্ষে ছিল মানবমুখী 'রেনেশাঁস'-এরই অবদান। বাংলাদেশে উনিশ শতকে প্রতীচ্যের ভাবাদর্শের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের ফলে যে আত্মানুসন্ধানের সূচনা হয়েছিল, তাতে প্রথমে অতি স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি সাড়া দিলেও, ধীরে ধীরে এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। নব্য নৈতিকতার আর এক প্রতিভূ স্বয়ং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সে যুগে সর্ব বিষয়ে আধুনিকতার প্রবর্তক ঠাকুরবাড়ির ছেলে সত্যেন্দ্রনাথ বিলেতে গিয়েছিলেন আই. সি. এস. পরীক্ষা দিতে। এমনিতেই বহু দেশীয় রীতির বিরুদ্ধে ছিলেন তিনি, তার ওপর বিদেশের প্রভাব। বিদেশ থেকে স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে একের পর এক চিঠিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন বদ্ধ ঘরের চার দেওয়ালের বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য, বৃহত্তর জগৎ ও জীবনকে দেখার জন্য। ঝরোখা ভেঙে ফেলার স্বপ্ন দেখতেন তিনি। অবরোধ-প্রথার অবসান ঘটিয়ে মেয়েদের বাইরে নিয়ে আসার কথা অনেকেই বলতেন, কিন্তু নিজের জীবন দিয়ে এর পরীক্ষা খুব বেশি ব্যক্তি করতে পারেননি। সত্যেন্দ্রনাথ পেরেছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সঙ্গে দাম্পত্য-সম্বন্ধ স্থাপনের আগে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ককে আরও একটু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করতে উৎসাহী ছিলেন। শাস্ত্রে 'গর্ভাধান' সংক্রান্ত যে নিয়মই থাকুক, সত্যেন্দ্রনাথ স্থির করেছিলেন যে যতদিন পর্যন্ত স্ত্রী পরিণতা না হবেন বা যতদিন পর্যন্ত স্ত্রীর স্বাধীন মতামত গড়ে উঠবে না, ততদিন তাঁরা দাম্পত্য-সম্পর্কে প্রবেশ করবেন না। সুদূর প্রবাস থেকে প্রোষিতভার্তৃকা স্ত্রীকে লেখা তরুণ স্বামীর পত্রগুলি নতুন যুগের পরিবর্তিত মানসিকতার সবচেয়ে বড় দলিল। স্ত্রীকে 'ভাই' সম্বোধন করে চিঠি লেখাব রীতিই তো সে যুগের সমাজে অকল্পনীয় ছিল।[১৫৩] দেশীয় প্রথার সমালোচনা করে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে লেখা এক চিঠিতে তিনি পরিণত-বয়স্কা স্ত্রীকে নিজের দায়িত্ব গ্রহণের অধিকারও দিয়েছিলেন: 'তুমি এখন না জানি কত বড় হইয়াছ। এখন তোমার শরীরের স্ফূর্তি ও লাবণ্য বৃদ্ধি হইবার সময়। তোমার যৌবন-কুসুমের কলিকাবস্থা গিয়া তাহা এখন প্রস্ফুটিত হইতে চলিবে। তুমি এখন আপনিই আপনার রক্ষয়িত্রী—এবং তোমার আপনার মনের বলের উপর সুখ দুঃখ নির্ভর করিবে।'[১৫৪] সত্যেন্দ্রনাথের চিঠিতে আমরা মানসিকতায় পরিবর্তনের স্পষ্ট সুর শুনি। নারী যে নিজেই নিজেকে রক্ষা করবে, এটা চিরাচরিত ভারতীয় ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে। ভারতীয় চিন্তাধারা ছিল মনুর স্মৃতিশাস্ত্রের পন্থানুযায়ী। স্ত্রীজাতিকে বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী ও বার্দ্ধক্যে পুত্র রক্ষা করবেন এবং কোন অবস্থাতেই তারা স্বাধীন ভাবে থাকার যোগ্য নয়—মনুর এই বিধান স্ত্রী স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অন্যতম প্রধান যুক্তি হিসেবে ঊনবিংশ শতাব্দীতেও বিভিন্ন লেখাপত্রে ব্যবহৃত হয়েছিল।

শুধু যে মুখের কথায় 'আপনিই আপনার রক্ষয়িত্রী' বলে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা, তা নয়। স্ত্রীর নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্যও সত্যেন্দ্রনাথ বিস্মৃত হননি।

১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারি লন্ডন থেকে লেখা চিঠিতে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রীকে লিখলেন "আমাদের যখন বিবাহ হইয়াছিল তখন তোমার বিবাহর বয়স হয় নাই—আমরা স্বাধীন পূর্ব্বক [তদেব] বিবাহ করিতে পারি নাই, আমাদের পিতামাতারা বিবাহ দিয়াছিলেন। ইহা ভাই সত্য কি না? . . . যে পর্যন্ত্য তুমি বয়স্ক শিক্ষিত ও সকল বিষয়ে

উন্নত না হইবে, সে পর্য্যন্ত আমরা স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধে প্রবেশ করিব না। ইহা কি তোমার মনের ভাবের সঙ্গে মেলে না ? আমি যে তোমাকে কত ভালবাসি তুমি তা জান—আমি তা বাবা মহাশয়কে [দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে] লিখিয়াছি যে, যেমন উৎকৃষ্ট বীজ ফলিবার জন্য, উৎকৃষ্ট সরস জমির প্রতীক্ষা করে, আমি তোমার জন্য সেইরূপ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব।'[১৫৫] সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন জ্ঞানদানন্দিনীকে বিলেতে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে। সত্যেন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল বিদেশের অবরোধ-মুক্ত জীবনের স্বাদ যেন তাঁর স্ত্রী পান। তাঁর মনে হয়েছিল, 'আমাদের স্ত্রীলোকেরা এত অল্প বয়সে বিবাহ করে, যখন বিবাহ কি তাহারা জানে না ও আপনারা মনের স্বাধীনভাবে বিবাহ করিতে পারে না। তোমার বিবাহ ত তোমার হয় নাই, তাহাকে কন্যাদান বলে, তোমার পিতা কেবল তোমাকে দান করিয়াছেন। আমরা যখন আপনার স্বাধীনপূর্ব্বক প্রেমের সহিত বিবাহ বন্ধনে প্রবেশ করিতে পারিব, তখন কি সুখী হইব না ?'[১৫৬] স্ত্রীর মনোবাসনার প্রতি এভাবে সম্মান দেখানোর ঐতিহ্যও বাংলাদেশে ছিল না। এই সম্মান দেখানোর অর্থই হল, দাম্পত্য-সম্পর্কের অংশীভুক্ত স্ত্রীর পৃথক সত্তাকে স্বীকার করে নেওয়া।

উনবিংশ শতাব্দীতে নতুন মানসিকতা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে যে অধিকার দেওয়ার কথা দু-একজন চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন, তা দাম্পত্য-সম্পর্কিত নতুন চেতনার প্রতিফলক। আমরা গত শতকের একটি রচনায় পড়ি যে স্বামী স্ত্রীকে চিঠি লেখার সময়ে স্বামীর নাম ধরে সম্বোধনের স্বাধীনতা দিচ্ছে : 'স্বামীকে সম্বোধন করিয়া লিখিবার জন্য তোমার যাহা ভাল লাগে লিখিও . . . তাঁহাতে কাহারও আপত্তি করিবার অধিকার নাই, . . . অন্য স্বামীর কথা বলিতে পারি না, আমার ত তোমার ঐ একঘেয়ে "প্রাণেশ্বর", "প্রাণনাথ", "প্রাণকান্ত" ভাল লাগে না। নাম করিয়া ডাকার চেয়ে কি মিষ্টি কিছু আছে ?'[১৫৭] এই প্রস্তাবে যা সবচেয়ে লক্ষণীয়, তা হল স্বামীর পরিবর্তিত মনোভাব— স্ত্রী স্বামীকে কী সম্বোধনে ডাকবে বা চিঠি লিখবে, সে বিষয়ে অন্য কারও হস্তক্ষেপের কোন অধিকার নেই। কারণ, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক একান্তভাবে তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক—এ সম্পর্কের নির্ধারক তারাই, এবং সমাজের এ বিষয়ে কোন মালিকানা নেই। অথচ, এক সময়ে দেশাচার ও সামাজিক রীতি-নীতি দাম্পত্য-সম্পর্কের মধ্যে এতদূর হস্তক্ষেপ করত যে স্ত্রী-স্বামীকে কীভাবে পত্র লিখবে, সেটাও স্থির করার অধিকার স্ত্রীর ছিল না। বিদ্যাসাগরের *বর্ণপরিচয়* প্রকাশিত হওয়ার আগে বাঙালি সমাজে *শিশুবোধক* নামে একটি পুস্তক বহুল প্রচলিত ছিল। এই গ্রন্থটি মেয়েদেরও পাঠ্য ছিল। *শিশুবোধক*-এ স্বামীকে স্ত্রীর চিঠি লেখার জন্য আদর্শ চিঠির বয়ান থাকত। সেই চিঠির সুর সদ্য উদ্ধৃত চিঠির মূল সুর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। দৃষ্টান্ত হিসাবে চিঠির বয়ান মুদ্রণের অর্থ ছিল স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে সমাজের হস্তক্ষেপ। সেই সব 'আদর্শ' চিঠির প্রথম বাক্য ছিল, 'শ্রীচরণসরসি দিবানিশি সাধনপ্রয়াসী দাসী শ্রীমতী মালতী মঞ্জরী দেবী প্রণম্য প্রিয়বর প্রাণেশ্বর নিবেদনাঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীপদসরোরুহ স্মরণমাত্রে অত্র শুভবিশেষ।' চিঠির শিরোনামায় লিখতে হত : 'ঐহিক পারত্রিক নিস্তারকর্তৃক ভবার্ণব নাবিক শ্রীযুক্ত প্রাণেশ্বর মধ্যম ভট্টাচার্য্য মহাশয় পদপল্লবাশ্রয় প্রদানেষু।'[১৫৮]

পত্র লেখার এই দুটি ধারাকে আলোচনা করলে দুই যুগ ও দুই মানসিকতার দিকটি সহজে বোঝা যায়। স্ত্রীকে স্বামী নাম ধরে সম্বোধনের স্বাধীনতা দিচ্ছে, আমরা এটিকে

কোন একজন একক স্বামীর মনোগত বাসনা হিসাবে গণ্য না করে দাম্পত্য-সম্পর্কে পরিবর্তনের অন্যতম লক্ষণ হিসাবে গ্রহণ করতে পারি।

এই পরিবর্তন যে সত্যিই ধীরে ধীরে দেখা দিচ্ছিল, খুব সামান্য হলেও তার আরও দু-একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সমাজের ওপর-থেকে চাপানো রীতি-নীতির পরিধির মধ্যে যে মেয়েদের আটকে থাকতে হয়নি, তারা অনেক ক্ষেত্রেই খুব অবলীলায় দাম্পত্য সম্পর্কের একটি রূপ দিতে পেরেছিল। ধরা যাক, সরলা দেবীর কথা।সরলা দেবী খুব ছোটবেলা থেকে রেঙ্গুনে থেকেছেন, 'কনভেন্টে' পড়েছেন। মুখে তাঁর ইংরেজি কথা। বিয়ে হযেছিল হাইকোর্টের ব্যারিস্টার সতীশরঞ্জন দাসের সঙ্গে। ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে সরলা দেবী তার দিনলিপিতে লিখেছিলেন : 'সংসারের কিছু কাজ করিতে, ভাই ভগিনীদের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে ও পিতা মাতার কার্য্যের সাহায্য করিতে চেষ্টা করিব ভাবিযাছিলাম। এমন সময়ে সতীশ আমাব প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইলেন।'[১৫৯] সতীশরঞ্জন দাস নয়, সতীশরঞ্জনও নয়, 'উনি' 'তিনি' তো নযই, সোজাসুজি 'সতীশ আমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইলেন'। উনবিংশ শতাব্দীর মহিলাদের আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথার একঘেঁয়ে সুরের মাঝখানে, এমন অকুতোভয, অকুণ্ঠভাবে প্রেমাস্পদ ও পববর্তী জীবনের স্বামীকে সরাসরি নাম ধবে উল্লেখ অনভ্যস্ত কানে আচমকা এক নতুন সম্পর্কের বার্তা বযে আনে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে সম্পর্কের এই নতুনত্ব মূলত বিদেশি ভাবধারা-সঞ্জাত। নতুন নতুন সাহিত্য পাঠের ফলে শুধু যে বিদেশি দাম্পত্য-সম্পর্ক বাঙালি মানসকে প্রভাবিত করেছিল, তা নয়—এক অভূতপূর্ব রোম্যান্টিকতার জন্ম হযেছিল কযেকজন শিক্ষিত বাঙালিব মধ্যে। এই রোমান্টিকতা কেবল সাহিত্যের নবনির্মিতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ব্যক্তিজীবনেও এর অলক্ষ্য ছাযাপাত পড়ল।

দেবেন্দ্রনাথ দাস (১৮৫৭-১৯০৯) অত্যন্ত বিশদভাবে এমন একটি অবস্থার বর্ণনা করেছেন : 'নূতন প্রেমের বেগ কি দুর্ধষ্য [তদেব]। বর্ষাকালে জোয়াবের সময় নদীর বাঁধ খুলিয় দিলে যেমন উচ্চণ্ডভাবে নদীর জল বহিতে থাকে, তোলপাড় করিয়া সমস্ত জিনিস স্রোতের সঙ্গে ভাসিয়া লইয়া যায, সেইবূপ মহাবেগে আমার হৃদয় একবার প্রসর পাইযা জগদম্বার [লেখকের স্ত্রীর] হৃদযের দিকে ধাবিতে লাগিল। তাহাকে ভালবাসা ভিন্ন আর কিছুই সে সময়ে আমার অন্তরে রহিল না। মনের কি বিচিত্র গতি। ভালবাসার কি মোহিনী শক্তি।'[১৬০] এই 'মোহিনী শক্তি'র আরও পরিচয় আত্মজীবনীর পরবর্তী অংশে রেখে গিয়েছেন দেবেন্দ্রনাথ। স্ত্রীর সঙ্গে নিবিড়তা যে কতটা গভীর ছিল, তা বোঝা যায স্ত্রীর পিতৃগৃহে চলে যাওয়ার পরে যখন দেবেন্দ্রনাথ তার মনের কথা লেখেন। 'কাজলা' গ্রামের মেয়ে বলে স্ত্রীকে বলতেন 'কাজলানী'। আমরা দেবেন্দ্রনাথের মুখেই শুনি তাঁর সংকটময় দিনগুলির বর্ণনা : 'কাজলানী আমাকে একেবারে জীবন্মৃত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। সমস্ত ছাড়িয়া সেই জগদম্বার ধ্যানে মগ্ন রহিলাম। বাড়ীতে বাঙ্গালা, ইংরেজী যত মানচিত্র ছিল সব আনিয়া কেবল কাজলা চিহ্নের অন্বেষণে বিব্রত থাকিতাম। কিন্তু কোথায় বা কাজলা ? কোনটিতেই ঐ গ্রাম খুঁজিয়া পেতাম না, কাজলা—কাজলা—করিয়া আমি অধীর হইয়া পড়িলাম . . .

'রাত্রিতে আমার যন্ত্রণা একেবারে অসহ্য হইয়া আসিত। প্রেয়সী বিরহে সবই আমার পক্ষে কাঁটাময় বোধ হত, সকলই শূন্য দেখিতাম, ঘরে শুইতে যাইতে পা সরিত না।

আমার জগদম্বা সে বিছানায় শুইয়াছিল ভাবিয়া কতবার সে বিছানাকে চুমা খেলাম, বিছানার মশারী [তদেব] খাটের পায়া, সমস্ত ঘরের জিনিসপত্র—তাহার সুন্দর হাত সে সকল স্পর্শিয়াছিল ও সেই ঘরে ছিল বলিয়া—কতবার সেগুলোকে জড়িয়া [তদেব] ধরিতাম, কতবার তাহার রাঙ্গা পা দুখানি ঘরের মেঝে মাড়িয়াছিল [তদেব] স্মরিয়া ধড়াশ করিয়া মেজের উপর পড়িয়া যেতাম। কত মাস চলিয়া গেল তবুও যেন জগদম্বার গন্ধ বালিশে শুঁকিতাম, বালিশকে চোকের জলে ভাসাইয়া দিতাম, আর হা জগদম্বে—হা জগদম্বে—বলিয়া ফুঁফিয়া ফুঁফিয়া কাদিতাম।[১৬১]

কিন্তু পরিণত বয়সে আত্মকথা লিখতে বসেও যখন দেবেন্দ্রনাথ বিস্মৃত হননি সেই সব আবেগতপ্ত সদ্য-উত্তীর্ণ কৈশোরের দিনগুলির কথা, আমরা ধরে নিতে পারি, কাজলা গ্রামের দশ বছরর বালিকা সেই তরুণের মনকে কতটা রাঙিয়ে দিয়েছিল। এই রোমান্টিক প্রেম-চেতনা বিশেষ ভাবে উনবিংশ শতাব্দীর দান। ব্যক্তিগত প্রণয়ের এই নিবিড় সংরাগ মূলত বিদেশের ভাবধারা, বিদেশি সংস্কৃতি ও বিদেশি জীবনবোধের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়েরই অভ্রান্ত স্বাক্ষর বহন করে।

সমসাময়িক বহু রচনায়, বহু আত্মকাহিনীতে প্রেমের এই রূপকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। দেবেন্দ্রনাথ দাসের মত উন্মাদনা না থাকলেও অনেকেই যে উন্মনা হয়ে পড়তেন এটা সত্য। যেমন দেখি *স্ত্রী ও স্বামী* উপন্যাসে। এটি খুবই স্বল্পখ্যাত রচনা। কিন্তু দাম্পত্য-জীবনে পারস্পরিকতা যে বৃদ্ধি পাচ্ছিল এই উপন্যাসে স্ত্রীর জন্য স্বামীর আকুলতা থেকেই তার প্রমাণ। বিয়ের চার বছর পর স্বামী শ্বশুরবাড়ি এসেছে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য, অথচ রাত্রে ছাড়া দেখা করার উপায় নেই। স্বামী ছটফট করছে, শীতকালের বেলা তবু যেন ফুরায় না। অবশেষে রাত্রে বাড়ির দাসী অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকা তেরো বছরের বালিকা বধূকে ঘরে ঢুকিয়ে দিল। স্ত্রী শয্যায় শুয়ে আছে, আর সেই সময়ে স্বামী তার মানসিক অবস্থা বর্ণনা করছে : 'যাহাকে একবার দেখিবার জন্য এতক্ষণ উন্মত্ত হইয়া ছিলাম, যাহার একটা কথা শুনিতে পাইলে আমি স্বর্গসুখ অনুভব করি, যাহার নাম আজ চারি বৎসরকাল আমার জপমালা হইয়াছে, আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে যাহার চিন্তাই আমার জীবনের সর্বপ্রধান চিন্তা হইয়াছে, আমার জীবনের সেই ধ্রুবতারা এখন আমার পার্শ্বে শায়িতা।'[১৬২] (নিম্নরেখা আমার) স্ত্রীর জন্য বিরহের অনুভূতিই বাংলা সাহিত্যে এক নতুন অভিজ্ঞতা। নইলে, সাধারণ বাঙালি-জীবনে হয় স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর কোন সম্পর্কই থাকত না, নয় তো খুব বেশি হলে স্ত্রী ছিল একটি বৃহৎ পরিবারের অংশমাত্র—তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের অভাবে, পারিবারিক রীতিতে কিংবা ঐতিহ্যের দায়বদ্ধতায় পরিবার নিরপেক্ষ পৃথক ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্ফূর্তি হত না।

দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর সঙ্গে পারস্পরিকতা সে যুগের বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের যে কতটা প্রভাবিত করেছিল, তার অপর প্রমাণ বঙ্কিমচন্দ্র। সাধারণ বাঙালি সমাজের ছবি যাই হোক, নবজাত ভাবাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত শিক্ষিত বাঙালির ব্যক্তিগত জীবনে স্ত্রীর সাহচর্যের যে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছিল আগের তুলনায় অধিক, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসগুলিতে পত্নী সম্বন্ধে মানসিক ধারণার পরিবর্তনের বহু চিহ্ন ছড়ানো রয়েছে। *বিষবৃক্ষ* উপন্যাসে (১৮৭৩) সূর্যমুখী গৃহত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর বঙ্কিমচন্দ্র নগেন্দ্রনাথের নিজের মনে চিন্তার যে বর্ণনা দেন, তার মাধ্যমে আমরা এই

পরিবর্তনের স্বরূপটি বুঝতে পারি। নগেন্দ্রনাথ ভাবছে, তার তো সবই আছে— অতুল ধন, পর্যাপ্ত বুদ্ধি ও শিক্ষা,মোহনরূপ—সবই ঈশ্বর তাকে দিয়েছিলেন, এমন কি 'ইহার অপেক্ষাও যে ধন দুর্লভ—যে একমাত্র সামগ্রী সংসারে অমূল্য অশেষ প্রণয়শালিনী সাধ্বী ভার্য্যা—ইহাও তাঁহার প্রসন্ন কপালে ঘটিয়াছিল।'[১৬৩] (নিম্নরেখা আমার)। দাম্পত্য প্রণয় স্বামীর অন্যান্য সুখ ও সম্পদের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে শুরু করেছিল, তা স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসে এই উদ্ধৃতি থেকে।

বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্ম ছিলেন না, সুতরাং ব্রাহ্মদের নারী-পুরুষের সম্বন্ধ সম্পর্কীয় তত্ত্ব প্রচারের কোন আবশ্যকতা তাঁর ছিল না। কিন্তু তাঁর শিক্ষিত মানসিকতায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে পারস্পারিক নির্ভরশীলতাই প্রধান হয়ে উঠেছিল। *বিষবৃক্ষ* উপন্যাসে নগেন্দ্রনাথের চিন্তায় স্ত্রীর যে মূর্তি তিনি এঁকেছিলেন, তা দু-এক জায়গায় পড়তে অনেকটা ব্রাহ্মদের পত্রিকার মত লাগে। স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিকতা এতদূর প্রাধান্য পেয়েছিল যে নগেন্দ্রনাথের কাছে সূর্যমুখী বাবা-মা-ছেলের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নগেন্দ্রনাথ ভাবছেন: 'আমি সূর্য্যমুখীর বধকারী—কে এমন পিতৃঘ্ন, মাতৃঘ্ন, পুত্রঘ্ন আছে যে, আমার অপেক্ষা গুরুতর পাপী ? সূর্য্যমুখী কি কেবল আমার স্ত্রী ? সূর্যমুখী আমার সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী। . . . সংসারে সহায়, গৃহে লক্ষ্মী, হৃদয়ে ধর্ম্ম, কণ্ঠে অলঙ্কার।'[১৬৪] ১২৭৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধের (পুস্তকাকারে *বিবিধ প্রবন্ধ-প্রথম ভাগ* নামে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত) প্রথম দিকে স্বামীর জীবনে স্ত্রীর মূল্য নির্দেশ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র স্ত্রীকে স্বামীর দাসী, শয়নে অপ্সরা, বিপদে বন্ধু, রোগে বৈদ্য, কার্যে মন্ত্রী, ক্রীড়ায় সখী, বিদ্যায় শিষ্য, ধর্মে গুরু, আশ্রমে আরাম, প্রবাসে চিন্তা, স্বাস্থ্যে সুখ, রোগে ঔষধ ,অর্জনে লক্ষ্মী, ব্যয়ে যশ, বিপদে বুদ্ধি ও সম্পদে শোভা বলে বর্ণনা করেছিলেন।[১৬৫] পাঠ করলে অনিবার্যভাবে স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর সম্পর্ক নিয়ে লেখা ঈশানচন্দ্র বসুর পূর্বোল্লিখিত *নারী-নীতি* গ্রন্থের কথা মনে এসে যায়।

স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা যে কত পালটে যাচ্ছিল, তা আমরা নগেন্দ্রনাথ-সূর্যমুখী সংক্রান্ত একটি কবিতা থেকেও বুঝতে পারি। কবিতাটিরও নাম 'বিষবৃক্ষ'। কবিতার উপজীব্য বিষয় অত্যন্ত মামুলি—সূর্যমুখীর সন্ধানে বিফল মনোরথ নগেন্দ্রনাথ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল, কবিতার লেখিকা মহিলা—গিরিবালা সেনগুপ্ত। অর্থাৎ, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তনের ফলে স্ত্রী যে স্বামীর জীবনে আরও গুরুত্বপূর্ণ হযে উঠছে, এটি মহিলারাও বুঝতে পারছিলেন। 'বিষবৃক্ষ' কবিতার পঞ্চম স্তবকের এক জাযগায় আছে যে অনুতপ্ত নগেন্দ্রনাথ সাধ্বী স্ত্রীর মর্যাদা বুঝতে পেরেছেন :

মরতে পুরুষাধম আমি পাপী পশুসম,
পেয়ে হারাইনু যাহা পাব কি তা আর ?
আমাকে করিতে সুখী কোথা গেলে প্রাণসখি।
সূর্য্যমুখি। এস দেখি মু'খানি তোমার।[১৬৬]

স্বামীর নিত্য-অবহেলায় অভ্যস্তা স্ত্রী আর অনুতপ্ত স্বামীর সাধ্বী স্ত্রীর সন্ধান, এই দুই কল্পনার মধ্যে যে আ-মেরু দূরত্ব, দাম্পত্য-সম্পর্কে একেবারে কোন পরিবর্তন ছাড়া তা সম্ভব নয়।

স্ত্রীর নিজস্ব সত্তার প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ না করা আপামর বাঙালির চিরন্তন ঐতিহ্যর সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল, যে, নতুন আদর্শে বিশ্বাসী, নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ এই নব্য সম্প্রদায়ের স্ত্রী-সম্পর্কিত আচরণকে তারা পৌরুষের অভাব বলে গণ্য করত—এটা ছিল তাদের কাছে 'পত্নীভয়'-এর লক্ষণ : '. . . তবে আধুনিক যুবকেরা যে কোন পূজা করিয়া জলগ্রহণ করেন, এ কথা আমরা বলিতে পারি না। শিবপূজা, গুরুপূজা করুন বা না করুন তাঁহারা প্রতিদিন গৃহিণীর পাদপদ্ম পূজা করিয়া থাকেন।'[১৬৭] গত শতকে এ ধরনের অভিযোগ নিয়ে লেখালেখি কিন্তু নেহাৎ কম হয়নি।[১৬৮]

প্রকৃতপক্ষে, এই উপহাস ('গৃহিণীর পাদপদ্ম পূজা' প্রভৃতি) এক জাতীয় মানসিক দূরত্বকেই ইঙ্গিত করে— এই দূরত্ব দুই প্রজন্মের, দুই মানসিকতার। উনবিংশ শতাব্দীতে অনেক উদার মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিও দাম্পত্য-সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্ত্রীর নিজস্ব সত্তা একটা সীমারেখার পর আর মেনে নিতে পারেন নি। এটা কেবল দাম্পত্য-সম্পর্কের ক্ষেত্রে আলাদা করে উল্লেখ করা অনুচিত— গোটা বিষয়টি গত শতকের নারীমুক্তির প্রশ্নের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

খুব সহজে মনে আসে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম। 'প্রগতি'র সঙ্গে যে পরিবারের নাম উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় প্রায় সমার্থক হয়ে গিয়েছিল, সেই ঠাকুরবাড়ির প্রধান পুরুষ দেবেন্দ্রনাথ, ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের কর্ণধার দেবেন্দ্রনাথ এবং *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার* উদার মতাবলম্বী দেবেন্দ্রনাথও কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা সীমারেখার পর ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে বিলেতে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে দেবেন্দ্রনাথকে চিঠি লেখেন, দেবেন্দ্রনাথ তাতে সম্মতি দেননি। অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে বিলেত থেকে এক চিঠিতে (২.৭.১৮৬৪) সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে লিখেছিলেন : 'বাবা মহাশয় চান আমি যেন অন্তঃপুরের মান মর্য্যাদার উপর হস্তক্ষেপ না করি, অর্থাৎ তোমাকে চিরজীবনের মত চারি প্রাচীরের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখি। আমি ত ভাই বুঝিতে পারি না বাবা মহাশয়ের এই ইচ্ছা কেমন করিয়া রক্ষা করি।'[১৬৯]

অথচ দাম্পত্য-জীবনে শুধু স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য নয়, বিবাহ বিষয়েও স্বাধীনতার ধারণা অনুপ্রবেশ করেছিল বাঙালি সমাজে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে অন্তিম লগ্নে এসেও পাত্রপাত্রীর নিজস্ব পছন্দ অপছন্দ বিবাহর প্রথা হিসেবে স্বীকৃত হয়নি। রক্ষণশীল গোঁড়া সমাজ 'কোর্টশিপ'কে নিয়ে যথেষ্ট ঠাট্টা করতেও কসুর করেননি। তবু, গত শতকের চল্লিশের দশক থেকে বিদেশি সাহিত্য পাঠের ফলে পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে যে পরিবর্তিত ধারণার সৃষ্টি হতে শুরু করে, তার পরিণতি হিসাবে বিদেশি রীতির অনুকরণে পাত্র-পাত্রীর প্রাক-বৈবাহিক পছন্দ-অপছন্দের প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হয়। ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দেই অক্ষয়কুমার দত্ত স্বামী ও স্ত্রী যে নিজেরা পছন্দ করে বিয়ে করতে পারে না, এই প্রথাকে অন্যতম সামাজিক 'কুরীতি' বলে বর্ণনা করেন।[১৭০]

১৮৪০-এর দশকের পক্ষে যথেষ্ট যুগান্তকারী হলেও, ১৮৫০-৬০-এর দশক থেকে বিয়ের আগে পাত্র-পাত্রীর পছন্দের দাবি নিয়মিত উঠতে শুরু করেছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত নিজেই দাবি জানান যে বিয়ের আগে পাত্র-পাত্রীর 'সাক্ষাৎকার, সদালাপ . . . হওয়া আবশ্যক।'[১৭১] তাঁরা স্বেচ্ছায় বিবাহ করতে পারেননি বলে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে যে আক্ষেপ করে পত্র লিখেছিলেন তাও এই পরিবর্তিত মানসিকতার ফল। মেয়েদের ওপর নানা অত্যাচার বর্ণনা করতে গিয়ে *অদ্ভুত স্বপ্ন বা স্ত্রী পুরুষের দ্বন্দ্ব* গ্রন্থেও এই ধরনের উক্তি একটি মেয়ের মুখ দিয়ে করানো হয়েছিল। যেমন, বাল্যবিবাহের দোষ বর্ণনা করতে গিয়ে স্ত্রী স্বামীকে বলছে : 'আমাদের দেশে যে বিবাহ হইয়া থাকে তাহা কি বাস্তবিক বিবাহ পদবাচ্য ? আমার যখন বিবাহ হইয়াছিল তখন কি আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম কে আমার স্বামী হইতেছে ? . . . অধিক বয়সে অর্থাৎ যখন জ্ঞান সঞ্চার হয়, তখন যদি বিবাহ হইবার নিয়ম হইত, তাহা হইলে কি আমরা নির্ব্বাচন করিয়া মনোমত স্বামী গ্রহণ করিতে পারিতাম না ? এবং তাহা হইলে কি সকল রমনীর কষ্ট নিবারণ হইত না ?'[১৭২]

মেয়েদের মুখ দিয়ে 'কোর্টশিপে'র কথা বলানো হলেও, এ দাবির উদ্ভব নারী-সমাজ থেকে হয়েছিল এ কথা বলা যায় না।

নতুন চেতনার ফলে পুরুষের কল্পনায় নারীর যে মানস-মূর্তি অঙ্কিত হচ্ছিল, তাতে নারী শুধু ভালবাসার সামগ্রী রইল না, এখন সে ভালবাসা চাহিদা করতেও সক্ষম। এই সচেতনতা থেকেই স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের পছন্দ-অপছন্দ সংক্রান্ত আলোচনার সূত্রপাত। ভাবের জগতে এই নতুন পরিবর্তনটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

এ ধরনের চিন্তাও ছিল পশ্চিম থেকে আমদানি করা। পাত্র-পাত্রীরা নিজেরা বিয়ের জন্য 'দেখাশোনা' করছে, এটা আমাদের সমাজে আদৌ ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীতে এটা একান্তভাবেই চিন্তার জগতে সীমাবদ্ধ ছিল। দীনবন্ধু মিত্রর রচনার সমালোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন : '. . . লীলাবতী বা ললিতের বেলা ভাষা বিকৃত কেন ? . . . [কারণ] এখানে অভিজ্ঞতার অভাব। প্রথমে নায়িকাদের কথা ধর। লীলাবতী বা কামিনীর শ্রেণীর নায়িকা সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, কেন না, কোন লীলাবতী বা কামিনী বাঙ্গালা সমাজে ছিল না বা নাই। হিন্দুর ঘরে ধেড়ে মেয়ে, কোর্টশিপের পাত্রী হইয়া, যিনি কোর্ট করিতেছেন, তাঁহাকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে, এমন মেয়ে বাঙ্গালী সমাজে ছিল না—কেবল আজিকাল নাকি দুই একটা হইতেছে শুনিতেছি। ইংরেজের ঘরে তেমন মেয়ে আছে, ইংরেজ কন্যাজীবনই তাই।'[১৭৩] 'ইংরেজ কন্যাজীবনে'র কাহিনী ও তাঁদের সামাজিক অবস্থার বিবরণ সাহিত্যের মাধ্যমে পাঠ করে নবীন বাঙালি মন বিবাহরীতির প্রাচীন বদ্ধতা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল পাত্র-পাত্রীর নিজস্ব পছন্দের স্বাধীনতায়।[১৭৪]

শুধু প্রাক্-বৈবাহিক পর্বে নারী পুরুষ পরস্পরের ইচ্ছা—অনিচ্ছার দাম দেওয়া নয়, দাম্পত্য-জীবনে পারস্পরিক নৈকট্যের পথ প্রস্তুত করার জন্য মহিলাদের বহু পত্রিকায় স্ত্রীকে স্বামীর উপযুক্ত হিসাবে তৈরি করার জন্য জরুরি আচার-বিধির ওপর প্রচুর লেখালেখি হয়েছে।[১৭৫] এটা প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীর ভূমিকা সম্বন্ধে পুরুষের বাসনা-কামনার প্রতিফলন।

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর স্ত্রী বালাসুন্দরী দেবীকে (১৮৩৩-১৮৫১) সে যুগের পক্ষে যথেষ্ট 'আধুনিক' করে তুলতে চেয়েছিলেন—এমনকি, স্ত্রীর যথাযথ শিক্ষার জন্য তিনি ইংরেজ গভর্নেসেরও ব্যবস্থা করেছিলেন।[১৭৬] সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলেত থেকে পত্রের মাধ্যমে তাঁর স্ত্রীর খোঁজ নিতেন। সত্যেন্দ্রনাথ বিলেত থেকে হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ পুত্র ও সত্যেন্দ্রনাথের ঠিক পরের ভাই) অনুরোধ করেছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার জন্য।[১৭৭] গিরিশচন্দ্র সেন রাত্রে সকলে ঘুমিয়ে পড়ার পর স্ত্রীকে বর্ণপরিচয় পড়াতেন।[১৭৮] কেশব সেনের মা সারদাসুন্দরী দেবীকে তাঁর স্বামী প্যারীচরণ সেন বিদ্যাশিক্ষায় সর্বদা উৎসাহ দিতেন ও রাত্রে নিজেই স্ত্রীকে পড়াতেন।[১৭৯] সীতানাথ তত্ত্বভূষণ (বিবাহ ১৮৮৫, পরবর্তী কালে ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি) বিয়ের পর তাঁর স্ত্রী নগেন্দ্রবালা দত্তকে পড়াতেন। তাঁর কন্যা ও জীবনীকার জ্যোতির্ময়ী মুখোপধ্যায় লিখেছেন যে সীতানাথের দিনলিপি থেকে জানা যায় কীভাবে রোজই তিনি স্ত্রীর শিক্ষকতা করতেন।[১৮০]

এই ধরনের গৃহশিক্ষায় স্ত্রী স্বামীর সমান শিক্ষিত হয়ে উঠবে, কেউই কিন্তু তেমন কোন আকাশকুসুম কল্পনার বশবর্তী হয়ে স্ত্রীকে শিক্ষিত করতে চাননি। কিছুটা শিক্ষা দিলে স্ত্রী স্বামীর মন, ভাবাদর্শ প্রভৃতি আরও গভীর ভাবে অনুভব করতে পারবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামীদের এই বিশ্বাসই প্রধান ছিল। তাই শিক্ষা ছিল স্ত্রীকে মনের মত করে গড়ে তোলার প্রথম সোপান। যেখানে স্ত্রীর ভূমিকা সম্বন্ধে স্বামীর চিন্তাভাবনা কেবল শিক্ষাদানেই সীমিত ছিল না, সে সব ক্ষেত্রে স্বামীরা চেষ্টা করতেন লেখাপড়া শেখানোর চেয়ে আরও একটু অগ্রসর হয়ে তাদের ধ্যান-ধারণাকে বাস্তবায়িত করতে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অবরোধপ্রথার বিলোপ চাইতেন এবং তিনি ছিলেন স্ত্রী-স্বাধীনতার সপক্ষে। ঘরের মেয়েদের তিনি বাড়ির বাইরে আনতে চাইতেন—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অসম্মত হওয়ায় জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে বিলেতে নিয়ে যেতে পারেননি বটে, কিন্তু বড়লাটের বাড়িতে এক নৈশ ভোজসভায় (১৮৬৬) স্ত্রীকে পাঠিয়েছিলেন।[১৮১]

স্ত্রীকে এভাবে জীবনসঙ্গিনীর সঙ্গে মানস-সঙ্গিনী হিসেবে গড়ে তোলার যে মানসিকতা, স্ত্রীকে ব্যক্তিগত সুখদুঃখের শরিক হিসেবে প্রস্তুত করার যে দুর্দমনীয় স্পৃহা ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে লক্ষ করা যায়, তারও মূলে ছিল সেই নতুন মূল্যবোধ যা পরিবারের মধ্যে স্ত্রীর সম্মান সম্বন্ধে বাঙালিকে সচেতন করেছিল, জাগ্রত করেছিল দাম্পত্য-সম্পর্কীয় নতুন ধারণা, বিকশিত করেছিল এক নতুন প্রেমবোধ। যাঁরা বাঙালি মনের অন্তঃস্থলে ঘটে চলা এই পরিবর্তনের সন্ধান রাখতেন না, তারা ঠিক এর গুরুত্বও উপলব্ধি করতে পারতেন না। এমন নয় যে তাঁরা মেয়েদের দুরবস্থা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না, কিন্তু স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের ক্ষেত্রে তারা অধিকাংশ স্থলেই চিরাচরিত ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। যেমন পারেননি শিবনাথ শাস্ত্রীর বাবা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা প্রসন্নকুমার ঠাকুর। বড়লাটের বাড়িতে যে নৈশভোজে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী গিয়েছিলেন, সেখানে প্রসন্নকুমার ঠাকুরও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বাইরের পুরুষের সামনে 'ঘরের বৌকে প্রকাশ্য স্থলে দেখে রাগে লজ্জায় সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে'[১৮২] গিয়েছিলেন। কারণ, তাঁর সঙ্গে নতুন মানসিকতার সম্যক পরিচয় ছিল না।

এই নতুন বিকশিত প্রেমবোধ বাঙালির জীবনে তার সমস্ত জটিলতা, ভীরুতা,

আত্মত্যাগ ও যন্ত্রণা নিয়ে কী বিপুলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে সমসাময়িক সাহিত্যে। বাঙালি-জীবনের ওপর প্রেমানুভূতির প্রভাবের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'প্রেমের অভিষেক' কবিতাটি। সাধারণ মানুষের অতি সাধারণ জীবনকে প্রেম তার নিজস্ব মহিমায় করে তোলে মহিমান্বিত, জীবনকে দান করে এক বিশেষ অর্থ। প্রেমের এই রূপটিকে ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে কবিতায় প্রকাশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রেমের জয়গান গেয়ে তিনি বলে ওঠেন :

তুমি মোরে করেছ সম্রাট। তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরবমুকুট। পুষ্পডোরে
সাজায়েছ কণ্ঠ মোর, তব রাজটিকা
দীপিছে ললাটমাঝে মহিমার শিখা
অহর্নিশি। আমার সকল দৈন্য-লাজ
আমার ক্ষুদ্রতা যত ঢাকিয়াছি আজ
তব বাজ-আস্তরণে।[১৮৩]

'ধূলিমাখা' যে করণিকের বাস্তব ছবি রবীন্দ্রনাথ এঁকেছিলেন, 'শতসহস্রের পরিচয়হীন প্রবাহ' থেকে প্রেম তাকে উত্তীর্ণ করে 'অমৃত আলযে' যেখানে দাঁড়িয়ে সে প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারে :

আমি জ্যোতিষ্মান
অক্ষয়যৌবনময় দেবতাসমান,
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা,
সেথা মোরে অর্পিয়াছে আপন মহিমা
নিখিল প্রণয়ী, সেথা মোর সভাসদ
রবিচন্দ্রতারা, পরি নব পরিচ্ছদ
শুনায় আমারে তারা নব নব গান
নব অর্থভরা—চিরসুহৃদসমান
সর্বচরাচর।[১৮৪]

এই 'নব অর্থভরা' 'নব নব গানে'র মূর্চ্ছনা উনিশ শতকের বাঙালি চিত্তাকাশকে বারবার আলোড়িত করেছিল। বাঙালি জীবন ও বাংলা সাহিত্যে প্রেমের এই বিচিত্র প্রকাশ দেখলে বিশ্বাসই হয় না যে এই নতুন ভাবাদর্শের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি সমাজের সঙ্গে তার কত দূরত্ব ছিল। সে যুগের কয়েকজন ব্যক্তির জীবনীতেও এই নতুন চেতনার প্রভাব লক্ষ করা যায়।

হিন্দু সমাজের তুলনায় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশা ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি। যখন হিন্দু সমাজে বাড়ির বাইরের পুরুষের সামনে মেয়েদের বের হওয়া নিন্দনীয় বলে মনে করা হত, সেই সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের মেয়েদের ক্ষেত্রে এই বিধি নিষেধের

কড়াকড়ি ছিল অনেক কম। ১৮৭২-৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ব্রাহ্মদের প্রতিষ্ঠিত 'ভারতাশ্রম' সভায় 'নরনারী সম্মিলিত হইয়া প্রত্যহ স্নানান্তে ব্রহ্মপোসনা করিবেন, নির্দ্ধারিত হইল। . . . প্রত্যেক পরিবারের মহিলাদিগের শিক্ষার ও সদালোচনার ব্যবস্থা হইল। যুবকদিগের মধ্যে অনেকেই আত্মীয়া [অর্থাৎ, 'ভারতশ্রম' পরিবারের সভ্যবৃন্দা] মহিলাদিগের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন।' ব্রহ্ম মন্দিরে ব্রাহ্মিকাদের প্রকাশ্যে বসে উপাসনা করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল।[১৮৫] শুধু 'ভারতাশ্রম' নয়, ব্রাহ্ম সমাজের অন্যান্য অনুষ্ঠানেও পুরুষ ও নারীর মেলামেশার অধিকার ছিল রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারের তুলনায় বেশি।

কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে সুদক্ষিণা (১৮৫৯—১৯৩৪) ও তাঁর ছোট বোনকে নিয়ে তাঁদের মা ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিয়েছিলেন মূলতঃ হিন্দুসমাজের রীতি-নীতি থেকে বক্ষা পাওয়ার জন্য। সুদক্ষিণার বিয়েও হয়েছিল এক ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীর সঙ্গে এবং তিনি তাঁদের পূর্বপরিচিত ছিলেন। এমনকি, সুদক্ষিণার স্বামী অম্বিকাচরণ সেন ঢাকায় সুদক্ষিণারা যে বাড়িতে ছিলেন, সেখানে রাত্রিবাসও করেছিলেন এবং সেখানেই তাঁদের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হয়েছিল।[১৮৬]

কেশবচন্দ্র সেনের দুই মেয়ে সুনীতি এবং সুচারুরও বিয়ে হয়েছিল পূর্বপরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গেই। এঁরা কেউই ব্রাহ্ম পরিবারে বিয়ে করেননি এবং তাঁদের বিয়ে নিয়ে উদ্ভূত সমস্যা সেদিন শিক্ষিত বাঙালি সমাজে অত্যন্ত আলোচিত একটি বিষয় ছিল। এর মধ্যে সুনীতি দেবীর (১৮৬৪-১৯৩২) বিয়েই সবচেয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল কারণ এ বিয়ে উপলক্ষ্য করে ব্রাহ্ম সমাজ ভেঙে গিয়েছিল।[১৮৭] সুনীতি দেবীর বিয়ে ঠিক হয়েছিল চোদ্দ বছর বয়সে, কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে। নৃপেন্দ্রনারাযণ নিজেই দেখতে এসেছিলেন পাত্রী। পরবর্তীকালে রচিত আত্মজীবনীতে সেই সাক্ষাতের একটি লজ্জানম্র, সুকুমার বর্ণনা দিয়েছিলেন সুনীতি দেবী। নিজের স্বীকারোক্তি অনুসারে প্রথমে ভারি ঘাবড়ে গিয়েছিলেন তিনি। আত্মজীবনীতে এটিকে এক 'সঙ্কটময় মুহূর্ত' ('critical moment') বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। মহারাজা ও তাঁর সঙ্গীর মধ্যে কোনজন নৃপেন্দ্রনারায়ণ, তা বুঝতে পারেননি সুনীতি দেবী। এই সময়ে কেশব সেন একটি বাক্স দেখিয়ে সুনীতি দেবীকে বললেন,. এটি মহারাজ এনেছিলেন। তারপর চার চোখের মিলন হওয়া মাত্রই প্রেম : 'I looked up, and as I did so I met the Maharajah's eyes fixed on me full of love, and I blushed. From that moment my future husband and I loved each other. He was so handsome and so charming.'[১৮৮] পরে বহু বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁদের বিবাহ শেষ পর্যন্ত হয়েছিল। কেশব সেন-এর সেজো মেয়ে সুচারু দেবীর (১৮৭৪-১৯৬৭) বিয়ে বহুদিন পর্যন্ত হয়নি, পাত্রীর নিজের অনমনীয় প্রতিজ্ঞার কারণে। তাঁর বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়েছিল ময়ূরভঞ্জের মহারাজা রামচন্দ্রের সঙ্গে। কিন্তু রামচন্দ্রের পরিবারের অনিচ্ছার ফলে সেই বিয়ে হতে পারেনি। রামচন্দ্রের বিয়ে হয়েছিল অন্যত্র। সুচারু দেবী অন্যপূর্বা হয়ে আর কোন পাত্রকে বিয়ে করতে সম্মত হলেন না। শেষে রামচন্দ্রের প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর সুচারু-রামচন্দ্রের পরিণয় সম্পন্ন হয়েছিল।[১৮৯]

পরিচিত ঘরে বিয়ে হয়েছিল শ্রীনাথ ঠাকুরের মেয়ে ইন্দিরা দেবীরও (১৮৬৩-১৯০৩)। তখন কনে-দেখা কী রকম ছিল, তার কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় ইন্দিরা দেবীর

আমার খাতা থেকে। ইন্দিরার বয়স তখন মাত্র তেরো, পড়ছেন রামায়ণ, মহাভারত, সুশীলার উপাখ্যান, প্রভৃতি। একদিন তাঁর এক পিসতুতো বোন এসে খবর দিলেন যে দেবেন্দ্রনাথের এক প্রিয় শিষ্যকে পাওয়া গিয়েছে—সচ্চরিত্র এবং কবি। এমনটি আর পাওয়া যাবে না। মাঘোৎসবের দিন শ্রীনাথ ঠাকুর পাত্র প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে দেখতে জোড়াসাঁকোয় যান। তার একদিন বাদে পাত্র নিজে এলেন মেয়ে দেখতে। ইন্দিরা দেবী লিখেছেন, পাত্র মেয়ে দেখতে আসবেন, চিঠি পড়ে এ সংবাদ জেনে 'ভয় ও লজ্জায় আমার বুকের ভিতর ধড় ধড় করিতে লাগিল ও আমি কি করে সম্মুখে বাহির হইব এই ভাবনাই বারবার মনে হইতে লাগিল। সেদিন বৈকালে খুব ঝড় হইয়াছিল। বাহিরেও ঝটিকা আর আমার হৃদয়ের মধ্যেও ভাবনার ঝটিকা বহিতেছিল।. . .'[১৯০]

তেরো বছরের মেয়ের এই বিয়েকে অবশ্য নিজে পছন্দ করে বিয়ে বলা চলে না। কিন্তু কমলা দত্তের (১৮৬৬-১৯৩৯) সঙ্গে প্রমথনাথ বসুর বিবাহ অবশ্যই প্রেমজ। বিয়ের আগে কমলা দত্তকে লেখা প্রমথ বসুর চিঠিগুলিও এই প্রেমের সাক্ষ্য।[১৯১]

যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলেত থেকে স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে আক্ষেপ করে চিঠি লিখেছিলেন যে তাঁরা 'স্বাধীন পূর্ব্বক বিবাহ' করতে পারেননি, তাঁদের কন্যা ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর (১৮৭৬-১৯৬০) জীবনে বাবা-মার সুপ্ত ইচ্ছা সফল হয়েছিল। পাত্র প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর পূর্বপরিচয় ছিল, ছিল দীর্ঘ পত্রালাপের মাধ্যমে সংযোগ। এই পত্রালাপের সূত্রপাত ঘটে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে।[১৯২] বিয়ে অবশ্য হয়েছিল আরও ছ বছর পরে (১৮৯৯)।

প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবীর পত্রাবলী বাঙালি জীবনে বাস্তব নব-নারীর সম্পর্কের মধ্যে রোমান্টিকতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। কমলা দত্তকেও প্রমথনাথ বসু বিবাহ-পূর্ব প্রেমের কথা লিখেছিলেন : 'প্রিয়তম কমলা, তুমি তোমার হৃদয় যদি আমাকে দিয়া থাকো, "যদি"র প্রয়োজন নাই, আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, দিয়াছ তাহা হইলেই আমি সুখী। পৃথিবীতে যত হীরা আছে তাহা পাইলেও, তোমায় হৃদয়ের সহিত না পাইলে আমি নিতান্ত দুঃখী, দরিদ্র-দীনহীন।'[১৯৩] এতদিন সাহিত্যের জগতে যে রোমান্টিকতা সীমাবদ্ধ ছিল তা গত শতকের শেষ ভাগে পাওয়া যায় নর-নারীর ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যেও।

এই প্রেমের পূর্ণতর রূপ ফুটে উঠেছিল প্রমথ চৌধুরী—ইন্দিরা দেবীর পত্রাবলীর মধ্যে। প্রথম দিকের চিঠিতে পরস্পর পরস্পরকে 'আপনি' সম্বোধন করতেন।[১৯৪] তখন তাঁদের পত্রে থাকত বহু নৈর্ব্যক্তিক বিষয়, থাকত পাশ্চাত্য সাহিত্যের কথা, ইন্দিরা সম্বোধন করতেন 'প্রমথবাবু' বলে, আর প্রমথ চৌধুরী চিঠির শেষে নিজের পুরো নাম লিখতেন। ধীরে ধীরে তাদের সম্পর্ক যে ঘনিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে, তা বোঝা যায় ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮-এর ইন্দিরা দেবীর পত্র থেকে। ইন্দিরা প্রমথ চৌধুরীকে সম্বোধন করছেন 'সুহৃদ্বর' : 'সম্বোধন দেখে হাসচ ?—আমি জানিনে পুরুষ পুরুষকে ছাড়া এ রকম পাঠ লেখা দস্তুরবিরুদ্ধ কিনা, কিন্তু যখন সবই নতুন তখন কোথায় নজির খুঁজতে যাব বল। তুমি বলেছিলে নাম ধরে লিখতে, কিন্তু নামের পরে "বাবু" যোগ করে দিলে তার সঙ্গে "তুমি" "তুমি" কিছুতেই খাপ খায় না, আমি মুখে বলবার সময়ও দেখেছি, আর "আপনি"ত তুমি কিছুতেই বলতে বা লিখতে দেবে না, আর শুধু নাম আমি কোন জন্মে লিখতে বা বলতে পারব না (হাজার হোক বাঙালীর ঘরে জন্মেছি।) . . .'[১৯৫] ধীরে

ধীরে তাঁদের সম্পর্ক যে নিকট থেকে নিকটতর হচ্ছিল, বোঝা যায় সম্বোধনের নমুনা দেখে—ইন্দিরা দেবী সম্বোধন করছেন *'mon ami'* আর, প্রমথ চৌধুরী সম্বোধন করেছেন পোশাকি নাম ছেড়ে নিরাভরন 'বিবি'। তারপর সে সম্বোধনও পরিবর্তিত হচ্ছে—*'Romes mis'* সম্বোধন করে ইন্দিরা দেবী লিখেছিলেন : 'তোমার হৃদয়ের বর্ণপরিচয় ? এক অক্ষরও হয় নি। শিখতে চাই বটে, যদি হাতেখড়ি থেকে শেখাতে পার। আমার হৃদয়ে দীপক রাগের রূপ দেখতে চাও ? . . . আমার কিছুই নেই। তুমি এ দরিদ্রের কাছে কেন এলে mon ami—তোমার বিলাসী অভিলাষী—মন নিয়ে ? কি আছে যে তোমাকে দেব তা ত ভেবে পাই নে . . .।'[১৯৬] প্রমথ-ইন্দিরা ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পরস্পরকে মোট চল্লিশটা পত্র বিনিময় করেছিলেন।[১৯৭] প্রমথ চৌধুরীর পত্রও সে রকমই ঘনিষ্ঠ হচ্ছিল, পাল্টে যাচ্ছিল সম্বোধনের রূপ—কখনও 'সখি', কখনও 'বধূঁয়া' অবশেষে প্রেমে উত্তাল বিদ্বান পুরুষটি প্রেমিকার জন্য জয়দেব থেকে উদ্ধার করেছিলেন প্রেমের সেই শাশ্বততম স্তোত্রটি :

> 'ত্বমসি মম জীবনং
> ত্বমসি মম ভূষণং
> ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং।[১৯৮]

নিজে পছন্দ করে বিয়ে সরলা দেবী চৌধুরাণীও (১৮৭২-১৯৪৫) করেছিলেন—তবে, ব্রাহ্ম সমাজের বাইরে। সরলা দেবীর সেযুগের অনুপাতে খুবই বিলম্বে বিয়ে করেছিলেন—তেত্রিশ বছর বয়সে (অবশ্য, সুচারু দেবীও ত্রিশ বছর বয়সে বিয়ে করেন, কিন্তু তাঁর বিয়ের পথে কাঁটা ছিল। সরলা দেবীর কৌমার্য স্বেচ্ছাকৃত)। আসলে বিয়ে করার ইচ্ছেই ছিল না সরলা দেবীর, জীবনকে সম্পূর্ণ নিজের মতো করে উপভোগ করেছিলেন তিনি। হিমালয়ের বুকে মায়াবতী আশ্রমে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছেন সরলা। এই সময়ে দিদির চিঠি এল : 'মায়ের শরীর একেবারে ভেঙ্গে গেছে, কখন কি হয় ঠিক নেই। মায়ের শেষ ইচ্ছা যে আমি বিয়ে করি।' চিঠির একদম শেষ মিনতি ছিল : 'মার বুকে আর মৃত্যুশেল হানিস নে।' আর আপত্তি করার সুযোগ পাননি সরলা দেবী। মায়ের সঙ্গে বিয়ে নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দিদিদের সুনিপুণভাবে পাতা ফাঁদে তিনি পড়ে যান—বৈদ্যনাথ স্টেশনে নেমে দেখেন আগেভাগেই তিনি বিয়ের কনে হয়ে গিয়েছেন।[১৯৯]

এ রকম কয়েকজনের কথা পৃথকভাবে উল্লিখিত হলেও, ধীরে ধীরে ব্রাহ্ম-বিবাহ-নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্ভুক্ত অনেকেরই বিয়ে হচ্ছিল নিজেদের মধ্যে আলাপ-পরিচয়ের দ্বারা, অথবা চেনা-জানা ঘরে। আর, ব্রাহ্মরা যখন ব্রাহ্ম পরিবারেই বিয়ে করতেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই পাত্র-পাত্রীর মধ্যে পূর্বপরিচয় থাকা সম্ভব ছিল। হিন্দু সমাজের নিয়ম-রীতিতে এটি একেবারে অজানা ছিল বলেই তৎকালীন যুগে অনেকে এই নতুন বিবাহ প্রথাকে খুব প্রসন্নমনে গ্রহণ করতে পারেননি।[২০০] 'কোর্টশিপ'-কে ঠাট্টা করে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর উপন্যাস 'রাধানাথ' *জন্মভূমি* পত্রিকায় ১২৯৭-৯৮ বঙ্গাব্দে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এ ধরনের রচনা ছিল সাধারণ বাঙালি সমাজের প্রতিক্রিয়ার প্রমাণ।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দাম্পত্য-সম্পর্কিত নতুন নীতি বিষয়ে প্রচুর লেখার ফলে বাস্তবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কতটা পরিবর্তিত হয়েছিল, তা খুব স্পষ্টভাবে বলার মত উপাদান আমাদের কাছে নেই। সাধারণ হিন্দু সমাজের সঙ্গে ব্রাহ্মদের এক সূক্ষ্ম রুচিগত পার্থক্য অবশ্যই ছিল। তবে ব্রাহ্ম পত্র-পত্রিকায় বিবাহ নিয়ে যে সব মতবাদ প্রচারিত হত, দাম্পত্য-জীবনের যে উদ্দেশ্যের ওপর জোর দেওয়া হত, তা অংশত লেখা হত হিন্দুসমাজের 'বিবাহ' প্রতিষ্ঠানের সংস্কারের দিকে লক্ষ রেখে। যেসব যুক্তিবাদী শিক্ষিত হিন্দু বিয়ের সব দিককে মেনে নিতে পারছিলেন না, অথচ ব্রাহ্ম সমাজেও প্রবেশ করেননি, তাঁরাও সংস্কারের কথা বলছিলেন। তবে অবশ্যই তাঁদের বক্তব্যের ঝোঁক ছিল ভিন্ন। ব্রাহ্মদের মত হিন্দু সংস্কারকরাও চাইতেন 'সুখী পরিবার'— তবে ব্রাহ্মরা জোর দিতেন 'আত্মার মিলন', 'পবিত্রভাবে উপাসনা' প্রভৃতির ওপর, হিন্দু সংস্কারকরা বিবাহের এই আধ্যাত্মিক দিকটির কথা খুব গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করেননি।

একটি ব্রাহ্ম দম্পতির জীবন-সাধনায় এই নতুন নীতিবাদ কতটা প্রভাব ফেলেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রকাশচন্দ্র রায় ও অঘোরকামিনী দেবীর যুগল জীবনে। প্রকাশচন্দ্র ও অঘোরকামিনীর দাম্পত্য-জীবন ছিল মূলত : আধ্যাত্মিকভাবে জীবনকে উদ্দীপ্ত করার প্রয়াস। কী কঠোর সাধনা ও কষ্টের সঙ্গে তাঁরা ইন্দ্রিয়-সংযম পালন করেছিলেন, তার পরিচয় তাঁরা রেখে গিয়েছেন *অঘোর প্রকাশ* গ্রন্থে। এই সিদ্ধান্ত তাঁরা নেন ১৮৮২ খিস্টাব্দে। প্রকাশচন্দ্র লিখছেন : 'এই সময় দৈনিকে লিখিয়াছিলাম, আলিঙ্গন নিষিদ্ধ হইল। গলা পর্যন্ত স্পর্শ বন্ধ হইল। মুখ চুম্বনে সুখও হয় না, দুঃখও হয় না, এইরূপ হওয়া চাই। অভ্যাসে ইহাও হইবে।'[২০১] এই আত্মত্যাগের শেষ পরিণতি—'আধ্যাত্মিক বিবাহ'। স্বামী নিজের হাতে স্ত্রীর মস্তকমুণ্ডন করে দিলেন, তারপর নরসুন্দরের সাহায্যে নিজের ক্ষৌরকার্য, সবশেষে ব্রহ্মকুণ্ডের জলে পরস্পরের পরস্পরকে অভিষেক।[২০২] এই বিবরণ পড়তে পড়তে মনে হয় বোধহয় এ কোন ব্রহ্মচারির ইন্দ্রিয় সংযমের ইতিবৃত্ত।

যদি প্রকাশচন্দ্র ও অঘোরকামিনী শারীরিক কামনা-বাসনার ওপর নিয়ন্ত্রণ এনে স্বামী-স্ত্রীর 'পবিত্র' দাম্পত্য-প্রণয়ের আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে থাকেন, এরই উন্নততর রূপ লক্ষিত হয় রবীন্দ্রনাথের জীবনে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ব্রাহ্ম ধর্মের নীতিগুলিকে জীবনে পরীক্ষা করার জন্য স্ত্রীকে প্রস্তুত করেননি, কিন্তু কঠোরতম সাধনার জন্য প্রস্তুত করিয়েছিলেন। সে পরীক্ষা অবিচল মানসিক স্থৈর্যের পরীক্ষা। রবীন্দ্রনাথ যে কী পরম যত্নে স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে মানসিক ও আত্মিক শক্তি সংগ্রহের শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে পত্নীকে লেখা তাঁর বিভিন্ন পত্রে।

রবীন্দ্রনাথ যখন সাহাজাদপুরে ছিলেন, তখন বোধহয় কবি-পত্নী তাঁর কোন এক চিঠিতে স্বামীর কাছে কোন কারণে মানসিক অশান্তির কথা লেখেন। ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে জুন রবীন্দ্রনাথ সাহাজাদপুর থেকে স্ত্রীকে লিখেছিলেন, 'তোমার কালকের একটা চিঠি পেয়ে আমার মন একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমরা যদি সকল অবস্থাতেই দৃঢ় বলের সঙ্গে সরল পথে চলি তা হলে অন্যের অসাধু ব্যবহারে মনের অশান্তি হবার কোন দরকার নেই—বোধহয় একটু চেষ্টা করলেই মনটাকে তেমন করে তৈরী করে নেওয়া যেতে পারে। . . . যতটুকু প্রতিকার করা আমাদের সাধ্য তা অবশ্য করব—যতটুকু অসাধ্য তা ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছা স্মরণ করে অপরাজিত চিত্তে বহন করবার চেষ্টা করব।'[২০৩]

ঐ বছরই শিলাইদহ থেকে স্ত্রীকে সংসারের সর্ব অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সহনশীলতার শিক্ষা দিচ্ছেন কবি : 'যে অবস্থার মধ্যে অগত্যা থাকতেই হবে তার মধ্যে যতটা পারা যায় প্রাণপণে নিজেদের কর্ত্তব্য করে যেতে হবে—তারই মধ্যে যতটা ভাল করা যায় তা ছাড়া মানুষ আর কি করতে পারে বল। অসন্তোষকে মনের মধ্যে পালন কোরো না ছোট বৌ—ওতে মন্দ বই ভাল হয় না।'[২০৪] আমরা বুঝতে পারি বাঙালির চিরন্তন উপেক্ষায়, অবহেলায় একদা-ভূলুণ্ঠিত স্ত্রীর মর্যাদা উনিশ শতকের নতুন ভাবাদর্শের সোনার কাঠির স্পর্শে একেক জনের মনে কতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ রামকৃষ্ণের বৈরাগ্য সাধনের শিক্ষা নয়, প্রকাশচন্দ্রের ইন্দ্রিয় সংযমের ব্রহ্মচর্য নয়—সংসারের শত আবিলতার মধ্যে থেকে মনকে তুচ্ছতার সীমা থেকে অসীমের মধ্যে উত্তরণেব শিক্ষা। এটি দাম্পত্য-সম্পর্কের একটি নতুন দিক, এই কারণে যে স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত সমস্যা, সুখ-দুঃখ তারা পরস্পরের কাছে জ্ঞাপন করছে এবং সম্পর্ক কতটা একান্ত ও ব্যক্তিগত হয়ে গিয়েছে, তা বোঝা যায় যখন স্বামী বহির্বিশ্বে অন্য কিছুর উল্লেখ না করে, কেবল নিজের মনোবলের দ্বারা সমাধানের পথ দেখাচ্ছেন।

একবার এক চিঠিতে এই কথাটা রবীন্দ্রনাথ খুব পরিস্কার করে লিখেওছিলেন স্ত্রীকে। মৃণালিনীদেবী ঠাকুরবাড়ির যৌথ পরিবারে থাকতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন, এ বিষয়ে হযত তাঁর কিছু অনুযোগও ছিল। সেই অনুযোগের বৃত্তান্ত জানিয়ে তিনি চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায এটা ছিল প্রায় অকল্পনীয়। স্ত্রীর মর্যাদা অনেক ক্ষেত্রে ছিল রক্ষিতারও নিচে—এবং তা 'শিক্ষিত' পরিবার সম্বন্ধেও প্রযোজ্য ছিল।[২০৫] সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে স্ত্রীব পারিবাবিক সংকটেব সময়ে তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথেব একটি চিঠি (জুন, ১৮৯৮) পড়লে বিশ্বাসই হয় না যে বাংলাদেশের জলহাওয়ায বেড়ে ওঠা কোন শিক্ষিত ব্যক্তির মনের কথা। সর্ব অবস্থায় স্থিতধী থাকার উপদেশ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'ভালবাসব এবং ভাল করব—এবং পরস্পরের প্রতি কর্তব্য সুমিষ্ট প্রসন্নভাবে সাধন করব—এর উপরে যখন যা ঘটে ঘটুক। জীবনও বেশী দিনের নয় এবং সুখ দুঃখও নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। স্বার্থহানি, ক্ষতি, বঞ্চনা—এসব জিনিষকে লঘুভাবে নেওয়া শক্ত, কিন্তু না নিলে জীবনের ভার ক্রমেই অসহ্য হতে থাকে এবং মনের উন্নত আদর্শকে অটল রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে।... স্ত্রী-পুরুষের অল্প বয়সের প্রণয়মোহে একটা উচ্ছাসিত মত্ততা আছে কিন্তু এ বোধহয় তুমি তোমার নিজের জীবনের থেকেও অনুভব করতে পারচ—বেশী বয়সেই বিচিত্র সংসারের তরঙ্গদোলার মধ্যেই স্ত্রীপুরুষের যথার্থ স্থায়ী গভীর সংযত নিঃশব্দ প্রীতির লীলা আরম্ভ হয়—নিজের সংসার বৃদ্ধির সঙ্গে বাইরের জগৎ ক্রমেই বেশী বাইরে চলে যায়—সেই জন্যেই সংসার বৃদ্ধি হলে এক হিসাবে সংসারের নির্জনতা বেড়ে ওঠে এবং ঘনিষ্ঠতার বন্ধনগুলি চারিদিক থেকে দুজনকে জড়িয়ে আনে।... আমরা দুজনে শেষ পর্যন্ত যেন পরস্পরের মনুষ্যত্বের সহায় এবং সংসারক্লান্ত হৃদয়ের একান্ত নির্ভরস্থল হয়ে জীবনকে সুন্দরভাবে অবসান করতে পারি।'[২০৬]

উনবিংশ শতাব্দীতে প্রেম নিয়ে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিয়ে এত চিন্তাভাবনা, লেখালেখি হয়েছে, কিন্তু শতাব্দীর একেবারে অন্তিম লগ্নে এসে রবীন্দ্রনাথের এ চিঠিটি যেন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের এ যাবৎ সব ধ্যান-ধারণার সংহত বাণীরূপ।

॥ ছয় ॥

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আনুষঙ্গিক অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ নারীসত্তার বিকাশ তথা স্ত্রীকে অধিকতর মর্যাদাদানের প্রয়াস লক্ষ করেছি। স্ত্রীকে অবহেলার যোগ্য সকল 'জড়পদার্থ' রূপে গণ্য করবার প্রাচীন ধারণাটি বদলাতে বদলাতে, শেষে, উনবিংশ শতাব্দীর উদারনৈতিক যুক্তিবাদের আলোকে বিবাহ-প্রথা সংস্কারের যে বাসনা জেগে ওঠে, সেই বাসনা থেকেই দাম্পত্য জীবনের চর্যাচর্য নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে। কিন্তু এই সব লেখার সিংহভাগই জুড়ে থাকত পুরুষেরা। মেয়েদের মন ঠিক কোন পথে ধাবিত হত, তাদের ব্যক্তিগত জগৎ, দাম্পত্য জীবনে পরিবর্তিত মূল্যবোধ তাদের ওপর কী প্রভাব ফেলেছিল, এসব নিয়ে খুব সুসংবদ্ধ ইতিহাস লেখার উপাদান আমাদের হাতের কাছে নেই। মেয়েরা খুব বেশি লিখে রেখে যাননি। তবে, তারই মধ্যে যেটুকু লিখে রেখে গিয়েছেন এবং বিভিন্ন সাহিত্যে নারী চরিত্রদের মুখ দিয়ে অনেক সময়ে যা যা বলানো হয়েছে, তাকেই ভিত্তি করে আমরা এই চেষ্টা করতে পারি। এক্ষেত্রেও সম্ভাব্য প্রধান আপত্তি এই হতে পারে যে সাহিত্যের নারী চরিত্রদের উক্তিও তো মূলত পুরুষদেরই সৃষ্টি। এটি অত্যন্ত সংগত আপত্তি। সেই কারণেই আমরা মেয়েদের মুখে-বসানো সব কথাকে না ধরে, মেয়েদের যে মানসিকতাগুলিকে স্থান-কাল-পাত্র বিচারে তাদের চিন্তাধারার সঙ্গে সুষম বলে মনে হয়, সেই রকম কয়েকটিকেই গ্রহণ করতে পারি। এছাড়া, পুরুষের কলমে নারীর উক্তির ভিন্ন একটা মূল্য আছে—এই অর্থে যে, এর থেকে আমরা সে যুগের পুরুষদের নারীর মন বোঝার ক্ষমতা সম্বন্ধেও অনুমান করতে পারি।

নীরবে ফুটাব সাধ, নীরবে শুকাব আশা।
নীরবে কবিতা যত গাহিবে প্রাণের ভাষা।

. . .

জীবনের মত সবি নীরবে নীরবে হবে,
মরণেরো গায়ে মোর নীরবতা মাখা রবে।[২০৭]

রচয়িত্রী মানকুমারী বসু। এ হল সেই জাতীয় কবিতা, যা পাঠ করেই বলে দেওয়া যায় কবি পুরুষ না মহিলা। উনিশ শতকের মেয়েদের জীবনের একটা প্রধান সুর এখানে অস্ফুটভাবে ধরা পড়েছে—'জীবনের মত সবি নীরবে নীরবে হবে'—কোন পুরুষ তার নিভৃত মুহূর্তেও এটি লিখতে পারতেন না। উনবিংশ শতাব্দীর নারীর প্রকৃতিগত বেদনা বোধহয় অন্য কোন রচনায় এত সার্থকভাবে ধরা পড়েনি। এত গভীর অভিমান একজন পুরুষের থাকবে কোথায়, যা থেকে তিনি বলতে পারেন, 'মরনেরো গায়ে মোর নীরবতা মাখা রবে।'

মেয়েদের সামাজিক মর্যাদার কথাটি মনে রাখলে আমরা এই অভিমানের কারণ আপনা থেকেই বুঝতে পারব। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনের কথা মনেই রাখতে হত, দুঃখের কথা শোনার মত দরদী শ্রোতাও ছিল না তাদের। যে দুঃখ অন্যকে বলে নিজেকে লাঘব করার উপায় থাকে না, সে দুঃখবোধ দুঃসহ। রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীকে মানসিক অশান্তির দিনে

সান্ত্বনাপূর্ণ ঐ চিঠি লেখার মত স্ত্রীর সঙ্গে মনের মিলই ছিল না বেশির ভাগ পরিবারে। রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, বিবাহের রাতে যে সুরে শানাই বাজে, সেটা প্রত্যহের সুর নয়। শানাইয়ের সুরের বিভিন্নতার চেয়েও বড়, যে শপথবাক্য পরস্পর পরস্পরের উদ্দেশে বিবাহের রাতে বলত, তাও অধিকাংশ সময়ে পালিত হত না। ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত দরজিপাড়া নিবাসিনী জনৈকা অভয়াসুন্দরী দাসের একটি কবিতায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের কিছুটা পরিচয় পাই :

দুর্ভাগিনী বঙ্গ নারী, একে পুত্রশোকে মরি,
দ্বিগুণ যাতনা পায়, পতির অযতনে।
রুদ্ধ রাখি অন্তঃপুরে, যে দুঃখও দাও অন্তরে,
সে যাতনা বাক্যেতেও কহা নাহি যায়।

. . .

ধন্য ওরে দেশাচার, করি তোরে নমস্কার,
কি বিচারে কি ব্যাভাব শিখাতেছ স্বদলে।
সেই বিচারর ফলে, নারী প্রাণে অগ্নি জ্বলে,
দাহ হয় দিবানিশি বঙ্গনারী সকলে।[২০৮]

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, নারী-জীবনের অভাববোধ নিয়ে যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধের চেয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে লেখা দু-একটি কবিতা অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি হৃদয়ে প্রবেশ করে। তিলোত্তমা দাসী সর্ব অর্থে এক দুর্ভাগিনী মহিলা। পূর্বোল্লিখিত দেবেন্দ্রনাথ দাসের স্ত্রী কৃষ্ণভাবিনী দাসী স্বামীর সঙ্গে বিদেশে চলে যান, তাঁদের পাঁচ বছরের ছোট মেয়েকে পিতামহ শ্রীনাথ দাসের কাছে রেখে। মা যখন বিদেশে গিয়ে সাগরপারের মেয়েদের দেখে পরিচিত হচ্ছেন তাঁদের ভিন্ন জীবনধারার সঙ্গে, তখন এদেশে ঠাকুরদার ব্যবস্থাপনায় দশ বছরের বালিকা তিলোত্তমার বিয়ে হয়ে গেল হরিপ্রসাদ ঘোষের সঙ্গে। অথচ ভুললে চলবে না যে দেবেন্দ্রনাথ দাসের পিতা শ্রীনাথ দাস ছিলেন বিদ্যাসাগরের বন্ধু। বিদ্যাসাগরের মতো যুক্তিবাদীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেও সামাজিক অন্যায় সম্পর্কে মন যে কতটা সংস্কারাচ্ছন্ন থাকতে পারে, শ্রীনাথ দাস তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

তিলোত্তমার বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি। স্বামীর কাছে অনেক অপমান, উপেক্ষা সহ্য করেছেন তাঁর একুশ বছর স্থায়ী 'দাম্পত্য' জীবনে। শেষে স্বামী সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে আবর্জনার মত পরিত্যাগ করেছিলেন তাঁকে।[২০৯] এক প্রচণ্ড দুঃখবোধ থেকে তিলোত্তমা রচনা করেছিলেন একটির পর একটি কবিতা। এই সব কবিতা মুদ্রিত যে গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল, তিনি তার নাম দেন *আক্ষেপ*। অত্যন্ত স্পর্শকাতর মনের এই মহিলার জীবনের বত্রিশ বছর নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের মধ্যে কেটেছে। প্রায় কিছুই পাননি জীবনে— এমনকি জননী হিসেবেও তিনি মৃত সন্তানের প্রসূতি। 'অনুযোগ' কবিতাটিতে মায়ের প্রতি তিলোত্তমার অনেক অনুযোগের প্রকাশ। বিদেশ-প্রত্যাগতা মা অবহেলিতা, রোগযন্ত্রণায় অচিকিৎসিতা মেয়েকে বলেছিলেন স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে আসতে। তিলোত্তমা তা চান নি, চেয়েছিলেন উনিশ শতকের বহুল প্রচারিত তত্ত্ব অনুযায়ী শত

দোযযুক্ত স্বামীরও 'ছাযেবানুগতা' তাঁকেই অনুসরণ করতে। মাকে সরাসরি প্রশ্ন করেছেন:

বল দেখি শুনি, তুমি মা জননী,
স্বামীরে ত্যাজিতে পারে কি রমণী ॥
হিন্দু গৃহ বাসে, হিন্দুর ললনা।
হিন্দু গৃহবধূ, হয় সেই জনা।[২১০]

কিন্তু সেই স্বামীর গৃহ ছেড়েও তিলোত্তমাকে চলে আসতে হয়েছিল এবং পিত্রালয়ে আসার পবে তিনি লিখেছিলেন, 'ভুলে সদা আছে স্বামী, আমারে ত্যজিয়ে।' ফলে, স্বামীর প্রতি অভিমান ভবে যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদযভার নিয়ে তিলোত্তমা লিখলেন,

বহুদিন, বহু দিন, অভাগীর সাথ।
ছিলে গো পাশেতে তুমি, ভাব দিনরাত ॥
স্বপনেব ছাযা প্রায, ভুলেছ বারতা হায়,
তথাপি অন্তর মাঝে কর যাতাযাত।[২১১]

স্ত্রীর সর্বদাই স্বামীর কথা মনে পড়েছে। স্বামীবও কি সেই অবস্থা ? স্বামীর কি আদৌ স্ত্রীর কথা মনে পড়ে ?

তাই ত জিজ্ঞাসি, ভুলেছ কি নাথ ?
দেখিলে কি মোবে চিনিতে পার ?
আমার মতন পাও কি যাতনা।
অথবা আমি কে চিনিতে নার।[২১২]

এর মধ্যে শুধু তীব্র অভিমান নয, একটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম অহমিকাবোধও আছে—স্বামী পরিত্যক্তা হওযা সত্ত্বেও তিলোত্তমা দাসী ভাবতেই পারছেন না যে, স্ত্রী হিসাবে কোন মূল্যই তাঁব আজ আর অবশিষ্ট নেই। লোকমুখে শুনেছেন, তাঁর স্বামী আবার বিয়ে করবেন, বিশ্বাস হয়নি। বঙ্গদেশের বহুপত্নীক পুরুষ-সমাজে এত লাঞ্ছনার পরেও তাঁর স্বামীর পুনঃপরিণয়ের সংবাদ কোন নারীর পক্ষে বিশ্বাস করতে না পারার মধ্যেই বোধহয় স্ত্রীর প্রকৃত অধিকারবোধজনিত গর্ব :

দাসী বলি অবহেলি, দুই পদ দিয়ে ঠেলি,
করিবে সুন্দরী সনে 'পুন পরিণয় ॥
এ বারতা মম মনে, সত্য কি গো হয় ?[২১৩]

তিলোত্তমা দাসীর আশাবাদী হৃদয়ে সন্দেহের কাঁটা থাকলেও, এ ঘটনা তো প্রায়ই ঘটত। এ বিষয় নিয়ে কবিতাও লেখা হয়েছে আরও। 'নাতিনীর প্রতি ঠাকরুন দিদি'

কবিতায় পিতামহী তার বাস্তব-অভিজ্ঞতা থেকে কিশোরী পৌত্রীকে সাবধান বাণী শোনাচ্ছে :

কি বলে বুঝাব তোরে   অবোধ অজ্ঞান
.   .   .
জ্বরের পিপাসা তার   মিটিলে সে ফিরে আর,
ফিরে নাহি চাবে ধনি   মুখপানে তোর,
আজ তার হবি দাসী,   কালি পরে হ'লে বাসি,
পলাবে ভ্রমর বধূঁ—   ফুল মধু চোর।[২১৪]

এরকম একটি দুটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। জীর্ণ বস্ত্রের মত পুরোন স্ত্রীকে ত্যাগ করে নবীনাকে গ্রহণ করা বোধহয় সে যুগের সমাজে মোটামুটি প্রচলিত প্রথা হিসাবে স্বীকৃতই ছিল। সিপাহী বিদ্রোহের চেয়ে বয়সে ঈষৎ বড় প্রসন্নময়ী দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় এমন একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। প্রসন্নময়ী দেবীর বাবা যখন সিপাহী বিদ্রোহের কারণে মুর্শিদাবাদে চলে গিয়েছিলেন, তখন সেখানে লেখিকার বাবার সঙ্গে যাদবচন্দ্র ধর নামে এক 'উদারচরিত্র ইংরাজি শিক্ষিত ডাক্তারের' অন্তরঙ্গতা হয়। খুব সম্ভবত উদার চরিত্রের জন্য, কিংবা ইংরাজী শিক্ষার কারণে, অথবা উভয়ের সমন্বয়ের ফলেই, ডাক্তার ধর একজন অত্যন্ত সমাজ-সচেতন ব্যক্তি ছিলেন ও স্ত্রীশিক্ষা, নারীমুক্তি প্রভৃতি নিয়ে আলোচনাও করতেন। প্রসন্নময়ী দেবীর বাবা ও অন্য আত্মীয়রা মুর্শিদাবাদে থাকার সময়ে ডাক্তারের পত্নী বিয়োগ হয়। এরপর প্রসন্নময়ী দেবী লিখেছেন, 'তিনি [ডাক্তার ধর] তাঁহার স্ত্রীর অকাল মৃত্যুজনিত শোকে কাজ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একেবারে শয্যা আশ্রয় করেন। তাঁহার কাকা এই সংবাদে অত্যন্ত কুপিত হইয়া ভ্রাতৃষ্পুত্রকে ভৎসনা করিয়া বলেন, 'যাদব, তোমার এ কি শোক ? স্ত্রী এক জোড়া চটি জুতো বই ত না। এক জোড়া গিয়াছে আর এক জোড়া আর চেয়েও ভাল আনিয়া দিব। কান্নাকাটি কি ? ভাগ্যবানের বউ মরে তামা পিতলে ঘর ভরে।'[২১৫]

প্রসন্নময়ী দেবী বাল্যে কাহিনীটি শুনেছিলেন এবং পরিণত বয়সে আত্মকথা লিখতে বসেও বিস্মৃত হতে পারেননি। লক্ষণীয় বিষয় হল, পিতৃব্য স্ত্রীর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন চটি জুতোর যার স্থান মানুষের পায়ের তলায়, সকলের নিচে। খুব ভেবে চিন্তে সচেতনভাবে হয়ত কথাটা বলা হয়নি। কিন্তু এই মানসিকতাটা আমাদের মজ্জায় মজ্জায়, এত গভীরে মিশে ছিল যে ভাষায় প্রকাশ করতে গেলেই আপনা থেকেই এ ধরনের উপমা চলে আসত।

একজোড়া চটি জুতোর মত হোক আর না হোক, স্বামীর দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়া মেয়েদের জীবনে প্রায়ই ঘটত। ভাবলে অবাক হতে হয়, এতগুলি সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলনের পরেও, উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষে এসেও সে যুগের বিখ্যাত একটি মহিলাদের মাসিক পত্রে পাঠ করি 'পতিত্যক্তা রমণীর খেদ' নামে একটি কবিতা। এই মহিলা নিজের নাম দেননি। কিন্তু কোন মহিলা সে সময়ে ছন্দে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করছেন—এ থেকে আমরা তাঁর শিক্ষাদীক্ষার মান এবং শ্বশুরবাড়ির সামাজিক অবস্থান সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি।

'পতিত্যক্তা রমণীর খেদ' কবিতায় স্ত্রী বলছেন যে, তার মনের গোপন ব্যথা মাত্র

একজনের কাছেই তিনি পৌঁছে দিতে পেরেছেন—এই দৃশ্যমান জগতের সর্বত্র থেকেও তিনি অদৃশ্য, তিনি সর্ব অর্থেই প্রকৃত অবলোকিতেশ্বর। সেই 'চিরজীবনের স্বামী'কে এই নারী নিজের মনোবেদনার কথা, যন্ত্রণার ইতিবৃত্ত জানাচ্ছেন। স্বামী-পরিত্যক্তা রমণী আক্ষেপ করে লিখছেন :

নাথ হে তোমার তরে, আশায় বাঁধিয়া হিয়া
ছিনু আহা চেয়ে পথ পানে,
কত যে ভাবনা ভয়, করিযাছি পরাজয
অন্তর্যামী বিনা তা কে জানে।

তোমা বই অনাথার, নাহি অন্য গতি আর,
কার কাছে জানাইব দুখ,
কাতরে বলি হে তাই, তোমারে যদি না পাই,
তবে বল বাঁচিযা কি সুখ।[২১৬]

একই শূন্যতাবোধের প্রকাশ পাই তিলোত্তমা দাসীর 'শূন্য প্রাণ' কবিতায়।[২১৭] তাঁর স্বামী হরিপ্রসাদ ঘোষের হয়ত নতুন মূল্যবোধের সঙ্গে পরিচয ছিল না, কিন্তু যে পরিবারের কৃষ্টি নিয়ে কোন সংশয়ের অবকাশ নেই, সেই ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মনেও তো দুঃখবোধ ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ হেমলতা দেবীর *অকল্পিতার* কবিতাগুলি পড়লে নারীর দুঃখের কথা জানতে পারি। এমন হতেই পারে যে, ব্যক্তিগতজীবনে তিনি সেই দুঃখময় অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হননি—ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীদের অবস্থা দেখে লিখেছিলেন। দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি সত্য হলে এ কবিতাগুলি ব্যক্তিগত অনুভূতির স্তর থেকে উত্তীর্ণ হয়ে সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলনে রূপান্তরিত হয়। তবে হেমলতা দেবী (১৮৭৩—১৯৬৭) নারী বিষয়ে নানা চিন্তা করতেন, সে সব তাঁর *মেয়েদের কথা* বইটিতে স্থান পেয়েছে। সেই অর্থে তিনি নারীর দুঃখ বুঝতেন, আর বুঝতেন বলেই লিখতে পেরেছিলেন, স্ত্রীস্বাধীনতার প্রয়োজনীযতা নিয়ে যারা প্রশ্ন করেন, অথচ স্বাধীনতাদানে যাদের এত কার্পণ্য তারা কি মেয়েদের মনের কথা কখনও শোনার চেষ্টা করেছেন? 'নারীর জীবন' কবিতায় খুব অকুণ্ঠিত ভাবে এই মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে :

নারীর জীবনে নাই প্রয়োজন
স্বাধীনতা, হেন সুখের কথা
বলেছিল সে গো কোন মহাজন?
বুঝেছিল সে কি নারীর ব্যাথা?

জেনে ছিল সে কি নারীর জীবনে
মরেছে গুমরি বেদনা কত,
কত দিবসের কত কল্যাণ
দিনে দিনে সেথা হয়েছে হত ?

. . .

নারী কি মায়ার ছলনা-মূর্ত্তি ?
নারী কি কেবলি নরের ভোগ্য ?
নহে কি জননী, নহে কি ভগিনী,
নহে কি বিশ্বহিতের যোগ্যা ?[২১৮]

নাবীর জীবনে বঞ্চনা, বেদনার কথা ছাড়াও হেমলতা দেবী নারীর মূল্য নিয়ে দুটি অত্যন্ত প্রচলিত ধারণা ও ব্যবহৃত রীতিকে সরাসরি আক্রমণ করেছিলেন। প্রচলিত ধারণাটি হল, নারী পুরুষকে সংসারাসক্ত করে উচ্চতর ভাবাদর্শ থেকে বিচ্যুত করে ('নারী কি মায়ার ছলনা-মূর্ত্তি ?') ও ব্যবহৃত রীতিটি হল, নারী পুরুষের ভোগ্যসামগ্রী মাত্র ('নারী কি কেবলি নরের ভোগ্য ?')। এ দুটির একটিরও অস্তিত্ব থাকলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পারস্পরিক মর্যাদার ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ফলে, দাম্পত্য-জীবনে প্রেমের প্রকাশ ব্যাহত হচ্ছে বারম্বার, স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের জন্য প্রেম 'মুক্ত স্বাধীনভূমি' পাচ্ছে না।[২১৯]

কল্প-কাহিনীর জাল বিস্তার করতে হলেও সামাজিক পটভূমির বাস্তবতা চাই। একজন লেখক মনে মনে অনেক দূর এগোতে পারেন, কিন্তু যে সমাজে তার লেখা পরিবেশিত হচ্ছে, তার বাস্তবতার সঙ্গে মৌলিক পার্থক্য থাকলে তার প্রতীতি নষ্ট হয়ে যায়। এ সমস্যা মাইকেল মধুসূদন দত্তেরও হযেছিল। ব্যক্তিগত জীবনে বহু সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধাচারণ করেও তিনি সাহিত্যরচনার সময়ে এই সীমাবদ্ধতাকে সব সময়ে অতিক্রম করতে পারেননি। নিজস্ব প্রতিভা দিয়ে কাব্যের গঠনে পরিবর্তন সাধন করার চেয়ে সামাজিক মূল্যবোধ পরিবর্তন করা অনেক দুষ্কর। ইউরোপীয় সাহিত্যে সদানিমগ্ন মাইকেল সেখানকার জাগ্রত নারীসত্তাকে প্রত্যক্ষ করে মানসিকভাবে ঐ অবস্থাকে অভিনন্দন জানালেও, তাঁর কোন চরিত্রকে ইউরোপীয় মহিলার আদলে তৈরি করেননি। তার কারণ হিসেবে *কৃষ্ণকুমারী* নাটক সম্বন্ধে কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতা এতই পৃথক ছিল যে স্বামী, ভাই বা বাবার মত একান্ত আপনজন ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে আলাপরত কোন সাধ্বী নারীরও চিত্র যদি তিনি অঙ্কন করেন, তবে তা তাঁর নাটকের দর্শকের পক্ষে মর্মন্তুদ হবে।[২২০]

একই টানাপোড়েন দেখি পৌরাণিক চরিত্র অবলম্বন করে রচিত মাইকেলের *বীরাঙ্গনা কাব্যে*। ঐ গ্রন্থের তিনটি 'পত্র' আমরা আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য গ্রহণ করতে পারি—'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা', 'সোমের প্রতি তারা' এবং 'অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী'। এর মধ্যে 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা' পত্রটিতে শকুন্তলার দুষ্মন্তের প্রতি অভিযোগের অনেকগুলিই সমসাময়িক বহু বাঙালি মেয়েরও। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে 'গুপ্তভাবে গন্ধর্ব্ব বিধানে' বিয়ে করে দেশে ফিরে যাবার পর আর কোন খোঁজ নেননি। বিবাহিতা স্ত্রীর

কোন খোঁজ না-নেওয়ার ঘটনা উনিশ শতকের বাঙালি সমাজের পক্ষে বিস্ময়কর কিছু নয়। কিন্তু মানসিকতায় পরিবর্তনটা আমরা বুঝতে পারি, যখন দেখি মাইকেল এটিকে তাঁর কাব্যের বিষয় করে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি এই সামাজিক প্রথাটিকে সমর্থন করেননি। তবু মাইকেল বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতাকে উপেক্ষা করতে পারেননি বলেই স্বামীকে মৃদু ভর্ৎসনা করার পরও শকুন্তলা শেষ পর্যন্ত কামনা করছে দুস্মন্তের পদযুগল—'সেবিবে/দাসীভাবে পা দুখানি—এই লোভ মনে—/এই চির-আশা নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে।'[২২১]

'সোমের প্রতি তারা' পত্রে দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারা সতীত্ব বিসর্জন দিয়ে বৃহস্পতি-শিষ্য সোমের প্রতি আকর্ষণবশত কুলত্যাগে প্রস্তুত। তারার এই বিবাহ অতিরিক্ত রূপজ আকর্ষণ থেকে লেখা পত্রের মধ্যে পুরুষ ও নারীর স্বাধীন সম্পর্কের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এখানেও তারার শেষ ইচ্ছা—'বিকাইব কায় মনঃ তব রাঙা পায়ে'।

দ্রৌপদীর মনোবেদনার সঙ্গে পতিবিরহাতুরা বাঙালিনীর বেদনার একাত্মতা খুঁজে পাওয়া যায়, যখন দ্রৌপদী বলে—'কে ফেরে বিদেশে। যুবতী-পত্নীরে ঘরে রাখি একাকিনী?' 'অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী' পত্রে দ্রৌপদীর তীব্র শারীরিক কামনার দিকটিই প্রকটিত। কিন্তু সেই কারণেই কোন স্ত্রী স্বামীসঙ্গ কামনা করছে,—কাব্যের বিষয়বস্তু হিসাবে বাঙালির কাছে তা কতটা গ্রহণীয় হবে, এ চিন্তা মাইকেলের ছিল, তাই দ্রৌপদীও শেষ পর্যন্ত আশ্রয় খুঁজেছে অর্জুনের পায়ে—'কর দয়া করি,/পাও যেন অভাগীরে চরণ-কমলে/ক্ষণকাল।' কোন কারণে এমন করতে হয়েছিল, তা মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একটি চিঠিতে বলেছিলেন। ইংল্যান্ডে যা শোভা পায়, আমাদের দেশে তা পায় না '. . . I write under very different circumstances.'[২২২]

ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষে উপনীত হয়েও অনেক ক্ষেত্রেই শতাব্দীর সূচনার সামাজিক পরিস্থিতিগুলির বিশেষ পরিবর্তন চোখে পড়েনা। পুরো এক শতক জুড়ে অনেক প্রভাব, ঘাত-প্রতিঘাত সমাজের ওপর পড়েছে। নতুন ভাবাদর্শ গড়ে উঠেছে, নতুন মূল্যবোধের এত জয়ধ্বনি। তবু সমাজের সাধারণ চিত্র যে খুব বদলে গিয়েছিল, এমন সিদ্ধান্ত করার পক্ষে সাক্ষ্য কম। দাম্পত্য-সম্পর্ক বিকাশের অন্তরায়স্বরূপ অনেক সামাজিক প্রথা অব্যাহত ছিল। যেমন, শতাব্দীর শেষে এসেও দেখি যে অবরোধ প্রথা পুরোদস্তুর বর্তমান। তখনও মেয়েরা দিনের আলোয় স্বামীর মুখ দেখে না—অন্তত সে প্রথা উঠে যায়নি সাধারণ পরিবার থেকে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শান্তা দেবী (জন্ম, ১৮৯৩) তাঁর আত্মকথায় এমন একটি কাহিনীর উল্লেখ করেছিলেন। সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবারের উদারনৈতিক আবহাওয়ায় পালিতা শান্তা ছোটবেলায় একবার ভারি বিস্মিত হয়েছিলেন 'আমাদের যে বৌদির কথা একটু আগে বললাম, ছেলেবেলায় তাঁর আচরণ আমার কাছে অদ্ভুত লাগত। দিনেরবেলা তাঁর স্বামী যদি তাঁর সামনে দিয়ে হাঁটতেন, তাহলেই বৌদি এক গলা ঘোমটা টানতেন। কিন্তু রাত্রে তাঁদের ঘরে গিয়ে দেখতাম বউদি স্বামীর সঙ্গে দিব্যি মাথা খুলে গল্প করছেন। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতাম। সামাজিক নিয়ম-কানুন বুঝতে পারতাম না।'[২২৩]

অথচ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সংখ্যায় অত্যল্প হলেও কয়েকটি পরিবারের মেয়েদের সংস্কৃতিগত মান অনেক বাড়ির পুরুষদের চেয়ে ঢের বেশি ছিল। তবু,

মানসিকতায় তাঁরা যতই অগ্রসর হোন, নর-নারীর সম্পর্ক বিষয়ে সামাজিক বিধি-নিষেধের অচলায়তনকে উপেক্ষা করা তাঁদের পক্ষেও সহজ ছিল না। ফলে, এ সব মহিলাদের চোখে অসঙ্গতি ধরা পড়েছে আরও বেশি মাত্রায়।

মাত্র আঠারো বছর বয়সে মৃত্যু হলেও, অমিয়বালা (১৯০১—১৯১৯) তাঁর দিনলিপিতে যা লিখে রেখে গিয়েছেন, তা পড়লে আমরা বুঝতে পারি দাম্পত্য সম্পর্কে মেয়েদের ধ্যান-ধারণা কোন-কোন ক্ষেত্রে কতটা পালটে যাচ্ছিল। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে অমিয়বালার বিয়ে হয়েছিল আইন-পাঠরত এক জমিদার-তনযের সঙ্গে। একে জমিদারের ছেলে, তার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়ছে—এ ছেলেকে আমরা প্রচলিত মাপকাঠিতে 'শিক্ষিত' বলতে পারি। শ্বশুরবাড়িতে মোটামুটি সুখেই কাটাচ্ছিল নব-দম্পতি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেখা দিল মানসিক অমিল। স্বামী ও শাশুড়ী প্রস্তাব দিলেন, অমিয়বালার বাবার কাছ থেকে আরও তিন হাজার টাকা চাই। অমিয়বালার বাবার সে অবস্থা না থাকার জন্য, মাত্র তিন মাস স্বামীর ঘর করার সুযোগ পেয়ে অমিয়কে চিরতরে পিত্রালয়ে ফিরে যেতে হয়।

এই ধরনের ভাগ্য বিপর্যয়ে মেয়েরা কি ভাবত, তার কিছুটা প্রতিফলন মেলে অমিয়বালার দিনলিপিতে। স্বামী-পরিত্যাক্ত হয়ে এসেও, প্রথম প্রেমের সুখস্মৃতি এঁরা সবাই (যাদের ভাগ্যে জুটত) খুব সযত্নে লালন করতেন। অমিয়বালাও স্বামী সোহাগে সোহাগিনী ছিলেন।'[২২৪]

বাঙালি বাড়ির আর পাঁচজন বউ-এর মতো অমিয়বালাও সর্বংসহা হতে প্রস্তুত ছিল, 'নীলকণ্ঠের মত সংসারের বিষ আকণ্ঠ পূর্ণ' করতে পারত সে,[২২৫] কিন্তু অমিযবালা সহ্য শক্তির সীমা অতিক্রম করে গিযেছিল। এই অবহেলার চেযেও বড় করে এক নতুন মূল্যবোধের মাপকাঠিতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে দেখতে চেযেছিল সে : 'নিজের স্ত্রীকে দশের কাছে এমন হীন এত অবহেলার পাত্রী করিয়া তুলিতে, তাহারও কি মানের খর্ব্ব হইতেছে না ?' অমিয়বালার স্বামীর কাছে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মূল্য মাত্র তিন হাজার টাকা। 'সে যদি আমায় ভালবাসিত, তবে এই দুঃখ কষ্টভরা জগতের মাঝখানে, আমার প্রাণে প্রেমের আলো জ্বালিয়া দিয়া, আমায় চিরসুখী করিয়া রাখিত। সংসারের কোন বাধাই তাহার ও আমার মিলনের পথে কাঁটা হইত না। আমায় যদি সে প্রাণ দিয়া যথার্থই ভালবাসিত, তবে কোন অসুবিধা কোন কষ্টই সে মানিত না।'[২২৬] তা হলে প্রথম জীবনের 'ভালবাসা' ? অমিয়বালার উত্তর, সে 'তীব্র আকাঙ্ক্ষার বহ্নি' ছাড়া আর কিছু নয়। শুধু যে অমিয়বালার স্বামী বাইরের লোকের কাছে স্ত্রীর মর্যাদাকে ধূলিসাৎ করেছে, তাই নয়, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে অলিখিত ব্যক্তিগত গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতিকেও সে সম্মান দেয়নি। অমিয়বালা ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই-এর দিনলিপিতে লিখেছেন যে তাঁর স্বামী অমিয়বালার পিসীমাকে গিয়ে তাঁর স্ত্রী হওয়ার 'অনুপযুক্ত'তার কথা জানিয়ে এসেছে, কারণ অমিয়বালার নাকি 'মহৎ রোগ' ছিল। ঘৃণায় শিউরে উঠেছেন অমিয়বালা, 'মহৎ রোগ কি, মেয়েমানুষের মেয়েলি রোগ—যাহা শতকরা ৯৫ জন স্ত্রীলোকেরই আছে। . . . একটা কথা বড় আশ্চর্যের সঙ্গে ভাবি আমি যে, তার মার বয়সী পিসীমা, সম্পর্কেও গুরুজন, তাঁহার সঙ্গে এ সব কথাবার্তা সে কি করিয়া বলে ? একটুও লজ্জা করে না তার ? . . . আমার বড় আপশোষ হয়, কেন মরিতে তাকে সে কথা বলিয়াছিলাম, কেন

স্বামীর কাছে সরল মনে নিজের এ অসুখের কথা জানাইয়াছিলাম।'[২২৭] এখানে অমিয়বালা শারীরিক সম্পর্কের উর্ধ্বে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে পারস্পরিকতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তার অবহেলায় মর্মাহত হয়েছেন।

এখানে একটি লক্ষণীয় বস্তু এই যে, উনবিংশ শতাব্দীতে পুরুষেরা শিক্ষিত হয়েছে মেয়েদের তুলনায় অনেক আগে ও সংখ্যায় অনেক বেশি। এবং পুরুষেরাই আমাদের সমাজে নারীমুক্তি, নারীপ্রগতির দাবি জানিয়েছিল প্রথম, সর্বাধিক প্রচারিত মহিলা-পত্রিকা, *বামাবোধিনী পত্রিকার*ও সম্পাদক-প্রতিষ্ঠাতা একজন পুরুষ। কিন্তু সমাজের কয়েকজন পুরুষকে বাদ দিলে, দাম্পত্য-জীবনে মেয়েদের মর্যাদা ও অধিকারের প্রয়োজন মেয়েরাই সবচেয়ে বেশি অনুভব করেছিল। সামাজিক রীতি ও প্রথার জন্য এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার অভাবে, তারা প্রতিবাদ করতে পারেনি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তারা সব কিছু সমর্থন করত। অবশ্য এটাও স্বীকার করতেই হবে যে, মহিলাদের মধ্যেও তাদের স্বাতন্ত্র্য বিষয়ে সচেতন ছিলেন খুব স্বল্প কয়েকজনই। কিছু কিছু মেয়ের নিজস্ব কথা আমবা শুনতে পাই, যার মধ্যে পরিবর্তনের সুরটা ধরা পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মেয়েরা সামাজিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কববে, এটা ভাবা অসম্ভব। কিন্তু তীব্র অভিমান অনেকের লেখায় চোখে পড়ে। মেয়েদের যে 'ভাষা' নেই, তাদের মনের বাসনাও নীরবে পূর্ণ করতে হয়—এটা এতদিন অনেক মহিলাই বুঝতে পারেননি। শতাব্দীর একদম শেষ পাদে এই নতুন উপলব্ধিই মেয়েদের নিজস্ব মূল্য সম্বন্ধে প্রথম সচেতনতা।

মেয়েদের মনের গভীরে, এই সচেতনতার উন্মেষ যেভাবেই ঘটুক, বাঙালিব সমাজ-জীবনে তাদের সামগ্রিক ভাষাহীনতা মেয়েদের দাম্পত্য-সম্পর্ককে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত চালিত কবেছে। রবীন্দ্রনাথের 'সুভা' গল্পের (রচনা সন, মাঘ, ১২৯৯ বঃ) নায়িকা বোবা সুভাষিণী প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর সাধারণ বাঙালি মেয়েদের প্রতিনিধিস্থানীয়া। রবীন্দ্রনাথ সুভা সম্বন্ধে লিখেছেন, 'যে কথা কয় না সে যে অনুভব করে, ইহা সকলের মনে হয না, . . .।' উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মেয়েদের সম্বন্ধেও এ সত্য প্রযোজ্য। বাঙালি মেয়েও মর্মে-মর্মে অনেক অনুভব করত—কিন্তু তার 'কথা' বলার অধিকার ছিল না। বিশেষতঃ বিবাহ বিষয়ে তো নযই—সেখানে পুরুষের ইচ্ছাই প্রধান ও তারই অগ্রাধিকার। রবীন্দ্রনাথ 'সুভা' গল্পেই মেয়ে-দেখা নিয়ে একটা মন্তব্য করেছিলেন, যা আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর বিবাহ-ব্যবস্থার স্বরূপটির পরিচয়বাহী—'বন্ধু সঙ্গে বর স্বয়ং কনে দেখতে আসিলেন—কন্যার মা বাপ চিন্তিত, শঙ্কিত, শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, যেন দেবতা স্বয়ং নিজের বলির পশু বাছিয়া লইতে আসিয়াছেন।'[২২৮] এখানে দেবতা ও বলির পশু শব্দ দুটি বোধহয় হাল্কাভাবে ব্যবহৃত হয়নি। অনিবার্যভাবে মনে চলে আসে খ্রিষ্টধর্ম-প্রচারক জগৎচন্দ্র গাংগুলীর মন্তব্য। বাল্যবিবাহ বিষয়ে লিখতে গিয়ে তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল কেমন করে তাঁর এগারো বছরের বোনকে পিতামহের বয়সী এক পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য টেনে আনা হয়েছিল।[২২৯] উনবিংশ শতাব্দীর বিবাহ ব্যবস্থায় স্বামী-দেবতার উদ্দেশে স্ত্রীকে তো বলি প্রদানই করা হত।

মূক সুভাকে দেখেও পাত্রপক্ষের পছন্দ হয়েছিল। বিয়ের কিছুদিনের মধ্যে বোঝা গেল যে কন্যা বোবা। রবীন্দ্রনাথের হাতে এই পুরো গল্পটা একটা প্রতীকী মর্যাদা লাভ করেছে—

বিয়ের আগে যে এটা বোঝা যায়নি, তার কারণই হল, সুভার 'কথা'র কোন গুরুত্ব ছিল না—তাই তাকে মুখ খুলতে হয়নি।

মুখ না খুললেও, মেয়েদের মধ্যে বাষ্প যে ধীরে ধীরে জমা হচ্ছিল, তা অনেকে বুঝেছিলেন। মেয়েরা তাদের স্থান-কাল-পাত্রপাত্রীভেদে নিজস্ব ভঙ্গিতে সেই বাষ্পকে প্রকাশ করছিল। আমাদের চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য যে দাম্পত্য-সম্পর্কের প্রতি এক তীব্র অসম্মান নিহিত, আছে, এটা রবীন্দ্রনাথ 'শাস্তি' গল্পে বাঙালি পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। অগ্রজকে স্ত্রী-হত্যার অপরাধ থেকে রক্ষা করার জন্য ছোটভাই ছিদাম সমস্ত দোষ নিজের নিরপরাধা স্ত্রী চন্দরার ওপর চাপিয়ে দেয়। অনুজের যুক্তি খুব সহজ, বউ মরলে বউ পাওয়া যাবে, ভাই মরলে ভাই পাওয়া যাবে না। কথাটা চন্দরার বুকে এত বেজেছিল যে, হত্যার প্রাপ্য শাস্তি ফাঁসি জেনেও চন্দরা এই অসত্য ভাষণের বিপক্ষে একটি কথাও বলেনি। উলটে বিচারকের কাছে সে চরম শাস্তিই বারম্বার প্রার্থনা করতে থাকে। একেবারে শেষ পর্যাযে রবীন্দ্রনাথ গল্পটিকে একটি নিছক পারিবারিক কলহের কাহিনী থেকে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি এক তীব্র ব্যঙ্গাত্মক প্রতিবাদে উত্তরণ ঘটান :

'জেলখানায় ফাঁসির পূর্বে দয়ালু সিভিল সার্জন চন্দরাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা কর ?"

চন্দরা কহিল, "একবার আমাব মাকে দেখিতে চাই।" ডাক্তার কহিল, "তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায়, তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব।" চন্দরা কহিল, "মরণ"।'[২৩০]

রামাযণের সেই বহুশ্রুত সংস্কৃত বাক্যটি—'দেশ দেশ কলত্রাণি'—যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষেও কতটা অপরিবর্তিতভাবে আমাদেব মূল্যবোধে রযে গিযেছিল, 'শাস্তি' গল্পটি তাব প্রমাণ। মাকে দেখতে ইচ্ছে করার মধ্যেও চন্দবা বহন করছে সীতার 'আর্কেটাইপ'।

'শাস্তি' গল্পের রচনাকাল শ্রাবণ, ১৩০০ সন, অর্থাৎ ইংরেজি ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দ। এর আগে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিযে পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভাবনাচিন্তা লেখালেখি হযেছে; দাম্পত্য-সম্পর্কে পবিত্রতার সুউচ্চ আদর্শ তুলে ধরা হয়েছে এবং বারবার কর্তব্য নানাভাবে নির্ধারণ করে দেওযা হয়েছে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের পারস্পরিকতার মূল ভিত্তি যে স্ত্রীর সমান মর্যাদা তা পুরুষদের অনেকেই আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। যার স্বামী বউ মরলে বউ পাবে বলে মিথ্যাভাষণ করে, স্ত্রীর প্রতি এই মানসিকতাসম্পন্ন সেই স্বামীর ঘর করার চেয়ে মৃত্যু ভাল—এই অভিমানভরে চন্দরা স্ত্রীকে শেষবারের মত দেখার জন্য স্বামীর বাসনাকে ব্যঙ্গ করে বলেছে, 'মরণ'।

চন্দরা রবীন্দ্রনাথের মানস-নির্মিতি। তাই সে যত সহজে মৃত্যুকে শ্রেয় বলে মনে করেছিল, বাঙালি ঘরের রক্তমাংসের মেয়েরা তত সহজে তা পারত না। কিন্তু তারা যে এই অন্যায়কে মনে মনে মেনে নিতে পারত না, তা বোধহয় রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও আরও কয়েকজনের চোখে পড়েছিল। ফলে দাম্পত্য-জীবনে মেয়েদের মধ্যে এক ধরনের অসন্তোষ জমে উঠেছিল। তাদের নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন মূল্যই ছিল না। মেয়েরা তাদের সামাজিক অবস্থা স্বীকার করে নিত—কিন্তু অন্তর দিয়ে সব সময়ে গ্রহণ করতে পারত না। পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়ের 'অনুপমা' গল্পের নায়িকা বিয়ের আগেই ছিল অন্যপূর্বা। সে সিতেশ নামে একটি যুবককে ভালবাসত। কিন্তু যেহেতু বিবাহের ক্ষেত্রে

মেয়েদের মতামতের কোন মূল্য সে সমাজ দিত না, তাই তার বিয়ে হল অন্য একজনের সঙ্গে। অনুপমা শিক্ষিত, তাই তার মন বিদ্রোহ করে উঠেছিল—কিন্তু বিবাহডোর ছিন্ন করতে পারেনি। সে একটি চিঠিতে স্বামীকে তার মনোভাব ব্যক্ত করছে :

'শ্রীচরণেষু,

আমাদের বিবাহ হইবার পরে, আমি আপনাকে এই প্রথম পত্র লিখিতেছি। . . . আমরা উভয়ে শুভ পরিণয় বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছি বটে, কিন্তু আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা, রুচি প্রবৃত্তির কথা, আমরা পূর্ব্বে কাহাকেও বলি নাই।

. . . আমাদের দেশের হিন্দু সমাজের সে রীতি নহে, আমাদের উভয়ের অভিভাবকগণ একটা কিছু ঠাওরাইয়া আমাদিগের বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। আমাদের হিন্দু সমাজের দৃষ্টিতে আমি আপনার পত্নী, আপনি আমার স্বামী, যিনি সকল সমাজের সারভূত—সকল জাতির ইষ্টদেবতা—সেই দয়াময় পরমেশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে আমি সিতেশবাবুর স্ত্রী। আপনার প্রণয়লিপির উত্তর দিতে হইলে, আপনার প্রণয়-আলিঙ্গণের প্রতি আলিঙ্গন দিতে হইলে, আমাকে দ্বিচারিণী সাজিতে হয়,—আমাকে সয়তানের সহায়ী সাজিতে হয়। রাজার আইন—সমাজের শাসন, সবই আপনার অনুকূল, আপনি আমার দেহ লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। . . .

ক্ষমার্হ অনুপমা।'[২৩১]

রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের আগে এ ভাবে কোন স্ত্রী তার স্বামীকে তাদের মানসিক দূরত্বের কথা সরসরি জানাচ্ছে, বাংলা সাহিত্যে এমন দৃষ্টান্ত খুব বেশি নেই।

কিন্তু এই অনুপমাদের মন শুধু যে চিরাচরিত সমাজে মর্যাদা পেত না,তাই-ই নয়, সে যুগের 'শিক্ষিত' ব্যক্তিরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতলস্পর্শী মনের কোন সন্ধানই রাখত না। তাই অনুপমার এই চিঠি পাওয়ার পর তার স্বামী শরৎ-কে তার শৈশব-সুহৃদ প্রিয়বাবু, বোঝাচ্ছে যে, এ অনুপমার বই-পড়া মনের বিকার মাত্র।[২৩২] কোন মেয়ে যে মনে মনে নিজের দয়িত্বকে ঠিক করে নিতে পারে, প্রেমাস্পদ নির্বাচনে স্বাধীনতা থাকতে পারে, উনবিংশ শতাব্দীতে এ ধরণা নেহাতই অবিশ্বাস্য বলে মনে হত।

উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে কত কিছু ঘটেছে, রাজাধিপতি পরিবর্তিত হয়েছে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গেছে পালটে, মানচিত্রে রদবদল হয়েছে অহর্নিশ। কিন্তু বেশি পরিবর্তিত হয়নি ঘর-গেরস্থলির ইতিহাস। পাশ্চাত্য শিক্ষারীতি, বা সভ্যতাদর্শ যখন তাদের নির্দিষ্ট পথে পরিক্রমা করেছে, তখনও অন্দরমহল রয়ে গিয়েছিল বহুলাংশে আগের মতই।

চারুলতার কথা দিয়ে আমরা বর্তমান আলোচনার সূত্রপাত করেছিলাম। 'নষ্টনীড়' রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় এসেছিল গত শতকের মেয়েদের দেখেই। কারণ, বিংশ শতাব্দীর সূচনায় মাত্র এক-দু বছরের মধ্যে মেয়েদের অবস্থার তেমন কিছু পরিবর্তন হয়নি, যাতে আমরা বলতে পারি যে চারুলতার পারিপার্শ্বিক একান্তই বিংশ শতাব্দীর অবদান। উনবিংশ শতাব্দীর দাম্পত্য-জীবনই রবীন্দ্রনাথকে এ গল্প লিখতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। সে অর্থে চারুলতা গত শতকের নায়িকা। চারুলতা 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণাল নয়। মৃণাল এ শতাব্দীর মেয়ে, সে যা করেছিল গত শতকের মেয়েরা তা করেনি, করার কথাও ভাবেনি, সুযোগ তো পায়ই নি। যতই গোপন ব্যথা থাক, স্বামীর পদচিন্তা ছাড়া বিশেষ কিছু সে যুগের মেয়েরা করে উঠতে পারে নি। তবে, ক্ষোভ জমা হচ্ছিল, এবং এই

ক্ষোভের অবচেতন প্রকাশ মূর্ত হয়ে উঠেছিল চারুলতায়। চারুলতা গত শতকের নারী-মানসের অবরুদ্ধ চেতনা, যাতনা ও বাসনার ভাবপ্রতিমা। 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কুমুদিনী যখন বিবাহিত জীবনের ওপর তীব্র কটাক্ষ করে বলে 'আমি এ বাড়িতে বিনা মাইনের স্ত্রী-বাঁদী হয়ে থাকব না', তখন সে দাম্পত্য-জীবনে স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য, অধিকারবোধ ও মর্যাদা সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন। কিন্তু সেটা ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দ। রবীন্দ্রনাথকেও বিংশ শতাব্দীর প্রায় তিন দশক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল কুমুদিনীর মুখ দিয়ে বলাতে, 'স্ত্রী যাদের দাসী, তারা কোন জাতের লোক?' উনবিংশ শতাব্দীতে তা সম্ভব ছিল না।

উল্লেখপঞ্জী

১। অন্নদামঙ্গল কাব্যের তৃতীয় খণ্ড 'মানসিংহ' উপাখ্যানের শেষে কবি সাংকেতিকভাবে কাব্যরচনার সন উল্লেখ করেছেন :

বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা।

সংকেতের অর্থ অনুযায়ী অন্নদামঙ্গলের রচনা সন ১৬৭৪ শক, অর্থাৎ ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দ। দ্র. *ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের গ্রন্থাবলী*, (কলকাতা, ১২৯৫ বঃ), পৃ ৪৮৫ পা. টী.

২। ঐ, ৪৬৩

৩। ঐ, ৪৬৭

৪। অধ্যাপক সুশীলকুমার দে এই পর্বের নাম দিয়েছেন, 'Interregnum in Poetry from 1760'
দ্র. Sushil Kumar De, *Bengali Literature in the Nineteenth Century* (Calcutta, 1962), p. 268

৫। *ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের গ্রন্থাবলী* (পূর্বোক্ত), পৃ ২২৮-২২৯

৬। প্রফুল্লচন্দ্র পাল (সম্পা), *প্রাচীন কবিওয়ালার গান* (কলকাতা, প্রকাশ সন নেই)

৭। ঐ, ৭২
রাসু ও নৃসিংহ ছিলেন দুই সহোদর ভাই। এঁদের জন্ম সন যথাক্রমে ১৭৩৪ ও ১৭৩৮।
দ্র. *প্রাচীন কবিওয়ালার গান, (পূর্বোক্ত)*

৮। ঐ, ২০৫
রাম বসুর জন্ম সন ১৭৮৬-৮৭। দ্র. *প্রাচীন কবিওয়ালার গান* , পৃ. ৫

৯। ঐ, ২০৪, রাম বসুর গান

১০। ঐ, ২৭০

১১। ঐ, ২৭১

১২। ঐ, ৩১৫

১৩। নিধুবাবুর গানের জনপ্রিয়তার প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে তাঁর গানের সংকলন *গীতরত্ন* প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১২৪৪ বঙ্গাব্দে। এরপর *গীতরত্নের* আরও দুটো সংস্করণ হয়েছিল যথাক্রমে ১২৬৩ ও ১২৭৪ বঙ্গাব্দে। মাত্র ত্রিশ বছরের মধ্যে কোন গীতগ্রন্থের তিনটি সংস্করণ, বিশেষতঃ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, উল্লেখের দাবি রাখে।

১৪। রমাকান্ত চক্রবর্তী (সম্পা.) *বিস্মৃত দর্পণ*, (কলকাতা, ১৩৭৮ বঃ) পৃ. ৫৭. 'অবতারণা'

১৫। ঐ, ২২, ৯৫, ১১৪, ৩১-৩২

১৬। ঐ, ১৩৪

১৭। *দেবীপদ ভট্টাচার্য (সম্পা.), রেভারেন্ড লালবিহারী দেও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান,* (কলকাতা, ১৯৬৮), পৃ ৫
১৮। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, *অযোগ্য পরিণয়,* (কলকাতা, ১২৮৬ বঃ) পৃ ৩৪
১৯। কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়, *দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনচরিত,* (কলকাতা, ১৩৬৩ বঃ) পৃ ৩২।
২০। *সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা,* ভাদ্র, ১৭৭২ শক, পৃ৬
২১। ইংরেজি ভাষা শেখার ফলে যে পশ্চিমের নতুন ভাবাদর্শের সঙ্গে পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটছে, তা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও অনুভূত হয়েছিল। 'কং ঘং'স্বাক্ষরিত 'বন্ধু হইতে প্রাপ্ত' একটি পত্রের প্রথম বাক্যই ছিল, 'রজনী কালে চন্দ্রের কিরণ দ্বারা যদৃশ অন্ধকার মোচন হইয়া আলোকময় হয়, সেইরূপ ভারতবর্ষের মূর্খতা অন্ধকার ইংলণ্ডীয় ভাষা অধ্যয়ন দ্বারা মোচন হইতেছে।' *সংবাদ প্রভাকর,* ২০.৪.১৮৪৯
২২। *সংবাদ প্রভাকর,* ১৫.৬.১৮৪৯
২৩। ঐ, ৩০.১১.১৮৫৪
২৪। Suresh Ch. Moitra (ed.) *Selections from Jnanannesan* (Calcutta, 1979), p. 29 (of the Bengali section)
২৫। বামাসুন্দরী দেবী, *কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে এ দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে,* (কলকাতা, ১৭৮৩ শক), পৃ ১০
২৬। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,* ভাদ্র ১৭৬৭ শক, পৃ ২০৫
২৭। Rev. K.M. Banerjea, *Native Female Education* (2nd edition), (Calutta, 1848), pp. 38-39
২৮। চন্দ্রমাধব চট্টোপাধ্যায়, 'হিন্দু মোসলমান ইংরাজ এই তিন জাতি কর্তৃক শাসিত ভারতবর্ষের অবস্থা বর্ণন বিষয়ক প্রবন্ধ' *সম্বাদ ভাস্কর,* ২০শে পৌষ, ১২৬০ বঃ, পৃ ৪৪৯
২৯। *অনুসন্ধান,* ২৯শে মাঘ, ১২৯৫বঃ, পৃ ২৩৬
৩০। Shib Chunder Bose, *Hindoos As They Are : A Description of the Manners, Customs and Inner Life of Hindoo Society in Bengal,* (Calcutta, 1881), p. 236
৩১। *বামাবোধিনী পত্রিকা,* ভাদ্র, ১২৭৪ বঃ, পৃ ৫৮১-৫৮৩
৩২। রামচন্দ্র দত্ত, *বাল্যবিবাহ,* (কলকাতা, ১২৯৪ বঃ), পৃ ৪
৩৩। *বামাবোধিনী পত্রিকা,* মাঘ, ১২৭১ বঃ, পৃ ১৫৩
৩৪। এ রকম বহু প্রহসন উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল। যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে তাদের অধিকাংশেই হয় পাওয়া যায় না কিংবা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গিয়েছে। তবু যা পাওয়া যায় তার মোটামুটি পূর্ণ তালিকার জন্য দ্র. জয়ন্ত কুমার গোস্বামী, *সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন* (কলকাতা, ১৯৭৪), পৃ ৩৪৩-৩৯১ এবং একই গবেষকের *বাংলা পথসাহিত্য : পথ-পুস্তিকা,* (কলকাতা, ১৯৮২), পৃ ১৬-৪৮
৩৫। চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, *বঙ্গবিবাহ,* (কলকাতা, ১২৮৮ বঃ), পৃ ৩৬-৩৭
৩৬। *বামাবোধিনী পত্রিকা,* মাঘ, ১২৯০ বঃ, পৃ ৩১৯-৩২০
৩৭। *বঙ্কিম রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৬১ বঃ), পৃ ৭৪৬
৩৮। দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, 'স্বামী ও স্ত্রী', *নব্য ভারত,* চতুর্থ খণ্ড, অষ্টম সংখ্যা, আশ্বিন, ১২৯৩ বঃ, পৃ ২৬০
৩৯। তারকচন্দ্র চূড়ামণি, *সপত্নী নাটক,* (কলকাতা, ১৮৫৭), পৃ ১৩
৪০। হরিমোহন কর্ম্মকার, *মাগ-সর্ব্বস্ব,* (কলকাতা, ১২৯৭ সম্বৎ), পৃ ২

৪১। রামনারায়ণ তর্করত্ন, *চক্ষুদান,* (কলকাতা, ১২৭৯ বঃ), পৃ ২৪
৪২। প্রসন্নকুমার পাল, *বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক নাটক* (কলকাতা, ১৮৬০), পৃ ৪১
৪৩। 'শ্যাম', 'আমার জীবনের ইতিহাস', *আর্য্যদর্শন*, আষাঢ়, ১২৮৭ বঃ, পৃ ১২১
৪৪। ঐ, শ্রাবণ, ১২৮৭ বঃ, পৃ ১৭১
৪৫। *আর্য্যদর্শন*, আশ্বিন, ১২৮৮ বঃ, পৃ ২৭৭
৪৬। নবীনচন্দ্র সেন, *আমার জীবন*, (কলকাতা, ১৩১৪ বঃ), পৃ ৭০
৪৭। *সংসার*, ১৫ই ফাল্গুন ও ২২শে ফাল্গুন, ১৩০৪ বঃ
গল্পের পরবর্তী অংশে লেখক ইন্দুলেখার মানসিক দ্বন্দ্বটি ফুটিয়ে তুলেছেন। বাসন্তী পূর্ণিমার রাতে সে ছাতে দাঁড়িয়েছিল।
'বসন্ত-সমীর পুষ্প সৌরভ বহন করিয়া ধীরে ধীরে তাহার যৌবনতপ্ত দেহ স্পর্শ করা মাত্র ইন্দুলেখা ভাবে, 'এ জগতে সুখভোগ করিবার অধিকার সকলেরই আছে। তবে আমি সুখভোগে বঞ্চিত হইব কেন ? ধর্ম্মের জন্য। কিন্তু ধর্ম্ম যদি থাকে তবে এমন হয় কেন ?' ঠিক সেই সময়ে নদীর তীরে জ্যোৎস্নালোকে দাঁড়িয়ে এক যুবক প্রেমের গান গেয়ে ওঠে। 'তখন ইন্দুলেখা হৃদয় হারাইল। লজ্জা ও ভয় আর তাহার রহিল না।' 'চন্দ্রলোকে দণ্ডায়মান যুবকের সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া সে ছাদ হইতে নামিয়া বুভুক্ষিতা সিংহীর ন্যায় তাহার উদ্দেশে চলিল।' সে যুবককে হৃদয়দান করেছিল। কিন্তু ভৃত্যের মুখে সহসা একটি ভক্তিগীতি শুনে ইন্দু পরপুরুষে আত্ম-নিবেদন করার ভ্রষ্টতার কথা মনে করে অনুতপ্ত হৃদয়ে দ্রুত ঘরে ফিরে আসে। পরদিন সে আত্মহত্যার জন্য আফিম খায়। স্বামী রামদয়াল বাবু সংবাদ পেয়ে যখন বাড়ি পৌঁছলেন, তখন ইন্দুলেখার শেষ অবস্থা। স্ত্রীর শেষ শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে রামদয়াল বাবু যা বলেন, তাতেও কিন্তু সেই অসম বিবাহের ফলে স্ত্রীর বিরহতাপিত হৃদয়ের একাকিত্বই স্বীকৃত হয়েছে : 'যুবতী যুবকের প্রয়োজন—বৃদ্ধের নয়। সংসারে যে যাহার অনুপযুক্ত [উপযুক্ত ?] সে তাহা পায় না।. . .তোমার জীবন ও যৌবন আমিই বিফল করিয়াছি। আমিই তোমার মৃত্যুর কারণ। আমি নারীহন্তা আমার নিস্তার নাই।'
দ্র. *সংসার*, ১৫ই ফাল্গুন, ১৩০৪ বঃ, পৃ ৬৯ ও ২২ শে ফাল্গুন, ১৩০৪ বঃ, পৃ ৭৬-৭৭
৪৮। *সপত্নী-নাটক*, (পূর্বোক্ত), পৃ ১৩২
৪৯। রামনারায়ণ তর্করত্ন, *কুলীনকুলসর্ব্বস্ব* (১৮৫৪), (কলকাতা, ১৯৮৭), পৃ ১৯
৫০। ঐ, পৃ ৪৭
৫১। যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, *চপলাচিত্তচাপল্য*, (কলকাতা, ১৮৫৭), পৃ ৩৬
৫২। *কুলীনকুলসর্ব্বস্ব*, (পূর্বোক্ত), পৃ ৪৩
৫৩। *চপলাচিত্তচাপল্য*, (পূর্বোক্ত), পৃ ৩৭
৫৪। *সপত্নী-নাটক*, (পূর্বোক্ত), পৃ ৯০
৫৫। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রচিত 'তমস্বিনী' গল্পে শ্যামা নামে এমন একটি মেয়ের কথা আছে। শ্যামা খুব ছোট বয়সে বিধবা হয়েছিল, আর বিয়ের পর স্বামীর মুখ দেখেছিল মাত্র একদিন। এখন শ্যামার বয়স পঁচিশ। তার আরও দু-একটি সমবয়স্কা বন্ধু আছে। কিন্তু শ্যামা দাম্পত্য-বিষয়ে সবচেয়ে কম জানত বলে ঐ বিষয়ে কোন আলোচনা হলে সে হাঁ করে শুনত। ফলে, 'গোপনীয় কথা বলিতে শ্যামা সকলের সেরা হইয়া উঠিয়াছিল। যে সব গান অতি কদর্য্য, যে সকল গল্প নিতান্ত অশ্রাব্য সেই সকল গান ও গল্প [সে] বয়স্যদিগের নিকট করিত। ইহা ভিন্ন অন্য কিছু আমোদ সে জানিত না।'
দ্র. *জন্মভূমি*, মাঘ ১৩০১ বঃ, পৃ ৬৯

৫৬। *সপত্নী-নাটক*, (পূর্বোক্ত) পৃ, ৯
৫৭। ধীরেন্দ্রনাথ পাল, *স্ত্রীর সহিত কথোপকথন* (প্রথম ভাগ), (কলকাতা, প্রকাশ সন নেই), পৃ ১৬, ১৭, ১৯
৫৮। শ্যামাচরণ শ্রীমাণি, *বাল্যোদ্বাহ নাটক*, (কলকাতা, ১৮৬০), পৃ ৩২-৩৩
৫৯। বিনোদিনী দাসী, *আমার কথা* (১৩১৯ বঃ), (কলকাতা, ১৩৭৬ বঃ) পৃ ৯-১০
৬০। *অমৃত গ্রন্থাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), (বসুমতী সাহিত্য মন্দির সংস্করণ), পৃ ৩১
৬১। *আমার কথা*, (পূর্বোক্ত), পৃ ৩৭
৬২। শিশিরকুমার ঘোষ, *নয়শো রূপেয়া*, (কলকাতা, ১৮৭৪), পৃ ৫০
৬৩। *অযোগ্য পরিণয়*, (পূর্বোক্ত), পৃ ১০
৬৪। বিনোদিনী দাসী, *আমার কথা*, (পূর্বোক্ত), পৃ ৬৬
৬৫। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মেয়েদের মধ্যে ব্রাহ্মরাই তাঁদের মেয়েদের তুলনামূলকভাবে বেশি শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের বক্তব্য রচনাকারে প্রকাশ করাব মতো প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ব্রাহ্ম মহিলাদেরই সবচেয়ে বেশি ছিল। দ্র. বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়।
৬৬। *নয়শো রূপেয়া*, (পূর্বোক্ত) ; অম্বিকাচরণ গুপ্ত, *কলির মেয়ে ছোট-বৌ*, (কলকাতা, ১২৮৮ বঃ) ; কালিপদ মুখোপাধ্যায়, *অনন্তলীলা (গুপ্তকথা)*, (কলকাতা, ১৩১৭ বঃ) (নতুন সং), *বিদূষক*, ২য় সংখ্যা, ১২৭৭ বঃ ; *অনন্তলীলা*, (পূর্বোক্ত)
৬৭। *স্ত্রীর সহিত কথোপকথন* (প্রথম ভাগ) (পূর্বোক্ত), পৃ ৫৩
৬৮। *পরিচারিকা*, আষাঢ়, ১২৮৬ বঃ, পৃ ৪৮
৬৯। দ্র. সনৎকুমার মিত্র, *শেকসপীয়র ও বাঙলা নাটক*, (কলকাতা, ১৩৯০ বঃ), পৃ ১৩
৭০। Vide : W. H. Carey, *The Good Old Days of Honourable John Company* (1882), (Calcutta, 1964), p. 178
৭১। হিন্দু কলেজে শেকসপিয়ারের একটি বিয়োগান্ত নাটক পড়াতেন ডিরোজিও। এছাড়া সাহিত্যের মধ্যে তিনি পড়াতেন Gay's Fables, Iilliad Odyssey, Dryden-এর Virgil এবং Milton-এর Paradise Lost.
দ্র. T. Edwards, *Henry Derozio, The Eurasian Poet, Teacher and Journalist* (Calcutta, 1884), p. 66
৭২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস* (কলকাতা, ১৩৬৮ বঃ), পৃ ১৮
৭৩। Vide : Ketaki Kushari Dyson, *A Various Universe*. (Oxford, 1978), p. 259
৭৪। রাজনারায়ণ বসু, *আত্মচরিত*, (কলকাতা, ১৩৫১ বঃ), পৃ ২০
৭৫। ঐ, ২২
৭৬। এমিলি ইডেন লিখেছিলেন : 'The native generation who have been brought up at the Hindoo College are perfectly mad about Shakespeare. What a triumph for him, dear creature.' vide : *A Various Universe*, op cit.p. 261
৭৭। 'বিবাহ', *বামাবোধিনী পত্রিকা*, ভাদ্র, ১২৭৪ বঃ, পৃ ৫৮২
৭৮। 'স্ত্রী ও স্বামীর পরস্পর সম্বন্ধ', *বামাবোধিনী পত্রিকা*, আশ্বিন, ১২৭১ বঃ, পৃ ১৮৩-১৮৪
৭৯। 'দুয়ে এক কিরূপে', *পরিচারিকা*, কার্তিক, ১২৯৫ বঃ, পৃ ১৬৬
৮০। *মহিলা*, আশ্বিন, ১৩১০ বঃ, পৃ ৭৯,
৮১। ঐ
৮২। শিক্ষিত বর বিয়ের প্রথম রাতে কনের সঙ্গে আলাপের চেষ্টা করছে :

বর ॥

জীবনে জীবন প্রথম মিলন,
যে সুখের কোথা তুলনা নাই।
এস, সব ভুলে আজি আঁখি তুলে
শুধু দুঁহু দোঁহা মুখ চাই।
মরমে মরমে শরমে ভরমে
জোড়া লাগিয়াছে এক ঠাঁই।
যেন এক মোহে ভুলে আছি দোঁহে,
যেন এক ফুলে মধু খাই।

সব শোনার পর কনে বলছে, আইমার কাছে শুতে যাই।

বর যখন প্রশ্ন করে :

কানন নিরালা, আঁখি হাসি-ঢালা,
মন সুখস্মৃতি সমাকুল
কী করিছ বনে কুঞ্জবনে ?

কনে বলে, খেতেছি বসিয়া টোপাকুল।

এরপর বর যখন বিরহ, নিরাশা প্রভৃতি গুরু বিষয়ে চিন্তায় আচ্ছন্ন, তখন স্ত্রীর মনোভাব—

বর ॥ বিষাদিনী বসি বিজন বিপিনে
কী করিবে তুমি প্রিয়ে ?
বিরহের বেলা কেমন কাটিবে ?

কনে ॥ দেব পুতুলের বিয়ে।

রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৬৮ বঃ), পৃ ৩১০-৩১২

৮৩। শরচ্চন্দ্র ধর, *অবলা বান্ধব*, (কলকাতা, ১৯৪৯ সম্বৎ), পৃ ১২

৮৪। *পরিচারিকা*, বৈশাখ, ১২৯৩ বঃ, পৃ ২৩

৮৫। *বামাবোধিনী পত্রিকা*, আষাঢ়, ১২৮৮ বঃ, পৃ ১৯৮

৮৬। শিবনাথ শাস্ত্রী, 'নারীর সখিত্ব', *ভারত-মহিলা*, ফাল্গুন, ১৩১২ বঃ, পৃ ১৪৯
বিবাহের অর্থ যে ব্যভিচার ও সব ধরণের 'অনৈতিক' সম্পর্কের অবসান এবং সেটা যে সামাজিক ও ব্যক্তিগত সাম্য, উভয়ের জন্যই জরুরি, এই সচেতনতা শুধু ব্রাহ্মদের আত্মপ্রচারধর্মী রচনাতেই নয়, অন্যত্রও পাওয়া যায়। দ্র. Jogendra Chandra Ghosh, *Conduct in Society : A treatise Morals*, (Calcutta 1889), p. 38

৮৭। *বঙ্কিম রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ ৩০৪

৮৮। মুক্তকেশী দেবী, 'রমণীর গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য', *অন্তঃপুর*, অগ্রহায়ণ, ১৩০৮ বঃ, পৃ ২৫৩

৮৯। 'নারী জীবনের উদ্দেশ্য' *বামাবোধিনী পত্রিকা*, মাঘ, ১২৯০ বঃ, পৃ ৩২০

৯০। *মহিলা*, শ্রাবণ, ১৩০৪ বঃ, পৃ ৩
মহিলা পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল শ্রাবণ, ১৩০২ বঙ্গাব্দে। এর সম্পাদক ছিলেন ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক গিরিশচন্দ্র সেন।

৯১। আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত, *গৃহিণীর কর্ত্তব্য* (১২৯১ বঃ) (কলকাতা, ১৩২০ বঃ), পৃ ৬৬-৬৮

৯২। 'মহিলার স্বাস্থ্য' *অন্তঃপুর*, আষাঢ়, ১৩১০ বঃ, পৃ ৫৯ *অন্তঃপুর* পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩০৪ বঙ্গাব্দে। এর প্রথম সম্পাদিকা বনলতা দেবী ছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা। বনলতা দেবীর মৃত্যুর পর এই

পত্রিকার পরবর্তী দুই সম্পাদিকা যথাক্রমে হেমন্তকুমারী চৌধুরী ও কুমুদিনী মিত্রও ব্রাহ্ম ছিলেন।

৯৩। নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মতে পাশ্চাত্য ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বাঙালি সমাজ সতীত্ব ও পাতিব্রত্য নিয়ে 'সুখ বা গর্ব' অনুভব করেনি। শ্রী চৌধুরীর মতে, উনবিংশ শতাব্দীতে সৃষ্ট নতুন সংস্কৃতিতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাঙালি পাশ্চাত্যের 'উচ্চতম জিনিসের' সঙ্গে প্রাচ্যের 'উচ্চতম জিনিসের' সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিল। তাঁর মতে, প্রেমের সঙ্গে সতীত্ব বা পাতিব্রত্যের সমন্বয়ের চেষ্টা এই বৃহত্তর সমন্বয় সাধনের প্রয়াসের অন্তর্ভুক্ত। নীরদচন্দ্র চৌধুরীর ভাষায় : 'নরনারীর সম্পর্কের রোমান্টিক পাশ্চাত্য রূপের সন্ধান পাইবামাত্র বাঙালির মনে হইল এই 'থিসিস'-এর একটি দেশী 'কাউন্টারথিসিস'-এরও প্রযোজন আছে। তাই বাংলাসাহিত্যে পতিব্রত্যের ধারণাও নূতন রূপ ও নতুন গৌরব ধরিয়া দেখা দিল।'
দ্র. নীরদচন্দ্র চৌধুরী, *বাঙালীর জীবনে রমণী*, (কলকাতা, ১৩৮৯ বঃ), পৃ ১৪৮-১৪৯

৯৪। Gyanendra Kumar Rai Chaudhuri, *Hindu Customs and Manners*, (Taki, 1888), pp. 28, 38-39, 42-43

৯৫। 'পতি সতীর একমাত্র গতি' *বঙ্গমহিলা*, জ্যৈষ্ঠ-১২৮২ বঃ, পৃ ৪৭

৯৬। শরচ্চন্দ্র ধব, *অবলা-বান্ধব*, (পূর্বোক্ত), পৃ ৪

৯৭। *পরিচারিকা*, চৈত্র, ১২৯৪ বঃ, পৃ ২৬৫

৯৮। ঐ

৯৯। ঐ, ২৬৬

১০০। *বঙ্কিম রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), (পূর্বোক্ত), পৃ ৭৬২

১০১। 'পতিব্রতা ও পাতিব্রত্য' *পরিচারিকা*, শ্রাবণ, ১২৮৬ বঃ, পৃ ৪৯

১০২। *মহিলা*, শ্রাবণ, ১৩০৪ বঃ, পৃ ৩

১০৩। 'প্রকৃত স্ত্রী' *বামাবোধিনী পত্রিকা*, পৌষ, ১৩০৪ বঃ, পৃ ৩২৪

১০৪ 'স্ত্রী জাতির কর্ত্তব্য,' *পরিচারিকা*, বৈশাখ, ১২৯৩ বঃ, পৃ ২৩

১০৫ 'নারী মানবকুলের আশ্রয়', *পরিচারিকা*, আষাঢ়, ১২৮৭ বঃ, পৃ ২৭

১০৬ বনলতা দেবী, 'রমণীর পরিবারিক ও সামাজিক কর্ত্তব্য' *অন্তঃপুর*, বৈশাখ, ১৩১০ বঃ, পৃ ১৯

১০৭ নগেন্দ্রবালা সরস্বতী, *গার্হস্থ্য ধর্ম*, (কলকাতা, ১৯০৪), পৃ ৩৩

১০৮ 'সতী ও সতীত্ব' *পরিচারিকা*, আষাঢ়, ১২৯২ বঃ, পৃ ২৭
এমনও বলা হয়েছিল যে আত্মত্যাগ, ভক্তি ও প্রেমের মত গুণ ছাড়া একজন নারী বিদূষী (Enlightened)হতে পারে, কিন্তু কখনোই হিন্দু স্ত্রী হওয়ার উপযুক্ত নয়। দ্র. *Hindu Customs and Manners*, op cit., p. 39

১০৯। 'সতীত্ব ও পাতিব্রত্যে বিভিন্নতা কি?' *পরিচারিকা*, বৈশাখ, ১২৮৯ বঃ, পৃ ৮

১১০। ঈশানচন্দ্র বসু, *স্ত্রীদিগের প্রতি উপদেশ*, (কলকাতা, ১৮০৭ শক), পৃ ৪

১১১। দ্র. বর্তমান অধ্যায়ের উল্লেখপঞ্জী নং ৫৭

১১২। Vide: Fernando Henriques, *Modern Sexuality*, (London, 1968), pp. 218-23

১১৩। 'স্বামী বশীকরণ মন্ত্র', *সাধারণী*, ১৪ই ভাদ্র, ১২৮৭ বঃ, পৃ ২৩২

১১৪। 'স্ত্রী ও পুরুষজাতির পরস্পর সম্বন্ধ', *বামাবোধিনী পত্রিকা*, শ্রাবণ, ১২৭১ বঃ, পৃ ১৫১

১১৫। ঐ, ১৫২-১৫৩

১১৬। *সমাজ-দীপিকা*, আষাঢ়, ১২৯২ বঃ, পৃ ৪৪-৪৫

১১৭। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, কার্তিক, ১৮০৪ শক, পৃ ১২৯
১১৮। 'নরনারীর সাম্য' *বামাবোধিনী পত্রিকা*, ভাদ্র, ১৩০৪ বঃ, পৃ ১৬৯
১১৯। 'পতিব্রতা এবং সতী', *বামাবোধিনী পত্রিকা*, জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৭ বঃ, পৃ ৩৪
১২০। দ্র. *রবীন্দ্র রচনাবলী* (ত্রয়োদশ খণ্ড), (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৬৮ বঃ), পৃ ৭৯
১২১। *সমাজ-দীপিকা*, আষাঢ়, ১২৯২ বঃ, পৃ ৪৫
১২২। নব নীতির বলিষ্ঠ জয়-ঘোষণা সত্ত্বেও পুরুষ বারাঙ্গনাসঙ্গ যে কতটা কামনা করত এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যে বারাঙ্গনাসক্তি কতটা বেড়ে গিয়েছিল, তা বোঝা যায় সমসাময়িক কয়েকটি প্রহসনের নাম থেকে। যেমন, হরিশ্চন্দ্র মিত্র, *ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে* (১৮৬৩), প্যারীমোহন সেন, *রাঁড় ভাঁড় মিথ্যা কথা তিন লয়ে কলিকাতা* (১২৭০ বঃ), প্রসন্নকুমার পাল, *বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক নাটক* (১৮৬০), বিপিনবিহারী দে, *একাদশীর পারণ* (১৮৭১), ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায, *মা এয়েছেন ! ! !* (১৮৭৩), তারিণী চরণ দাস, *বেশ্যা বিবরণ* (১৮৬৯), দীননাথ চন্দ্র, *কমলা কাননে কলমের চারার আঁটী* (১৮৮০), অজ্ঞাতনামার *বাহবা চৌদ্দ আইন*, প্রভৃতি।
দ্র. জয়ন্ত গোস্বামী, *সমাজচিত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন*, (পূর্বোক্ত), পৃ ১৬৯-২১৬
১২৩। বটুবেহারী বন্দ্যোপাধ্যায, *হিন্দু মহিলা নাটক* (কলকাতা, ১৮৬৯), পৃ ২১
১২৪। নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, *সমাজ-সংস্করণ*, (কলকাতা, ১২৭৬ বঃ), পৃ ৮২
১২৫। রাজনারায়ণ বসু, *সে কাল আর এ কাল*, (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮৩), পৃ ৭৮
১২৬। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.) *পুরাতন বাংলা পদ্যগ্রন্থ সংকলন* (দ্বিতীয়খণ্ড), (কলকাতা, ১৯৮১), পৃ ১৬৪
১২৭। ঐ, ১৬৮
১২৮। নারায়ণ দত্ত, *জন কোম্পানীর বাঙালি কর্মচারী*, (কলকাতা, ১৯৭৬), পৃ ৮১
১২৯। *হুতোম প্যাঁচার নক্শা*, (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৯১ বঃ), পৃ ৩৮
১৩০। ঐ, ১৫১
হুতোম প্যাঁচার নকশা ও *সমাজ কুচিত্র* গ্রন্থ দুটি বঙ্গীয সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণে *হুতোম প্যাঁচার নক্শা* গ্রন্থের মধ্যেই সন্নিবিষ্ট হয়েছে।
১৩১। শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ* (কলকাতা, ১৯৮৩), পৃ ৫৫-৫৬
১৩২। ঐ, ৪৩
এই বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এদেশের বিবাহিত পুরুষদের দাম্পত্যনীতি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ১২৯৪ বঙ্গাব্দে লেখা 'হিন্দু বিবাহ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'এখনও দেখা যায় দেশের অনেক খ্যাতনামা লোক প্রকাশ্যে রাজপথে গাড়ি করিয়া বেশ্যা লইয়া যাইতে এবং ধূমধাম করিয়া বেশ্যা প্রতিপালন করিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করিবেন না এবং সমাজও সে বিষয়ে তাহা দিগকে লাঞ্ছনা করেনা. . .,' দ্র. *রবীন্দ্ররচনাবলী* (ত্রয়োদশ খণ্ড), (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৬৮ বঃ), পৃ ৮২
১৩৩। হরিশ্চন্দ্র মিত্র, *ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে*, (ঢাকা, ১৮৬৩), পৃ ৫
১৩৪। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, *ভ্যালারে মোর বাপ*, (কলকাতা, ১২৯৩ বঃ), পৃ ৩০
১৩৫। *দীনবন্ধু রচনাবলী*, (সাহিত্য সংসদ সং, কলকাতা, ১৯৮১), পৃ ১৩০
১৩৬। বাংলা সাহিত্যে যে নতুন রুচির অনুকূল এক ধরনের সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, তা বোঝা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের *দেবী-চৌধুরাণী* উপন্যাসের একটি অংশে : 'ব্রজেশ্বর না বুঝিয়া সুঝিয়া

—আ ছি ছি ছি বাইশ বছর বয়সেই ধিক্। ব্রজেশ্বর না বুঝিয়া সুঝিয়া না ভাবিয়া চিন্তিয়া, যেখানে বড় ডবডবে চোখের নীচে দিয়া এক ফোঁটা জল গড়াইয়া আসিতেছিল — সেই স্থানে — আ। ছি ছি ছি ছি — ব্রজেশ্বর হঠাৎ চুম্বন করিলেন। গ্রন্থকার প্রাচীন—লিখিতে লজ্জা নাই—কিন্তু ভরসা করি, মার্জ্জিতরুচি নবীন পাঠক এইখানে এ বই পড়া বন্ধ করিবেন'।

দ্র. *বঙ্কিমরচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), (পূর্বোক্ত), পৃ ৭৪৭

ধীরে ধীরে নতুন মার্জিত রুচির বিকাশ ঘটছিল, তার ফলে প্রেম-পরিণয় সংক্রান্ত নতুন ভাবধারার বাহক হিসাবে বাংলা সাহিত্যে 'উচ্চ শ্রেণীর' সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, যদিও সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীর দর্পণ হিসেবে পথ-পুস্তিকাধর্মী রচনা বা স্বল্পখ্যাত প্রহসনে বর্ণিত পাত্র-পাত্রীর চরিত্র অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। তুলনায়, 'উচ্চ শ্রেণী'র সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল মূলতঃ নতুন মূল্যবোধ ও নীতি-আদর্শ থেকে।

১৩৭। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে ও সমাজে সব কিছুই ছিল বিধি-নির্দিষ্ট। দৈব ইচ্ছাই ছিল মানবজীবনের সবচেয়ে বড় নিয়ন্ত্রক। মধ্যযুগীয় সাহিত্যের চরিত্রদের মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছা বা কর্মশক্তির প্রকাশ দেখা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি প্রধানতঃ বাঙালির মানসিকতায় পরিবর্তনের ফল। এর পেছনে ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় অবশ্যই সহায়ক হিসাবে কাজ করেছিল। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য দ্র. ভবতোষ দত্ত, *কাব্যবাণী*, (কলকাতা, ১৯৬৬), পৃ ১-১৩।

১৩৮। ঈশানচন্দ্র বসু, *নারী নীতি*, (কলকাতা, ১২৯১ বঃ), পৃ ৩২-৩৩

১৩৯। শিবনাথ শাস্ত্রী, *আত্মচবিত*, (কলকাতা, ১৩৫৯ বঃ), পৃ ২৯

১৪০। *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, (পূর্বোক্ত), পৃ ১০৩

১৪১। মন্মথনাথ ঘোষ, *রাজা দক্ষিণাবঞ্জন মুখোপাধ্যায়* (১৯১৭), (কলকাতা, ১৯৮২), পৃ ৩৭-৪৩

১৪২। নবীনচন্দ্র সেন, *আমার জীবন* (প্রথম ভাগ), (পূর্বোক্ত), পৃ ১২০-১২১

১৪৩। Sunity Devee, *The Autobiography of an Indian Princess*. (London, 1921), p. 30

১৪৪। *হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী*, (কলকাতা, বসুমতী সাহিত্য-মন্দির সং), পৃ ২৬০

১৪৫। দ্র. কৈলাসবাসিনী দেবী, *হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা* (কলকাতা, ১৮৬৩), পৃ ৬২, *পরিচারিকা*, আষাঢ়, ১২৮৬ বঃ, পৃ ৪৮, *বামাবোধিনী পত্রিকা* , মাঘ, ১২৯০ বঃ, পৃ ৩১৯, *সংসার*, ১৫ই ফাল্গুন, ১৩০৪ বঃ, পৃ ৬৮, অন্নদাপ্রসাদ বসু, *অনঙ্গরঙ্গিনী* (কলকাতা, ১৮৯৭), পৃ ২৬, *মহিলা*, আশ্বিন, ১৩১০ বঃ, পৃ ৭৯ প্রভৃতি

১৪৬। নরেশচন্দ্র জানা, মানু জানা ও কমলকুমার সান্যাল (সম্পা.), *আত্মকথা* (দ্বিতীয় খণ্ড), (কলকাতা, ১৯৮২), (নিস্তারিনী দেবীর আত্মকথা), পৃ ১৮-১৯, ২১

১৪৭। নরেশচন্দ্র জানা, প্রমুখ (সম্পা.), *আত্মকথা* (প্রথম খণ্ড), (কলকাতা, ১৯৮১), (রাসসুন্দরী দেবীর আত্মকথা), পৃ ১৪, ১৬, ১৮

১৪৮। 'বালিকা বিবাহ ও বালিকা সহবাস', *বেদব্যাস*, ভাদ্র, ১২৯৭ বঃ, পৃ ৯৬-৯৯

১৪৯। শিবনাথ শাস্ত্রী, *আত্মচরিত*, (পূর্বোক্ত), পৃ ৭৯

১৫০। ঐ, ৬৮

১৫১। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে উদ্ভূত বিবাহবিধি অনুযায়ী দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রথমে কুল রক্ষার জন্য কুলীন কন্যা বিবাহ করে পরে মৌলিক (অর্থাৎ, অকুলীন) ঘরে যে বিবাহ করত তার নাম 'আদ্যরস'। দ্র. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয়*

শব্দকোষ (প্রথম খণ্ড), (নয়া দিল্লী, ১৯৭৮), পৃ ২৭৪
এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য দ্র. Ronald B. Inden, *Marriage and Rank in Bengali* Culture, (New Delhi, 1976) p. 77-78

১৫২। *দীনবন্ধু রচনাবলী*, (পূর্বোক্ত), পৃ ২৩২

১৫৩। পরবর্তীকালে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে 'ভাই ছুটি' সম্বোধন করে চিঠি লিখেছিলেন। তবে যতদূর জানা যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরই বাংলাদেশে প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি স্ত্রীকে 'ভাই' সম্বোধন করে চিঠি লিখতেন।

১৫৪। ইন্দিবা দেবী চৌধুরানী (সম্পা.), *পুবাতনী*, (কলকাতা, ১৮৭৯ শক), পৃ ৪৬-৪৮

১৫৫। ঐ, ৪৮-৪৯

১৫৬। ঐ, ৪৯-৫০

১৫৭। *স্ত্রীব সহিত কথোপকথন* (প্রথমভাগ), (পূর্বোক্ত), পৃ ৬৭

১৫৮। দ্র. ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আর্য্যবমণীব শিক্ষা ও স্বাধীনতা*, (কলকাতা, ১৩০৭ বঃ), পৃ ১৩১-১৩২

১৫৯। দ্র. অমৃতলাল গুপ্ত, *পুণ্যবতী নারী*, (কলকাতা, ১৯২৩), পৃ ১০

১৬০। দেবেন্দ্রনাথ দাস, *পাগলের কথা*, (কলকাতা, ১৩১৭ বঃ), পৃ ১০৭

১৬১। ঐ, ১১২-১১৪

১৬২। যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, *স্ত্রী ও স্বামী*, (কলকাতা, ১৩০১ বঃ), পৃ ১২

১৬৩। *বঙ্কিম বচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), (পূর্বোক্ত), প ২৭১

১৬৪। ঐ, ২৭১-২৭২

১৬৫। *বঙ্কিম বচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), (সাহিত্য সংসদ সংস্কবণ, কলকাতা, ১৩৬১ বঃ), পৃ ১৬০

১৬৬। *অন্তঃপুব*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮ বঃ, পৃ ১১৮

১৬৭। 'পত্নীভক্তি ও পত্নীভয়' *সাধারণী*, ১৭ই চৈত্র, ১২৮০ বঃ, পৃ ২৭১

১৬৮। দ্র. *নবপ্রবন্ধ*, বৈশাখ, ১২৭৪ বঃ, পৃ ১৪, হবিমোহন কর্ম্মকার, *মাগ সর্ব্বস্ব* (কলকাতা, ১৮৭০), অজ্ঞাতনামা, *মেযে মনষ্টাব মিটিং* (১৮৭৫), ভোলানাথ মুখোপাধ্যায, *ভ্যালা বে মোর বাপ* (১৮৭৬), কাশীনাথ বর্মা, *ছেলেব কি গুণ, স্ত্রীব জন্য মাকে খুন* (১৮৭৬), বিপিনবিহাবী দে, *অবলা কি প্রবলা ?* (১৮৮৯), প্রভৃতি

১৬৯। *পুরাতনী*, (পূর্বোক্ত), পৃ ৫৮

১৭০। বিনয় ঘোষ (সম্পা.) *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র* (তৃতীয় খণ্ড) (কলকাতা, ১৯৮০), পৃ ২১

১৭১। অক্ষয়কুমার দত্ত, *ধর্ম্মনীতি*, (কলকাতা, ১৮৫৬), পৃ ৬১

১৭২। বীরেশ্বর পাঁড়ে, *অদ্ভুত স্বপ্ন বা স্ত্রীপুরুষের দ্বন্দ্ব*, (কলকাতা, ১২৯৫ বঃ), পৃ ৬৭

১৭৩। 'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী' (১২৮৪ বঃ), *বঙ্কিম রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড) (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৬১ বঃ) পৃ ৮৩৪

১৭৪। বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন যে বাঙালি জীবনে প্রাক্-বৈবাহিক প্রেম নেই। শিক্ষিত বাঙালি 'কোর্টশিপ' শিখেছিল পাশ্চাত্য সাহিত্য পাঠ করে। সেই কোর্টশিপকে নিজেদের সাহিত্যকর্মে আমদানি করার স্পৃহা খুব স্বাভাবিক। দু-একজন স্থান-কাল-পাত্র ভুলে সে চেষ্টাও করেছিলেন। এই বিস্মরণের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্রকে সমালোচনা করেছিলেন। অথচ, এ সমস্যা বঙ্কিমচন্দ্রেরও ছিল। এর সমাধানের জন্য তিনি একটা নতুন পথ বেছে নিয়েছিলেন। বাংলা উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের ভালবাসার সূচনা হত বিবাহের পরবর্তী জীবনে। আবার 'কোর্টশিপে'র ধারণা বাঙালি-মনকে এতটা নাড়া

দিয়েছিল যে তার দাবিও পূরণ করার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা নিজের ভেতর থেকে অনুভব করেছিলেন। নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মতে, এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য বিবাহের পরবর্তী ভালোবাসাকেও 'কোর্টশিপে'র মত দেখানো হয়েছে। নীরদচন্দ্র চৌধুরী এর নাম দিয়েছেন 'post-marital courtship.' দ্র. *বাঙালি জীবনে রমনী*, (পূর্বোক্ত), পৃ ২০৩-২০৪

১৭৫। বামাবোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০ বঃ, পৃ ৫৮

১৭৬। Edward Storrow, *The Eastern Lily Gathered* (London : 1858), p 42

১৭৭। *পুরাতনী*, (পূর্বোক্ত), পৃ ২৭

১৭৮। গিরিশচন্দ্র সেন, *ব্রহ্মময়ী চরিত*, (কলকাতা, ১৮৬৯), পৃ ৬

১৭৯। নরেশচন্দ্র জানা, প্রমথ (সম্পা.), *আত্মকথা* (প্রথম খণ্ড), (পূর্বোক্ত), পৃ ১১ (দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা)

১৮০। জ্যোতির্ময়ী মুখোপাধ্যায়, *তত্ত্বভূষণ-জীবনী*, (কলকাতা, ১৩৬৬ বঃ), পৃ ৪৫

১৮১। *পুরাতনী*, (পূর্বোক্ত), পৃ ৩৩

১৮২। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুব, *আমাব বাল্যকথা ও আমাব বোম্বাই প্রবাস*, (কলকাতা, ১৯১৫), পৃ ৫

১৮৩। *ববীন্দ্র বচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), (কলকাতা, জন্মশতবার্ষিক সংস্কবণ, ১৯৬১), পৃ ৪৬৯-৪৭০

১৮৪। ঐ, ৪৭১

১৮৫। শ্রীনাথ চন্দ, *ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর*, (ঢাকা, ১৩২০ বঃ), পৃ ১১৪-১১৫

১৮৬। সুদক্ষিণা সেন, *জীবন-স্মৃতি*, (কলকাতা, ১৩৩৯ বঃ), পৃ ১০৬-১০৮

১৮৭। দ্র. শিবনাথ শাস্ত্রী, *আত্মচরিত*, (পূর্বোক্ত), পৃ ১৪২-১৫০

১৮৮। Sunity Devee, *The Autobiography of an Indian Princess*, Op., cit., pp. 54-55

১৮৯। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য দ্র. প্রভাত বসু, *মহারাণী সুচাবু দেবীর জীবনকাহিনী*, (কলকাতা, ১৩৬৯ বঃ), পৃ ৬৭-৭৩

১৯০। ইন্দিরা দেবী, *আমাব খাতা*, (কলকাতা, ১৩১৯ বঃ), পৃ ৪৫-৪৬

১৯১। দ্র. চিত্রা দেব, *অন্তঃপুরেব আত্মকথা*, (কলকাতা, ১৯৮৪), পৃ ৭১-৭২

১৯২। ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ইন্দিবা দেবীকে লেখা প্রমথ চৌধুরীর চিঠিই তাঁদের পরস্পরকে লেখা প্রাপ্ত চিঠিগুলির মধ্যে প্রাচীনতম।
দ্র. সুভাষ চৌধুরী (সম্পা.), *ইন্দিরা দেবী-প্রমথ চৌধুরী পত্রাবলী* (কলকাতা, ১৯৮৫), পৃ১

১৯৩। দ্র. *অন্তঃপুরের আত্মকথা*, (পূর্বোক্ত), পৃ ৭৩

১৯৪। *ইন্দিরা দেবী-প্রমথ চৌধুরী পত্রাবলী*, (পূর্বোক্ত), দ্র. পত্রসংখ্যা ১, ২, ৩

১৯৫। ঐ, পত্র সংখ্যা ৪, পৃ ৪

১৯৬। ঐ, পত্র সংখ্যা-২০, পৃ ৩১-৩২

১৯৭। ঐ, ৬-৭৭

১৯৮। ঐ, পত্র সংখ্যা ৫৩, পৃ ৯৮

১৯৯। সরলাদেবী চৌধুরানী, *জীবনের ঝরাপাতা*, (কলকাতা, ১৩৮৮ বঃ), পৃ ১৮৫-১৮৬

২০০। ব্রাহ্ম সমাজ ও ব্রাহ্ম বিবাহকে ঠাট্টা করে গত শতকের শেষ ভাগে বেশ কয়েকটি প্রহসন রচিত হয়েছিল। যেমন, অমৃতলাল বসু, *বিবাহ বিভ্রাট প্রহসন* (১৮৮৪), ভুবনমোহন সরকার, ডাক্তারবাবু (১৮৭৫), অমৃতলাল বসু, *বাবু* (১৮৯৪), মনোমোহন বসু, *নাগাশ্রমের অভিনয়* (১৮৭৫), ফকিরদাস বাবাজী, *অবতার* (১৮৮১), রাখালদাস ভট্টাচার্য, *সুরুচির ধ্বজা* (১৮৮৬), প্রভৃতি।

২০১। প্রকাশচন্দ্র রায়, *অঘোর প্রকাশ,* (কলকাতা, ১৩৬৪ বঃ), পৃ ৯৮-৯৯
২০২। ঐ, ১০১-১০৪
২০৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র* (প্রথম খণ্ড), (কলকাতা, ১৩৭২বঃ), পৃ ২৫-২৬
২০৪। ঐ, ২৮
২০৫। দীনবন্ধু মিত্রের *সধবার একাদশী*-তে (১৮৬৬) ধনী পরিবারের শিক্ষিত ছেলে অটল তার ব্যক্তিগত রক্ষিতা (কাঞ্চন) নকুলবাবুর বাগানে গিয়েছিল শুনে ক্ষুব্ধ হয়ে মন্তব্য করছে যে এর ফলে তার অপমানের চূড়ান্ত হয়েছে : 'ঘরের মাগ বেরয়ে গেলেও আমার মুখ হেঁট হয় না. . .' (দ্র. *দীনবন্ধু রচনাবলী*, পৃ ১৫৪)। এসব ক্ষেত্রে ঘরের স্ত্রীর মর্যাদা তথাকথিত শিক্ষিত পরিবারেও কেমন ছিল, তা সহজেই অনুমেয়।
২০৬। *চিঠিপত্র* (প্রথম খণ্ড), (পূর্বোক্ত), পৃ ৩৬-৩৮
২০৭। 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' (১৮৯৩), দ্র. বাণী রায় (সম্পা.), *কবিচতুষ্টয়ী*, (কলকাতা, ১৩৮৮ বঃ), পৃ ১১৫-১১৬
২০৮। 'দাম্পত্য-বিধি', *বামাবোধিনী পত্রিকা*, পৌষ, ১২৮৮ বঃ, পৃ ২৯২
২০৯। চিত্রা দেব, *অন্তঃপুরের আত্মকথা*, (পূর্বোক্ত), পৃ ৬৭
২১০। 'অনুযোগ', তিলোত্তমা দাসী, *আক্ষেপ*, (কলকাতা, ১৩২০ বঃ), পৃ ১৪৮
২১১। 'পতির উদ্দেশ্যে', ঐ, ৪৯
২১২। 'স্বামীর প্রতি', ঐ, ৩৬
২১৩। 'উচ্ছ্বাস', ঐ, ১৯
২১৪। *সাধারণী*, ২১শে পৌষ, ১২৮৬ বঃ, পৃ ১১৭
২১৫। প্রসন্নময়ী দেবী, *পূর্ব্ব কথা*, (কলকাতা, ১৯৮২), পৃ ১৮
২১৬। *পরিচারিকা*, মাঘ, ১২৯৪ বঃ, পৃ ২১৯-২২১,
২১৭। *আক্ষেপ*, (পূর্বোক্ত), পৃ ১৪৯
২১৮। হেমলতা ঠাকুর, *অকল্পিতা*, (কলকাতা, প্রকাশ সন নেই), পৃ ১৯-২০
২১৯। ঐ, ২০
২২০। ১৮৬১-৬২ খ্রিষ্টাব্দে কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা এই চিঠিটির জন্য দ্র. *মধুসূদন রচনাবলী*, (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮০), পৃ ৫৭১
২২১। ঐ, ১৩৫
২২২। ঐ, ৫৬৩
২২৩। শান্তা দেবী, *পূর্ব্ব স্মৃতি*, (কলকাতা, ১৯৮৩), পৃ ২৩
২২৪। 'অমিয়বালার ডায়েরি', *মানসী ও মর্ম্মবাণী*, ভাদ্র, ১৩২৭ বঃ, পৃ ৯৭-৯৮
২২৫। ঐ, ১০০
২২৬। ঐ, ১০১
২২৭। ঐ, আশ্বিন, ১৩২৭ বঃ, পৃ ১২৭
২২৮। *রবীন্দ্র রচনাবলী* (সপ্তম খণ্ড), (পূর্বোক্ত), পৃ ১৪৯-১৫০
২২৯। Juguth Chunder Gangooly, *Life and Religion of the Hindoos with a Sketch of my Life and Experience*, (London, 1860), pp. 41-42
২৩০। *রবীন্দ্ররচনাবলী* (সপ্তম খণ্ড), পূর্বোক্ত. পৃ ১৮৯
২৩১। *জন্মভূমি*, অগ্রহায়ণ, ১৩০৭ বঃ, পৃ ১৩৭-১৩৮
২৩২। ঐ, ১৪০-১৪১

৪
ঘর-গৃহস্থালি

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি ভদ্রমহিলাদের দিন কাটত অন্তঃপুরে। গত শতকের সূচনায় যে অবরোধ-প্রথা প্রচলিত ছিল, তা ধীরে ধীরে অনেকাংশে কমে গেলেও, মেয়েরা সাধারণতঃ ঘরের বাইরে বের হত না। বরং, ঘরের বাইরে মেয়েদের বের হওয়া বাঙালি-সমাজে যথেষ্ট নিন্দনীয় কাজ বলেই বিবেচিত হত। আমরা আলোচনা করেছি যে এই মানসিকতার জন্য তাদের শিক্ষাও গত শতকে যথেষ্ট ব্যহত হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে অন্তঃপুরই ছিল মেয়েদের বিচরণক্ষেত্রের সীমানা। এবং তাদের অস্তিত্বের প্রায় পুরোটাই জুড়ে ছিল ঘর-গৃহস্থালি। গত শতকের বাঙালি নারীর ইতিহাস ও ঘর-গৃহস্থালির ইতিবৃত্ত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

তবে, গত শতকের বাঙালি মেয়েদের ইতিহাস রচনার প্রধান অসুবিধাগুলি ঘর-গৃহস্থালি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। এ বিষয়ে খুব সচেতনভাবে কেউ উত্তরকালের জন্য ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে যাননি। তাই আমাদের একান্তভাবে নির্ভর করতে হয় সমসাময়িক নানা সাহিত্যকীর্তি বা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়ানো প্রক্ষিপ্ত রচনার ওপর। এ সব লেখাপত্র থেকে মেয়েদের গৃহস্থালি, স্বামীর সংসার বা একান্নবর্তী পরিবারের যুথবদ্ধ জীবনযাপনের রীতিনীতি বা তাদের দিন গুজরানের একটি ছবি মোটামুটি ফুটে ওঠে। বিভিন্ন ধরনের রচনার সমাবেশ থেকে ফুটে ওঠে গত শতাব্দীর বাঙালি সমাজের কয়েকটি টুকরো ছবি। টুকরোগুলিকে জোড়া দিলে সর্বদা নিখুঁত প্রতিমা হয় না। কিন্তু এ যুগের ঐতিহাসিকের কাছে এগুলিই একমাত্র উপাদান। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যাই হোক, গৃহস্থালির ইতিহাস রচনায় তো আর পুরাকীর্তি বা ফাইলবন্দী সরকারী কাগজ পাওয়া যায় না!

সামাজিক প্রচলন অনুসারে উনবিংশ শতাব্দীতে মেয়েদের এত অল্প বয়সে বিয়ে হত যে তাদের 'সংসার' বলতে বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়িকেই বোঝাত। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত বা তা সীমিত থাকত স্বামীর ঘরে, কোন ক্ষেত্রে যৌথ পরিবারে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই তা মেয়েদের উত্তর-বৈবাহিক জীবনের পর্ব। বিবাহের আগে মেয়েরা যা শিক্ষা পেত, তার একটা প্রধান অঙ্গ ছিল শ্বশুরবাড়িতে তাদের আচরণীয় ব্যবহার সম্পর্কিত। সে অর্থে, মেয়েদের পিতৃগৃহবাসকে তাদের 'প্রকৃত' জীবনের প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সরোজিনী দেবী লিখেছিলেন : 'যে মাতা কন্যাকে সদ্বিদ্যার সহিত গৃহকর্ম্ম, শিল্পকর্ম্ম, রন্ধন, সন্তানপালন, রোগীর সুশ্রুষা, পরোপকার, মিতব্যয়, ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়া, সৌজন্য ও সর্বোপরি ধর্ম্মশিক্ষার দ্বারা তাহাদিগের সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিয়া তাহাদের ভবিষ্যতের সুমাতা ও সুগৃহিণীর পথ সুগম করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ আদর্শ জননী।'[১] সে যুগের বহু রচনাতে পাওয়া যায় যে

শ্বশুরবাড়িতেই মেয়েদের 'আসল' জীবন কাটত।

ইন্দিরা উপন্যাসে ইন্দিরা তার বোন কামিনীকে শ্বশুরবাড়ির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিল: 'সে নন্দনবন, সেখানে রতিপতি পারিজাত ফুলের বাণ মারিয়া লোকের জন্ম সার্থক করে। সেখানে পা দিলেই স্ত্রীজাতি অপ্সরা হয়, পুরুষ ভেড়া হয়। সেখানে নিত্য কোকিল ডাকে, শীতকালে দক্ষিণে বাতাস বয়, অমাবস্যাতেও পূর্ণ চন্দ্র উঠে।'[২] এই বর্ণনার অত্যুক্তি বাদ দিলেও পাঠকের চোখের সামনে ফুটে ওঠে ভারি সুখের একটি ভরভরন্ত ছবি। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, সত্যিই কি উনিশ শতকের বঙ্গদেশে শ্বশুরঘর বলতে সাধারণভাবে ঐ মনোরম চিত্রটিই সকলের মনে জাগত ? নাকি, অত্যুক্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল কোন সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ ? নইলে এত লোভনীয় বর্ণনার পরও কামিনী তার দিদির গাল টিপে বলেছিল কেন 'মরণ আর কি ?' তবে কি এই বর্ণনাটি আলঙ্কারিকের বিচারে নিছকই ব্যজস্তুতি ?

॥ এক ॥

মেয়েদের জীবনকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হত : কন্যা, জায়া, জননী। এর মধ্যে কন্যা পর্ব অতিবাহিত করেই তারা সংসারে প্রবেশ করত। সেখানে তাদের বাকি থাকত জায়া ও জননীর জীবন। বৃহত্তর এই দুই অভিধার মধ্যে থাকত আরও বহু সম্পর্কের আবেষ্টনী, যা শুধুমাত্র মানুষের সমাজবদ্ধতার কারণেই নয়, গত শতকের বাংলার পারিবারিক গঠন বৈশিষ্ট্যের জন্যেও মেয়েদের সারা জীবন মান্য করতে হত। একান্নভুক্ত যৌথ পরিবারে সদ্যপ্রবিষ্ট বালিকাবধূ উদ্বাহ সম্পর্কের দ্বারা কেবল মাত্র একজন ব্যক্তিবিশেষের জায়াই হত না। সে শ্বশুর-শাশুড়ীর পুত্রবধূ, ননদ-দেবরের ভ্রাতৃবধূ ও শ্বশুর-শাশুড়ী স্থানীয়-স্থানীয়াদের কাছে পুত্রবধূতুল্য। পরবর্তী জীবনে, জননীর সূত্র ধরে সে হত শাশুড়ী, বৈবাহিকী প্রভৃতি। এই প্রতিটি সম্পর্কের কাছেই সে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দায়বদ্ধ। এগুলি স্থান-কাল-পাত্র নিরপেক্ষভাবে প্রতিটি সমাজ সম্পর্কেই প্রযোজ্য। তবে, উনিশ শতকের বাঙালি সমাজে এই সম্পর্কের বাঁধন ছিল আজকের সামাজিক সম্পর্কের চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ়। তাই, গত শতকের পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীর ঘর বলতে বোঝাত বহু সম্পর্কের একটি সূক্ষ্ম জালিকা। দশ-বারো বছর বয়সে[৩] বিয়ের পর মেয়েদের বাকি জীবন আবর্তিত হত এই সম্পর্কগুলির বৃত্তের মধ্যে। বস্তুতপক্ষে, বিয়ের সময়ে (বা, পরবর্তী কালেও অনেক ক্ষেত্রে) স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কটা প্রায়শই খুব গৌণ হত। শ্বশুরবাড়ির অন্যান্য আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্কই মুখ্য হয়ে উঠত।

মাতৃক্রোড় থেকে সদ্যোৎপাটিত হয়ে বালিকার বধূ অবস্থায় প্রথম সম্পর্ক স্থাপিত হত শাশুড়ীর সঙ্গে। সমসাময়িক রচনা পাঠ করলে মনে হয় যে শাশুড়ী-পুত্রবধূর সম্পর্ক আর যাই হোক মাতা-কন্যার সম্পর্কের মত ছিল না। 'বস্তুতঃ অনেক গৃহিণী বধূদিগকে দাসী ভিন্ন আর কিছুই মনে করেন না। বিবাহিত পুরুষমাত্রই অবগত আছেন, যে বিবাহ যাত্রার সময়, "কি আনিতে যাইতেছ," মাতার এই প্রশ্নে বর কি উত্তর দান করেন।'[৪]

শুধু যে কেবল প্রথানুসারে নিয়ম রক্ষার জন্য করা হত বলে এই প্রশ্নের গুরুত্ব, তা নয়। সে যুগের মেয়েদের শাশুড়ীর এমন এক সর্বময় কর্তৃত্বের মধ্যে থাকতে হত যে

উদ্ধৃত অংশের প্রবন্ধের লেখকের মনে ছেলেদের বিয়ের আগে এই শপথটির কথা অনিবার্যভাবে এসে পড়েছিল। সামগ্রিকভাবে সমাজে পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের স্থান যাই হোক না কেন, অন্তঃপুরের মধ্যে ছিল তাদের দোর্দণ্ড প্রতাপ। পরিবারের যিনি কর্ত্রী, তিনি তার সীমিত পরিধির মধ্যে ছিলেন সর্ব ক্ষমতার অধিকারিণী: 'যেরূপ দেশ মধ্যে রাজা ও গ্রামের মধ্যে জমীদার, সেইরূপ বঙ্গদেশে গৃহস্থ মধ্যে গৃহিণী; রাজার ও জমিদারের ক্ষমতার সীমা আছে, কেন না তাহাকে সময়ে সময়ে কর্ত্রীকে ভয় করিয়া চলিতে হয়। কিন্তু গৃহিণী বা গিন্নীর ক্ষমতার সীমা নাই। তাহার অত্যন্ত প্রতাপ।'[৫] একটি নয়, বিভিন্ন লেখায় এভাবে গৃহিণীকে জমিদার বা রাজার সঙ্গে তুলনা করে পরিবারের মধ্যে তার ক্ষমতার বিস্তার বোঝানো হত।[৬]

গৃহিণী পরিবারের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারিণী, শুধু এটুকু বললেই সমস্ত ছবিটা পবিষ্কার হয না। বাংলাদেশের যৌথ পরিবারের কাঠামোর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে সেখানে কর্তা হত একজন, কিন্তু গৃহিণীর সে রকম কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না। কর্তার স্ত্রী ছাড়াও, বাংলাদেশের যৌথ পরিবারে প্রাযই একাধিক বয়স্কা রমণী আর্থিক বা অন্য কোন কারণে একই পরিবারেব মধ্যে বাস করতেন। অন্তঃপুরে এদের কর্তৃত্বও অস্বীকার কবা যায না : 'এই কর্ত্রী বা গৃহিণীরা পিসী, মাসী, ঠাকুরমাতা ও বিধবা দিদিরূপে বঙ্গদেশে বিরাজ করিতেছেন।'[৭] এবং শ্বশুরবাড়িতে নববধূর সুখাসুখ, ভাগ্য—সব কিছুই নির্ভর করত এই কর্ত্রীপদবাচ্যা রমণীদের ওপর। তিনি যদি ছেলের মা স্বয়ং নাও হন, আমরা আলোচনাব সুবিধার জন্য একই পরিবারস্থ শাশুড়ী-স্থানীয়া সব মহিলাকেই শাশুড়ী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

অন্তঃপুর মাসিক পত্রিকায় হিরণ্ময়ী সেনগুপ্তা 'নববধূ' প্রবন্ধের এক জায়গায নববধূর অবস্থা বর্ণনা করতে গিযে বলেছিলেন : 'আমাদের হিন্দু পরিবারে বাল্য বিবাহ প্রচলিত সুতরাং নববধূ অল্পবয়স্কা হইয়া থাকে। প্রথমাবধি তাহাকে সদ্ব্যবহারের দ্বারা সন্তানতুল্য পালন করিলে, বধূ ঠিক তদনুযায়ী কন্যাতুল্য হইয়া উঠে, কিন্তু অতিশয় দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, অধিকাংশ ঘরে বধূকে নিদারুণ যাতনা দেওয়া হয়।'[৮] *বঙ্গমহিলা* পত্রিকায় এক অজ্ঞাতনামা প্রবন্ধকার লিখেছিলেন যে বধূদের প্রতি কেবলমাত্র দাসীদের মত ব্যবহারই করা হত না, 'গৃহিণীরা নিয়ম করিলেন যে বধূদিগের কথা কহা ও অবগুণ্ঠন মোচন নিতান্ত গর্হিত কর্ম।'[৯] দাসীদের মুখ অবগুণ্ঠনে ঢেকে রাখতে হত না। বধূদের শাশুড়ীর মনোরঞ্জনের একমাত্র উপায় ছিল তার 'বৈধ বা অবৈধ আজ্ঞা সকল' মুখ বুজে পালন করা ও দাসীর মতো পরিশ্রম। তবেই সে হত পরিবারের কর্ত্রীর চোখে লক্ষ্মী বউ,[১০] অন্যথায় নববধূ হত কর্ত্রীর বিরাগভাজন। আর শাশুড়ীর বিরাগভাজন হওয়া বাঙালি পরিবারের বধূর পক্ষে খুব সুখকর অভিজ্ঞতা ছিল না, বিশেষতঃ যখন তার স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক খুব নিকট ছিল না।[১১] শাশুড়ীর সঙ্গে পুত্রবধূর এই ধরনের সম্পর্ক কেবল একটি বা দুটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না : 'সামান্য সাংসারিক ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া বধূকে যাতনা দেওয়া যেন তাঁহাদের [শাশুড়ীদের] প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।'[১২] এবং দীর্ঘদিন ধরে এই অবস্থা অপরিবর্তিত রয়ে গিয়েছিল। *পরিচারিকা* পত্রিকায় শাশুড়ীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছিল, 'যিনি জননী হইবেন, জননীর অভাব পূর্ণ করিবেন, তিনি যেন ব্যাঘ্রী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। ননদিনীরা পিশাচিনী সাজিয়া—সে গৃহ, সে সম্পর্ক, সে হৃদয়শ্রী সমুদয়

নষ্ট কবিয়া ফেলেন।'[১৩] নতুন জায়গায়, নতুন পরিবেশে অপরিচিতা নতুন বউ চারপাশের লোকেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার সঙ্গে আদৌ সুপরিচিত থাকত না। বালিকাবয়স ও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে অপরিচয়ের জন্য তার কাজকর্মে ভ্রান্তি ঘটত। কিন্তু ভাগ্যে জুটত সংশোধনের পরিবর্তে কটু সমালোচনা।[১৪] বহুক্ষেত্রেই বধূর এই 'যাতনার' স্মৃতি তার পরবর্তী জীবনেও রয়ে যেত। ইন্দিরা দেবীকে তার মা বিয়ের অব্যবহিত পরে শ্বশুরবাড়িতে তার অভিজ্ঞতার যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, তা তাঁর মেয়ের আত্মজীবনীতেও এসে গিয়েছিল। ইন্দিরা দেবী আত্মজীবনী লিখত বসে তাঁর মায়ের শ্বশুরবাড়িতে 'লাঞ্ছনা ও কষ্টের' উল্লেখ করেছিলেন।[১৫]

এই সম্পর্কটা একদিনে সৃষ্টি হয়নি। চিরাচরিত বাঙালি সমাজেই বোধহয় শাশুড়ী বউ-এর সম্পর্কের মধ্যে এক ধরনের উত্তেজনা ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত ভারতচন্দ্রের বহুশ্রুত প্রায় প্রবাদোপম একটি পংক্তি থেকেও এটি বোঝা যায়। শ্বশুর বাড়িতে নতুন বউ-এর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ভারতচন্দ্র লিখেছিলেন : 'শাশুড়ী সাপিনী, ননদী বাঘিনী, সতিনী বিষের ভরা।' চিরাচরিত বাঙালি পরিবারের এ এক জীবন্ত বর্ণনা। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাতেও আমরা শাশুড়ী-পুত্রবধূর সম্পর্কের মধ্যে উত্তেজনার আভাস পাই কেরীর রচনাতে। ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত *কথোপকথন* গ্রন্থের 'স্ত্রীলোকের কথোপকথন' অংশে ননদ-ভ্রাতৃবধূর কথোপকথনের একটি টুকরো এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। ননদ ভ্রাতৃবধূকে 'তোদের বৌ কেমন' প্রশ্ন করায় ভ্রাতৃবধূ বলছে, 'ছোট বৌটা বড় হিজল দাগুড়া অঙ্গ লাড়ে না আর সদায় তার ঝগড়া কি করিব বুন সহিতে হয় যদি কিছু বলি তবে বলিবে দেখ এ মাগী বৌদের দেখিতে পারে না।'[১৬]

গত শতাব্দীতে সমাজ-সংস্কারকদের আলোচনার অন্যতম প্রধান উপজীব্য বিষয় ছিল সমাজে মেয়েদের অবহেলিত মর্যাদা। সেখানে নারীকে পুরুষের বিপরীতে রেখে আলোচনা করা হত। কিন্তু সে আলোচনায় পারিবারিক ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে রমণীদের মধ্যে স্তরবিন্যাস তত গুরুত্ব পায়নি। সমাজে পুরুষদের যে সর্বময় কর্তৃত্বের অধীনে মেয়েদের থাকতে হত, মেয়েরা নিজেরা তাদের মর্যাদা অনুযায়ী সেই অবদমিত অহংকে অন্তঃপুরের মধ্যে যতটা সম্ভব পূরণ করে নেওয়ার চেষ্টা করত। এর সহজতম লক্ষ্য ছিল পুত্রবধূ। তার চাল-চলন, কথাবার্তা, কাজকর্ম—সবই ছিল বাড়ির কর্ত্রীদের আলোচনার বিষয়। ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে সতীপ্রকাশ সেন নতুন বউ-এর অবস্থার এক অসাধারণ বর্ণনা দিয়েছিলেন : 'কোনের বউ প্রতি পদেই অপরাধী, প্রতি কার্যেই দোষী। গমনে, ভোজনে, রন্ধনে, বাক্য কথনে, অঙ্গ চালনে সকলেতেই কোনের বউ দোষী। কোনের বউ ক্ষুধা হইলে বলিতে পাইবে না, খাইতে পাইবে না—উদর পুরিয়া খাইতে পাইবে না, কোন ইচ্ছা হইলে প্রকাশ করিতে পাইবে না—তিরস্কার হইলে কাঁদিতে পাইবে না—পীড়া হইলে বলিতে পাইবে না—হাসিয়া কথাটি কহিতে পাইবে না—যাতনা হইলে প্রকাশ করিতে পাইবে না।'[১৭]

প্রতিটি পরিবার সম্পর্কে এই সত্য প্রযোজ্য না হলেও এক বিশাল সংখ্যক পরিবারের বধূদের ক্ষেত্রে এটাই ছিল নিয়ম : 'ইহাই বঙ্গসমাজের নিয়ম—ইহাই বঙ্গসমাজে চিরপ্রচলিত, ইহাই বঙ্গসমাজে আদরের ধন। . . . কোনের বউ সকল দিকেই অপরাধী, দ্রুত চলিতে ফড়কা, মন্থরে কুঁড়ে, হাসিলে লজ্জাহীনা, না হাসিলে অহঙ্কারী, কথা কহিলে বাচাল,

না কহিলে গর্বিতা, ক্ষুধায় খাইলে রাক্ষসী, না খাইলে তাচ্ছিল্যকারিণী ইত্যাদি বিশেষণ দেওয়া হয়। কোনের বউ পৃথিবীর সকল সুখে বঞ্চিত।'[১৮] শুধু এই সাধারণ মন্তব্য,ই নয়, দু-একটি সত্যিকারের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় গত শতকের বাঙালি পরিবারের ইতিহাসের পাতা থেকে। *পরিচারিকা* পত্রিকায় শোভাবাজার রাজবাড়ির এক পুত্রবধূর ওপর শাশুড়ীর অত্যাচার বর্ণনা করা হয়েছিল। শাশুড়ী সেই পুত্রবধূকে খেতে দিত না, পছন্দ মত জামা কাপড় পরতে দিত না, এবং এই বধূটির স্বামীও তার মায়ের এই ধরনের কাজের কোন প্রতিবাদ করত না। প্রকৃতপক্ষে, স্বামীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অভাবের সুযোগ নিয়েই অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাশুড়ীরা পুত্রবধূদের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করত। *পরিচারিকার* প্রবন্ধকার মন্তব্য করেছিলেন : 'সম্রান্ত ভদ্রলোকের গৃহে এমন দুর্ঘটনা হইল, ইহা আমাদের জাতীয় অপমান ও লজ্জার বিষয়।'[১৯]

পরিচারিকা বিস্ময় প্রকাশ করলেও, এ বিষয়ে অত্যন্ত 'প্রগতিশীল' পরিবারও সর্বদা ব্যতিক্রম ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সঙ্গে তার শাশুড়ীর বোধহয় সুসম্পর্ক ছিল না। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় যে বাড়ির দাসীদের কাছ থেকে শোনা কথার ওপর ভিত্তি করেও শাশুড়ী জ্ঞানদানন্দিনীকে বকতেন।[২০] এ বিষয়টি নিয়ে বোধহয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও চিন্তিত ছিলেন। ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারি লণ্ডন থেকে লেখা এক চিঠিতে তিনি স্ত্রীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন : 'মা কি এখন তোমার সঙ্গে এক এক সময় কথা টথা কন—না আগেকার মত পৃথকই থাকেন ?'[২১]

পুত্রবধূর সঙ্গে অনেক শাশুড়ীই কথা বলতেন না। এটাও বোধহয় গত শতকের অন্দরমহলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল : 'নববধূ শাশুড়ীর সহিত কথা বলিবে না—এই নিয়মটী দুর্বোধ্য বই কি।' কিন্তু উলটোটাই তো হবার কথা ছিল। 'কোমল স্নেহপ্রবণ ব্যবহার জনিত সুশিক্ষা দ্বারা তাহাকে গড়িয়া তুলিবেন, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম বলিয়া বোধ হয়।'[২২] অথচ বাস্তবে শাশুড়ী আশা করে থাকেন 'বধূ গৃহে আসিলেই তিনি সংসারের কার্যভার হইতে অবসৃত হইবেন। . . . যে বয়সে নববধূ সংসার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, সে বয়সে পুত্র সন্তানগণ ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়। শ্বশ্রূগণ সেই বয়সের বালিকাকে সর্বগুণান্বিতা দাসীরূপে দেখিতে চাহেন।'[২৩]

উনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন লেখা পড়লে মনে হয়, বয়স্কা রমণীরা পুরুষ সমাজের কর্তৃত্বের আবেষ্টনীর মধ্যে অতিবাহিত জীবনের পরাজিত অহংপূরণ করতেন অল্পবয়স্ক বধূদের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনের মাধ্যমে। কিন্তু সেই বধূদের পক্ষে তা পূরণ করার কোন উপায় থাকত না। এই পরিস্থিতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল বধূর সারাদিন মুখ বুজে ঘরের কাজ করা। হরিহর শেঠ বালিকাবধূর সাংসারিক কাজের বর্ণনা দিয়েছিলেন : 'সংসারের দশজন পরিজন, কিন্তু একটি বালিকা বা কিশোরী বধূ নিদাঘের দুরন্ত গরমে, রুগ্ন দেহে একাকী তাহাদের আহারের জন্য পাকশালায় দুইবেলা হাড়ি ঠেলিতেছে। কাহারও স্কুল, কাহারও আফিস, কেহ বা দুইটার পূর্ব্বে আহার করিতে পারেন না,— তাহাদের সকলের সুবিধামত ব্যবস্থা করিতে করিতে অবস্থাভেদে হয়ত নিজের কোলের ছেলে মেয়েকেও দেখিতে হইতেছে বা স্বামীর ফরমাইস বা অপর গৃহকর্ম্মেও মনোনিবেশ করিতে হইতেছে, তথাপি সহানুভূতি বাক্যে একটু তুষ্ট করা দূরে থাকুক মাতৃস্থানীয়া

শ্বশ্রূঠাকুরাণী দিনরাত্রি মুখভার করিয়া আছেন, সময় সময় বাক্য যন্ত্রণা দিতেছেন। . . . আজকাল এমন অনেক ধনী গৃহস্থ দেখা যায় যেখানে অর্থের অসচ্ছলতা নাই, বাহিরে ল্যাণ্ডো মোটর মোসাহেবের ছড়াছড়ি, পূজা, বিবাহ, পার্টি ইত্যাদির ব্যয় প্রচুর হইতেছে। কিন্তু বালিকা বধূর রোগক্লিষ্ট দেহের উপযোগী শীতের সময় ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট গরম জামা নাই, পীড়ার উপযুক্ত চিকিৎসা নাই, গৃহকর্ম্মের জন্য যথেষ্ট দাসী নাই, আবশ্যক পরিমিত দুধটুকু পাইবার ব্যবস্থা নাই।'[২৪]

বামাবোধিনী পত্রিকা পুত্রবধূর প্রতি এই ধরনের ব্যবহারের নাম দিয়েছিল 'বধূশাসন'।[২৫] কেশব সেনের মা সারদাসুন্দরী দেবীর (১৮১৯—১৯০৭) বিয়ে হয়েছিল মাত্র ন বছর বয়সে। দশ বছর বয়সে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে দেখলেন, শ্বশুরবাড়ি সংক্রান্ত ভয় অমূলক নয়। 'প্রথম শ্বশুরবাড়ি আসিয়া যখন এক একজনের মুখ পানে চাইতাম, আমার এক এক পোয়া করিয়া রক্ত শুকাইয়া যাইত। ভয় হইত, কে কি বলিবেন। আমি তিন সন্তানের মা হইলাম, তখন পর্যন্ত আমার ভয় ছিল। শাশুড়ীর মুখপানে তাকাইতে ভয় হইত। . . .আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি প্রথমে আমায় ভাল চোখে দেখেন নাই, বোধহয় সে আমার দোষ। তাঁর এক প্রকার বিশ্বাস ছিল, তখন আমার দশ বৎসর হইতে অনেক বেশী বয়স। আমার একটু দোষ দেখিলেই তিনি আমার শ্বশুরকে বলিয়া দিতেন, এবং আমায় বকুনি খাওয়াইতেন। যদি আমার দু চারজন সমবয়সী একত্র বসিয়া খেলা করিতেছি দেখিতেন, তাঁহার রাগ হইত। আমরা একটু এ ঘর ও ঘর করিলে তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। আমরা ভয়ে কাঁপিতাম।'[২৬]

পুরো বর্ণনাটা পড়লেই বোঝা যায় যে শাশুড়ীর রাগের কোন প্রকৃত কারণ ছিল না, কেবলমাত্র কর্তৃত্ব জাহির করা ছাড়া। যেখানে মনে হত যে তার শাসনও যথেষ্ট নয়। সেখানে তিনি শ্বশুরকে দিয়ে বকুনি খাওয়াতেন। নীরদচন্দ্র চৌধুরী শাশুড়ী-পুত্রবধূর এই সম্পর্ককে ভারতীয় সমাজের এক প্রধান বিচ্যুতি (one of the fundamental aberrations of Indian life) বলে বর্ণনা করেছেন। শ্রী চৌধুরীর মতে, এই দ্বন্দ্বের প্রধান উৎস হল বধূর স্বামী ও শাশুড়ীর পুত্রের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য পারস্পরিক প্রতিযোগিতা।[২৭] নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মায়ের সঙ্গেও তাঁর শাশুড়ীর সম্পর্ক খুব সহজ ছিল না। ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে নীরদ চৌধুরীর মায়ের বিয়ে হয়েছিল, তাঁর শাশুড়ী তারপর আরও সাড়ে ছ বছর জীবিত ছিলেন এবং শাশুড়ী-পুত্রবধূর সম্পর্কের মধ্যে পারস্পরিক সন্দিগ্ধতা নিদারুণভাবে সক্রিয় ছিল।[২৮] আরও একটা ভয়ও শাশুড়ীদের মনে কাজ করত যে ছেলের বউ যদি ছেলেকে করতলগত করতে পারে, তাহলে পারিবারিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের প্রতিযোগিতায় পাল্লা পুত্রবধূর দিকেই ঝুঁকে পড়বে। তাই পুত্রের সঙ্গে পুত্রবধূর সুসম্পর্কও অনেক শাশুড়ী সুনজরে দেখত না এবং অনেক সময়ে ছেলে যাতে তার বউ-এর ওপর বিরক্ত হয়, ছেলের মা সে চেষ্টাও করত।[২৯]

শুধুমাত্র কটুবাক্য প্রয়োগ বা পরিশ্রম করানোই নয়, শাশুড়ীদের কর্তৃত্ব স্থাপনের আরও একটি সহজ উপায় ছিল বউকে বাপের বাড়ি যেতে না দেওয়া। গত শতকের বাঙালি সমাজে এটাও ছেলের বউ-এর প্রতি বিরূপ শাশুড়ীর 'শাস্তি'র অন্যতম অঙ্গ বলে বিবেচিত হত। বিয়ের দান-সামগ্রী বা যৌতুক যদি শ্বশুরবাড়ির মনোমত না হত, তবে নবোঢ়ার বাবা-মায়ের সে অপরাধের মূল্য প্রায়ই দিতে হত বালিকা-বধূকে—ব্যবস্থা হত

বউকে আর বাপের বাড়ি যেতে দেওয়া হবে না।[৩০] বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ির আদেশে বাপের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কহীন বধূর সংখ্যা ঊনবিংশ শতাব্দীতে খুব কম ছিল না। *যুগান্তর* (প্রথম প্রকাশ, ১৮৯৪) উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বিশ্বনাথ তর্কভূষণের কন্যা ভুবনেশ্বরীকে তার শাশুড়ী বৈবাহিক পরিবারের ওপর রাগ করে বলেছিলেন : 'এস বাছা, ঘরে ঢোক, আর বাপের বাড়ী যাবার নামটি করতে পারবে না।'[৩১] এবং বাস্তবেও তিন বছর তিনি ভুবনেশ্বরীকে পিত্রালয়ে যেতে দেননি।[৩২] রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা'[৩৩] গল্পের নিরুপমাকে তার শ্বশুর-শাশুড়ীর লাঞ্ছনার প্রধান কারণ ছিল নিরুপমার বাবার প্রতিশ্রুত অর্থ দিতে পারার অক্ষমতা। আরও পরবর্তী কালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'হৈমন্তী' গল্পে (১৯১৪) হৈমন্তীর শ্বশুর-শাশুড়ী পুত্রবধূকে শাস্তির অঙ্গ-স্বরূপ বাপের বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দেননি।

ছেলের সঙ্গে তার বউ-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অভাবে পুত্রবধূ যেমন অসহায় বোধ করত (এবং যাতে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না জন্মায় সে চেষ্টাও যেমন শাশুড়ীরা মাঝে মাঝে করত), সে রকম, ছেলের সঙ্গে তার বউ-এর সুসম্পর্ক থাকলে কিন্তু শাশুডীর ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই ভিন্ন হত। পূর্বোল্লিখিত *যুগান্তর* উপন্যাসে ভুবনেশ্বরীর শাশুড়ী বড় ও মেজ বউ-এর ওপরও প্রীত ছিলেন না, কিন্তু তাদের কিছু বলতে তিনি সাহস পেতেন না, 'কারণ তাহারা উভয়েই উপার্জক পুত্রের পত্নী, তাহাদের পতিগণ তাহাদিগকে ভালবাসে, শ্বশুর তাহা জানেন, তাহারাও জানে, যে তাহারা উপার্জক পুত্রের স্ত্রী, সুতরাং শ্বশ্রূর একগুণ বলিলে দশগুণ শুনাইয়া দেয়।'[৩৪] যেখানে পুত্রের সঙ্গে তার স্ত্রীর সদ্ভাব থাকত, সেখানে পুত্রবধূর ওপর শাশুড়ীর কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রয়াস ছিল কম। এমনকি অনেক সময়ে পুত্রের সমর্থনের সুবাদে পুত্রবধূ তার ইচ্ছাকেও কাজে পরিণত করতে সমর্থ হত। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ বঙ্কিমচন্দ্রের *ইন্দিরা* (১৮৭২) উপন্যাস। এই উপন্যাসের প্রথম অংশটি পাঠ করলে বোঝা যায় যে অন্দরমহলের কর্ত্রী ছিলেন সুভাষিণীর শাশুড়ী। কিন্তু শাশুড়ীর আপত্তি সত্ত্বেও সুভাষিণী যেভাবে কুমুদিনীকে পাচিকা হিসাবে নিয়োগ করেছিল, তা লক্ষণীয়। সুভাষিণীব প্রধান সহায় ছিল তার স্বামী। সুভাষিণী তার স্বামীকে আদেশ করেছিল কুমুদিনীকে পাচিকা হিসাবে নিয়োগের জন্য। স্বামী খেতে বসে তার মাকে বলে যে সে পুরনো পাচিকার রান্না মুখে তুলতে পারছে না। অতএব, নতুন পাচিকার প্রয়োজন। পারিবারিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে দ্বিতীয় প্রজন্মের গৃহিণী হিসাবে সুভাষিণী যেভাবে কর্ত্রীর প্রকাশ্য বিরোধিতা না করে নিজের কার্যসিদ্ধি করেছিল, তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন যে কর্ত্রী সুভাষিণীর হাতে কলের পুতুল, কারণ রমণের স্ত্রী এবং 'রমণের বৌর কথা *ঠেলে* কার সাধ্য ?'[৩৫]

সুভাষিণীর আরও একটা সুবিধা ছিল—সে তখন দুই সন্তানের জননী। সন্তানের জননী হওয়া পারিবারিক ক্ষেত্রে বধূর পক্ষে মর্যাদার সূচক ছিল। এই মনোভাবটি কেবল সাধারণ বাঙালি পরিবারেই দেখা যেত না—অত্যন্ত প্রাগ্রসর পরিবারও এই মনোভাব থেকে মুক্ত ছিল না। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন : 'আমি যখন দুই ছেলে নিয়ে প্রথম বাড়ী এলুম তখন আমার খুব আদর হল। বৌ-এর ছেলে না হলে আর আদর হত না। বাঁজা বউয়ের আদর নেই।'[৩৬] সন্তানের জননী হলে বধূর হাতে অধিকতর কর্তৃত্ব আসত। তখন সে আর সব সময়ে শাশুড়ীর কথা বিনা প্রতিবাদে সহ্য করত না।[৩৭]

বহুদিনের অবদমিত ক্রোধ তখন আত্মপ্রকাশ করত। শুধু যে পুত্রবধূ কটু বাক্যের প্রত্যুত্তরই দিত সব সময়ে, তা নয়। রজনীকান্ত গুপ্ত লিখেছিলেন, 'অনেক সময়ে বধূ-শাশুড়ীতে যে বাক্যুদ্ধ আরম্ভ হয়, বাহুযুদ্ধে তার পরিণতি ঘটে।'[৩৮] আর, প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই অল্প বয়সে শাশুড়ীর কাছে যে ব্যবহার তারা পেত, তা পূরণ করে নিত ভবিষ্যত জীবনে যখন তারা সংসারের কর্ত্রী হত। এইভাবে বাঙালি সমাজে প্রতিটি প্রজন্মেই মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতে কর্তৃত্ব স্বীকার ও কর্তৃত্ব স্থাপনের পালা চক্রাকারে আবর্তিত হত। 'এইরূপে গৃহিণীত্ব পুরুষানুক্রমে বঙ্গে চলিয়া আসিতেছে।'[৩৯]

কর্তৃত্ব স্বীকার অল্প বয়সে প্রায় সব বধূকে করতে হলেও, সবাই যে শাশুড়ীর কাছ থেকে খারাপ ব্যবহার পেত, তা নয়। রাসসুন্দরী দেবী তাঁর আত্মকথায় কৃতজ্ঞচিত্তে শাশুড়ীর দয়ার্দ্র ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন : 'পিত্রালয়ে আমার অতিশয় সোহাগ ছিল।...পরে নূতন জায়গায় গিয়া নূতন বৌ হইলাম, এখানেও আমার আদরের ত্রুটি হয় নাই, বৌ হইয়া আমার সোহাগের কিছু মাত্র হ্রাস হয় নাই, বরং ক্রমেই আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী আমার খেলার জন্য কত প্রকার জিনিস আনিয়া দিতেন। আর ঐ গ্রামের সকল বালিকাদিগকে ডাকিয়া আমার নিকট আনিয়া দিতেন।'[৪০] শাশুড়ীর সঙ্গে অসদ্ভাবের কথা কৈলাসবাসিনী দেবীও (১৮২৮—১৮৯৫) লেখেননি। রাত্রে শাশুড়ীর সঙ্গে শয়ন[৪১] প্রভৃতি ঘটনার উল্লেখ থেকে স্বভাবতই মনে হয় যে কৈলাসবাসিনী দেবীর সঙ্গে তাঁর শাশুড়ীর সুসম্পর্কই ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথের স্ত্রী প্রফুল্লময়ীকে (১৮৫২—১৯৪০) তাঁর শাশুড়ী যেমন স্নেহ করতেন, পুত্রবধূ হিসেবে প্রফুল্লময়ীও তাঁকে সে রকম শ্রদ্ধা করতেন। শাশুড়ীর মৃত্যুর পর প্রফুল্লময়ী দেবী লিখেছিলেন : 'তিনি প্রত্যেককে সমান ভাবে আদরযত্নে অতি নিপুণভাবে সকলের অভাব দুঃখ দূর করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কাহাকেও কোন বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া মনে ব্যথা দিবার কখনও চেষ্টা করিতেন না।'[৪২] এ মন্তব্যকে কিছুটা সীমিত অর্থে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, আমরা জানি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী সারদা দেবীর সঙ্গে তার অন্যতম পুত্রবধূ জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পর্কের মধ্যে এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ছিল। অন্যদিকে, সারা জীবনে শ্বশুরবাড়িতে মাত্র তিনবার গিয়েছিলেন প্রসন্নময়ী দেবী (১৮৫৭—১৯৩৯), কিন্তু শাশুড়ীর কাছ থেকে যথেষ্ট স্নেহ ও ভালবাসা পেয়েছিলেন। এমনকি সেমিজ, জ্যাকেট পরা ও লেখাপড়া জানা নববধূকে দেখতে যখন শ্বশুরবাড়ির গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা ভিড় করে আসত ও নানা রকম বিরূপ সমালোচনা করত, প্রসন্নময়ী দেবীর শাশুড়ী তাদের কথার 'তীব্র প্রতিবাদ' করে সমালোচকদের নিরস্ত করতেন এবং পুত্রবধূকে গোপনে সংশোধন করতেন।[৪৩] সমালোচকদের হাত থেকে শাশুড়ীর নববধূকে রক্ষা করার দৃষ্টান্ত উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজে বিরল। বরং যে চিত্রটা পাওয়া যায়, তা সম্পূর্ণ এর বিপরীত। সাধারণত পাওয়া যায় যে পুত্রবধূর সমালোচনায় শাশুড়ী নিজেই মুখর হয়ে পাড়ায় পাড়ায় তা প্রচার করে বেড়াত।[৪৪] শাশুড়ী-পুত্রবধূর সুসম্পর্কের প্রমাণস্বরূপ যে কটি রচনার উল্লেখ পাওয়া যায়, সেগুলি সবই ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ। অপরদিকে, শাশুড়ীর হাতে পুত্রবধূর লাঞ্ছনাকে উপজীব্য করে বহু প্রবন্ধ রচিত হয়েছিল এবং সেই প্রবন্ধগুলিতে এ বিষয়টি বাংলার পারিবারিক রীতি হিসেবে বর্ণিত হত।

শাশুড়ীদের হাতে লাঞ্ছনা ও কষ্টই কিন্তু মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতে অবস্থানের শেষ কথা ছিল না। শ্বশুরবাড়িতে মেয়েদের ওপর অর্পণ করা হত অসীম দায়িত্ব : 'বলিতে গেলে পরিবারিক সুখ স্ত্রীজাতির উপর অধিক নির্ভর করে। রমণী গৃহকে শোভা ও সৌন্দর্য্যে ভূষিত এবং সুশোভিত করিবেন, এ কর্ত্তব্য তাহার।'[৪৫] ঘরে-বাইরে নারী ও পুরুষের কার্যক্ষেত্রের বিভাজনের সূত্র ধরেও মেয়েদের ওপর অর্পিত হত বহু কর্তব্য : 'রাজার যেরূপ রাজ্য, রমণীর সেইরূপ পরিবার। পরিবারে রমণীর একাধিপত্য। সেখানে রমণীর উপরে সকলের সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধানের ভার, পারিবারিক কার্য্য সকল সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার ভার।'[৪৬]

মেয়েদের একটি বিশেষ ধরনের কাজের ভার দেওয়ার মূলে ছিল কিছুটা সামাজিক বিবর্তনের ধারা ও কিছুটা পুরুষদের ভূমিকা। স্ত্রীশিক্ষা যে তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থাকে আলোড়িত করতে পারে, এ আশঙ্কা বোধহয় অনেকেরই মনে দেখা দিয়েছিল। ফলে, স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসের সত্যযুগেই মেয়েদের বলা হয়েছিল যে তারা গৃহের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী। একই কারণে, সে যুগের বহু রচনাতেই ঘরের কাজের মহত্ব প্রমাণের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এ কথা ঠিক যে গত শতকের শেষভাগে উপনীত হয়ে সামান্যতম স্ত্রীশিক্ষারও বিরোধিতা করছেন, এরকম ব্যক্তির সংখ্যা নগণ্য। স্ত্রীশিক্ষার কিছু তুলনামূলক সুবিধা সম্বন্ধে সমাজের এক বৃহৎ জনগোষ্ঠী সচেতন হচ্ছিল। কিন্তু যা সে যুগের মানুষদের ভাবিত করেছিল, তা হল স্ত্রীশিক্ষার সম্ভাব্য পরিণাম। খুব কম ক্ষেত্রেই পুরুষরা রাজি ছিল বাইরের জগতে নিজেদের সমকক্ষ হিসাবে মেয়েদের মেনে নিতে। তাই মহিলাদের বিভিন্ন মাসিকপত্রে প্রকাশিত এই ধরনের লেখাকে তাদের স্বার্থবোধপ্রসূত বলে মনে হওয়াটা স্বাভাবিক।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতেই পারে। অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু মেয়েদের এই বিশেষ পারিবারিক মর্যাদা দেওয়ার কথা বলত মেয়েরাই স্বয়ং। সেক্ষেত্রে হয়ত পুরুষদের স্বার্থবোধের তত্ত্ব দিয়ে সবটা ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ, যুক্তিযুক্তভাবে, এ ধরনের মত প্রচার যদি মেয়েদের গৃহরুদ্ধ করে রাখার জন্য পুরুষদের প্রচার হয়, তবে মেয়েরা নিজেরাই কেন এ কথাগুলি বলবে? কিন্তু যুক্তির জগতে যা আপাত ভাবে অসঙ্গত বলে বোধ হয়, তাই-ই বাস্তবে ঘটে বহু ক্ষেত্রে।

উনিশ শতকের বাঙালি 'ভদ্র' পরিবারের একটি কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য হল এই যে, অন্তঃপুরে ক্ষমতার স্তরমাত্রিক বিভাজন হত এবং নিয়ন্ত্রণগতভাবে তা ছিল দুই স্তরে বিন্যস্ত। এই স্তর বিভাজনের ভিত্তি ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বয়ঃক্রম। সমাজে মেয়েদের মর্যাদা পুরুষের যত নিচেই হোক না, বা মেয়েরা নিজেদের যতই অবহেলিত বোধ করুক না কেন, পারিবারিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কিন্তু মেয়েদের যত বয়স বেড়েছে, তারা ততই পুরুষের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কথা বলেছে। তাছাড়া পিতৃতান্ত্রিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা নারীর মনে পিতৃতান্ত্রিক বোধবুদ্ধি প্রবেশ করত। এবং তা সযত্নে করানোও হত। তাই এই দুই মিলে বারবার বামাকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে পুরুষের কণ্ঠস্বর। অনেক ক্ষেত্রে নাম না জানা থাকলে, একটা রচনা পুরুষের না মহিলার, তা বোঝা শক্ত হয়ে পড়ে। পুরুষেরা যেমন সাধারণভাবে স্ত্রীশিক্ষায় শঙ্কিত এবং স্ত্রীশিক্ষাকে তার নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যেই রাখতে বেশি আগ্রহী ছিল, একইরকমভাবে পরিবারের কর্ত্রীস্থানীয়া বয়স্কা

রমণীরাও উদ্বেগ প্রকাশ করতেন স্ত্রীশিক্ষার পরিণাম নিয়ে। তাদেরও ভয় ছিল, হয়ত মেয়েরা লেখাপড়া শিখে গৃহকাজে অমনোযোগী হয়ে উঠবে ও ঐতিহ্য-পারম্পরিক সংসারের কাজে দেখা দেবে শৈথিল্য। এই উদ্বেগের বাস্তব ভিত্তি কতটা ছিল, বা আদৌ ছিল কিনা, তা এই আলোচনার বিচার্য বিষয় নয়। যা লক্ষ করার, তা হল এক ধরনের মানসিক অশান্তি। এই অশান্তি একটি বিশেষ মানসিকতার প্রতিফলক। পারিবারিক কর্তৃত্ব নব্য শিক্ষিতাদের হাতে চলে যাওয়ার ভয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন অনেক বর্ষীয়সী রমণী। এই ভয়ের প্রকাশ সরাসরি ঘটেছে *বামাবোধিনী পত্রিকায়* প্রকাশিত একটি রচনায় : 'ইহারা [শিক্ষিতা বঙ্গমহিলারা] পতিকে ভক্তি না করিয়া সময়ে সময়ে অভক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক মর্ম্মপীড়াজনক বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনদিগকে অমান্য করিয়া তাঁহাদিগের উপর কর্তৃত্ব করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। গৃহকর্ম্মে মনোযোগ না দিয়া তাস খেলা প্রভৃতি বৃথা আমোদে কালক্ষেপ কবিযা থাকেন।'[৪৭] ঐ রচনায় মন্তব্য করা হয়েছিল যে বঙ্গমহিলারা তাদের এই রকম আচরণের দ্বারা 'স্বার্থপরতার দৃষ্টান্তস্থলে' পরিণত হয়ে উঠছে। এটি ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দের রচনা। আবও বত্রিশ বছর পর প্রকাশিত একটি রচনাতে এই আশঙ্কাই ব্যক্ত হয়েছিল অত্যন্ত পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় : 'বালিকাগণ বিবিদের স্কুলে রীতিমত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, অনেকে বিলাতী শিল্পকর্ম্ম, চিত্রবিদ্যা এবং গীতবাদ্যাদিতেও নৈপুণ্যলাভ করে। রন্ধন ও গৃহকর্ম্মাদিতে প্রায় সকলেরই অবহেলা, পূজার্চ্চনা ধর্ম্ম গ্রন্থাদি পাঠে তাহাদের উপেক্ষা দেখা যায়।'[৪৮]

এ উদ্ধৃতিটি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে সাধারণত দুটি বিষয়ে অমনোযোগিতা বা শৈথিল্যের আশঙ্কা প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিল—রান্নাবান্না ও অন্যান্য ঘরের কাজ এবং পূজা-পাঠ। এ দুটিকে পারিবারিক ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব আত্মসাতের নির্দেশক হিসেবে মনে করা হত। সে প্রচেষ্টা থেকে মেয়েদের বিরত করার জন্য শ্রেষ্ঠ উপায় বলে বিবেচিত হয়েছিল ঘরের কাজের মধ্যে তাদের মনোযোগকে নিবদ্ধ রাখা। বলা হত, মেয়েরা ঘরের কাজের জন্যই সবচেয়ে উপযুক্ত—কারণ, 'তারা সমাজের গৃহলক্ষ্মী, ভগিনী এবং জননী।'[৪৯] মেয়েদের কাজের জগতের ব্যাপ্তি সম্বন্ধে কী মনে করা হত, তা বোঝা যায় রাসসুন্দরী দেবীর আত্মজীবনীর একটি বাক্য থেকে : 'মেয়েছেলে ঘরের মধ্যে কাজকর্ম্ম করিবে, রান্নাবান্না করিবে, লজ্জা সরম করিবে, আমরা ইহাই জানি।'[৫০] খুবই সূক্ষ্মভাবে উপস্থিত, কিন্তু নজর এড়িয়ে যায় না যে এই বাক্যের মধ্যেই নির্দিষ্ট হয়েছে মেয়েদের কী কী কাজ করতে হত ও কী কী করা উচিত বলে বিবেচিত হত। এই দুটি নিয়েই গড়ে উঠেছিল উনিশ শতকের বাঙালি মেয়েদের গৃহস্থালি।

যদিও বর্তমান গ্রন্থের প্রধান চরিত্র শহরের 'ভদ্রমহিলা', কিন্তু শুধুমাত্র শহুরে ভদ্রকুলবালাদের মধ্যেই এ আলোচনা সীমিত রাখা সম্ভব নয়। কারণ, শহরজীবন বাঙালি সমাজের বহিরঙ্গে যতই পরিবর্তন আনুক, মোটামুটিভাবে অন্দরমহল অপরিবর্তিতই রয়ে গিয়েছিল। গত শতকের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মেয়েদের কথা আলোচনার সময়ে শহর ও শহরতলির পার্থক্য পৃথকভাবে নির্দেশিত হয়নি। মফঃস্বলের পাশাপাশি শহুরে জীবন বলতে যে সংস্কারবর্জিত উদার, মুক্ত পরিবেশের কথা মনে হয়, হয়ত তার অনেকটাই মানস-কল্পনা, কিংবা, সমাজের বহিরঙ্গে পরিবর্তন দেখে অন্তঃপুরের পরিবর্তন সম্বন্ধে অনুমানের ফল। কলকাতারও সাধারণ বাড়ির মেয়েদের জীবন যাপনে অতিরিক্ত বৈচিত্র

বোধহয় কিছুই ছিল না। চিত্রা দেব এক জায়গায় বলেছেন যে শহরে মেয়েরা আরও বেশি অবরোধবাসিনী ছিলেন : 'গ্রামে মেয়েরা জল টলটলে পুকুর পেতেন, ঘাসের গালচে পাতা মাটিতে রাখতে পারতেন পা, মাথা তুলে দেখতে পেতেন নীল গগনের সূর্য। শহরে এ সব কিছুই ছিল না। সর্বত্র খালি আবরু, পর্দা, ঝরকা, পাখি, খড়খড়ি। মেয়েদের বাইরের দালানে যাওয়া বারণ, খোলা ছাদে ওঠা বারণ, হেঁটে চৌকাঠ পেরোনোর তো কথাই নেই।'[৫১] তাই শহরের অন্তঃপুরও মোটেই মুক্তাঞ্চল ছিল না। বরং সে যুগের অনেক লেখায়, যেখানে মেয়েদের গৃহকাজ বর্ণিত হয়েছে, না বলে দিলে ধরার উপায় নেই এর পাত্রীরা কলকাতার না মফঃস্বলের।

পার্থক্য ছিল ব্রাহ্ম ও অব্রাহ্ম পরিবারের জীবনধারায়। বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার সবচেয়ে বেশি হয়েছিল ব্রাহ্ম পরিবারে। গত শতকে মেয়েদের সামাজিক অবস্থা নিয়ে যত সোরগোল উঠেছিল, তার এক বড় অংশের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ব্রাহ্মরা। ব্রাহ্ম ও অব্রাহ্ম পরিবারের মেয়েদের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে যে পার্থক্য চোখে পড়ে তা মূলত ঃ জীবনবোধের পার্থক্য—সমস্ত দৈনন্দিনতার মধ্যে সূক্ষ্ম রুচিবোধের পার্থক্য। অবশ্য ব্রাহ্ম-অব্রাহ্ম বিভাজন প্রাত্যহিকতায় এক ধরনের প্রান্তিক পার্থক্য এনেছিল মাত্র। সব যুগের মত গত শতকেও জীবনযাপনের ধারার প্রধান নির্ধারক ছিল আর্থিক ক্ষমতা। সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈকিতভাবে একই মানের দুটি ভিন্ন স্থানের পরিবারের জীবনধারায় মোটামুটি অভিন্নতা লক্ষ করা যায়। কিন্তু কলকাতার ধনী পরিবারের বধূর সঙ্গে কলকাতারই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বধূর জীবনযাপনে ছিল আশমান জমিন ফারাক।

॥ দুই ॥

মেয়েদের দৈনন্দিন জীবন বলতে সাধারণভাবে বোঝাত রাঁধার পর খাওয়া আর খাওয়ার পর রাঁধা। কেবলমাত্র এ দুটি কাজের মধ্যেই যে তাদের সমস্ত দিন অতিবাহিত হত, তা নয়। তবে প্রায় প্রবাদোপম এই বাক্যটির মধ্যে মেয়েদের প্রাত্যহিক জীবনযাপনের ধারার একটি আভাস পাওয়া যায়। এর নিহিতার্থ ছিল খুব সহজ : মেয়েরা দিন কাটাত বাড়ির বিভিন্ন কাজের মধ্যেই। এর মধ্যে উচ্চতর কোন বুদ্ধিজৈবিক ক্রিয়া, আমোদ-প্রমোদ বা অবসর বিনোদনের অন্য কোন মাধ্যমের কোন স্থান ছিল না। এই বাক্যটি দীর্ঘদিন ধরে বাঙালি জীবনে মেয়েদের কাজ বোঝাতে ব্যবহৃত হত। তারপর মেয়েরা গত শতাব্দীতে, একটু একটু করে শিক্ষিত হচ্ছিল। ঘটছিল স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার। তবু ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে সে শিক্ষার প্রকৃত সার্থকতা ছিল না। বস্তুতপক্ষে, খুব কম ক্ষেত্রেই বাঙালি মেয়েদের দৈনন্দিনতার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ও পুঁথিগত শিক্ষার কোন সম্পর্ক ছিল। সারা দিনই তাদের ব্যস্ত থাকতে হত গৃহস্থালির বিভিন্ন কাজে।

ঘরকন্নার কাজ বলতে সাধারণতঃ কী বোঝাত ? উত্তর এক কথায় দেওয়া যায়—সংসারের সব কাজ। কিন্তু সংসারের সব কাজগুলি কী কী ? সে যুগের বিভিন্ন রচনায় ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত উল্লেখ থেকে এ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যায় বটে, কিন্তু আমরা আরও সহজে গত শতকের একটি মাসিক পত্রে প্রকাশিত এই কাজের একটি তালিকাকে বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ করতে পারি। ঘরকন্নার কাজ বলতে সাধারণতঃ বোঝাত :

(ক) গৃহ এবং গৃহসামগ্রী পরিষ্কার ও সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা,
(খ) পরিমিত ব্যয়ে সুচারুরূপে গৃহস্থালি সম্পন্ন করা,
(গ) রন্ধন ও পরিবেশন,
(ঘ) সূচীকর্ম,
(ঙ) পরিজনদের যত্ন, এবং
(চ) সন্তানপালন।[৫২]

মোট ছটি ভাগে বিভক্ত এই কাজগুলি নিযেই ছিল সে যুগের মেয়েদের গৃহস্থালি। এবং অলিখিত হলেও, এর সঙ্গে অবশ্যকৃত্য ছিল পারিবারিক নিয়মবিধিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মান্য করার দায়িত্ব। শেষোক্ত এই দায়িত্বটি বাসন মাজা বা রান্না করার মত 'কাজ' না হলেও, এর ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল মেয়েদের ঘরকন্নার জগৎ : '. . .শুধু শ্বশ্রূকে কায়মনোবাক্যে ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে সেবা করা উচিত এবং আন্তরিক অনুরাগ ও আগ্রহ সহকারে তাঁহাদের আদেশ সকল পালন করা ও তাঁহাদের বাধ্যতা স্বীকার করা উচিত।'[৫৩]

যদিও ওপরের তালিকায় প্রথম স্থান পেযেছে ঘরদোর পরিষ্কারের কথা, কিন্তু মেয়েদের ঘরকন্নার কাজের মধ্যে প্রধান ছিল রান্না। রান্নার ওপর উনবিংশ শতাব্দীতে বহু লেখা হয়েছে। রান্নার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য পুরাণ থেকে দ্রৌপদী, সীতা, দময়ন্তী প্রমুখদের রন্ধন পটুত্বের কথা উল্লেখ করে *পরিচারিকা* পত্রিকা মন্তব্য করেছিল : 'রন্ধনকে নীচ কার্য্য যেন কেহ মনে না করেন। অন্যান্য বিদ্যার ন্যায ইহাতে সুদক্ষ হওয়া কর্ত্তব্যের বিষয় জ্ঞান করা উচিত। জীবন রক্ষার প্রধান উপায় ভাল আহার। সেই আহার যাহাতে ভালরূপে হয়, তাহার তত্ত্বাবধান করা গৃহিণীর একটি প্রধান কর্ত্তব্য। পিতা মাতা স্বামী পুত্র ইত্যাদির আহার যে রন্ধনের সাহায্য বিনা হয না সেই রন্ধনকার্য্যে অপটু এবং অশিক্ষিত থাকা কোন নারীর উচিত নহে।'[৫৪]

রান্নাঘরের আয়োজন যে কত বিস্তৃত ছিল, তার টুকরো বিবরণ পাওয়া যায় বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো লেখাপত্র থেকে। একান্নবর্তী পরিবারের রান্নার বর্ণনা শুনিয়েছেন রাসসুন্দরী দেবী। রাসসুন্দরী দেবীর বিয়ে হয়েছিল বারো বছর বয়সে। বেশ কিছুদিন নিরুদ্বিগ্নভাবে শ্বশুরঘর করার পর শাশুড়ী দৃষ্টিশক্তি রহিত হলে গোটা সংসারের ভার এসে পড়ল রাসসুন্দরী দেবরীর ওপর : 'বিশেষতঃ ঐ সংসারটি [শ্বশুরবাড়ি] বড় কম নহে, দস্তুর মতই আছে। বাটীতে বিগ্রহ স্থাপিত আছেন, তাহার সেবাতে অন্নব্যঞ্জন ভোগ হয়। বাটীতে অতিথি, পথিক সতত আসিয়া থাকে, তাহাদিগকে বাটীর মধ্য হইতে সিধাপত্র দেওয়া হয়। এদিকে রান্নাও বড় কম নহে। আমার দেবর ভাশুর কেহ ছিল না বটে, কিন্তু চাকর চাকরানী প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশজন বাটীর মধ্যে খাইত, তাহাদিগকে দু বেলাই পাক করিয়া দিতে হইত।'[৫৫] সব পরিবারই যে আয়তনে এত বড় ছিল, এমন নয়। তবে রান্নাবান্নার পাট সব বাড়িতেই প্রায় একই ধাঁচের ছিল। অবশ্য, এত কাজের লোক থাকা সত্ত্বেও রাসসুন্দরী দেবীকে এত খাটতে হত কেন, তার কারণ তিনি জানাননি। তবে নিজের কাজের একটা ফিরিস্তি দিয়েছেন। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছিলেন, কাজের চাপ এত বেশি ছিল যে অনেকদিন সারা দিনে একবারও খাওয়ার ফুরসৎ পেতেন না। 'এক সন্ধ্যা দশ বারো সের চাউল পাক করিতে হইত। এদিকে বাটীর কর্ত্তাটির স্নান

হইলেই ভাত চাই, অন্য কিছু আহার করিতে বড় ভালবাসিতেন না। এ জন্য অগ্রে তাঁহার জন্য এক প্রস্থ পাক হইত। এই প্রকার পাক করিতেই বেলা তিন চারিটা গত হইত।'[৫৬]

গৃহস্থালিকে সে যুগে কতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হত, তা বোঝা যায় নব্য শিক্ষিতাদের ব্যবহারেব সমালোচনা থেকে। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগ উঠল যে শিক্ষিতা মেয়েদের ঘরের কাজে আর মতি নেই, দেখা দিয়েছে গৃহধর্ম পালনে শৈথিল্য। সর্বদাই তুলনা চলত প্রাচীনাদের সঙ্গে : 'বর্ত্তমান সময়ে পুস্তক পাঠের প্রতি স্ত্রীলোকদিগের যেরূপ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যান্য কার্য্যের প্রতি সেরূপ অবজ্ঞাও লক্ষিত হইয়া থাকে, পূর্ব্বে গৃহস্থ্য সমস্ত কার্য্যই পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে করিতে হইবে।'[৫৭] এর পরই আমরা পাই আরও একটি তথ্য : 'পূর্ব্বের মত পাকা রাধুনী আর দৃষ্টিগোচর হয় না। এক্ষণকার বাবুরা প্রায়ই পাচক ব্রাহ্মণ বা পাচিকা ব্রাহ্মণী রাখিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের গৃহিণীদিগের রন্ধন করিবার ক্ষমতা নাই।'[৫৮] পড়লেই বোঝা যায় যে এটি কোন প্রবীণ বা প্রবীণার কলম থেকে বেরিয়েছিল। যে কোন যুগেই বয়স্ক ব্যক্তিদের কাছে অতিবাহিত অতীতের মধ্যে লুকিয়ে থাকে আচার-বিধির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তার ওপর, নব্য শিক্ষিতা বধূরা আবহমানকালব্যাপী সযত্নে রক্ষিত পারিবারিক ভারসাম্যের পক্ষে মস্ত বড় উপদ্রব হিসেবে গণ্য হত। তাই 'দুই একপাত ইংরেজী' পড়া বউদের আচার-আচরণ এতই ভিন্নদেশি মনে হত যে পরিবারের ক্ষমতা-নিয়ন্ত্রণের শীর্ষস্থ ব্যক্তিবর্গ সর্বদাই তাদের মর্যাদা হারানোর শঙ্কায় ভীত থাকতেন। পরিবারের কর্ত্রীদের প্রধান ভয় ছিল শিক্ষিতা বধূর কাছে কর্তৃত্ব হারানোর : 'পুত্রের বিবাহের পূর্ব্বে তাহাদের [কর্ত্রীদের] যে অধিকার ছিল, সেই অধিকারচ্যুত হইতে তাঁহাদের অত্যন্ত কষ্ট হয়।'[৫৯] মূলতঃ এই ভীতি থেকেই শিক্ষিতা বউদের বিরুদ্ধে অধিকাংশ অভিযোগ আনা হত।

গত শতকের শেষ ভাগে এসে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বাড়ির বউদের কাজকর্মে অবহেলার বিরুদ্ধে অভিযোগের পর অভিযোগ পাই : মেয়েরা ঘরদোর ঠিক মত সামলাতে পারে না, আয় বুঝে ব্যয় করতে না পারার জন্য পারিবারিক ঋণের বোঝা বাড়তে থাকে, স্ত্রীরা বিলাসিনী, সাজ পোষাকের দিকেই তাদের প্রধান লক্ষ্য—'কর্ত্তা মাসান্তে মাহিনার টাকা আনিয়া গৃহিণীর হস্তে অর্পণ করিলেন, গৃহিণী তাহার অধিকাংশ বোম্বাই শাড়ী বা সিল্কের জ্যাকেট এবং হার ও বালা, বুট মুজা পোমেটম ইত্যাদিতে ব্যয় করিলেন, শিশু ও রোগীদের দুগ্ধ ও বাজার খরচ ইত্যাদিতে অর্থের টানাটানি হইতে লাগিল, ধর্ম্মকর্ম্মোদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয়ের ঘরে একেবারে শূন্য পড়িল।'[৬০] আরও একটা সাধারণ অভিযোগ ছিল যে মেয়েরা গান-বাজনা, ছবি আঁকা ইত্যাদিতে যতটা পটু হয়, ঘরের কাজে ততটা নয়।[৬১] যেহেতু রন্ধনকে গৃহস্থালির প্রধান কাজ বলে মনে করা হত, তাই অভিযোগের এক বড় অংশ জুড়ে ছিল রান্নায় তাদের অমনোযোগের প্রসঙ্গ : 'কি ধনী কি নির্ধন প্রায় অধিকাংশ মহিলাবর্গই রন্ধনকে একটি অতীব নিকৃষ্ট ও কষ্টকর কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত করিয়া ক্রমেই তাহা হইতে সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ করিতেছেন। যদিও বহু দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকের অধিকাংশ রমনীবর্গকেই অবস্থানুসারে নিতান্ত বাধ্য হইয়াই উক্ত কার্য্য আপনাদিগকেই সম্পন্ন করিতে হয় কিন্তু তাহাতে তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখ ও বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন।'[৬২] একই ধরনের অভিযোগ পাওয়া যায় তাদের আতিথেয়তার ত্রুটি নিয়েও। সব অভিযোগের মধ্যেই সেই একই বিলাপধ্বনি শোনা

যায়—কী ছিল, আর কী হল!

এ প্রসঙ্গে স্বতঃই একটা প্রশ্ন জাগে। এই সব সাক্ষ্য যদি সত্যি হয়, তবে গৃহস্থালির কাজ করত কারা? অভিযোগকারীদের মতে, বউ-ঝিরা তো মেমসাহেব, তারা পশমের ওপর ফুল তোলে, গান বাজনায় সময় কাটায়। তাহলে মেয়েদের ঘরের কাজে কি আদৌ মন ছিল না? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমরা দেখতে পারি গত শতকে বিবাহের জন্য পাত্রী পছন্দ হত কীভাবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা গত শতকে কখনই বিবাহের ক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য গুণ হিসেবে গণ্য হত না। গৃহস্থালিব কাজকর্ম এবং বিশেষ করে রান্নাবান্নায় পটুত্ব ছিল পাত্র পক্ষের পছন্দের মাপকাঠি। মানোদা দেবী (১৮৭৮—১৯৬৩) দিনলিপিতে তাঁর এক অবিবাহিতা খুড়তুতো বোনের কথা লিখেছিলেন। বিয়ের আগে সেই বোনকে তার ভাবী শ্বশুর দেখতে এসেছিলেন। মানোদা দেবীর ছোট দাদামশাই মেয়ের গুণাবলী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন, 'এ মেয়ে মাংস, চপ, কাটলেট ইত্যাদি সবই রান্না করিতে পারে ও সেলাইতে কার্পেট ও রেশমের বহু রকমারী কারুকার্য করিতে পারে।' ছেলের বাবার প্রয়োজন অত্যন্ত ন্যূন। তিনি মেয়ের রন্ধন ও গৃহস্থালির অন্যান্য বিষয়ে পটুত্বের জবাবে এক গাল হেসে বলেছিলেন, 'মা যদি আমার ঘরে যাইয়া আমাকে একটু সুক্তোর ঝোল ও পাতলা মুসুরির ডাইল ও দুটি ডাইলের বড়া রান্না করিয়া দেয় তবেই আমার পরম সার্থক জীবন মনে করিব। আর সূচী কর্ম? আমার ছেঁড়া কাপড় দিয়ে যাচ্ছি ২/১ খানা কাঁথা সেলাই করিয়া দিতে পারে তবে ত কথাই নাই।'[৬৩] অর্থাৎ সেই গুণই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হত যা দরকারি ছিল ঘর-গেরস্থালির কাজে।

সে যুগে মহিলাদের জন্য প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকায় রন্ধনের বিশদ বিবরণ পাঠ করলে বোঝা যায় গৃহস্থালির এই অবশ্যকৃত্য কাজটির প্রতি সমসাময়িক সমাজের মনোভাব কী ছিল। রন্ধন শুধু গৃহস্থালির প্রধান কাজ ছিল না, এ বিষয়ে পারদর্শিতা মেয়েদের সবচেয়ে বড় গুণ বলে স্বীকৃত হত। ঈশানচন্দ্র বসু লিখেছিলেন, 'রন্ধনেই মেয়েদের বিশেষ বিদ্যা, নৈপুণ্য ও মর্যাদার প্রকাশ।'[৬৪] কৃষ্ণপ্রিয়া চৌধুরানী মা ও মেয়ের সংলাপের মধ্য দিয়ে মেয়েকে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে 'সুনিয়মে রন্ধন ও পরিবেশন করাই মেয়েদের নিত্য নৈমিত্তিক কাজের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য'।[৬৫] এই মনোভাব থেকেই মহিলাদের জন্য প্রতিটি পত্রিকায় রন্ধনের ওপর পৃথক বিভাগ থাকত এবং তার সঙ্গে থাকত বিভিন্ন খাদ্যের রন্ধন প্রণালী। খুব বিলাসী খাদ্যের বর্ণনা নয়—অতি সাধারণ রোজকার খাদ্যের বর্ণনা। যেমন, *বামাবোধিনী পত্রিকার* একটি সংখ্যায় 'পাকবিদ্যা' শীর্ষক একটি রচনায় পাই 'শাকের ঘন্ট', 'মোচার ঘন্ট', 'ইঁচড়ের ডালনা', 'আলুর দম', 'রোহিত মৎস্যের বিশেষ প্রলেহ', 'মাচের বড়া ভাজা' ও 'ডিম্ব প্রলেহ', 'ওলকপি ও মোচা চিংড়ির প্রলেহ' প্রভৃতি রান্নার বর্ণনা।[৬৬] ধরে নেওয়া যায় এগুলির উদ্দেশ্য ছিল নবীনা গৃহবধূদের বিভিন্ন রান্নার সঙ্গে পরিচিত করানো। পুরুষরা রান্নাঘরে গিয়ে পাক প্রণালী খুলে বিভিন্ন রান্নার চেষ্টা করবে, এটা অবশ্যই পত্রিকাকারদের উদ্দেশ্য ছিল না। আর, প্রাচীনাদের 'শাকের ঘন্ট' বা 'মোচার ঘন্ট'র মত সাধারণ রান্না শেখানোর দর্পিত স্পর্ধাও এই ধরনের রচনার উদ্দেশ্য ছিল না। তাছাড়া, এ লেখাগুলি যদি প্রাচীনাদের জন্যই প্রকাশিত হয়, তবে এই রচনাগুলিই বিভিন্ন পত্রিকায় আধুনিকাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। যদি কোন বয়স্কা মহিলাকে এত সাদামাটা রান্না শেখাতে হয়, তাহলে প্রমাণ হয়

যে তারাও গৃহস্থালির কাজ করতেন না। ফলে নব্য শিক্ষিতা মেয়েরা বিবিয়ানি করে গৃহকর্মে শৈথিল্য প্রদর্শন করে এবং প্রাচীনারা ছিলেন রন্ধন পটিয়সী—এ যুক্তি আর ধোপে টেঁকে না। পুরুষ-শাসিত সমাজে ও প্রাচীনা-শাসিত সংসারে মেয়েরা গৃহস্থালির কাজ না কবে অব্যাহতি পাবে. এটা যুক্তি দিযে স্বীকার করা যায় না।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বারবার অভিযোগ করা হত বটে যে মেয়েরা রান্নাবান্না বা অন্যান্য ঘবের কাজ করে না, কিন্তু সমসাময়িক স্মৃতিচিত্র যা পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয় বান্নার কাজ মেয়েরাই করত। কৃষ্ণকুমার মিত্র (জন্ম, ১৮৫২) লিখেছিলেন যে তাঁর মা দুবেলা নিজেব হাতে রান্না করতেন। পঁচিশ-ত্রিশজন একসঙ্গে খেতে বসতেন, মা-ই সকলকে পরিবেশন করতেন।[৬৭] বিপিনচন্দ্র পালের (জন্ম, ১৮৫৮) বাবা বিচারক ছিলেন। কিন্তু তাঁদের বাডিতে কখনও রান্নার জন্য পাচক নিয়োগ করা হয়নি। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে প্রায় কুড়িজনের পরিবারের রান্নার দাযিত্ব ছিল তাঁর মায়ের ওপর। এর জন্য তাঁর মাযের কোনদিন কোন অভিযোগ ছিল না, উপরন্তু এই কাজের দাযিত্ব পেযে তিনি রীতিমত গর্বিত ছিলেন।[৬৮] বাড়িভর্তি ঠাকুর-চাকর থাকা সত্ত্বেও রাসসুন্দরী দেবীকেই রান্নার সব কাজ করতে হত। প্রসন্নময়ী দেবীর লেখা থেকে জানা যায় যে বড়লোকের বাড়িতেও গৃহিণীরাই রান্নাবান্না করতেন।[৬৯] বঙ্কিমচন্দ্রের *ইন্দিরা* উপন্যাস সুভাষিণীব কথা থেকে জানা যায যে তাদের মত যথেষ্ট অবস্থাপন্ন বাডিতে বাঁধুনি থাকা সত্ত্বেও বাডির মেয়েবা রান্না করত।[৭০] আমরা অনেক রচনার পরোক্ষ প্রমাণ থেকেও বুঝতে পারি মেযেদেব রান্নাবান্নার কথা। যেমন, হেমন্তকুমারী গুপ্তার নব্য শিক্ষিতা মেযেদের কাজে বিশৃঙ্খলার অভিযোগ[৭১] প্রমাণ কবে যে শিক্ষিতা মেযেরাও অবশ্যই রান্নাবান্না করত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন লেখায় প্রাচীনাদের সঙ্গে নবীনাদের কাজের তুলনামূলক আলোচনা করা হত। 'বঙ্গীয় গৃহিণীদিগেব নিত্যকার্য্যে'র[৭২] মধ্যে ছিল ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে ইষ্ট নাম জপ করে শয্যা ত্যাগ, তারপর প্রাতঃকৃত্যাদির পর শিশু ও বালক বালিকাদের প্রাতরাশের আয়োজন, গৃহপ্রাঙ্গণে গোবরছড়া দেওয়া, তারপর বাসনপত্র মেজে তরকারি কাটা, তারপর আহ্নিক বা পুজো, তারপর স্নান করে রান্না, দুপুরে খাওয়ার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আচার-চাটনি বা ছেলে-মেয়েদের খাবার তৈরি করা, বিকেল বেলায় সকলকে খাইয়ে পাড়ায় বেড়াতে বেরিয়ে হয় প্রতিবেশীদের সঙ্গে গল্প নতুবা কারও বাড়িতে অসুখ হলে তার কুশল জিজ্ঞাসা করা, সূর্যাস্তের আগেই রাত্রের জন্য তরকারি কাটা, তারপর সান্ধ্য আহ্নিকাদি করে আবার রান্না। এর থেকে আমরা কাজের পর কাজ দিয়ে ঠাসা পরিপূর্ণ একটি দিনের ছবি পাই। গৃহস্থালির হাজারো কাজের মধ্যে রান্নাই প্রধান। এর সঙ্গে ছিল ধর্মকর্ম, মালা-চন্দন দিয়ে ঠাকুরপুজো।

তবে এ ছবিটি পুরোপুরি শহরের ছবি নয়। কারণ, প্রবন্ধের লেখিকা প্রবন্ধের পরবর্তী পর্যায়ে নগরবাসিনী ভদ্রগৃহিণীদের জীবনযাপন বর্ণনার সময়ে ওপরের বর্ণনা থেকে একটি কাজ বাদ দিয়েছিলেন। 'নগরবাসিনী ভদ্র গৃহিণীরা পুষ্প চন্দনাদি যোগ্য নিত্য পূজার্চ্চনা বড় করেন না। অনেকে নির্জ্জলা আহ্নিক করিয়া থাকেন। সকাল বেলায় গৃহ বিলেপন ও গোবর ছড়া দেওয়া ইত্যাদি তাহাদের প্রায় হয় না।' অর্থাৎ আধুনিকতার ছোঁয়া বলতে বোঝাত কেবল পুজোর ব্যবস্থার পার্থক্যই। বাকি অনেকটা একই রয়ে গিয়েছিল—সেই

হেঁসেল, আত্মীয় পরিজনের পরিচর্যা, সেই সমস্ত দিন ধরে গৃহস্থালির তত্ত্বাবধান।

এই শতকের গোড়ায় আরও এক পরিণত বয়স্কা রমণী লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাঁর ফেলে আসা অতীতের কথা। এ সব রচনাকে ইতিহাসের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করার প্রধান অসুবিধা হল এই যে এই রচনাগুলিতে প্রায়ই কোন সময়ের কথা বলা হচ্ছে তার কোনও সন তারিখ থাকত না। তবু এ শতকের সূচনায় প্রসন্নময়ী দেবী তাঁর অতীত জীবনের যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেটিকে আমরা গত শতকের শেষার্ধ সম্বন্ধে প্রযোজ্য বলে ধরে নিতে পারি।

প্রসন্নময়ী দেবী লিখেছিলেন যে মেয়েদের প্রধান ও সম্মানীয় কাজ ছিল ঘরের কাজ, সন্তানপালন, দেবসেবা এবং পরিবারবর্গের পরিচর্যা। গৃহস্থালির মধ্যে রান্না ও ঠাকুর পুজোর কথা তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন : '[গৃহিনী] প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া স্নানান্তে বংশানুক্রমিক বিগ্রহ "শ্যামরায়" "মঠের শিব" এবং "মঙ্গলচণ্ডীর" মন্দির প্রক্ষালন করিয়া স্বহস্তে তাহাদের পূজার আয়োজন করিতেন। গৃহিণীর জ্যেষ্ঠ কন্যা বা [বিধবা] পুত্রবধূ সকলের জলযোগের আযোজন করিতেন, সে ভার তাহাদের হস্তে। সবাই স্নাত হইয়া, পূজান্তে, বিধবাগণ রক্তচন্দনের ও সীমন্তে সিন্দুর ফোঁটা পড়িয়া গৃহকার্য্যে লক্ষ্মীপ্রতিমাবৎ শোভা পাইতেন, . . . ছোট ছোট বধূরা রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃতা—পাচক ব্রাহ্মণদিগের [তদেব] হস্তে আহার করা তখন নিয়ম ছিল না'।[৭৩] এটিও শহরের কোন পরিবারের অন্তঃপুরের বর্ণনা নয়, অন্তত কলকাতার বর্ণনা তো নয়ই। কারণ, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শহরে শ্যামরায় বা মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির প্রক্ষালনের সুযোগ বাড়ির গৃহিণীর পেতেন না। তাছাড়া মনে হয যে লেখিকা এখানে পারিবারিক মন্দিরের কথা বলেছেন। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল একটি ছোট বাক্যাংশ—'পাচক ব্রাহ্মণদিগের [তদেব] হস্তে আহার করা তখন নিয়ম ছিল না।' এর থেকে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে এই রচনাটি যখন প্রকাশিত হয়েছিল (অর্থাৎ, বিংশ শতকের সূচনায়), তখন হয়ত বাড়ির মেয়েদের সংসারের ভার লাঘব করার জন্য ধীরে ধীরে কয়েকটি অবস্থাপন্ন ঘরে পাচক ব্রাহ্মণদের নিযুক্তি শুরু হয়েছিল।

এই প্রথার উদ্ভব হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এবং মূলতঃ শহরাঞ্চলে। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১৮৫০—১৯৪১) স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন যে তার ছোটবেলায় যশোরে 'টাকা দিয়ে রাঁধবার বামুন পাওয়া যেত না। তাই পুজো বা অন্য কোন ক্রিয়াকর্মে রাঁধবার লোক দরকার হলে চক্রবর্তী বাড়ির মেয়েদের অনুরোধ করে ডেকে আনা হত, তারপর কাজকর্ম হয়ে গেলে তাদের উপহারের মত কাপড়চোপড় দেওযা হত।'[৭৪] এমনকি, বড় মানুষের ঘরেও পাচক-পাচিকা রাখার রেওয়াজ ছিল না।[৭৫] তবে, গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শহরাঞ্চলে অবস্থাপন্ন বাড়িতে পাচক নিয়োগ হত, বিশেষতঃ কলকাতায়। *ইন্দিরা* উপন্যাসে সুভাষিণী কুমুদিনীকে জানিয়েছিল যে কলকাতার রেওয়াজ মত তাদের বাড়িতেও পাচিকা আছে।[৭৬] মুক্তকেশী দেবী ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে লক্ষ করেছিলেন 'যে আজি কালি দেখিতে পাওয়া যায়, রমণীগণ এই সুমহৎ ব্যাপার (রন্ধন) পাচক ঠাকুর কিম্বা পাচিকা ঠাকুরাণীর হস্তে দিয়া নিশ্চিত হইয়া থাকেন।'[৭৭] অতএব, রান্নার কাজের জন্য পাচক-পাচিকা নিয়োগ গত শতকের গৃহস্থালির ইতিহাসে এক নতুন সংযোজন।

আর, আরও অবস্থাপন্ন কেতাদুরস্ত পরিবারে খানাপিনার জন্য বাবুর্চিও নিয়োগ করা

হত। গত শতকের প্রথম ভাগেই দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময়েই তাঁর বেলগাছিয়ার বাগান বাড়ির সাহেবি খাওয়া-দাওয়া, ছুরি-কাঁটার শব্দ শহরে গুঞ্জন তুলেছিল। একটি ছড়ার গানও বাঁধা হয়েছিল :

বেলগাছিয়ার বাগানে হয় ছুরিকাঁটার ঝনঝনি,
খানা খাওয়ার কত মজা আমরা তার কি জানি ?
জানেন ঠাকুব কোম্পানী।[৭৮]

তবে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি, কুমারটুলির মিত্রবাড়ি বা কলুটোলার শীলদের বাড়ি—এইসব পরিবারে পাচক-পাচিকা বহুদিন ধরেই নিযুক্ত ছিল। এইসব বাড়ির নিয়মাবলী সাধারণ বাঙালি পরিবারের গৃহস্থালির সূচক নয়। শরৎকুমারী চৌধুরানী (১৮৬১—১৯২০) ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে *ভারতী* পত্রিকায় লিখেছিলেন যে তাঁর মা-দিদিমারা ঘরের কাজ নিজেরাই করতেন, তাঁর সময় থেকেই দাস-দাসীর চলন আরম্ভ হযেছিল।[৭৯] তবে সব বাড়িতে দাস-দাসী রাখা সম্ভব হত না। প্রথম দিকে এই প্রথা সীমিত ছিল খুবই স্বল্প সংখ্যক পরিবারে। শরৎকুমারী চৌধুরানী নিজেই মন্তব্য করেছিলেন 'যে সুলভে দাস-দাসী পাওয়াও যায় না, খরচেও কুলায় না'।[৮০]

আর, যে বাড়িতে দাস-দাসী রাখার প্রশ্ন উঠত না, সে বাড়িতে মেযে-বউদেবই সব কাজ করতে হত। অনেক সময গোটা সংসারের কাজ বিভক্ত হযে যেত অনেকের মধ্যে। কিন্তু যে পরিবাবে কর্মিণীর সংখ্যা কম, সেখানে একা বউকেই দশভুজা হযে সামলাতে হত গোটা সংসাবের কাজকর্ম। সুদক্ষিণা সেনের (১৮৫৯—১৯৩৪) আত্মজীবনী পড়লে বোঝা যায় যে মেয়েরা রান্না শিখতে শুরু করত খুব ছোট বয়স থেকে।[৮১] তখন মেযেদের বিয়ে হত ছোট বযসে এবং বিযের পর বালিকাবধূকে শ্বশুরবাড়িতে গিযে রাঁধতে হত। যত বযস বাড়ত, তত বেশি হত সাংসারিক দায়-দায়িত্ব।[৮২]

মেয়েরা গৃহস্থালির কাজকে কতটা গুরুত্ব দিত, তা বোঝা যায ঊনবিংশ শতাব্দীতে গৃহস্থালির ওপর প্রচলিত কয়েকটি মেয়েলি ছড়া থেকে। গৃহস্থালির প্রধান প্রধান কাজ বলতে কী বোঝাত, পাকা গৃহিণী হওয়ার জন্য কী কী গুণাবলী আবশ্যক মনে করা হত তা *বামাবোধিনী পত্রিকায়* প্রকাশিত এই ছড়াগুলির মধ্যেই ধরা পড়েছিল। যেমন :

হাঁড়ি হানশাল রান্না
তিন নিয়ে ঘর কন্না।
পান পাণি চূণ
তিন গৃহিণীর গুণ।
আসন বাসন বসন শায
লালন পালন মেয়ের কায।
রাখা ঢাকা শিল্পি-কর্ম্মা।
বলে গেছেন রামশর্ম্মা।[৮৩]

পানীয় জল বিষয়ে নেওয়া হত প্রচুর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। পানীয় জল হিসাবে কোনটা উপযুক্ত কোনটা অনুপযুক্ত, সে সম্বন্ধেও ছড়া ছিল। যেমন, প্রায় সান্ধ্য-ভাষায় রচিত খারাপ বা পানীয় হিসাবে অনুপযুক্ত জলের সূত্র :

হাটে আনে ঘাটে খায়
শিগ্‌গির শিগ্‌গির অন্নাই যায়।
শেষানি মিশানি কমানি,
তিন জানি শ্মশানি

আর ভাল জলের ছড়া :

চাতক জল ফটিক পাণি,
কল্‌সীর মুখে বেঁধো কানি।
আভাঙা জল ঘিয়ের ফুট,
মাটির পাত্রে কর কুত্।[৮৪]

এই ছড়াগুলি থেকে বোঝা যায় গৃহস্থালির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রতিটি কাজের প্রতি মেয়েদের কতটা মমত্ব ছিল। গৃহস্থালির কাজকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করার মধ্যেই নারীজন্মের চূড়ান্ত সাফল্য, এটাকে গত শতকে ধ্রুব সত্য বলে অধিকাংশ মেয়ে মনে করত। যে যত স্বল্প উপকরণ দিয়ে গৃহস্থালির কাজ করতে পারবে, সে তত সুগৃহিণী। পচা মাছকেও রান্নার গুণে উৎরে দেওয়ার ক্ষমতাকে ধরা হত রন্ধন বিদ্যায় পটুত্বের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা। একটি ছড়ায় সেই ভাব খুব সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছিল :

মাচ পচা ? না রাঁধুনী পচা ?
তেল ঘিয়ে কি হয় ? রাঁধতে জানলে হয়।[৮৫]

গৃহস্থালির প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখার ফলে মেয়েদের নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখার অবসর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মিলত না। সংসারের সমস্ত কাজ সেরে নিজের খেতে খেতে কত যে দেরী হয়ে যেত একেক দিন, তার বিবরণ শুনিয়েছেন রাসসুন্দরী দেবী—'এই প্রকার পাক করিতেই প্রায় তিন চারিটা গত হইত।' কিন্তু ঘড়ির কাঁটা তিনটে কি চারটে ছুঁলেই যে খাওয়া সুনিশ্চিত, তারও অর্থ ছিল না। তখনও বাড়িতে হঠাৎ লোক চলে এলে তাকেই নিজের মুখের ভাত দিয়ে দিতে হত। সারাদিন অভুক্ত থাকার পর পরে খেতে বসার সময়ে ছেলে কাঁদতে শুরু করলে ধরার লোক থাকত না। রাসসুন্দরী দেবীর মনে হত, এর চেয়ে না খাওয়াও বুঝি ভাল।[৮৬] এমনকি, ছেলে কোলে নিয়ে খেতে বসলেও তাঁর নিশ্চিন্তে খাওয়া হত না। ছেলে প্রায়ই ভাত নষ্ট করে দিত।[৮৭] রাসসুন্দরী দেবীর মত একা সংসারের ভার সামলাতে না হলেও, সংসারের কাজকর্ম সব শেষ করে মেয়েদের খেতে খেতে প্রায়শই দুপুর গড়িয়ে যেত। রমেশচন্দ্র দত্তর *সমাজ*

উপন্যাসের (প্রথম প্রকাশ, ১৮৯৪) একটি চরিত্র 'দাদা মহাশয়'কে বলতে শুনি : 'ঐ সকাল থেকে উঠে বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, কুটনা কোটা, বাটনা বাটা, রাঁধা, বাড়া, পুরুষদের খাওয়ান, ছেলেদের খাওয়ান—এ সব কাজ হলে তবে বৌয়েরা মুখে জল দিতে পারিত।'[৮৮] এটাই ছিল বাঙালি অন্দরমহলের সাধারণ ছবি। কেশব-জননী সারদাসুন্দরী দেবীর এগারো বছর বয়সে দীক্ষা হয়েছিল। ফলে, সংসারের সমস্ত পরিশ্রমের ওপর শুরু হযেছিল পূজা-পাঠের জীবন। এত খাটুনির মধ্যে কিশোরীর জীবনে 'আমোদ' ছিল একটাই—অনেক সময়ে তাঁর শ্বশুর বাইরে যাবার সময়ে সারদাসুন্দরীর বাল্যবিধবা ননদের হাতে টাকা দিয়ে যেতেন এবং সারাদাসুন্দরী ও তাঁর ননদ সেই টাকা দিয়ে জিনিস কিনে সমস্ত দিন ধরে খাবার তৈরি করতেন।[৮৯] সারাদাসুন্দরী যে কাজকে 'আমোদ' বলে উল্লেখ করেছিলেন, সেটাও কিন্তু রান্নাবান্নার কাজই ছিল। রক্ষণশীল ব্যক্তিরা নব্য-সম্প্রদাযিনীদের সম্বন্ধে যে যাই অভিযোগ[৯০] করুন না কেন গত শতকের সাধারণ বাঙালি ঘরের মেয়েদের অলস ও বিলাসী জীবনযাপনের ফুরসৎই ছিল না।

সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের (জন্ম, ১৮২২) বিবাহ হয়েছিল এগারো বছর বয়সে। সত্তর বছর বয়সেও আত্মজীবনী লিখতে বসে তাঁর নবপরিণীতা বধূর শ্বশুরবাড়িতে 'হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের' কথা উল্লেখ করতে ভোলেননি গিরিশচন্দ্র।[৯১] বালিকাবধূর এই অবর্ণনীয় পরিশ্রমে কিশোর-স্বামীর মন যে কী পরিমাণে ব্যথিত হত, তা বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর মনে থেকে গিয়েছিল। একেক রাত্রে মাটির ওপর মাদুর পেতে শুয়ে তাঁরা পরস্পর বলাবলি করতেন : 'যদি কখন আমাদের পুত্র ও পুত্রবধূ হয়, তবে আমরা তাহাদিগকে পরম সুখে রাখিব, আমাদের মত যন্ত্রণা যেন শত্রুকেও পাইতে না হয়।'[৯২]

চিরাচরিত সমাজব্যবস্থায় পূজা-পার্বণকে মেয়েদের দৈনন্দিন কাজের মধ্যেই ধরা হত। শহরের জীবন গ্রামের জীবন থেকে যে ক্ষেত্রে ভিন্ন ছিল, তা হল শহরে পূজা-পাঠের স্বল্পতা। মফঃস্বল অঞ্চলে মেয়েদের প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মকর্ম যে কতটা অংশ জুড়ে ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় গত শতকের দু-একটি স্মৃতিচারণমূলক রচনায়। ময়মনসিংহ জেলার জমিদার বাড়ির মেয়ে হেমন্তবালার (১৮৯৪—১৯৭৬) বিবাহ হয়েছিল রঙপুর জেলার আর এক ভূম্যাধিকারী পরিবারে। দেশের বাড়ির বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন : 'কর্ত্রীরা বারব্রত, উৎসব পার্বণ দেবসেবা এবং নিত্যপূজাহ্নিক ছাড়া কথকতা, যাত্রাগান, মনসামঙ্গল প্রভৃতি প্রসঙ্গে চিত্তবিনোদন করতেন। সংসারধর্ম তো আছেই। পুত্রকন্যার লালন-পালন, দশকর্ম, জামাইষষ্ঠী, ভাই দ্বিতীয়া, স্বর্গীয়গণের শ্রাদ্ধ শান্তি। ছিল পাপ পুণ্যে ভরা সংসার।'[৯৩] নির্ত্যকর্মের তালিকাটি পড়লেই বোঝা যায় এ কোন শহুরে কর্ত্রীর কথা নয়। শহরেও উৎসব-পার্বণ ছিল, এমনকি, দেবসেবাও (যদিও গ্রামের মত ব্যাপক নয়)। কিন্তু 'চিত্তবিনোদনের' মাধ্যম হিসেবে যাত্রাগান, মনসামঙ্গল বা কথকতার স্থান গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শহরাঞ্চলে, বিশেষতঃ কলকাতায় সঙ্কীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। গ্রামে কিন্তু ধর্মকর্মের ধারাটি দীর্ঘদিন অব্যাহত ছিল।

শতাব্দীর শেষ লগ্নে জন্মে হেমন্তবালা দেবী গ্রামের জীবনে যা লক্ষ করেছিলেন, পঞ্চাশ বছর আগেও গ্রামের জীবন অনেকটা একই রকম ছিল। নবীনচন্দ্র সেন (জন্ম, ১৮৪৬) তাঁর আত্মজীবনীর 'পর্ব্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ' অংশে ছেলেবেলায় গ্রামে মেয়েদের

কথকতা, পাঠ প্রভৃতিতে অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করেছিলেন। নবীনচন্দ্র সেন লিখেছিলেন যে শ্রাবণ মাসে প্রত্যেক ভদ্রগৃহস্থের বাড়িতে মনসার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হত, সন্ধ্যার সময়ে সমস্ত গ্রাম মনসা-পুঁথি পাঠের শব্দে মুখর হয়ে উঠত। আর সারা বছর অপরাহ্নে ও সন্ধ্যায় বাড়ি বাড়ি রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কণ পাঠ হত। সে সব অনুষ্ঠানে সব বয়সের মেয়েরাই যোগ দিত।[৯৪]

শহুরে মেয়েদের শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ বেশি ছিল বলে তাদের দৈনন্দিনতার মধ্যে অলক্ষিতে সামান্য পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। এবং এই পরিবর্তন মূলতঃ সীমাবদ্ধ ছিল তাদের ধর্মকর্মের জীবনেই। গৃহস্থালির অন্যান্য দিকগুলি অনেকটা একই রকম ছিল। শহুরে মেয়েদের জীবনে অন্তঃপুরই বিচরণের ক্ষেত্র ছিল এবং সমস্ত সাংসারিক কাজকর্মই তাদের অন্দরমহলে থেকে করতে হত। রবীন্দ্রনাথ *ছেলেবেলা* গ্রন্থে লিখেছিলেন যে মেয়েরা বাড়ির বাইরে যেত 'পাল্কির হাঁপ-ধরানো অন্ধকারে' আর, 'পার্বণের দিনে গিন্নিকে পাল্কিসুদ্ধ গঙ্গায় ডুবিয়ে আনা' হত।[৯৫] আবার, হেমন্তবালা দেবীও কলকাতার জীবন সম্বন্ধে ছবি এঁকেছিলেন : 'শৈশবে ও বাল্যকালে আমরা চিকের আড়ালেই থাকতাম, প্রতিবেশীর সঙ্গে পরিচয় রাখিনি। বন্ধ পাল্কী নদীর জলে ডুবিয়ে আমার মাকে স্নান করানো হোল। . . . মাঝে মাঝে বাবার সঙ্গে গড়ের মাঠে গিয়েছি, বাবা নেমে যেতেন, আমি গাড়িতেই থাকতাম।'[৯৬] পাশাপাশি দুটো বর্ণনাকে রেখে পড়লে বোঝা যায় যে গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ত্রিশ-চল্লিশ বছরের পার্থক্যেও অন্তঃপুরের অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু গ্রামের মেয়েরা শহরের মেয়েদের তুলনায় বেশি বাড়ির বাইরে যেতে পারত। তারা পুকুরে জল আনতে যেত, ঘাটে কাপড় কাচতে যেত। শহরের মেয়েদের সে সুযোগ ছিল না। এছাড়া পার্থক্যের জায়গা ছিল ধর্মকর্ম। ধর্মকর্মের জীবনে যে কতটা পার্থক্য ছিল, তা বোঝা যায় হেমন্তবালা দেবীই যখন গৌরীপুরের বাসায় তাঁর জীবনযাপনের বর্ণনা দেন : 'গৌরীপুরে থাকতে মা ভোর বেলায় জাগিয়ে দিতেন, শয্যায় শুয়ে শুয়ে বিভিন্ন দেবদেবীর স্তব পাঠ করতে হোত। . . . প্রাতঃকৃত্যের পর কাপড় ছেড়ে একটা ছোট তামার কলসী করে ইদারা থেকে জল তুলে মায়ের তৎকালীন হবিষ্যঘরের তালা খুলে ঘর ঝাঁট দেওয়া, তারপরে জল ছিটিয়ে ঘর ঝাঁট দেওয়া . . .। তারপর চাল ভিজানো, চন্দন ঘষা, সজ নৈবেদ্য [পূজার সজ্জা] করা, দূর্ব্বো বেলপাতা গুছিয়ে রাখা, . . . তারপরেই পুণ্যিপুকুর প্রভৃতি ব্রতপূজা।'[৯৭] শহরের মেয়েদের গৃহস্থালিতে পুজোর এত বিস্তৃত আয়োজন থাকত না। এর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল গ্রামের সঙ্গে শহরের পরিবেশগত পার্থক্য। গ্রামে ধর্মকর্মের জন্য যে বিস্তৃত আয়োজন করা সম্ভব, শহরে তার সুযোগ ছিল না। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারের ফলে মেয়েদের মানসিকতাও কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছিল। শহরের মেয়েদের গৃহস্থালিতে পূজা-পাঠ যে ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছিল, তা সমসাময়িক বিভিন্ন রচনা থেকে অনুমান করা সম্ভব।

বিগত কালের একটি বিখ্যাত মেয়েদের পত্রিকা অভিযোগ করেছিল যে 'প্রাচীন শ্রেণীর মহিলাদিগের সকল কার্য্যে ধর্ম্মের সঙ্গে যোগ, ইহাদের [নব্য শ্রেণীর মহিলাদের] ধর্ম্মের সঙ্গে বিয়োগ।'[৯৮] নব্য-শিক্ষিতা মেয়েরা যে পুজো, আহ্নিক ইত্যাদি করে না এ নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অনেকেই বোধহয় চিন্তিত ছিলেন। শিক্ষিতা মেয়েদের সম্বন্ধে অনেকে বলতেন যে তারা ঘরের কাজ আদৌ করে না, আর, যারা এতদূর

অভিযোগ করতেন না, তারাও এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে প্রাচীন রমণীদের 'যুবতী কন্যা ও বধূদিগের নিত্যকার্য্য সাধারণতঃ মাতা ও শ্বশ্রূমাতার তুল্য কেবল তাঁহারা পূজার্চ্চনা ব্রতোপবাসাদির বড় ধার ধারেন না, রামায়ণ মহাভারতাদি শুনিতে ভালবাসেন না। এই শ্রেণীর কন্যাগণ স্বামীর বা অন্য আত্মীয়ের প্রদত্ত নাটক উপন্যাসাদি পুস্তক আদরে পাঠ করেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম কর্ম্মে বিশেষ মতি নাই, তাঁহাদিগের কুসংস্কার বড় নাই।'[৯৯] ধর্মকর্মের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করার জন্য গত শতকের বিভিন্ন লেখাপত্রে প্রাচীনা ও নবীনাদের জীবনযাপন পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা করা হত। মেয়েদের শিক্ষা প্রণালীর দোষেই যে তারা আর ধর্মকর্মে উৎসাহী নয়- এ অভিযোগও[১০০] বারবার করা হয়েছিল। এমনও অভিযোগ করা হয়েছিল যে 'নব্য শ্রেণীর হিন্দু মহিলারা' আসলে 'নামে মাত্র হিন্দু'। কারণ, 'তাঁহাদের রীতি নীতি আচার ব্যবহার হিন্দুর মত নহে, তাঁহারা হিন্দুয়ানীর [তদেব] প্রায় কোন ধার ধারেন না, পূজার্চ্চনা ধর্ম্ম কর্ম্ম বড় মানেন না। কেবল পুত্র কন্যার বিবাহের সময় হিন্দু পুরোহিতকে মন্ত্র পড়াইবার জন্য আহ্বান করা হয়, বিবাহ সভায় শালগ্রাম ঠাকুর স্থাপিত হইয়া থাকে, কন্যা হিন্দু দেবদেবীর নামে মন্ত্রাদি উচ্চারণ করেন, এই পর্য্যন্ত হিন্দুয়ানীর [তদেব] সঙ্গে তাঁহাদের সম্পর্ক।'[১০১] প্রাচীনাদের সঙ্গে নবীনাদের তুলনা, অভিযোগের ভাষা, নব্য শ্রেণীর মহিলাগণ বা অধুনা শিক্ষিতা স্ত্রীজাতি প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখে মনে হয় যে এই অভিযোগগুলি করতেন প্রবীণ-প্রবীণারা। এঁদের অনেকেরই শৈশব অতিবাহিত হয়েছিল গ্রামে এবং সেই সময়ে তারা যা যা করেছিলেন, পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে ব্যত্যয় দেখে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন স্ত্রীশিক্ষাকে। দেবসেবায় শৈথিল্যের মধ্যে তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন 'বিদ্রোহে'র গন্ধ, তুলেছিলেন 'গেল গেল' রব।

॥ তিন ॥

মেয়েদের ঘর গেরস্থালির বিভিন্ন কাজের মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল সন্তানপালন। সন্তানপালনের ওপর গত শতকে প্রকাশিত রচনার পরিমাণ থেকে বোঝা যায় এ বিষয়টির প্রতি তৎকালীন সমাজের মনোভাব কী ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মেয়েদের মাসিক পত্রিকা *বামাবোধিনী পত্রিকার* প্রথম সংখ্যায় এই পত্রিকায় লেখ্য বিষয়ের যে তালিকা দেওয়া হয়েছিল, তার অন্যতম ছিল 'শিশুপালন'[১০২] এবং অন্যান্য বহু পত্রিকাতেও এ বিষয়টির ওপর একটি নিয়মিত বিভাগ থাকত।

এইসব পত্রপত্রিকায় মাতৃত্বের মহত্ব, সন্তানপালনের আবশ্যকতা প্রভৃতি নিয়ে বহু লেখা হয়েছিল। বনলতা দেবী লিখেছিলেন : 'মাতৃভাবই রমণীর দেবত্ব। সন্তানপালন রমণীর জীবনের সর্ব্ব প্রধান মহৎ কার্য্য। রমণী-হৃদয়ের যত সৌন্দর্য্য যত মহত্ত্ব আছে তাহা এই কার্য্যে পরিস্ফুট হয়। সন্তান পালনের ন্যায় গুরুতর কর্ত্তব্য আর নাই। এই কর্ত্তব্যভার বহন করিতে হইলে সংকল্প, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও বিশেষ চিন্তার আবশ্যক। . . . প্রত্যেক রমনী যদি জননী পদে অধিষ্ঠিত হইয়াও জননীর কর্ত্তব্য—এই সন্তানপালন সুচারুরূপে পালন করিতে চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে তিনি পারিবারিক প্রধান কর্ত্তব্য অবহেলা করেন এবং সমাজের মহা অনিষ্ট সাধন করেন।'[১০৩] কলকাতা থেকে জনৈকা

'শ্রীমতী চ'—লিখেছিলেন যে সন্তানপালন মেয়েদের প্রধান কর্তব্য। এই কাজ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে করা উচিত এবং শিশুদের আহারের দায়িত্ব দাস-দাসীদের হাতে অর্পণ করা উচিত নয় এবং সন্তানের দৈহিক পুষ্টির সঙ্গে তার মানসিক বৃত্তিগুলির বিকাশের দিকেও মাতার দৃষ্টি দেওয়া উচিত।[১০৪] *বামাবোধিনী পত্রিকায়* মন্তব্য করা হয়েছিল : 'মানুষের সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্ব প্রধান শিক্ষয়িত্রী মাতা। বিদ্যালয় লভ্য শিক্ষার সুফল যতই হউক না কেন, মাতৃক্রোড়ে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতেই মনুষ্যের চরিত্র প্রধানতঃ গঠিত হয়।'[১০৫]

আসলে নারীকে পরিবারের কর্ত্রীত্ব বা মাতৃত্বের মর্যাদা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই মর্যাদার দায়িত্বভার নিরূপণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। আগেই আলোচনা করা হয়েছে[১০৬] যে গত শতাব্দীতে মেয়েদের কর্মসীমা পারিবারিক ক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখার জন্য পারিবারিক কাজগুলির গৌরব অনেক বেশি করে ব্যাখ্যাত হতে শুরু করেছিল। মাতৃত্ব ও সন্তানপালনও ছিল এই ধরনের একটি বিষয়।

মাতৃত্বের গুরু দায়িত্ব মেয়েরা আবহমান কাল ধরে পালন করে এসেছে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিভিন্ন রচনায় মেয়েদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে তোলার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজকর্তারা সামাজিক বিধিব্যবস্থায় যে পরিবর্তন আশঙ্কা করেছিলেন, সেই মানসিকতা থেকেই বোধহয় সন্তান-পালন সংক্রান্ত লেখাগুলিও রচিত হয়েছিল। একটা ভয় দেখা দিয়েছিল যে মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে আর মা হতে চাইবে না। এই মনোভাব স্পষ্ট বোঝা যায় অমৃতলাল বসুর *বৌমা* প্রহসনে কিশোরীর কথায়। এই প্রহসনে শিক্ষিতা কিশোরী তার প্রতিবেশী বৃদ্ধ মতিলালকে বলছে : 'আপনি কি জানেন না যে সন্তান হওয়া কত বড় কুরুচি, কি ভয়ঙ্কর অশ্লীল। যদিও কমলের [বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নায়িকা] একটি ছেলে হয়েছিল বটে, কিন্তু বলেছি তো কমল উপনায়িকা মাত্র, আর সেও ছেলের সঙ্গে স্বামীর উদ্দেশ্যে দুটো প্রণয়ের কথা হয়েছিল বইতো নয়। কিন্তু আমি হচ্ছি আসল নায়িকা, আমার কখন সন্তান হতেই পারে না।'[১০৭] শিক্ষিতা মেয়েদের বিদ্রূপ করার জন্য রচিত হলেও এর পেছনে যে ভয়ের ভাবটা কাজ করছিল, তা অলক্ষ্য থাকে না। সন্তানপালন ঘরেব কাজের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং সন্তানপালনের ওপর এত বিশদ আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল মেয়েদের এই কাজের গুরুত্ব আরও ভালভাবে উপলব্ধি করতে শেখানো।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মেয়েরা মা হত সাধারণতঃ তেরো থেকে সতেরো বছর বয়সের মধ্যে।[১০৮] অনেকে আবার এই বয়সের মধ্যে একাধিক সন্তানেরও জননী হয়ে যেত। ফলে, সাংসারিক সমস্ত কাজের ওপর এসে চাপত মাতৃত্বের দায়িত্ব। এর অনিবার্য পরিণতি ছিল অল্প বয়সে স্বাস্থ্যহানি। মেয়েদের সম্বন্ধে বাংলায় প্রচলিত একটি প্রবাদ 'কুড়িতেই বুড়ি'র একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যায় অল্প বয়সে বহু সন্তানের মাতা হওয়ার মধ্যে। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'স্ত্রীলোকের রূপ' প্রবন্ধের একটি বাক্য থেকেও উনিশ শতকের বাংলায় মেয়েদের যৌবনোদ্‌গমেই গতশ্রী হওয়ার সাক্ষ্য মেলে : 'কিন্তু রূপান্ধ ভামিনীগণ। তোমাদিগের যৌবন কতক্ষণ থাকে? জোয়ারের জলের মতই আসিতে আসিতে যায়।'[১০৯] অল্প বয়সে মাতৃত্বের ফলে মেয়েদের শুধু যে স্বাস্থ্যোবনতি ঘটত, তাই-ই নয়। জনৈক 'হিন্দু মহিলা' লিখেছিলেন যে অল্প বয়সে মা হওয়ার দরুন গৃহস্থ

ঘরের বউ-ঝিদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা একেবারেই লোপ পেয়েছিল, এমনকি, 'ছেলে ছাড়ে না' বলে তারা চুল বাঁধবারও সময় পেত না।[১১০] বিবাহের মতই মাতৃত্বও মেয়েদের জীবনে ও জীবনযাত্রায় সব দিক দিয়ে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করত।

উনবিংশ শতাব্দীর একটা আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে, যে স্ত্রীশিক্ষার ফল নিয়ে গত শতকের সমাজ-জীবনে এত আলোড়ন উঠেছিল, যে স্ত্রীশিক্ষা সামাজিক বহু আধি-ব্যাধির কারণ বলে নির্দেশিত হত, সন্তানপালনের স্বার্থে সেই শিক্ষারও উপযোগিতা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। আসলে, স্ত্রীশিক্ষাকে অনেকেই ভয় পেতেন, আবার, সেই স্ত্রীশিক্ষা ছাড়া যে উনবিংশ শতাব্দীর পরিবর্তিত ধারণা অনুযায়ী সন্তানপালন সম্ভব নয়, এটাও অনেকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। গত শতকের বাংলাদেশের সমাজমনস্ক ব্যক্তিদের মধ্যে এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে এক ধরনের টানাপোড়েন লক্ষ করা যায়। হেমাঙ্গিনী চৌধুরী সুষ্ঠুভাবে সন্তানপালনের জন্য মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লিখেছিলেন: 'এখন যাঁহারা বালিকা, আর কতিপয় বৎসর পরে তাঁহারাই জননী হইবেন। কি প্রকারে শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হয়, কিরূপে নৈতিক উন্নতি হয় এবং শৈশবে কী প্রকারে শিক্ষা দিলে শিশু পরে সত্যপ্রিয় বা সুপ্রকৃতিবিশিষ্ট হইবে, এইসব উত্তমরূপে শিখিতে ও বুঝিতে হইলে লেখাপড়া শিক্ষার নিতান্ত দরকার। মাতার অজ্ঞতাহেতু যে আমাদের দেশে অনেক শিশুই অকালে যমালয়ে প্রেরিত হইয়া থাকে, ইহা বিজ্ঞ বুদ্ধিমান ব্যক্তি কদাচ অস্বীকার করেন না।'[১১১]

উনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন লেখায় শিশুর শিক্ষার জন্য মায়ের দায়িত্বের উপর গুরুত্ব দেওয়া হত। সন্তানের শুভাশুভ নির্ভর করছে তার প্রাথমিক শিক্ষার ওপর এবং শিশুর প্রথম শিক্ষাদাত্রী হিসেবে মাতার কর্তব্য ছিল শিশুকে সৎপথে চালিত করা। বলা হত, মা তার 'স্নেহমাখা হৃদয়স্পর্শী উপায়দ্বারা শিশুকে যে শিক্ষা দিতে পারেন, বই পড়ে বা "উপদেশগর্ভ বক্তৃতা" শুনে তার সামান্য অংশও পাওয়া সম্ভব হয় না।'[১১২] এই শিক্ষা যে কত ছোট বয়স থেকে আরম্ভ করতে হবে বলে সে যুগের ব্যক্তিরা মনে করতেন তার কিছু আঁচ পাওয়া যায় *বামাবোধিনী পত্রিকায়* প্রকাশিত 'স্ত্রী গণের ধর্ম্মহীন শিক্ষা সমুচিত কি না' প্রবন্ধটি থেকে।[১১৩]

সন্তানপালনের পূর্বাবস্থা হিসেবে প্রসবকালীন সাবধানতা অবলম্বনের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করা হত। সন্তানের নিরাময় স্বাস্থ্যের জন্য প্রসূতি মাতার স্বাস্থ্য নীরোগ ও সন্তানের জন্ম নির্বিঘ্নে হওয়া জরুরি ছিল।[১১৪] অতএব প্রসূতির সুস্বাস্থ্যের ওপর বিভিন্ন লেখাপত্র মূলতঃ সন্তানপালনের ওপর চিন্তাভাবনার আনুষঙ্গিক অঙ্গ। উনবিংশ শতাব্দীতে হয়ত এর প্রয়োজনীয়তাও ছিল। কারণ, তখন সাধারণ বাঙালি ঘরের অনেকেরই শিশুর জন্ম বিষয়ে খুব সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। প্রসব করানোর জন্য সে যুগে 'ধাই' পাওয়া যেত, কিন্তু গৃহবধূরা একটু বর্ষীয়সী না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে অনভিজ্ঞা থেকে যেত। ধাত্রীবিদ্যা বিষয়ে মেয়েরা যে সাধারণভাবে কত অনভিজ্ঞা হত, তার কিছু আন্দাজ পাওয়া যায় জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর 'স্মৃতিকথা' থেকে। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর ননদ স্বর্ণকুমারী দেবী অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কাছে পুণায় গিয়েছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনী লিখছেন: 'আমি তখন ছেলে পিলে [তদেব] হবার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বুঝতুম না, আমার স্বামীও ধাত্রী প্রভৃতির কোন ব্যবস্থা করেননি, পূর্বেই বলেছি তিনি

সংসারানভিজ্ঞ ছিলেন। একদিন আমরা দুজনে নদীতে স্নান করে ঘরে ফেরবার পর স্বর্ণ বলেন তাঁর অস্বস্তি করছে। আমি পেটে তেল মালিশ করতে লাগলুম,—তারপর একটা কালো মাথা দেখে ধড়মড় করে লাফিয়ে উঠে পড়ি কি মরি একেবারে চাকরদের ঘরে ছুটে গিয়ে তাদের একজনের বুড়ী মাকে ধরে নিয়ে এলুম।'[১১৫]

গর্ভবতী অবস্থায় মেয়েদের পালনীয় নিয়ম ও প্রসবকালীন সাবধানতা প্রসঙ্গে গত শতকের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় খুব বিশদভাবে আলোচনা হত, ধাত্রীবিদ্যা ও শিশুপালনের ওপর নিয়মিত পুস্তকও প্রকাশিত হত। এ থেকে অনুমান করা যায় যে উনবিংশ শতাব্দীতে এ বিষয়টি কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মেয়েদের পোষাক, খাদ্য, বায়ু সেবন, পরিশ্রম প্রভৃতি প্রতিটি বিষয় পৃথকভাবে আলোচিত হত।[১১৬] এই সঙ্গে আলোচিত হত গর্ভধারণের বিভিন্ন লক্ষণের বর্ণনা। এর মধ্যে বিবমিষা, লাল নিঃসরণ, দুগ্ধ নিঃসরণ, বর্ধিত উদর, ভ্রূণ সঞ্চার, আকর্ণন ও জরায়ু পরিবর্তন প্রভৃতি লক্ষণগুলি উল্লিখিত হলেও, গর্ভের বিশেষ লক্ষণ হিসেবে একটি লক্ষণের উল্লেখ করা হয়নি। কারণ, বলা হয়েছিল 'যে এই লক্ষণটি 'স্ত্রীলোকেরা পাঠ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন'।[১১৭]

ঠিক কোন লক্ষণটির বর্ণনা পাঠ করতে মেয়েরা কুণ্ঠিত হতে পারে বলে *বামাবোধিনী পত্রিকার* পরিচালকেরা মনে করেছিলেন, তা বোঝার উপায় নেই। তবে উনবিংশ শতাব্দীতে স্ত্রীরোগ বা প্রসব সংক্রান্ত বিভিন্ন লেখায় মেয়েদের শারীরিক অবস্থা যথেষ্ট খোলাখুলি ও অনাসক্তভাবে বর্ণিত হত। এমনকি, *বামাবোধিনী পত্রিকাতেও*। *অবলা-বান্ধব* পত্রিকা ধাত্রী-বিদ্যার ওপর রচিত একটি বইয়ের প্রশংসা করে লিখেছিল যে বাঙালি মেয়েরা এই বইটি পড়লে 'মহোপকার লাভ করতে পারিবেন'।[১১৮] এ থেকে আমরা গত শতকের শেষার্ধে এক পরিবর্তিত মানসিকতার পরিচয় পাই। এ বিষয়গুলি যে মেয়েদের পাঠের উপযুক্ত এবং এগুলি আলোচনার মধ্যে যে সঙ্কোচের কোন কারণ নেই, দু-একটি ব্যতিক্রম সত্ত্বেও এই ধারণা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। এই মানসিকতা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয় ছাড়া সম্ভব ছিল না।

গর্ভধারণ ও প্রসব সংক্রান্ত বিভিন্ন লেখার মধ্যে প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়গুলি ছিল গর্ভাবস্থায় মেয়েদের পথ্য, দোহদ (সাধ ভক্ষণ অনুষ্ঠান), স্নান, বস্ত্র, অঙ্গচালন, পরিশ্রম, মানসিক উত্তেজনা, কোষ্ঠবদ্ধতা, স্তন এবং চুচুক, গর্ভস্রাব নিবারণের উপায়'প্রভৃতি।[১১৯] গর্ভধারণ থেকে প্রসব পর্যন্ত প্রতিটি স্তরের ওপর বিশদ আলোচনা করা হত। কখন প্রসব বেদনা হয়, তার লক্ষণ কী কী ও সেই সময়ে পালনীয় নিয়মের যেমন বিশদ আলোচনা হত,[১২০] সে রকম প্রসূতিকে পরীক্ষা করার খুঁটিনাটিও বাদ যেত না।[১২১] প্রসূতির বস্তিদেশের তলায় কীভাবে 'অয়েলক্লথ' পাততে হবে, কীভাবে জরায়ুর মুখ পরীক্ষা করতে হবে বা শিশুর মাথা জননেন্দ্রিয়ের ওপর দিয়ে এলে কীভাবে প্রসবদ্বার রক্ষা করতে হবে[১২৩]—এগুলি এতদিন ছিল ধাত্রীদের জ্ঞাতব্য বিষয়। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই বিষয়গুলি সাধারণ মেয়েদের পক্ষেও জানা আবশ্যক বলে বিবেচিত হতে লাগল যাতে ধাত্রী ডাকার আগেই তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে (জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর যেমন হয়েছিল)। তাছাড়া, ধাত্রীরা প্রসবের সময়ে চিরাচরিত রীতি অনুসরণ করত এবং জটিলতা দেখা দিলে তাদের নির্দেশিত ব্যবস্থাদি সব সময়ে গত শতকের শেষার্ধের 'আধুনিক' বিজ্ঞানানুগ হত না। যে বিষয়গুলির সঙ্গে ধাত্রীদের কোন পরিচয়ই ছিল না,

সেগুলির বৈজ্ঞানিক আলোচনা হত—যেমন, অস্ত্রপ্রচারের সাহায্যে প্রসব বা অস্বাভাবিক প্রসব।[১২৪] কিম্বা, জরায়ু থেকে 'ফুল' নির্গমনের প্রণালী।[১২৫] এই বর্ণনাগুলি পড়লে বোঝা যায় যে গত শতাব্দীতে কীভাবে ধীরে ধীরে শিক্ষিত বাঙালি সমাজে বৈজ্ঞানিক চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল।

প্রসবকালীন পালনীয় স্বাস্থ্যবিধির সঙ্গে আরও যে একটি বিষয় গত শতকের শিক্ষিত ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তা হল সূতিকাগারের অবস্থা। চিরাচরিত বাঙালি সমাজে প্রত্যেক বাড়িতেই সন্তানের জন্মের জন্য একটি সুতিকাগার নির্মিত হত। সাধারণতঃ এই ঘরগুলি হত অত্যন্ত ছোট, সবচেয়ে বেশি অবহেলিত এবং অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সন্তানের জন্ম হত। এটা কেবল দরিদ্র পরিবারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল না, উচ্চবিত্ত বাড়ির অবস্থাও প্রায় একই ছিল। গত শতকের বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক ও বাগ্মী কিশোরীচাঁদ মিত্রের স্ত্রী কৈলাসবাসিনী দেবী লিখেছিলেন : 'আমাদের জে শূতিকাগার তাহা এক প্রকার গারোদ ঘর। জদিও আমি বড় নকের কন্যা, বড় নকের বৈউ, বড় নকের স্ত্রী তথাপি সেই সামান্য নকের মত থাকিতে হইবে। নামোর ঘর জল উঠিতেছে, তার উপর দরমা মাদুর কম্বল পাড়া একটি বালিস এই বিচানার সঙ্গে। খাওযা ঝাল ও চিঁড়া ভাজা। ধোপা নাপিত বন্দ। পোয়াতির এই দুরাবোস্থা। ওদিকে দাই নাপিত বাজোনদার হিঝিরে অবাবিরদার। কিন্তু পআতিকে জে বিছেনা দিলে ফেলা জাবে সেইটে বড় বাজে খরচ।... এই অবোস্থা তাহাতে এক মাস কিছু ছুঁতে পাবে না, ঘরে আসিতে পাবে না।'[১২৬] (মূল রচনার বানান অপরিবর্তিত)। রামকৃষ্ণ পরমহংস যে জন্মের পরমুহূর্তেই ধান সিদ্ধ করার জন্য রক্ষিত চুল্লির মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন, সেটা সম্ভব হয়েছিল এই কারণে যে, রামকৃষ্ণের মা চন্দ্রাদেবীর প্রসবের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল একটা চালাঘর যেখানে ছিল ধান কুটবার জন্য একটা ঢেঁকি ও ধান সিদ্ধ করার জন্য একটা উনুন।[১২৭] সাধারণতঃ বাঙালি পরিবারের সূতিকাঘর এ রকম অস্বাস্থ্যকরই হত। স্বদেশি আন্দোলনের অন্যতম নেতা কৃষ্ণকুমার মিত্র লিখেছিলেন যে আগে বাড়ির ভাল ঘরকেই সূতিকাগার হিসেবে ব্যবহার করা হত। পরে মেয়েদের মধ্যে এক 'কুসংস্কার' দেখা দেয় যে যে ঘরে সন্তানের জন্ম হয়, তা অশুচি হয়ে যায়। কৃষ্ণকুমার মিত্রের জন্মের সময় ঘরের মধ্যে একটা 'ছনের' ঘর তৈরি করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে, এই কুসংস্কার যখন গভীর হল, তখন অন্তঃপুরের মধ্যে একটা চালা তৈরি হত। তার একটাই দরজা। দিনরাত আগুন জ্বালিয়ে রাখা হত, ধোঁয়া বের হওয়ারও পথ থাকত না। সেটাই সূতিকাগার হিসাবে ব্যবহৃত হত।[১২৮] জগচ্চন্দ্র মজুমদার লিখেছিলেন যে সূতিকাগারগুলি 'শমনভবনের দমন নিমিত্ত, বা কারাগারকে লজ্জা দিবার জন্য সজ্জা করিয়া আছে।'[১২৯] গ্রামাঞ্চলে এই সূতিকাগারগুলি নির্মিত হত প্রসবের কয়েকদিন আগে, স্থান হিসেবে বেছে নেওয়া হত প্রশস্ত প্রাঙ্গনের একদম শেষপ্রান্ত কিংবা আচমনের জায়গার নিকটবর্তী কোন স্থান : 'ইহা অতি খর্ব্ব, অনুচ্চ এবং এরূপে তালপত্র দ্বারা আচ্ছাদিত ও বেষ্টিত হয়, যে অতি কষ্টেই ঐ গৃহবাসী লোকেরা রৌদ্র এবং বৃষ্টি হইতে রক্ষিত হয়েন। প্রবেশদ্বার ভিন্ন ইহাতে বায়ু গমনাগমনের আর উপায় থাকে না, এবং ইহার মেজে এরূপ নিম্ন ও আর্দ্র যে স্বাভাবিক অবস্থাতেও একরাত্রি উহাতে শয়ন করিলে বিলক্ষণ ছর্দ্দি [তদেব] হইবার সম্ভাবনা। সহর অঞ্চলের গৃহস্থের বাটীতে প্রশস্ত

প্রাঙ্গনাভাবে পূরীষগৃহ, রন্ধনশালা বা বৃহৎ নর্দমার নিকটবর্তী এক কদর্য্য নিম্নগৃহ সূতিকাগৃহ রূপে নির্দিষ্ট হয়।'[১৩০] এরকম দুর্গন্ধময় স্থানে[১৩১] প্রসবের পর সাধারণত দু-তিন সপ্তাহ আগুন জ্বালিয়ে রাখা হত, সকালে ও বিকেলে ঐ ঘর ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে যেত এবং প্রসূতির শয্যা পাতা হত দরমার ওপর পাতা মাদুরে। বালিশের জন্য ব্যবহৃত হত ইট।[১৩২]

খুব স্বাভাবিক কারণেই প্রসবকালীন অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সূতিকাগারের অবস্থাও পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। সূতিকাগারের উন্নতি ছিল প্রসূতির সুস্বাস্থ্যর অপরিহার্য শর্ত। সূতিকাগারের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য প্রসূতির ও নবজাত শিশুর রোগ হয়, এ সচেতনতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। একটি পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল যে সূতিকাগারের অনিয়মের জন্য নবজাত শিশুর 'পেঁচোয পাওয়া' প্রভৃতি রোগ হয়ে থাকে।[১৩৩] এই কারণে প্রসবের পর মা ও শিশুকে এমন জায়গায় রাখা প্রয়োজন যেখানে বিশুদ্ধ বাতাস পাওয়া যায়।[১৩৪] ডাঃ যদুনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন যে সূতিকাগার সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও খোলামেলা থাকবে, এর মেঝেটি দৈর্ঘ্যে দশ-বারো হাত ও প্রস্থে পাঁচ-ছ হাত হওয়া প্রয়োজনীয়।[১৩৫] বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সূতিকাগারকে প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হয়েছিল। শিবচন্দ্র দেব লিখেছিলেন যে শিশু মাতৃগর্ভে সাধাবণত ৯৮ ডিগ্রি উত্তাপে থাকে। তাই শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পর প্রথম চার-পাঁচ দিন পর্যন্ত সূতিকাগারের উষ্ণতা কম করে ৭০ ডিগ্রি ও তারপর তিন-চার সপ্তাহ পর্যন্ত উত্তাপ ৬৫ ডিগ্রি থাকা উচিত।[১৩৬] এই আদর্শ খুব বেশি ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু গৃহস্থালির বিভিন্ন দিক যে সে যুগের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সুষ্ঠু প্রসবের মত আরও একটি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হত—সন্তানপালন পদ্ধতি। বাঙালি গৃহে সন্তানপালন পদ্ধতি যে ত্রুটিপূর্ণ, এমন অভিযোগ অনেকেই করতেন : 'সন্তান পালন করা বড় কঠিন। কিন্তু এখনও যে সমস্ত বঙ্গদেশের নরনারীরা এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন, এখনও যে তাহাদের কিছু মাত্র আলস্য বা অসাবধানতা নাই—ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না।'[১৩৭] অপর এক প্রবন্ধকার সন্তানপালনের কদর্য রীতির জন্য মূলতঃ দায়ী করেছিলেন মায়েদের সুশিক্ষার অভাবকে : তাঁর মতে, এই অশিক্ষার জন্য সন্তানের কেবল শরীরই নয়, 'শরীর মন ও আত্মা এ তিনেরই সুমহৎ অমঙ্গল সংঘটিত হইতেছে'।[১৩৮]

শিশুকে যত্ন করে পালন করতে হবে, শুধু এটুকুই বলে ছেড়ে দেওয়া হত না। যত্ন করে পালন করার জন্য করণীয় কাজেরও বিশদ আলোচনা করা হত। সন্তানকে ঠিকমত পালন করার জন্য গর্ভাবস্থা থেকেই মায়ের সাবধানতার ওপর জোর দেওয়া হত। বিশ্বাস করা হত যে মায়ের দোষেই সন্তান রুগ্ন হয়।[১৩৯] গর্ভাবস্থায় মেয়েদের জন্য সুপারিশ করা হত সহজে পরিপাকযোগ পুষ্টিকর খাবার।[১৪০] এছাড়া, ভাবী সন্তানের নির্মল চরিত্রের জন্য গর্ভবতী নারীর শান্ত চিত্ত ও সুস্থির স্বভাব হওয়ার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করা হত।[১৪১]

জন্মের পর শিশুর পরিচর্যার একদম গোড়াতেই প্রয়োজনীয় ছিল তার খাদ্য নির্বাচন। শিশুর প্রথম খাদ্য হিসেবে মাতৃদুগ্ধের শ্রেষ্ঠত্ব ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্বীকৃত হয়েছিল। স্তন্য সঞ্চারের জন্যও শিশুকে মাতৃদুগ্ধ খাওয়ানো উচিত—'প্রসবের পরই সকল প্রসূতির স্তনে

দুগ্ধের সঞ্চার হয় না, এবং বালক স্তন চুষিয়া দুগ্ধ পরিষ্কার করিয়া না লইলে তাহা হইবারও অন্য উপায় নাই।'[১৪২] মাতৃদুগ্ধ প্রথম এক বছর পর্যন্ত সুপারিশ করা হত এবং তার পরিমাণ বয়স অনুসারে কীভাবে পরিবর্তিত হবে, তারও বিশদ নির্দেশ পাওয়া যায়।[১৪৩]

মাতৃদুগ্ধের অভাব হলে ধাত্রীদুগ্ধ দেওয়ার ব্যবস্থা অনুমোদিত হত। ধাত্রী নির্বাচনের জন্যও কতগুলি বিশেষ সতর্কতা গ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হত। এখানে লক্ষণীয়, এই নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধাত্রীর স্বাস্থ্য এবং চরিত্র, দুইই সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হত। *বামাবোধিনী পত্রিকা* সতর্ক করে দিয়েছিল যে স্তন্যদায়িনী ধাত্রী যেন রোগিনী বা দুশ্চরিত্রা না হয়।[১৪৪] রোগিনীর ক্ষেত্রে আপত্তির কারণ সহজেই বোধগম্য। কিন্তু সেই সঙ্গে গত শতকে এটাও মনে করা হত যে স্তন্যদাত্রীর চরিত্রও স্তন্যের মাধ্যমে শিশুর মনে সঞ্চারিত হয়। 'যে সে স্ত্রীলোককে ধাত্রী রাখা উচিত নহে।... ধাত্রীর শরীরের প্রতি যেমন দৃষ্টি রাখা উচিত, চরিত্রের প্রতিও সেইরূপ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। অসচ্চরিত্রা ধাত্রীর দুগ্ধপান করিয়া শিশুদিগের নানা প্রকার পীড়া হয়, ইহা প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে কলিকাতার কোন কোন ভদ্র পরিবারে বেশ্যা দিগকে [তদেব] ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া সন্তানদিগের শরীরকে জন্মের মত নিস্তেজ ও কলুষিত করিয়া ফেলিতেছেন।'[১৪৫] একই মত পোষণ করতেন শিবচন্দ্র দেব। তিনিও রাগি, অতিরিক্ত ভীরু, অপরিমিতাচারী, মিথ্যারাদী, বিশৃঙ্খল, অপরিষ্কার ও 'কুরীতি বিশিষ্ট' স্ত্রীলোককে ধাত্রী হিসাবে নির্বাচন করার বিরোধী ছিলেন। স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে তিনি লিখেছিলেন : 'ঐ প্রকার স্ত্রীর দুগ্ধ বালকের পক্ষে উপকারী নহে বরঞ্চ এমত দেখা গিয়াছে যে দাই অত্যন্ত রাগাসক্ত হইয়া স্তন পান করাইলে শিশুর হাত পা খেচনী রোগ হয় এবং ভেদ ও বমন হইয়া থাকে। অধিকন্তু ঐ প্রকার দাইয়ের মনে নিয়ত শোক বা দুঃখ কিম্বা চিন্তা থাকে তাহাতে তাহার দুগ্ধ শিশুর পক্ষে স্বাস্থ্যকর হয় না, অতএব দাইয়ের মানসিক স্বাস্থ্য ও সৎ স্বভাব নিতান্ত প্রয়োজনীয়।'[১৪৬] ধাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে লক্ষণগুলি ছিল পরিষ্কার ও সরল আকৃতি, উজ্জ্বল ও পুলকিত চোখ, রক্তাভ ভেজা ঠোঁট, শাদা ও শক্ত দাঁত, অক্ষত বোঁটাযুক্ত, কঠিন ও সুগঠিত স্তন, প্রভৃতি।[১৪৭]

ধাত্রীরও যদি দুধের অভাব হয়, তবে সেক্ষেত্রেও বিকল্প ব্যবস্থা ছিল।[১৪৮] শিশুদের পক্ষে নিষিদ্ধ খাদ্যের তালিকায় পাই মাংস বা কোন গুরুপাক দ্রব্য, কাঁচা ফল, বেশি পরিমাণে মাখন আর 'তরল দ্রব্যের' মধ্যে বিশেষভাবে অনুমোদিত হয়েছিল দুধ, 'কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জল,' মধু প্রভৃতি।[১৪৯]

খাওয়ার পরেই আসে শরীর সুস্থ রাখার জন্য শিশুর ব্যায়ামের কথা। শিশুর ব্যায়াম বলতে বোঝান হত অঙ্গচালনা। শিশুকে 'চীৎ করিয়া রাখিলে ও শোয়াইলে যে নিজ হইতে অঙ্গচালনা করে, তাহাই উৎকৃষ্ট অঙ্গচালনা। [শিশু] ৪/৫ মাসের হইলে শরীর ও পদদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া প্রাতে বৈকালে বাহিরে ক্রোড়ে করিয়া ভ্রমণ করা যাইতে পারে।'[১৫০] ব্যায়াম করানোর পদ্ধতি সম্বন্ধেও খুব বিশদ আলোচনা করা হয়েছে গত শতকের মহিলাদের জন্য পত্রিকাগুলিতে। যে কাজ মেয়েরা বহু যুগ ধরে পালন করে আসছিল, তাকে আরও সুচারুরূপে সম্পন্ন করানোর প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হয়েছিল। এমনকি, শিশুকে কীভাবে হাঁটাতে হবে, তারও বিস্তারিত বর্ণনা থাকত।[১৫১]

বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধীয় জ্ঞান কেবলমাত্র পেশাদারি চিকিৎসক নয়, প্রভাবিত করেছিল দৈনন্দিন জীবনে আচরণীয় কর্তব্য-অকর্তব্যের ধারণাকেও। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে মহিলাদের প্রতি যে যে নির্দেশ দেওয়া হত, তার এক বড় অংশ ছিল পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র অনুপ্রাণিত। বিভিন্ন মহিলা-পাঠ্য পত্রিকায় এগুলি প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল এই নবলব্ধ জ্ঞানকে প্রয়োগ করে গৃহস্থালির কাজকে আরও সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে শিক্ষা দেওয়া। সন্তানপালন মায়েরা চিরকালই করে এসেছেন। কিন্তু সন্তানপালন সম্বন্ধে এই সচেতনতা ছিল নতুন। আরও লক্ষণীয়, সন্তানের মানসিক উৎকর্ষের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাও এই যুগে অনুভূত হয়েছিল। মেয়েদের প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে এই ধরনের চিন্তাধারা গৃহস্থালির ইতিহাসে এক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। যেমন, শিশুপালনের ক্ষেত্রে শিশুর শরীর ও মনের ওপর সমান গুরুত্ব আরোপ বা তার জীবনধারায় বৈচিত্র এনে তাকে মানসিক অবসাদের হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার চিন্তা ছিল একেবারেই নতুন।[১৫২] শিশুপালনের ক্ষেত্রে আধুনিকতার সূত্রপাত হিসেবে এই ধরনের চিন্তাভাবনা ভদ্রমহিলাদের অন্তঃপুরেও প্রবেশ করেছিল। তবে, এগুলি লিখিত হত অবস্থাপন্ন ও 'ভদ্রলোক' পরিবারের জন্য। কারণ, অক্ষরজ্ঞানসম্পন্না মহিলা সে যুগে প্রধানতঃ পাওয়া যেত 'ভদ্রলোক'দের বাড়িতেই। আর, এই ধরনের পরিবারের বাইরে কোন মহিলা অক্ষরজ্ঞানসম্পন্না হলেও, তারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে সন্তানপালনের জন্য বই পড়ছে, উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের অনুমান হয়ত কিছুটা কল্পনাশ্রয়ী হযে যাবে। তাছাড়া, *শিশুপালন* গ্রন্থের মুখবন্ধে লেখক শিবচন্দ্র দেব যা লিখেছিলেন, তা থেকেও বোঝা যায় যে এ ধরনের রচনা মূলতঃ কোন শ্রেণীর পাঠিকাদের জন্য প্রকাশিত হত। শিবচন্দ্র দেব লিখেছিলেন : 'I am somewhat encouraged in this undertaking by the circumstance that many of my country-men have already commenced educating their wives and daughters, and that there are few Hindoo families of respectability in Calcutta, some female members of which are not capable of reading books written in their own language.'[১৫৩] সুতরাং যে কোন জায়গার 'ভদ্র' পরিবারের বধূ নয়, কলকাতার ভদ্রমহিলারাই ছিলেন এই ধরনের লেখার প্রধান লক্ষ্য।

কেবল শিশুর মানসিক উৎকর্ষবিধানের প্রতি দৃষ্টি দেওয়াই নয়, আধুনিকতার পদসঞ্চার আমরা লক্ষ করি শিশুর আহারাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশদানের মধ্যেও। এগুলি যে সমাজের এক বিশেষ শ্রেণীর পরিবারের অন্তঃপুরের দৈনন্দিনতায় একটু একটু প্রভাব ফেলতে শুরু করেছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বস্তুতপক্ষে, সন্তানপালন যে লেখার একটি উপজীব্য বিষয় হতে পারে বা এ বিষয়ে যে মহিলাদের শেখানোর কিছু থাকতে পারে, এটাই ছিল গত শতকের পক্ষে যথেষ্ট নতুন চিন্তা। সে যুগের বহু মহিলা-পাঠ্য পত্রিকায় প্রকাশিত হত মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ, শরীরের বিভিন্ন যন্ত্র ও তাদের কার্যধারার সচিত্র বর্ণনা, গর্ভাবস্থায় পালনীয় নিয়মাবলী এবং সন্তানপালনের ওপর বিভিন্ন রচনা।

বঝাতে অসুবিধা হয় না যে এই পরিবর্তিত মানসিকতার মূলে ছিল পাশ্চাত্য

চিকিৎসাবিজ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতা। আমাদের সনাতন বনৌষধি পদ্ধতির শারীরবৃত্ত থেকে যে এটা সম্পূর্ণ পৃথক তা বোঝা যায় মানবদেহের অভ্যন্তরের বিভিন্ন যন্ত্রের বিবরণ ও তাদের ছবি দেখে। শবব্যবচ্ছেদ ভিন্ন এই জ্ঞান সম্ভব ছিল না। সনাতন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার পুরো পদ্ধতিই পৃথক ছিল। গত শতকে প্রকাশিত আয়ুর্বেদীয় মতে রচিত শিশুপালন সংক্রান্ত কোন বইয়ের মূল উপজীব্য বিষয়ের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের তুলনামূলক আলোচনা করলেই এ পার্থক্য পরিস্ফুট হবে। আয়ুর্বেদীয় মতে রচিত *শিশুপালন* গ্রন্থে রজঃস্বলা অবস্থায় মেয়েদের পালনীয় নিয়মের মধ্যে বলা হয়েছিল : 'অশ্রুপাত, নখচ্ছেদন, তৈলাদি মর্দন, অনুলেপন, চক্ষুতে অঞ্জন দেওয়া, স্নান, দিবানিদ্রা, দ্রুতগমন, অতিশয় উচ্চশব্দ শ্রবণ, উচ্চহাস্য করা, অধিককথা বলা, পরিশ্রম, মৃত্তিকা খনন ও বায়ু সেবন রজঃস্বলা স্ত্রীলোকের পক্ষে এ সমস্ত নিষিদ্ধ। এই নিয়মগুলি পালন না করিলে শিশুর বড়ই অনিষ্ট হয়। রজঃস্বলা অবস্থায় ক্রন্দন করিলে শিশুর দৃষ্টি বিকৃত হয, নখচ্ছেদ করিলে কুনখী হয়, তৈলাদি মর্দন করিলে কুষ্ঠ রোগাত্রগ্রস্ত , স্নান ও অনুলেপনে দুঃখশীল, কজ্জল ব্যবহারে অন্ধ, দিবানিদ্রা দ্বারা নিদ্রাশীল, দ্রুতগমনে চঞ্চল, উচ্চশব্দ শ্রবণে বধির, অতি হাস্য করিলে তালু দন্ত ও ওষ্ঠ ও জিহ্বা শ্যামবর্ণ হয়, অধিক কথা বলিলে প্রলাপী, পরিশ্রম ও বায়ু সেবনে উন্মত্ত এবং মৃত্তিকা খনন করিলে স্খলিত [টাকী] হয়।'[১৫৪] এই মতের পাশাপাশি 'আধুনিক' চিকিৎসাবিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গর্ভধারণ ও প্রসবকে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হত। শিশুর জন্ম যে কোন অনৈসর্গিক ঘটনা নয়, গর্ভধারণের মধ্যে যে কোন অলৌকিকত্ব নেই এবং সুষ্ঠুভাবে গৃহস্থালির কাজ সম্পন্ন করার জন্য যে এগুলি সম্বন্ধে মেয়েদের অবহিত হওযা আবশ্যক, এ বিষয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ধীরে ধীরে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অতএব, পশ্চিমি বিজ্ঞানের আলোকে শুধু চিকিৎসাশাস্ত্র নয, সমগ্র মানসিকতারই আমূল পরিবর্তন সাধিত হচ্ছিল। পুরনো অনৈসর্গিকত্বের পরিবর্তে স্থান নিচ্ছিল এই নতুন কার্যকারণ তত্ত্ব। গৃহস্থালির জগতে এর প্রয়োগ সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায় সন্তানপালনের ওপর প্রকাশিত লেখাপত্রে।

সন্তানপালন সংক্রান্ত বিভিন্ন রচনায় মেয়েদের এমন সব শিক্ষা দেওয়া হত যা পড়লেই বোঝা যায় যে লেখকদের সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নিবিড় পরিচয় ছিল। শিক্ষাদানের উদ্দেশে রচিত গত শতকের একটি সংলাপমূলক লেখায় আমরা পড়ি স্বামী স্ত্রীকে বলছে কীভাবে শিশুকে স্নান করানো উচিত। এর মধ্যে 'স্পঞ্জ' ব্যবহারেরও নির্দেশ ছিল।[১৫৫] পড়লেই বোঝা যায় যে সন্তানপালন সংক্রান্ত এইসব লেখা ছিল এ বিষয়ে রচিত পাশ্চাত্য পুস্তক পাঠের ফল।

সন্তানপালন সংক্রান্ত নতুন ধ্যান-ধারণার সঙ্গে যে চিরাচরিত বাঙালি পরিবারে পালিত নিয়ম-নীতির কোন পরিচয় ছিল না, এমন নয়। মাতৃদুগ্ধ ত্যাগ করার পরেই যে শিশুর পক্ষে কঠিন খাদ্য খাওয়া সম্ভব নয়, এটা অবশ্যই বাঙালি পরিবারের পক্ষে কোন নতুন তথ্য ছিল না। তবু এ বিষয়টিরও বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল গত শতকে। মাতৃদুগ্ধের পর কীভাবে কোন খাবার খেতে দিতে হবে, দুধের সঙ্গে কী কী দিতে হবে, চিনি দেওয়া উচিত কি না, প্রভৃতি বিষয়েও সমসাময়িক চিকিৎসকরা বিশদ ও তথ্যবহুল নির্দেশ দিতেন।[১৫৬] মাতৃদুগ্ধ থেকে অন্য আহার্যে

পরিবর্তনের সময়েই নয় শুধু, শিশুর দন্তোদ্‌গমের সময়েও মায়ের কী ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত সে বিষয়েও বিশদ নির্দেশ দেওয়া হত। বলা হত, মাতৃদুগ্ধ ছাড়া যে শিশু অন্য কিছু খায় না, সে দন্তোদ্‌গমের প্রাথমিক পর্ব নির্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হয়, সুতরাং প্রথম অবস্থায় শিশুকে বেশি আহার দেওয়া উচিত নয়।[১৫৭] আর, মাতৃদুগ্ধ ত্যাগের আগেই যদি শিশুর দন্তোদ্‌গম শুরু হয়, তাহলে 'জননীকেও কোন ভারী গুরুপাক দ্রব্য খাইতে না দিয়া সহজ ও স্নিগ্ধ আহার দেওয়া কর্ত্তব্য। ঐরূপ করিলে মাতার স্তনে সন্তানের শারীরিক অবস্থার উপযুক্ত দুগ্ধ হইবে।'[১৫৮]

একেবারে শিশু অবস্থার পরও সন্তানের কীভাবে পালন করতে হবে, সে বিষয়েও বিশদ আলোচনা পাওয়া যায় গত শতকের সন্তানপালন সংক্রান্ত লেখাপত্রে। শিবচন্দ্র দেব দু থেকে পাঁচ-ছ বছরের শিশুদের নিয়ে, ব্যায়াম ও আহারের জন্য দীর্ঘ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিলেন।[১৫৯]

ভিন্ন ভাবে দেখতে গেলে, এত বিস্তৃত নির্দেশাবলীর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পরিবর্তিত ধ্যান-ধারণার সঙ্গে মেয়েদের পরিচিত করিয়ে তাদের জন্য নির্দিষ্ট গৃহস্থালির কাজকে আরও সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন করার শিক্ষা দেওয়া। তাই, সন্তানপালনের ওপর রচিত বিভিন্ন লেখায় সেই সব বিষয়ই প্রধানতঃ আলোচিত হত যেগুলি গত শতকের নতুন জ্ঞানের আলোকে ভিন্ন ভাবে সম্পাদন করা সম্ভব বলে বিবেচিত হত। সন্তানপালনের ওপর বিভিন্ন লেখাপত্রের মধ্যে প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলি ছিল :

(ক) শিশুদের বাইরের বাতাসে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজনীয় কি না। যদি প্রয়োজনীয় হয়, তবে বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য শিশুর বযস ন্যূনপক্ষে কত হওয়া দরকার ?

(খ) অঙ্গচালনার জন্য কোন বিশেষ উপায় গ্রহণ করা উচিত কি না।

(গ) শিশুদের কোলে করে নাচালে বা ওপরে তুলে আদর করলে তাদের কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না।

(ঘ) শিশুদের নিদ্রার স্থান গরম থাকা উচিত কি না।

(ঙ) ঘুমের সময়ে শিশুদের কান চাপড়ালে তাদের কোন ক্ষতি হয় কি না।

(চ) দোলনায় শুইয়ে দোল দিয়ে ঘুম পাড়ানো উচিত কি না।

(ছ) শিশুদের ঘুমের সময়ে মশা-মাছি নিবারণের জন্য তাদের মুখে কোন কাপড় ঢাকা দেওয়া উচিত কি না।

(জ) বেশিক্ষণ নিদ্রা শিশুদের পক্ষে উপকারি না অপকারি, ইত্যাদি।[১৬০]

এই বিষয়গুলি উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ পর্যন্ত কোন সমস্যাই সৃষ্টি করেনি। বাঙালি সমাজে চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে সন্তানপালন করা হত। তার অনেকগুলি প্রধান যৌক্তিকতা নিয়ে গত শতকের শেষ ভাগে নতুন ভাবে চিন্তা ভাবনা শুরু হয়েছিল। এবং ধীরে ধীরে সন্তানপালন সম্বন্ধে এক নতুন রীতি গড়ে উঠেছিল। গৃহস্থালি সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণায় এই সচেতনতা এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছিল। মেয়েদের বাদ দিয়ে সমাজসংস্কার হয় না এবং মেয়েদের জীবনে পরিবর্তন আনতে হলে গৃহস্থালির সংস্কার

প্রয়োজন, এই সচেনততাই ছিল উনিশ শতকের বাঙালি মেয়েদের ঘর-গেরস্থালি সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

॥ চার ॥

রাসসুন্দরী দেবী লিখেছিলেন যে যে-মেয়েরা মাথা নত করে পুরুষদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত, তারাই ছিল সমাজের চোখে লক্ষ্মী মেয়ে। এই 'লক্ষ্মী' মেয়ের ধারণাটি দীর্ঘদিন ধরে বাঙালি সমাজে প্রচলিত ছিল। এটিকে আরও সুস্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন লেখায় আদর্শ নারীর উদাহরণ হিসাবে অনেকগুলি কাল্পনিক চরিত্র তৈরি করা হয়েছিল। যেমন, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *মনোরমার গৃহ*[৬১] গ্রন্থের মনোরমা বা *বামাবোধিনী পত্রিকার* বিভিন্ন লেখায় সুশীলা, জ্ঞানদা, নির্ম্মলা প্রভৃতি কল্পিত চরিত্রগুলি। এইসব লেখাপত্রে মেয়েদের পক্ষে আদরণীয় হিসেবে যে আদর্শগুলির ওপর জোর দেওয়া হত, তা কিন্তু গৃহস্থালির কাজের মধ্যেই আবদ্ধ থাকার আদর্শ। অর্থাৎ, পুরুষের ভাবমূর্তিতে (পুরুষবাই প্রধানত এই ধরনের রচনার লেখক ছিলেন) মেয়েদের অবস্থার খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। তারা যে রান্নাঘরের ছিল সেই রান্নাঘরেই, যে চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ ছিল সেই চার দেওযালের মধ্যেই আরও পাকাপোক্ত হয়ে, আরও স্থায়ী, আরও অনড় হয়ে রইল। এর বাইরে অন্য কিছু সামাজিক অনুমতিই তাদের দেওয়া হত না।

কেবল একটিই প্রভেদ চোখে পড়ে। প্রভেদটি এই যে রান্নাঘর বা বৃহত্তর অর্থে গৃহস্থালিকে গত শতকে আরও মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। অনুচ্চারিত থাকলেও যা এতদিন কারও কারও কাছে ছিল 'দাসীবৃত্তি'র সমতুল্য, তাকে খুব সচেতনভাবে দেবীমূর্তির মত আদরণীয় করে উপস্থাপিত করা হয়েছিল।

এ থেকে একটি প্রশ্ন অনিবার্যভাবেই মনে আসে, গত শতকে মেয়েদের কাজকর্মকে বিশেষভাবে গৌরবান্বিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল কেন? আমরা আগেই দেখেছি যে মেয়েরা শিক্ষা পেতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে সমাজকর্তাদের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল যে চিরাচরিত 'মেয়েলি' কাজের প্রতি তাদের আর শ্রদ্ধা থাকবে না। এই ভীতি-বিহ্বল মানসিকতা থেকে মেয়েদের নতুন করে তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। তাই জোর দেওয়া হত মেয়েদের প্রথাসিদ্ধ কাজের ওপর এবং নবলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে সেই কাজকে আরও সুচারুরূপে সম্পন্ন করার ওপর। বস্তুতপক্ষে মেয়েদের যে শিক্ষা দেওয়া হত তার এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চিরাচরিত 'মেয়েলি' কাজগুলিকে আরও সুসম্পন্ন করতে শেখানো। গৃহস্থালির বিষয়ে যে নতুন ধ্যান-ধারণা গড়ে উঠতে শুরু করেছিল, তাও ছিল মূলতঃ এই প্রয়োজনেই।

কিন্তু কতটা নতুনত্ব এসেছিল গৃহস্থালি সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণায়? আমরা দেখেছি, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেও নিয়মিত লেখা হত যে স্তন্যের মাধ্যমে স্তনদাত্রীর চরিত্র শিশুর মধ্যে সঞ্চারিত হয়। অথচ, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং শিশুপালনের ওপর রচিত বই পড়লে বোঝা যায় যে স্তন দুগ্ধের উৎস সম্বন্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক লেখকই অবহিত ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্তন্যের মাধ্যমে চরিত্র সঞ্চারণ তত্ত্ব প্রচার করার একমাত্র

উদ্দেশ্য ছিল মেয়েদের বোঝানো যে তারা যদি সচ্চরিত্রা না হয় তবে তাদের সন্তানও চরিত্রবান হবে না। তাই, মেয়েরা অক্রোধী হবে, লোভ করবে না, সহনশীলা হবে, তাদের রিরংসা থাকবে না, প্রভৃতি। এগুলিও ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্যে 'নারী' বিষয়ে যে ধারণা ছিল, তার বাইরে নয়। অতএব, বিভিন্নভাবে ঘুরে-ফিরে সেই একই বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছিল—তা সে দাম্পত্য জীবনে নীতি-রক্ষার প্রশ্নেই হোক কিংবা সন্তানপালনেই হোক। এর থেকে এমন মনে হওয়া খুবই সঙ্গত যে মেয়েদের শিক্ষা, দাম্পত্যজীবন বা ঘর-গেরস্থালির ওপর রচনার পেছনে একই কারণ বর্তমান ছিল। সর্বত্রই আমরা সামাজিক স্থিতাবস্থা রক্ষার এক তাগিদ লক্ষ করতে পারি। এই তাগিদটুকু বাদ দিয়ে গৃহস্থালি সংক্রান্ত ভাবনায় যে নতুনত্ব চোখে পড়ে, তা গত শতকের গৃহস্থালির মূল কাঠামোকে পরিবর্তিত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না।

উল্লেখপঞ্জী

১। সরোজিনী দেবী, 'পরিবারে শিশুশিক্ষা', *অন্তঃপুর*. জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০ বঃ, পৃ ৩৩

২। *বঙ্কিম রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৬১ বঃ), পৃ ২৯১

৩। 'বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ-সংস্কার', *বঙ্গমহিলা*, চৈত্র, ১২৮২ বঃ, পৃ ২৭৮

৪। 'পারিবারিক সংস্কার', *বঙ্গমহিলা*, মাঘ, ১২৮২ বঃ, পৃ ২৩৫

৫। 'গৃহিণী', *সাধারণী*, ২৩শে চৈত্র, ১২৮৬ বঃ, পৃ ২৭৬

৬। *বামাবোধিনী পত্রিকা*, ভাদ্র, ১২৯১ বঃ, পৃ ১৪৩

৭। *সাধারণী*, ২৩শে চৈত্র, ১২৮৬ বঃ, পৃ ২৭৬

৮। *অন্তঃপুর*, অগ্রহায়ণ, ১৩০৯ বঃ, পৃ ১৫০

৯। *বঙ্গমহিলা*, মাঘ, ১২৮২ বঃ, পৃ ২৩৫

১০। ঐ, ২৩৬

১১। দ্র. বর্তমান গ্রন্থের 'দাম্পত্য-ভাবনা' শীর্ষক অধ্যায়।

১২। *অন্তঃপুর*, অগ্রহায়ণ, ১৩০৯ বঃ, পৃ ১৫০

১৩। 'শ্বশ্রূ ও ননন্দা', *পরিচারিকা*, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১২৯৩ বঃ, পৃ ৩৩

১৪। ঐ

১৫। ইন্দিরা দেবী, *আমার খাতা* (কলকাতা, ১৩১৯ বঃ)

১৬। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), *পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন* (প্রথম খণ্ড), (কলকাতা, ১৯৭৮), পৃ ১৫৮

১৭। সতীপ্রকাশ সেন, 'কোনের বউ', *সোমপ্রকাশ*, ১৫ই বৈশাখ, ১২৮৭ বঃ, পৃ ১৫

১৮। ঐ

১৯। 'শাশুড়ীর অত্যাচার', *পরিচারিকা*, অগ্রহায়ণ, ১২৯৮ বঃ, পৃ ১৭৯

২০। দ্র. জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর 'স্মৃতিকথা', ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী (সম্পা), *পুরাতনী*, (কলকাতা, ১৮৭৯ শক). পৃ ২১

২১। ঐ, ৫৬

২২। রজনীকান্ত গুপ্ত, 'কয়েকটি অদ্ভুত প্রথা', *ভারত-মহিলা*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ বঃ, পৃ ৩৯

২৩। 'আমাদিগের নারী জাতির অবস্থা', *বামাবোধিনী পত্রিকা*, শ্রাবণ, ১২৮১ বঃ, পৃ ১২৩

২৪। হরিহর শেঠ, *ঘরের কথা* (চন্দননগর, ১৩৩১ বঃ), পৃ ৮৪—৮৬) প্রকাশ সন অনুযায়ী *ঘরের কথা* বিংশ শতাব্দীর রচনা, কিন্তু এ গ্রন্থটি লেখক লিখেছিলেন পরিণত বয়সে

এবং বইয়ের মধ্যে বারবার উনবিংশ শতাব্দীর অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ছায়াপাত করেছে।

২৫। 'বধূশাসন', *বামাবোধিনী পত্রিকা*, আশ্বিন, ১২৯৪ বঃ, পৃ ১৬২

২৬। নরেশচন্দ্র জানা, মানু জানা ও কমলকুমার সান্যাল (সম্পা), *আত্মকথা* (প্রথম খণ্ড), (কলকাতা, ১৯৮১), পৃ ৭ (সারদাসুন্দরী দেবীর আত্মকথা)

২৭। Nirad C. Chaudhuri, *The Autobiography of an Unknown Indian*, (7th Jaico Imp. Bombay 1984), p. 170

২৮। Ibid, 165-166

২৯। *অন্তঃপুর*, অগ্রহায়ণ, ১৩০৯ বঃ, পৃ ১৫০

৩০। *ঘরের কথা*, (পূর্বোক্ত), পৃ ৮৯

৩১। শিবনাথ শাস্ত্রী, *যুগান্তর*, (কলকাতা, ১৩৭৪ বঃ), পৃ ১৪৫

৩২। ঐ, ১৪৭

৩৩। *'দেনাপাওনা'* গল্পটির রচনা সন ১২৯৮ বঃ। এটি প্রকাশিত হয়েছিল *হিতবাদী* পত্রিকায়। তবে *হিতবাদী* পত্রিকার কোন 'ফাইল' আবিষ্কৃত না হওয়ায়, এই গল্পটির প্রকাশ সন নিয়ে ঈষৎ সংশয়ের অবকাশ আছে।

৩৪। *যুগান্তর*, (পূর্বোক্ত), পৃ ১৪৭

৩৫। *বঙ্কিম রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৬০ বঃ), পৃ ৩০৬

৩৬। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর 'স্মৃতিকথা', *পুরাতনী*, (পূর্বোক্ত), পৃ ৩৬

৩৭। *পরিচারিকা*, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১২৯৩ বঃ, পৃ ৩৪

৩৮। *ভারত-মহিলা*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ বঃ, পৃ ৩৯

৩৯। *সাধারণী*, ২৩শে চৈত্র, ১২৮৬ বঃ, পৃ ২৭৭

৪০। *আত্মকথা* (প্রথম খণ্ড), (পূর্বোক্ত), পৃ ১৯ (রাসসুন্দরী দেবীর আত্মকথা)

৪১। *আত্মকথা* (দ্বিতীয় খণ্ড), (কলকাতা, ১৯৮২), পৃ ১৬—১৭ (কৈলাসবাসিনী দেবীর আত্মকথা)

৪২। প্রফুল্লময়ী দেবী, 'আমাদের কথা', *প্রবাসী*, বৈশাখ, ১৩৩৭ বঃ, পৃ ১১৩

৪৩। প্রসন্নময়ী দেবী, *পূর্ব্ব কথা* (১৯১৭), (কলকাতা, ১৯৮২), পৃ ৪৪

৪৪। *অন্তঃপুর*, অগ্রহায়ণ, ১৩০৯ বঃ, পৃ ১৫০

৪৫। 'পারিবারিক সুখ' ,*পরিচারিকা*, বৈশাখ, ১২৯৭ বঃ, পৃ ১৪৯

৪৬। বনলতা দেবী, 'রমনীর পারিবারিক ও সামাজিক কর্ত্তব্য', *অন্তঃপুর*, বৈশাখ, ১৩১০ বঃ, পৃ ৯

৪৭। 'বঙ্গমহিলা', *বামাবোধিনী পত্রিকা*, বৈশাখ, ১২৮১ বঃ, পৃ ১২

৪৮। 'বঙ্গ নারীদিগের অবস্থা', *মহিলা*, কার্তিক, ১৩১৩ বঃ, পৃ ৮৮

৪৯। 'সুগৃহিণী', *মহিলা*, মাঘ, ১৩১০ বঃ, পৃ ১৮৮

৫০। *আত্মকথা* (প্রথম খণ্ড), (পূর্বোক্ত), পৃ ৩৭ (রাসসুন্দরী দেবীর আত্মকথা)

৫১। চিত্রা দেব, *অন্তঃপুরের আত্মকথা*, (কলকাতা, ১৯৮৪), পৃ ৮৬

৫২। *মহিলা*, মাঘ, ১৩১০ বঃ, পৃ ১৮৮

৫৩। *মহিলা*, কার্তিক, ১৩০৪ বঃ, পৃ ৯০

৫৪। 'ঘরকন্নার কাজ', *পরিচারিকা*, জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫ বঃ, পৃ ৪৩

৫৫। *আত্মকথা* (প্রথম খণ্ড), (পূর্বোক্ত), পৃ ২১ (রাসসুন্দরী দেবীর আত্মকথা)

৫৬। ঐ, ৩৬—৩৭

৫৭। 'গৃহিণীগণের গৃহকার্য্য করা চাই', *সাধারণী*, ৪ঠা শ্রাবণ, ১২৮৭ বঃ, পৃ ১৬১
৫৮। ঐ
৫৯। *ভারত-মহিলা*, শ্রাবণ, ১৩১৩ বঃ, পৃ ২৬৬
৬০। 'পারিবারিক অবস্থা', *মহিলা*, আশ্বিন, ১৩১৩ বঃ, পৃ ৬০
৬১। 'শিক্ষিতা মহিলাদিগের ত্রুটী', *বামাবোধিনী পত্রিকা*, বৈশাখ, ১২৯৪ বঃ, পৃ ২৬
৬২। সরোজিনী দেবী, 'রন্ধনে রমণী', *অন্তঃপুর*, মাঘ, ১৩১০ বঃ, পৃ ২২৫
৬৩। মানোদা দেবী, 'জনৈক গৃহবধূর ডায়েরী', *মাসিক বসুমতী*, ভাদ্র, ১৩৬২ বঃ, পৃ ৯০৫—৯০৬
৬৪। ঈশানচন্দ্র বসু ,*নারী নীতি*, (কলকাতা, ১২৯১ বঃ), পৃ ৪৯
৬৫। কৃষ্ণপ্রিয়া চৌধুরানী, *নারী-মঙ্গল* , (কলকাতা, ১৩০১ বঃ), পৃ ১৯
৬৬। *বামাবোধিনী পত্রিকা*, শ্রাবণ, ১২৯১ বঃ, পৃ ১২৫—১২৬
৬৭। কৃষ্ণকুমার মিত্র, *আত্মচরিত* (১৩৪৩ বঃ), (কলকাতা, ১৩৮১ বঃ), পৃ ৪
৬৮। বিপিনচন্দ্র পাল,*আমার জীবন ও সমকাল* (প্রথম পর্ব), অনু. শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়, (কলকাতা, ১৯৮৫), পৃ ৩০
৬৯। প্রসন্নময়ী দেবী, *পূর্বকথা* (পূর্বোক্ত), পৃ ৭
৭০। *বঙ্কিম রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), (পূর্বোক্ত), পৃ ৩০০
৭১। হেমন্তকুমারী গুপ্তা, 'গৃহিণী ও গৃহ শৃঙ্খলা', *অন্তঃপুর*, ভাদ্র, ১৩১০ বঃ, পৃ ১১৫
৭২। 'বঙ্গীয় গৃহিণীদিগের নিত্যকার্য্য',*মহিলা*, চৈত্র, ১৩১০ বঃ, পৃ ২৩৯—২৪১
৭৩। প্রসন্নময়ী দেবী, 'সেকালের কথা',*অন্তঃপুর*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮ বঃ, পৃ ১০৮
৭৪। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর 'স্মৃতিকথা', *পুরাতনী*, (পূর্বোক্ত), পৃ ৯১
৭৫। *মহিলা*, শ্রাবণ, ১৩০৮ বঃ, পৃ ৩
৭৬। *বঙ্কিম রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), (পূর্বোক্ত), পৃ ৩০০
৭৭। এই রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল মুক্তকেশী দেবীর স্বামী-সম্পাদিত *শিক্ষা পরিচয়* পত্রিকায় ১২৯৪ বঙ্গাব্দে। লেখিকার মৃত্যুর পর তাঁর স্বামী প্রবন্ধটি *অন্তঃপুর* পত্রিকায় পুনঃপ্রকাশ করেছিলেন। দ্র. মুক্তকেশী দেবী 'রমনীর গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য',*অন্তঃপুর*, অগ্রহায়ণ, ১৩০৮ বঃ, পৃ ২৫৫
৭৮। দ্র. চিত্রা দেব,*ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল*, (কলকাতা, ১৩৯০ বঃ), পৃ ১২
৭৯। 'মেয়ে-যজ্ঞির বিশৃঙ্খলা', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা),*শরৎকুমারী চৌধুরানীর রচনাবলী* , (কলকাতা, ১৩৫৭ বঃ), পৃ ২১৭
৮০। ঐ
৮১। সুদক্ষিণা সেন,*জীবনস্মৃতি* (কলকাতা, ১৩৩৯ বঃ), পৃ ৩৯—৪০
৮২। বসন্তকুমারী বসু,*নারী জীবনের কর্ত্তব্য*, (কলকাতা, ১৩১৯ বঃ), পৃ ৪৯
৮৩। 'গার্হস্থ্য শিক্ষা',*বামাবোধিনী পত্রিকা*, আশ্বিন, ১২৮৮ বঃ, পৃ ১৬৯
৮৪। ঐ, ১৭০
৮৫। *বামাবোধিনী পত্রিকা*, অগ্রহায়ণ, ১২৮৮ বঃ, পৃ ২৩১
৮৬। *আত্মকথা* (প্রথম খণ্ড), (পূর্বোক্ত), পৃ ২৫ (রাসসুন্দরী দেবীর আত্মকথা)
৮৭। ঐ, ২৬
৮৮। *রমেশ রচনাবলী*, (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, কলকাতা ১৯৮২), পৃ ৪৭২
৮৯। *আত্মকথা* (প্রথম খণ্ড), (পূর্বোক্ত), পৃ ৮ (সারদাসুন্দরী দেবীর আত্মকথা)
৯০। *রমেশ রচনাবলী* (পূর্বোক্ত), পৃ ৪৭২ ;*সাধারণী*, ৪ঠা শ্রাবণ, ১২৮৭ বঃ, পৃ ১৬১ ; 'বঙ্গ নারীদিগের অবস্থা', *মহিলা*, কার্তিক, ১৩১৩ বঃ, পৃ ৮৯ ; সুখদা গুপ্তা, 'হিন্দু সমাজে বঙ্গনারী', *অন্তঃপুর*, চৈত্র, ১৩১০ বঃ, পৃ ২৭০-২৭১ ; বসন্তকুমারী দাসী, *যোষিদ্বিজ্ঞান*,

(বরিশাল, ১২৮২ বঃ), পৃ ৩১ ; মনোমোহন বসু, *হিন্দু আচার ব্যবহার*, (কলকাতা, ১২৯৩ বঃ), পৃ ৪৯ ; বিদ্যা শিখিলে কি গৃহকর্ম্ম করিতে নাই ?' *বামাবোধিনী পত্রিকা*, আশ্বিন, ১২৭৭বঃ, পৃ ১৭৮

৯১। গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, 'বাল্যজীবন', দ্র. *আত্মকথা* (প্রথম খণ্ড), (পূর্বোক্ত), পৃ ১৬—১৯ (গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'বাল্যজীবন' অংশ)

৯২। ঐ, ১৬

৯৩। হেমন্তবালা দেবী চৌধুরানী, 'পুরনো দিনের কথা', *গল্পভারতী*, আষাঢ়, ১৩৭৬ বঃ, পৃ ৬৫

৯৪। নবীনচন্দ্র সেন, *আমার জীবন*, (কলকাতা, ১৩১৪ বঃ), পৃ ৯৩

৯৫। *রবীন্দ্র বচনাবলী* (দশম খণ্ড), (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৬৮ বঃ), পৃ ১৩১

৯৬। *গল্পভারতী*, কার্তিক, ১৩৭৬ বঃ, পৃ ৪৫০

৯৭। *গল্পভারতী*, আষাঢ়, ১৩৭৬ বঃ, পৃ ৬৮—৬৯

৯৮। *মহিলা*, শ্রাবণ, ১৩০৮ বঃ, পৃ ৬

৯৯। *মহিলা*, চৈত্র, ১৩১০ বঃ, পৃ ২৪১

১০০। দ্র. *বামাবোধিনী পত্রিকা*, জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৭ বঃ, পৃ ৩০ ; অগ্রহায়ণ, ১২৮০ বঃ, পৃ ২৫৩—২৫৪ ; কার্তিক, ১২৯০ বঃ, পৃ ২২৪ ; *মহিলা*, আশ্বিন, ১৩১৩ বঃ, পৃ ৬০

১০১। *মহিলা*, কার্তিক, ১৩১৩ বঃ, পৃ ৮৯

১০২। *বামাবোধিনী পত্রিকা*, ভাদ্র, ১২৭০ বঃ, পৃ ১

১০৩। বনলতা দেবী, 'রমণীর পারিবারিক ও সামাজিক কর্ত্তব্য', *অন্তঃপুব*, বৈশাখ, ১৩১০ বঃ, পৃ ১১

১০৪। 'নারী জীবনের কর্ত্তব্য', *মহিলা*, কার্তিক, ১৩০৪ বঃ, পৃ ৯০

১০৫। 'আমাদেব অভাব', *বামাবোধিনী পত্রিকা*, ভাদ্র, ১২৯২ বঃ, পৃ ১৩৪

১০৬। দ্র. বর্তমান গ্রন্থেব 'স্ত্রীজনোচিত শিক্ষা' শীর্ষক অধ্যায়।

১০৭। *অমৃত গ্রন্থাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), (বসুমতী সাহিত্য-মন্দির সংস্করণ, কলকাতা, প্রকাশ সন নেই), পৃ ১৮

১০৮। 'বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদের বর্তমান অবস্থা' (দ্বিতীয় ভাগ), *বামাবোধিনী পত্রিকা*, আষাঢ়, ১২৯৮ বঃ, পৃ ৭৮

১০৯। *বঙ্গদর্শন*, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮১ বঃ, পৃ ৫৯

১১০। 'মহিলার স্বাস্থ্য', *অন্তঃপুর*, আষাঢ়, ১৩১০ বঃ, পৃ ৫৯

১১১। হেমাঙ্গিনী চৌধুরী, 'স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা', *অন্তঃপুর*, মাঘ, ১৩০৭ বঃ, পৃ ১৩

১১২। *বামাবোধিনী পত্রিকা*, ভাদ্র, ১২৯২ বঃ, পৃ ১৩৪

১১৩। *বামাবোধিনী পত্রিকা*, বৈশাখ, ১২৮০ বঃ, পৃ ৩

১১৪। 'গর্ভাবস্থায় প্রসূতির শুশ্রূষা', *বামাবোধিনী পত্রিকা*, কার্তিক, ১২৭৪ বঃ, পৃ ৬১৭

১১৫। *পুরাতনী*, (পূর্বোক্ত), পৃ ৩৫

১১৬। *বামাবোধিনী পত্রিকা*, কার্তিক, ১২৭৪ বঃ, পৃ ৬১৭—৬১৯

১১৭। *বামাবোধিনী পত্রিকা*, আশ্বিন, ১২৭৪ বঃ, পৃ ৫৯৭—৫৯৮

১১৮। ডাঃ যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, *ধাত্রী শিক্ষা এবং প্রসূতি শিক্ষা*, (চুঁচুড়া, ১৮৭১), *অবলাবান্ধব*-এর মন্তব্যটি আখ্যাপত্রে উদ্ধৃত

১১৯। গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, *মাতৃশিক্ষা* , (কলকাতা, ১৭৯২ শক), দ্র. প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়

১২০। *বামাবোধিনী পত্রিকা*, অগ্রহায়ণ, ১২৭৪ বঃ, পৃ ৬৩৭

১২১। *বামাবোধিনী পত্রিকা*, ফাল্গুন, ১২৭৪ বঃ, পৃ ৬৮৯—৬৯০

১২২। ঐ, ৬৯০

১২৩। *বামাবোধিনী পত্রিকা*, চৈত্র, ১২৭৪ বঃ, পৃ ৭১০
১২৪। *বামাবোধিনী পত্রিকা*, অগ্রহায়ণ, ১২৭৪ বঃ, পৃ ৬৩৯
১২৫। *বামাবোধিনী পত্রিকা*, জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৫ বঃ, পৃ ৩২—৩৩
১২৬। *আত্মকথা* (দ্বিতীয় খণ্ড), (পূর্বোক্ত), পৃ ৫ (কৈলাসবাসিনী দেবীর আত্মকথা)
১২৭। স্বামী-সারদানন্দ, *শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ* (প্রথম খণ্ড), (প্রথম প্রকাশ, ১৯১৫), (রিফ্লেক্ট্ পাবলিকেশন সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮৪), পৃ ১১৪—১১৫
১২৮। *আত্মচরিত*, (পূর্বোক্ত), পৃ ৩৬
১২৯। জগচ্চন্দ্র মজুমদার, *নীতিগর্ভ প্রসূতি প্রসঙ্গ*, (কলকাতা, ১২৭৫ বঃ), পৃ ২
১৩০। গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, *মাতৃশিক্ষা*, (পূর্বোক্ত) পৃ ৩৮—৩৯
১৩১। *বামাবোধিনী পত্রিকা*, অগ্রহায়ণ, ১২৭৪ বঃ, পৃ ৬৩৬
১৩২। *মাতৃশিক্ষা*, (পূর্বোক্ত), পৃ ৪০
১৩৩। *বামাবোধিনী পত্রিকা*, অগ্রহায়ণ, ১২৭৪ বঃ, পৃ ৬৩৬
১৩৪। *মাতৃশিক্ষা*, (পূর্বোক্ত), পৃ ৩৯
১৩৫। *ধাত্রীশিক্ষা এবং প্রসূতি শিক্ষা* , (পূর্বোক্ত), পৃ ২১
১৩৬। শিবচন্দ্র দেব, *শিশুপালন* (প্রথম প্রকাশ, ১৮৫৭), (কলকাতা, ১৮৬৪), পৃ ৩১
১৩৭। 'বঙ্গ মহিলাব সন্তানাদি পালনের কথা', *সাধাবণী*, ১৬ই কার্তিক, ১২৮৭ বঃ, পৃ ১৭
১৩৮। 'সন্তানপালন রীতি', *বামাবোধিনী পত্রিকা*, শ্রাবণ, ১২৭৯ বঃ, পৃ ১০৭—১০৮
১৩৯। ঐ, ১০৯—১১০
১৪০। শিবচন্দ্র দেব, *শিশুপালন*, (পূর্বোক্ত), পৃ ১০
১৪১। ঐ, ১৫—১৬
১৪২। 'শিশুদের আহাব', *বামাবোধিনী পত্রিকা*, বৈশাখ, ১২৭৩ বঃ, পৃ ২৪৭
১৪৩। 'সন্তানপালন রীতি', *বামাবোধিনী পত্রিকা*, শ্রাবণ, ১২৭৯ বঃ, পৃ ১১১
১৪৪। ঐ
১৪৫। *বামাবোধিনী পত্রিকা*, পৌষ, ১২৭৮ বঃ, পৃ ২৬৫
১৪৬। *শিশুপালন*, (পূর্বোক্ত), পৃ ৫৩—৫৪
১৪৭। ঐ, ৫৫
১৪৮। *বামাবোধিনী পত্রিকা*, শ্রাবণ, ১২৭৯ বঃ, পৃ ১১১
১৪৯। *বামাবোধিনী পত্রিকা*, বৈশাখ, ১২৭৩, পৃ ২৫০—২৫১
১৫০। *বামাবোধিনী পত্রিকা*, শ্রাবণ, ১২৭৯ বঃ, পৃ ১১২
১৫১। 'শিশুদের ব্যায়াম', *বামাবোধিনী পত্রিকা*, অগ্রহায়ণ, ১২৭৪ বঃ, পৃ ৩৯৪
১৫২। ঐ, ৩৯৬
১৫৩। *শিশুপালন*, (পূর্বোক্ত), 'Preface'
১৫৪। বিনোদ বিহারী রায়, *শিশুপালন* , (রাজশাহী, ১২৯৭ বঃ), পৃ ৩
১৫৫। 'স্বামী ও স্ত্রীর কথোপকথন', *বামাবোধিনী পত্রিকা*, কার্তিক, ১২৭৫ বঃ, পৃ ১২৯—১৩০
১৫৬। *শিশুপালন*, (পূর্বোক্ত), পৃ ৬৬
১৫৭। দ্র. 'দন্ত উঠিবার সময় শিশুকে যেরূপ রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে তাহার বিবরণ', *শিশুপালন*, (পূর্বোক্ত), পৃ ৯৩
১৫৮। ঐ, ৯৪
১৫৯। দ্র. 'স্তন ত্যাগাবধি দ্বিতীয় বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুপালনের নিয়ম', ঐ, ১০৪—১০৫
১৬০। 'স্বামী ও স্ত্রীর কথোপকথন', *বামাবোধিনী পত্রিকা*, ফাল্গুন, ১২৭৪ বঃ, পৃ ২০৬—২০৮
১৬১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *মনোরমার গৃহ*, (কলকাতা, ১২৯৯ বঃ)

৫
মেয়েদের নিজস্ব জগৎ

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় নারী-সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার দুটি পৃথক দিক সহজেই চোখে পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীতে একটু একটু করে স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত হচ্ছে, সমাজে মেয়েদের স্থান, তাদের কর্তব্য, ভূমিকা প্রভৃতি নিয়ে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছে, বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে 'নারীমুক্তি', 'অবরোধ প্রথা' প্রভৃতি শব্দ। অন্য দিকে, প্রায় সমসাময়িক যুগেই চোখে পড়ে, মেয়েদের বিচরণের সীমা বেঁধে দেওয়ার প্রয়াসও। একেই তো গোটা বাঙালি সমাজের তুলনায় সংস্কারপন্থীদের সংখ্যা ছিল হাস্যকর রকমের নগণ্য, তায় আবার তাঁদের মধ্যেও ছিল 'নারীমুক্তি' নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত। সংস্কারকদের একাংশ অন্তঃপুরকে কতটা স্বাধীনতা দেওয়া হবে, সে বিষয়ে যথেষ্ট দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কয়েকটি পরিবার স্ত্রীশিক্ষায় সম্মত হলেও, শিক্ষণীয় বিষয়ের সীমানা চিহ্নিত করে এবং মেয়েদের কর্তব্য, অকর্তব্যের মাত্রা সম্বন্ধে বারবার সচেতন করে দিয়ে মেয়েদের একটা নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে বেষ্টন করে ফেলা হতে লাগল। ফলে, একান্তই অবরোধবাসিনী মেয়েরা বাইরের স্বাদ-গন্ধ কিছু পেল বটে, কিন্তু পেল না নিজের ইচ্ছায় বিচরণের অধিকার। তাদের সঙ্গে পুরুষের বাস্তব যে পার্থক্যগুলি ছিল, সেগুলি তো বজায় রইলই, বরং, সেই পার্থক্যগুলিকে একটা যুক্তিগ্রাহ্য রূপ দেওয়ার চেষ্টা হতে লাগল উনবিংশ শতাব্দীতে।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের দীর্ঘ সময় অবসিত হওয়ার পরও অবরোধপ্রথা দূর করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্রবন্ধ লেখা হত।[১] এমনকি, বিংশ শতাব্দীর সূচনাতেও লেখা হয়েছিল, 'এক্ষণে বঙ্গ মহিলাগণ সঙ্কীর্ণ অন্তঃপুর কারাগারে যেভাবে অবরুদ্ধ হইয়া স্থিতি করেন তাহাতে তাঁহাদের মানসিক উন্নতি ও স্ফূর্তির বিষয় বিঘ্ন হইয়াছে।'[২] এই চার দেওয়ালের মধ্যেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল মেয়েদের একটা আলাদা পৃথিবী। এই আলাদা পৃথিবী নিশ্চয় মেয়েদের চিরকালই ছিল—এর মধ্যে হয়ত উনবিংশ শতাব্দীর অভিনবত্ব কিছু নেই। কেবল আমরা তার হদিশ জানি না। কারণ, মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষার চল বিশেষ ছিল না বলে কেউ তার নিজস্ব জগতের ইতিবৃত্ত বিশেষ লিখে রেখে যায়নি। এর সূচনা ঘটেছিল উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। পুরুষবাহী হয়ে শিক্ষার যে ছিটেফোঁটা অন্দরমহলে প্রবেশ করেছিল, তার ফলে মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রে নতুনভাবে ভাবতে শুরু করে। গত শতকের বহু মহিলা তাঁদের মনের কথা লিখে রেখে গিয়েছেন। শুধু স্মৃতিচিত্র নয়, মহিলারা তাদের ঘরদোর সংসার সম্বন্ধে অনেক কথা লিখে গিয়েছেন। এই সব বিভিন্ন ধরনের লেখা ও আত্মজৈবনিক রচনা থেকে বেরিয়ে আসে মেয়েদের মানসিকতা, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের ভালবাসা-ভাললাগার কথা। ধরা পড়ে,তাদের নিজস্ব জগতের কথা।

মেয়েদের নিজস্ব 'জগৎ' বলতে কী বোঝাত ? মেয়েদের জীবন বলতে এক সময়ে

বোঝানো হত 'রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধার' সেই বৈচিত্র্যহীন প্রাত্যহিকতা। সঙ্গে অবশ্যই ছিল পূজার্চনা, ঘর গৃহস্থালির হাজারো কাজ। মেয়েদের এ সব কাজই সাবেক কাল থেকে চলে এসেছে। তার মধ্যে যখন একটু একটু করে স্ত্রী-শিক্ষার সূত্রপাত হতে আরম্ভ করল, তখনও যে মেয়েরা এই সব ধরাবাঁধা কাজ থেকে অব্যাহতি পেল, তা নয়। কিছু একট: লিখে যাওয়ার মত লেখাপড়া যারা শিখেছিলেন, তাঁদের জবানি থেকেই জানা যায় দিনের কতটা অংশ কাটত ঘরের কাজে। তবু এদের, কলম থেকে আমরা ঘরকন্নার কাজের মধ্যেই গড়ে ওঠা এক পৃথিবী সম্বন্ধে কিছু ধারণা করতে পাবি। ঘরের শত-সহস্র কাজের মধ্যেও তাঁদের মন, তাঁদের কাজকর্ম সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা এবং সর্বোপরি তাঁদের অনুভূতির নিজস্ব জগৎ সম্বন্ধে আমরা কিছু কিছু আন্দাজ করতে পারি। তবে এইসব রচনা থেকে আমরা শিক্ষিতা মহিলাদের মনের কথাই জানতে পাবি মাত্র। এবং এক পরিবারের মেয়ের থেকে অন্য বাড়ির মেয়ে সংবেদনশীলতার মাত্রা স্বাভাবিক কারনেই পৃথক হত। যেমন পৃথক হত ব্রাহ্ম বাড়ির মেয়েদের জীবনবোধ থেকে গোঁড়া হিন্দু পরিবারের মেয়েদের চিন্তাভাবনা ও চারদিকে পরিদৃশ্যমান জগৎ সম্বন্ধে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি।

বর্তমান অধ্যায়ে এই পার্থক্যগুলি মেনে নিয়েও, অত্যন্ত সীমিত উপকরন থেকেই আমরা মেয়েদের নিজস্ব জগতের কয়েকটি দিক অনুসন্ধানের চেষ্টা করব। মেয়েদের নিজস্ব জগতের প্রায় সবটাই জুড়ে ছিল ঘর-গৃহস্থালি। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা মেয়েদের কাজকর্ম, সাংসারিক কর্তব্যের চাপ প্রভৃতি বিষয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করেছি। সে আলোচনা ছিল মুখ্যতঃ বর্ণনাত্মক। এ অধ্যায় আমাদের অনুসন্ধেয় বিষয় এই সব কাজের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা এই অধ্যায়ে মেয়েদের মনের দিকে চোখ ফেরাচ্ছি। কী ভাবতেন সেই সময়ের মহিলারা, কী চোখে দেখতেন তাঁদের পারিপার্শ্বিককে, সমাজকে, পুরুষকে, তাঁদের দিনযাপনকে ? কীভাবে তাঁরা প্রকাশ করতেন তাঁদের মনের কথা— কী লিখতেন, গাইতেন, কেমন করে ভরিয়ে তুলতেন তাঁদের দিনগুলিকে ? গত অধ্যায়ে আমরা মেয়েদের জগতের বহিরঙ্গের দিকে তাকিয়েছি। এবার তাকাব তাঁদের ভাবনার জগতের দিকে। এ অধ্যায়ে মেয়েদের ভালবাসা, ভাললাগা, ভাল-না-লাগার প্রসঙ্গই প্রধান।

॥ এক ॥

গত শতকে স্ত্রীশিক্ষা সংক্রান্ত যত লেখাপত্র হয়েছে, তার সিংহভাগই বেরিয়েছিল পুরুষদের কলম থেকে। এখানে একটা প্রশ্ন আসে, মেয়েরা নিজেরা কি লেখাপড়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেনি ? অবশ্যই করেছিল। এবং এই লেখাপড়ার সূত্রেই তাদের প্রথম মানসিক পরিবর্তনটি আমাদের চোখে পড়ে।

১৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে জন্মেছিলেন রাসসুন্দরী দেবী। তাঁর যখন লেখাপড়া শেখার বয়স তখন স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে বটে, কিন্তু সমাজে তা স্বীকৃত হয় নি। বরং বলা যায়, অধিকাংশ লোকই ভাবতে পারত না যে একটি মেয়েও আবার পুরুষের মত লেখাপড়া করবে। পরবর্তীকালে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি অনেকাংশে

পরিবর্তিত হলেও প্রতিবন্ধকতা একেবারে নির্মূল হয়নি। কিন্তু গত শতকের গোড়ায়, এমনকি বিশের দশকের শেষ পর্যন্ত প্রতিবন্ধকতা ছিল প্রচুর এবং স্ত্রীশিক্ষা ব্যাপারটাই ছিল প্রায় অকল্পনীয়। খুব পরিণত বয়সে আত্মজীবনী লিখতে বসেও তাঁর কৈশোর কালের সামাজিক প্রতিকূলতার কথা ভোলেননি রাসসুন্দরী দেবী।[৩]

'কলুর বলদের' মত সাংসারিক কাজের চাপের মধ্যে নিষ্পেষিত হয়েও রাসসুন্দরী দেবীর ছিল বিদ্যার্জনের এষণা। নিশ্চয় এ যাণ্ডা আরও কয়েকজন মেয়ের মধ্যেও বর্তমান ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জন্মেছিলেন, এমন মহিলাদের মধ্যে রাসসুন্দরী দেবীর আত্মস্মৃতির সঙ্গেই আমরা সমধিক পরিচিত। তাই তাঁর মুখেই শুনি মেয়েদের লেখাপড়া শেখার জন্য আকুলতার কথা। রাসসুন্দরীর মনের বাসনা ছিল 'লেখাপড়া শিখিয়া পুঁথি পড়িব'। কিন্তু গত শতকের প্রথম দিকে কোন মেয়ের পক্ষে লেখাপড়া শিখব বললেই শেখার উপায় ছিল না।

মেয়েদের বিদ্যাচর্চার ফলে 'ভদ্রলোকের জাতি' বিলুপ্ত হতে পারে, সমাজের কর্তাব্যক্তিরা এমন আশঙ্কাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করতেন।[৪] কিন্তু সমাজের অন্যান্য বিধিনিষেধকে মেনে নিতে পারলেও, মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি এই সার্বজনীন বিরোধিতাকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেননি রাসসুন্দরী। তিনি লিখেছিলেন : 'তখন আমাদিগের দেশের সকল ব্যবহারই বড় মন্দ ছিল না, কিন্তু এই বিষয়টি ভারী মন্দ ছিল। সকলেই মেয়েছেলেকে বিদ্যায় বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। . . . বাস্তবিক মেয়েছেলের হাতে কাগজ দেখিলে সেটি ভারি বিরুদ্ধ কর্ম জ্ঞান করিয়া, বৃদ্ধ ঠাকুরাণীরা অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন, অতএব আমি কেমন করিয়া লেখাপড়া শিখিব।'[৫]

রাসসুন্দরীর লেখা থেকে যা স্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসে তা হল একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর মেয়েরা পুরুষদের মতেরই পোষকতা করতেন। ফলে পুরুষরাও যেমন চাইতেন না মেয়েরা লেখাপড়া করুক, সে রকম বয়স্কা মহিলারাও ছিলেন স্ত্রীশিক্ষার সম্পূর্ণ বিপক্ষে। রাসসুন্দরী দেবী উনিশ শতকের বিশের দশকের কথা লিখেছেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর স্মৃতিকথা থেকে জানা যা যে গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও মেয়েদের লেখাপড়া করা যথেষ্ট নিন্দনীয় কাজ বলে বাঙালি সমাজে বিবেচিত হত।[৬]

কিন্তু যে মেয়ের মনে শিক্ষা পাওয়ার বাসনা জেগে ওঠে,তার সহস্র প্রতিকূলতার মধ্যেও তা চরিতার্থ করার পথ অনুসন্ধান খুবই স্বাভাবিক। রাসসুন্দরী দেবী ঈশ্বরের কাছে প্রাণভরা প্রার্থনা করতেন : 'হে পরমেশ্বর। তুমি আমাকে লেখাপড়া শিখাও, আমি লেখাপড়া শিখিয়া পুঁথি পড়ব। হে দীননাথ।'[৭] লেখাপড়া শেখার জন্য একটি মেয়ের এই আন্তরিক ব্যাকুলতা থেকে একটি নতুন যুগের সূচনা ধরা পড়ে। এই যুগের নতুনত্ব মানসিকতায়, নতুন চেতনায়। রাসসুন্দরী দেবীর লেখা থেকে বোঝা যায় যে মেয়েরা তাদের চিরাচরিত কাজ করে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারছিল লেখাপড়া শেখার প্রয়োজনীয়তা। হয়ত এ ধরনের মেয়ের সংখ্যা বাঙালি সমাজে খুব বেশি ছিল না। তবু যে কোন সূচনা এক জনকে দিয়েই হয়ে থাকে। সে অর্থে রাসসুন্দরী দেবীর আকুলতার একটি ভিন্ন তাৎপর্য আছে।

কী পড়তে চাইতেন রাসসুন্দরী ? তখন সাধারণ বাড়িতে পড়ার মত বই-ই বা কটা থাকত ? এমনিতেই তো ছাপা বইয়ের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। তাই পুঁথি পড়তে শেখাই

ছিল বিদ্যাভ্যাসের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চাশার কাজ। কিন্তু পুঁথি পড়তেও তো অক্ষরজ্ঞান দরকার। সেটাই বা কে শেখাবে? ছোটবেলায় রাসসুন্দরী ছেলেদের পাঠশালায় গিয়ে বসে থাকতেন। ছাত্ররা যা পড়ত, তা শুনতে শুনতে তিনিও কিছু শিখেছিলেন। পরবর্তী জীবনে পুঁথি পড়ার অদম্য বাসনায় কবেকার শেখা সেই 'চৌত্রিশ অক্ষর ফলা বানান' মনে করতে লাগলেন। কিন্তু লিখতে তো আর জানেন না। লেখাটা শুনে-শুনে হয় না, কাউকে শেখাতেই হয়। রাসসুন্দরী দেবীকে কে শেখাবেন? 'বিশেষতঃ আমি মেয়ে, তাহাতে আবার বৌ মানুষ।'[৮] যেন দুটো মস্ত অপরাধ। তাই, অনন্যোপায় হয়ে সমস্ত বিঘ্নের ত্রানকর্তার কাছে পৌঁছে দিতেন নিজের প্রার্থনা।

যেযুগে রাসসুন্দরী দেবীর জন্ম, সে সময়ে মেয়েদের মধ্যে যদিওবা দু একজন শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু রাসসুন্দরী দেবীর মত সবাই তাঁদের মনের কথা লিপিবদ্ধ করে যেতে পারেন নি। রাসসুন্দরী দেবীর যে কেবল লেখাপড়ার আগ্রহ ছিল, তা নয়, তিনি বোধহয় সব দিক দিয়েই একজন ব্যতিক্রম ছিলেন। তখন তাঁর বয়স অল্প। একদিন রীতিমত স্বপ্নই দেখে ফেললেন, তিনি চৈতন্যভাগবত খুলে পাঠ করছেন। ধরমর করে জেগে উঠলেন তিনি ঘুম থেকে। দীর্ঘ জীবনে কত দুঃখের বর্ষা গিয়েছে, কিন্তু কৈশোরের সেই বিশেষ দিনটির উত্তেজনার গনগনে আঁচ যেন বার্ধক্যেও অনুভব করতে পারতেন।[৯]

যুগসন্ধিক্ষণে বিদ্যালাভের জন্য রাসসুন্দরী দেবীর এই আকুলতা বিফল হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কয়েকজন মহিলা লেখাপড়া শেখার প্রয়োজনীয়তা যে কী বিপুল পরিমাণে বুঝতে পেরেছিলেন, তা ছড়িয়ে আছে সমসাময়িক লেখাপত্রে। সমগ্র বাঙালি সমাজের তুলনায় তাঁরা হয়ত সংখ্যায় অত্যল্প, কিন্তু এ বিষয়ে খুব অকৃত্রিম ছিল তাঁদের বিশ্বাস। কৈলাসবাসিনী দেবী স্ত্রীশিক্ষার বিরোধীদের সমস্ত গুজব আপত্তি খণ্ডন করে মেয়েদের বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করেছিলেন।[১০] হেমলতা দেবী সৎ পুস্তক পাঠ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাকে 'অমূল্য' বলেছিলেন। এই ধরনের পুস্তকপাঠে 'হৃদয়ের পবিত্র ও উচ্চ ভাব সকল উত্তেজিত হয় ও প্রস্ফুটিত হয়।'[১১] আর পরবর্তীকালে লীলাবতী মিত্র স্ত্রীশিক্ষাকে বাংলাদেশের উন্নতির অন্যতম শর্ত হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর মতে উচ্চশিক্ষার অভাবেই মেয়েদের মধ্যে হৃদয়ের ঔদার্য ও মহত্ত্বের বিকাশ বিঘ্নিত হচ্ছিল।[১২] উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের এই রচনাগুলি পড়লে বোঝা যায়, গোটা সমাজের পক্ষে খুব নগণ্য হলেও কয়েকজন মহিলার নিজস্ব জগতে শিক্ষা কত গভীরভাবে প্রবেশ করেছিল। মেয়েদের পূর্বাপর অপরিবর্তিত জগতে শিক্ষার অনুপ্রবেশ ছিল গত শতকের মেয়েদের ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। কত মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত বা কত মেয়ে বিদ্যালয় পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন, যা পরোক্ষে তাদের সামগ্রিক অবস্থা সম্বন্ধে সচেতনতার প্রতিফলনের প্রমাণ দেয়।

॥ দুই ॥

আমরা রাসসুন্দরী দেবীর স্মৃতিচারণ দিয়ে এ আলোচনার সূত্রপাত করেছিলাম। মেয়েদের নিজস্ব জগৎ সম্বন্ধে ধারণা গড়তে হলে এই আত্মজীবনীটির গুরুত্ব অপরিসীম। শুধু

লেখাপড়ার জন্য ব্যাকুলতাই নয়, রাসসুন্দরী দেবীর রচনা থেকে মেয়েদের জগতের আরও একটি দিক বেরিয়ে আসে—গভীর ঈশ্বরভক্তি। স্বামী, পুত্র, পরিবার, হাসি-কান্নার মত ঈশ্বরও মেয়েদের জগতের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন। ঈশ্বর চিরকালই বাংলাদেশের অনেক হতভাগ্য রমণীর অনেক অতৃপ্ত কামনা, অনেক দুঃখ-বেদনা, অনেক গোপন ব্যথার নীরব শ্রোতার ভূমিকা পলন করে এসেছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে অনেক নতুন ধ্যান-ধারণার অনুপ্রবেশের ফলে মেয়েদের নিজস্ব জগতে কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা দিলেও ঈশ্বরের সঙ্গে এই অলৌকিক নিভৃতচারিতা কখনও বন্ধ হয়নি। নীরদচন্দ্র চৌধুরী আত্মজীবনীতে তাঁর মায়ের কথা লিখতে গিয়ে পারিবারিক অশান্তির প্রসঙ্গে লিখেছিলেন যে মহিলারা যেখানে প্রকাশ্যে চিৎকার করে না, সেখানে তারা 'send up their secret thoughts to God, the unfailing Dispenser of Justice।'[১৩] রাসসুন্দরী দেবীর আত্মজীবনী পড়ে বুঝি প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি সব কিছুর মধ্যেই লেখিকা অনুভব করেছেন এক পরম পুরুষের মঙ্গল স্পর্শ। চরম দুঃখের দিনেও যেমন ঈশ্বরকে স্মরণ করে আশায় বুক বেঁধেছেন তিনি, তেমনি তুচ্ছাতিতুচ্ছ আনন্দেও ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে কখনও কুণ্ঠিত হননি। শ্বশুরবাড়ির চাকরদের কাছে ভাল ব্যবহার পেলেও মনে করেছেন ঈশ্বর বুঝি তাদের রাসসুন্দরীর সঙ্গে সদয় ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন বলেই তারা বালিকাবধূর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেনি।[১৪] রাসসুন্দরী দেবীর আত্মজীবনীতে অনেকগুলি ঈশ্বর বিষয়ক কবিতা ও কবিতার অংশ আছে। এদের প্রায় প্রত্যেকটিতেই মধ্যযুগীয় কবিদের ধারা অনুসরণ করে সংযোজিত 'ভণিতা' থেকে বোঝা যায় যে কবিতাগুলি রাসসুন্দরী দেবীরই রচনা। সাহিত্য হিসেবে এগুলি খুব উঁচু মানের নয়। কিন্তু পড়লেই বোঝা যায় লেখিকার বিশ্বাসের সরলতা। যেমন :

> ওহে প্রভু বিশ্বব্যাপী, বিশ্বময় বিশ্বরূপী
> কতরূপে কত অবতার।
> মহাদেবে কর মোহ, মোহিনী রূপেতে মোহ,
> তব মায়া কে হইবে পার ?[১৫]

বা,

> ওহে কৃষ্ণ রাধাকান্ত, কে জানে তোমার অন্ত,
> তুমি আদি অন্তের অন্তর্য্যামী।
> পুরাণেতে আছে ব্যক্ত ভবাদি স্তবে অসক্ত
> নারী জাতি কি জানিব আমি।[১৬]

এ রকম আরও বহু কবিতা আছে। প্রত্যকটিতেই ধরা পড়ে আত্মনিবেদনের সহজ সুর।

উনবিংশ শতাব্দীর বহু বঙ্গমহিলার জীবনেই দেখা যেত আন্তরিক ঈশ্বরভক্তির অবারিত প্রকাশ। সকলের ক্ষেত্রে হয়ত রাসসুন্দরী দেবীর মত শোকে নিরুদ্বিগ্নমনা হয়ে আত্মসমর্পন সম্ভব হয়নি, সবাই হয়ত চরম দুঃখের দিনে শান্ত হয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারেননি, কিন্তু ভগবৎ বিশ্বাস তাদের জীবনের এক বড় অংশ জুড়ে ছিল। এর একটা কারণ বোধহয় এই যে মেয়েদের সারা দিনের একটা মস্ত অংশ কাটত ঠাকুর

পুজোয়। সংসারের বিভিন্ন কাজের মধ্যে এটাও ছিল একটা প্রধান কাজ। দোল-দুর্গোৎসবের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ছিল খুব অল্প কয়েকটি পরিবারের। আমরা গত অধ্যায়ে দেখেছি যে, এ ধরনের বড় উৎসব ছাড়াও প্রায় সব বাড়িতেই প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার অন্যতম অঙ্গস্বরূপ ছিল দেবার্চনা। উনবিংশ শতাব্দীতে সদ্য গড়ে ওঠা শহুরে পরিবারের অধিকাংশেরই গ্রামের সঙ্গে পার্থক্য খুব প্রকটভাবে সূচিত হয়নি। ফলে, গ্রামকেন্দ্রিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত বাঙালির জীবনের অনেক আনুষঙ্গিকই শহরেও কিছু পরিমাণে অব্যাহত ছিল। এছাড়া মেয়েরা নিজেরা লেখাপড়া না জানলেও, তারা যে ধরনের কথকতা শুনত, যে ধরনের গান সে যুগে প্রচলিত ছিল, তাদেব মূল উপজীব্য বিষযের প্রভাবের অনিবার্য ফলস্বরূপও মেয়েদের জীবন হত ঈশ্বরমুখী। তবে, এ বিষয়েও প্রত্যক্ষ উপকরণ আমাদের হাতে খুব বেশি নেই। শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে যে অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে তাঁদের আত্মকথা লিখে রেখে গিযেছেন, তাঁদের সকলের রচনাতে রাসসুন্দরী দেবীর মত ঈশ্বরভক্তির ছবি পাওযা যায় না।

ঈশ্বরভক্তির প্রাবল্য না থাক, বহু মহিলাই সংসারের সহস্র সুখদুঃখের মধ্যে ঈশ্বরকে স্মরণ করতেন। সমাজ-সংস্কারক কিশোরীচাঁদ মিত্রের স্ত্রী কৈলাসবাসিনী দেবীর স্মৃতিচারণের মধ্যেও এই ঈশ্বরভক্তির পরিচয় মেলে। শিশুপুত্রের জন্ম সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন, 'শ্রীশ্রীজগত পিতাব [তদেব] কৃপাতে এই দায় থেকে মুক্তি হইলাম।'[১৭] শুধু নিজের কথাই নয়, ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দিহান ব্যক্তিদেরও রেহাই দেননি কৈলাসবাসিনী দেবী। তাদের তিনি পরিস্কারভাবে 'বানর' বলেছেন : 'নির্বোধ বানর মানুষ অনেক আছেন তারা ক্রমে নাস্তিক হইতে লাগিল।'[১৮] কেশব সেনের জননী সারদাসুন্দরী দেবীর (১৮১৯—১৯০৭) বিযে হয়েছিল দশ বছর বযসে, আর, দীক্ষা হয়েছিল মাত্র এগারো বছর বযসে। অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা মহিলা ছিলেন সারদাসুন্দরী দেবী। তিনি জানতেন, সৎ কাজ না করলে মানুষের মুক্তি হয় না। তাই, 'সর্ব্বদাই সৎকর্ম্মে লিপ্ত থাকিতাম। ক্রমে ক্রমে ধর্ম কর্ম একটা বাই হইল, তাহা হইতে শেষে তীর্থ দর্শনের একটা খুব ইচ্ছা দাঁড়াইল। . . . আমি যে মুক্তি পাব এই আশা করি, শুধু তাঁর পাদপদ্মে থাকিব—এই মাত্র ইচ্ছা।'[১৯] অনেক তীর্থও ভ্রমণ করেছিলেন তিনি—কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা, বিন্দ্যাচল।[২০] তবে, সারদাসুন্দরী দেবীর ধর্মমত সাধারণ হিন্দু মহিলাদের থেকে একটু পৃথক ছিল। এগারো বছর বয়স থেকে 'হরিনামের মালা গ্রহণ' করলেও, যত বয়স বেড়েছে, তত সারদাসুন্দরী দেবী স্থির বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিলেন যে 'এক ঈশ্বর ও তাঁর উপাসনা ভিন্ন আমার মুক্তি নাই। মানুষ যে সাকার উপাসনার দ্বারা মুক্তি পায় না, এই কথা আমি ঠিক বলিতে পারি না। নিরাকারের দ্বারা মানুষের মুক্তি হয়—ইহা আমি জানি এবং আমার নিজের মুক্তিও নিরাকারের উপর নির্ভর করিতেছে।'[২১] নিরাকার ঈশ্বর পূজা বা একেশ্বরবাদে বিশ্বাস পুত্র কেশব সেনের প্রভাবের ফল। কিন্তু যে রূপেই ঈশ্বরকে ডাকুন না কেন, তাঁর আত্মজীবনীতে ঈশ্বরের প্রতি নিবেদনের সুরটি স্পষ্ট।

অধিকাংশ হিন্দু মেয়েই কিন্তু শুধু সাকার পূজা নয়, পালন করত আরও বহু ব্রত-পার্বণ। মেয়েদের নিজস্ব জগৎ বোঝার জন্য এই ব্রতগুলির এক বিশেষ তাৎপর্য আছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার বলেছিলেন যে ব্রত হল মানুষের 'মনস্কামনার স্বরূপ'। সেই হিসেবে, মেয়েরা যে ব্রত উদযাবপন করত, সেগুলিতে তাদের মনস্কামনা, আশা-

আকাঙ্খা প্রভৃতি খুব সার্থকভাবে প্রতিফলিত হত। মেয়েদের পারিপার্শ্বিক, ক্ষুদ্র বিচরণ ক্ষেত্রের মধ্যে তাদের সুখদুঃখ প্রভৃতি থেকে এই ব্রতগুলির জন্ম। মেয়েরা কী ধরনের ব্রত উদযাপন করত তার কিছু বিবরণ শুনিয়েছেন প্রসন্নময়ী দেবী। 'সিপাহী বিদ্রোহে'র চেয়ে সামান্য বয়সে বড়[২২] : প্রসন্নময়ী দেবী স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছিলেন : 'শৈশবে আমরা সব বালিকা একত্র মিলিয়া কার্ত্তিক মাসে "যমপুকুর" ও বৈশাখে "পুণ্যপুকুর" পূজা ও "নিত্যসুন্দরী" "ফলদানের" ব্রত ইত্যাদি করিয়া তবে জল গ্রহণ করিতাম।' উত্তরকালের পাঠকদের জন্য 'পুণ্যপুকুর' পুজোর মন্ত্রও তিনি শুনিয়েছেন :

পুণ্যপুকুর পুষ্পমালা
কে পূজে ঠিক দুপুরবেলা ?
আমি সতী লীলাবতী
ভায়ের বোন ভাগ্যবতী,
শিবতুল্য স্বামী চাই,
কার্ত্তিক গণেশ কোলে পাই,
মরণ হয় জাহ্নবী জলে
এই বর মাগি চরণ তলে।[২৩]

পুণ্যিপুকুর বা পুণ্যপুকুর ব্রত গত শতকের সবচেয়ে বেশি পালিত ব্রত ছিল। এর প্রধান কারণ বোধহয় গ্রীষ্মকালের তীব্র জলকষ্ট। বৈশাখ মাসে সংক্রান্তির দিন থেকে শুরু করে এক মাস ধরে এই ব্রত পালন কর হত। *বামাবোধিনী পত্রিকা* এই ব্রতপালনের নিয়ম-কানুনের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছিল। কীট, পতঙ্গ ও পাখির যেখানে গতিবিধি থাকে অর্থাৎ ঘরের বাইরে একটি ছোট পুকুর খুঁড়ে, তার চারিদিকে গোবর লেপে, একপাশে গাছ পুঁতে এক পাশে শিবমন্দির, শিবমন্দিরের সামনে রাম-সীতা প্রভৃতি দশটি মূর্তি এঁকে ঐ পুকুর জল দিয়ে ভর্তি করতে হত। তারপর সেই পুকুরপুজো, শিবপুজো, দশটা পুতুল পুজো শেষ ক'রে গাছের তলায় আতপ চাল ও চিনি ছড়িয়ে দিতে হত। স্থান ভেদে পুণ্যিপুকুরের মন্ত্রও বিভিন্ন জায়গায় একটু একটু পৃথক হত। যেমন :

পুণ্যি পুকুর পুষ্পমালা
কে করেরে দুপোর বেলা।
আমি সতী লীলাবতী
ভাইয়ের বুন পুত্রবতী।
হবে পুত্র মরবে না,
চক্ষের জল পড়বে না।
পুত্র থুয়ে স্বামীর কোলে,
মরণ হোক্ গে গঙ্গাজলে ॥[২৪]

শিব পুজোর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা দশটি পৌরাণিক চরিত্রের ছবি আকত। এগুলি হল, সীতা,

রাম, লক্ষণ,দশরথ, কৌশল্যা, কুন্তী, অন্নপূর্ণা, পৃথিবী, গঙ্গা ও দুর্গার ছবি। এর প্রত্যেকটিই ছিল মেয়েদের বিভিন্ন মনস্কামনার প্রতীক। মেয়েরা একেকটা করে পুতুল ধরত আর কামনা করত সীতার মত সতী হই, রামের মত পতি পাই, লক্ষ্মণের মত দেবর পাই, দশরথের মত শ্বশুর পাই, কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাই, কুন্তীর মত পুত্র পাই, অন্নপূর্ণার মত রাঁধুনি হই, পৃথিবীর মত ধৈর্যবতী হই, গঙ্গার মত শীতল হই ও দুর্গার মত সোহাগী হই।[২৫]

শুধু পুণ্যপুকুর নয়, প্রত্যেক মাসে যে সব ব্রত-পার্বণ ছিল, তারও কিছু নমুনা পাই প্রসন্নময়ী দেবীর লেখায়। কার্তিক, মাঘ আর বৈশাখ ছিল 'পুণ্য মাস'। কার্তিক মাসে আকাশপ্রদীপ, যমপুকুর পুজো, ব্রাহ্মণ ভোজন, চণ্ডীপাঠ আর দান-ধ্যান। মাঘ মাসে ভোর বেলায় স্নান, পুরাণ শোনা, বস্ত্র বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে গৃহদেবতাকে খিচুড়ি, পিঠে-পায়েস ভোগ দেওয়া ছিল প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়িরই রেওয়াজ। আর বৈশাখে তো চৈত্র সংক্রান্তি থেকে শুরু করে ব্রত-পার্বণের ছড়াছড়ি : 'জলদান, ফলদান, নিত্য সুন্দরী (পুনর্জ্জন্মে নিরূপমা সুন্দরী হইবার জন্য), জন্মএয়তি ব্রত, দেবতাকে ভোগ, নারায়ণের মস্তকে ঝরণা এবং শাস্ত্র শ্রবণ ও শতনাম কীর্ত্তন হইত। দিনে গৃহিণীদিগের একেবারেই অবসর থাকিত না। সন্ধ্যাসমাগমে গৃহবিগ্রহের জন্য গন্ধমাল্য রচনা করা এবং চণ্ডীমণ্ডপের দালান স্বহস্তে শীতল জলে ধুইয়া বস্ত্রাঞ্চলে মুছিয়া শীতলপাটী বিছাইয়া জলযোগের আয়োজন করিতেন ও সমাগত আত্মীয় স্বজন গুরু পুরোহিতদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক শীতলভোগ খাওয়াইয়া কৃতার্থ হইতেন।'[২৬] পুরো বর্ণনাটি পড়লেই বোঝা যায়, ব্রত-পার্বণ অনুষ্ঠান ও আয়োজনের মধ্যে মেয়েদের কতটা সময় ব্যয়িত হত।

প্রসন্নময়ী দেবীর উল্লিখিত কয়েকটি ব্রত ছাড়া আরও বহু ব্রত মেয়েরা পালন করত। যেমন,হরিষ মঙ্গলচণ্ডী, জয় মঙ্গলচণ্ডী, সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডী, অরণ্যষষ্ঠী, মূলা ষষ্ঠী, নাগপঞ্চমী, গাড়শী, ক্ষেত্র, বুড়া ঠাকুরাণী, কুলই, নাটাই, পাটাই প্রভৃতি। অধিকাংশ ব্রতেরই উদ্দেশ্য ছিল দেব-দেবীর মহিমাকীর্তন। কিন্তু ব্রত কথার শেষে মেয়েরা যা প্রার্থনা করত, তা তাদের সার্বিক সামাজিক পরিস্থিতির প্রতিফলক। ব্রতকথার মন্ত্রগুলিতে সংস্কৃতের আড়ম্বর ছিল না, ছিল না উচ্চ ভাব বা মহতী কল্পনার কোন স্থান। মঙ্গলবার দিন মেয়েরা বিভিন্ন ব্রত পালন করত—অষ্টমঙ্গলা, মঙ্গলচণ্ডী, জল মঙ্গলচণ্ডী, হরিষ মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি। এর মধ্যে হরিষ মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত যে করে সে চিরকাল সুখে থাকে, তাকে চোখের জল ফেলতে হয় না, আর যে শোনে তারও মঙ্গল হয়।[২৭] তবে এটা হল ব্রত পালনের সাধারণ উৎসাহ-দান। প্রত্যেক ব্রততেই মেয়েদের নিজেদের কিছু প্রার্থনা থাকত, যা ছিল তাদের কামনাবাসনা থেকে স্বতোঃৎসারিত। যেমন, প্রত্যেক মঙ্গলবার জয় মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত উদ্‌যাপনের ফলে—

অপুত্রের পুত্র হয় নির্ধনের ধন।
অন্ধজনে চক্ষু লাভ বন্ধন মোচন॥
বিবাহ কামনা করি পুত্র-কন্যাবতী।
মনোমত কন্যা-বর লভে শীঘ্র গতি॥

যে গৃহেতে পূজা পান চণ্ডী ভগবতী।
চোর অগ্নি ভয় নাই নাহিক দুর্গতি ॥[২৮]

মাঘ মাসে মেয়েরা সূর্য ব্রত পালন করত। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের মধ্যে দুটি চতুষ্কোণ গর্ত তৈরি করে, সেগুলি চাল, আবির, হলুদ, ইট, নীল গুড়ো দিয়ে ভর্তি করে, সূর্য, চাঁদ, নক্ষত্র, আটঘাট, দেবদ্বার প্রভৃতির ছবি এঁকে মেয়েরা সূর্য প্রণাম করত। মেয়েরা সূর্যের কাছে প্রার্থনা করত :

পৃথিবী আইলা ভাসিয়া।
আমি ব্রত করি সোনার খাটে বসিয়া ॥
তিন কুণ্ডলী পূজি মুই।
তিন রাজ ভজি মুই।
আগে পূজি বাপের রাজ,—
দুধেভাতে খাইয়া।
মধ্যে পূজি স্বামীর রাজ,—
মৎস্যে ভাতে খাইয়া।
শেষে পূজি পুত্রের রাজ, —
ঘৃতে ভাতে খাইয়া।[২৯]

এখানে যে তিনটে 'বাজ্যের' কথা বলা হয়েছে, তা মেয়েদের জীবনে তিনটে পর্বের প্রতীক। বাল্যকালে সে পিতৃগৃহে প্রার্থনা করছে দুধভাত, মধ্য পর্যায়ে স্বামীর ঘরে স্ত্রীর কামনা মাছভাত, আর, বৃদ্ধ বয়সে বিধবা হয়ে পুত্রের সংসারে মা কামনা করছে ঘিভাত। মেয়েদের সার্বিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তাদের কামনাবাসনার এত সার্থক প্রকাশ একমাত্র ব্রতকথার প্রার্থনাতেই পাওয়া যায়।

এই সব ব্রতকথার উৎস আজ সঠিকভাবে নির্ধারণ করা অসম্ভব। তবে ব্রত পালনের মন্ত্র, তাদের কাহিনী প্রভৃতি পাঠ করলে অনিবার্যভাবে মনে হয় যে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়াই ছিল অধিকাংশ ব্রতকথার উদ্দেশ্য। এই ব্রতকথা ও তাদের কাহিনীগুলির কতটা পুরুষের ও কতটা নারীর সৃষ্টি, তার কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখেছি যে মেয়েদের শিক্ষাদানে ও গার্হস্থ্য আচরণবিধির ক্ষেত্রে তাদের কর্তব্য, অকর্তব্যের সীমারেখা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলার বিষয়ে বয়স্কা রমণীদেরও উৎসাহ অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদের মতই ছিল। তাছাড়া ব্রতকথাগুলির মধ্যে—তাদের বিশদ বিরণের মধ্যে—এমন এক 'রমণীয়' ব্যাপার আছে যে স্বভাবতই মনে হয়, বোধহয় এদের আদি রচনার ক্ষেত্রে না হলেও এই ব্রতকথাগুলির প্রচার ও পরিমার্জনের ক্ষেত্রে মেয়েদের একটা বড় ভূমিকা ছিল। এর থেকে আরও একটি বিষয় মনে হয় যে নারীরা যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধারক ও বাহক হতে পারেন এই ব্রতকথাগুলিও বোধহয় তার অপর সাক্ষ্য। তাই প্রত্যেক ব্রত কথাতেই আমরা পাই ষড রিপুর কোনটির প্রাবল্যের ফলে মানুষের দুর্গতি ও তারপর উপাস্য দেবতার দয়ায় দুর্গতিমোচনের কাহিনী। এগুলির মাধ্যমে মেয়েদের মধ্যে অবশ্যই গুরুভক্তি, গার্হস্থ্য

ধর্মের প্রতি আস্থা, চারিত্রিক সংযম প্রভৃতি শেখানোর উদ্দেশ্য প্রবল ছিল কিন্তু মেয়েদের মানসিক প্রস্তুতির প্রসঙ্গও উপেক্ষা করা যায় না। যেমন, পৌষ মাসে লক্ষ্মী পুজো করলে মানুষ ধনে-জনে সুখে-শান্তিতে দিন কাটায়। এই ব্রতকথার শেষে লক্ষ্মী দেবী বলছেন: 'মানুষের দেওয়া কুলোয় না, লক্ষ্মীর দেওয়া ফুরোয় না, শঙ্খে আছি চক্রে আছি গদায় আছি পদ্মে আছি, এক অংশ ব্রাহ্মণে আছি, এক অংশ রাজাতে আছি, দুঃখী দেখে খেতে দিও, রুখু মাথায় তেল দিও, নিবস্ত্রকে বস্ত্র দিও . . . অহঙ্কার করো না, লক্ষ্মীশ্রী হয়ে থেকো, ঘরে লক্ষ্মী অচলা হয়ে থাকবেন . . . ।'[৩০] একই রকমভাবে, বারমেসে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করা হত দূরের মানুষকে নিকটে আনতে, শত্রুকে পরাজিত করতে, মিত্রের জয়ে সাহায্য করতে, মানবাঞ্ছা পূর্ণ করতে, ধূপ ধুনোর বাতাস খেতে ও ধন-পুত্র-লক্ষ্মী লাভ করতে।[৩১] কার্তিক মাসে মেয়েরা যমপুকুর ব্রত পালন করত চারটি বাসনা পূরণের জন্য—'এই ব্রত করলে ধর্ম হয়, পুণ্যি হয়, জয়ন্তেতে মাছ খায়, মরলে স্বর্গে যায়'।[৩২] উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মেয়েদের এই চারটি প্রার্থিত বস্তুর চেয়ে বড় উচ্চাশা আর কী ছিল?

সতীত্বের আদর্শকে মেয়েরা খুব শ্রদ্ধা করত। বহু ব্রতকথায় আমরা মেয়েদের সারা জীবন সতী হয়ে বেঁচে থাকার প্রার্থনা করতে শুনি! পুণ্যিপুকুর, হরিষ মঙ্গলচণ্ডী, নাটাই, সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডী, ইতুর পুজো প্রভৃতি প্রত্যেক ব্রতকথাতেই মেয়েরা সতী হওয়ার জন্য প্রার্থনা জানাত। শান্তা দেবী আত্মজীবনীতে ছোটবেলায় দেখা হরিরচরণ ব্রতের উল্লেখ করেছেন:

> হরির চরণ হরির পা,
> হরি বলেন ওগো মা,
> আজ কেন আমার ঠাণ্ডা গা
> কোন সতী পূজেছে পা?
> সে সতী পুণ্যবতী
> সাতভায়ের বোন সাবিত্রী সতী . . .

সেই সঙ্গে পাই ধনে-জনে পুত্র-পৌত্র সহ পরিপূর্ণ এক সংসারের বাসনা। পুত্রের অকাল মৃত্যুর ভয়ে মেয়েরা অরণ্যষষ্ঠী ব্রত পালন করত। অরণ্যষষ্ঠী ব্রত শেষ করার পর মেয়েরা প্রার্থনা করত:

> হয়ে পুত্র মরবে না
> চোকের জল পড়বে না।[৩৪]

অনুরূপভাবে, পুত্রের আয়ু কামনায় মেয়েরা পাটাই ব্রত পালন করত।[৩৫]

গত শতকের মেয়েদের দাম্পত্য-জীবন প্রায়ই সুখের হত না। অথচ, মেয়েরা জীবনের বাকি সব সুখের বিনিময়েও স্বামীর ভালবাসা কামনা করত। বিভিন্ন ব্রতকথায় এই কামনা নানা ভাবে প্রকাশ পেত। আলপনা পুজোর পর মেয়েরা প্রার্থনা করত:

খাট পালঙ্ক দেব দোলঙ্গ গিরদে আশে পাশে,
রূপ যৌবন সদাই সুখী স্বামী থাকে পাশে।[৩৬]

এছাড়া ছিল স্বামীসোহাগ ব্রত। প্রথম রজঃস্বলা হওয়ার পর সন্তান না হওয়া পর্যন্ত এই ব্রতের অনুষ্ঠান করতে হত। এই ব্রত যারা পালন করত তাদের স্বামীর মঙ্গল কামনায় প্রত্যেক দিন সকালে গো, ব্রাহ্মণ ও দ্বিজাতিদের পুজো করতে হত, স্বামীর যাবতীয় আদেশ নির্বিচারের পালন করতে হত, স্বামীর ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ খেয়ে থাকতে হত ও স্বামী বাইরে থেকে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরলে তার হাত-পা ধুইয়ে দিতে হত।[৩৭]

স্বামীর নিঃসঙ্গ প্রেম প্রার্থনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিল সতীনের অকল্যাণ কামনা। এই প্রসঙ্গটির একটি আলাদা তাৎপর্য রয়েছে। কারণ, সতীনের সঙ্গে ঘর করা ছিল মেয়েদের একান্ত নিজস্ব সমস্যা। স্বামীর একাধিক স্ত্রী থাকলে স্বামীর ভালবাসা ভাগ হয়ে যাবে, তাই মেয়েদের কাছে সতীনের মৃত্যুর মত আনন্দময় ঘটনা খুব কমই ছিল। বহু-বিবাহ প্রথা বাংলাদেশে এত ব্যাপক ছিল যে সতীনের ভয় খুব ছোটবেলা থেকে মেয়েদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হত। মেয়েরা পাঁচ বছর বয়স থেকে সতীনের অমঙ্গল কামনায় ব্রত পালন করত। এই ব্রতের মন্ত্র ছিল :

হাতা ২ হাতা, খা সতীনের মাতা [মাথা],
বেড়ী ২ বেড়ী সতীন বেটী চেড়ী।[৩৮]

অনেক সময়ে মেয়েরা প্রার্থনা করত :

তেঁতুল খানি ঢলা ঢলা, সতীনের হোক চোখটি কানা
মাছি, মাছি, মাছি, সতীন মলেই বাঁচি।
উদ্বেরালী হুতুযা, ভাতার রেখে সতীন খা।
ময়না, ময়না, ময়না, সতীন যেন হয় না।
যদি সতীন হয় যেন মরে যায়।[৩৯]

বহু ক্ষেত্রে মেয়েদের নিত্যকর্মপদ্ধতির অঙ্গস্বরূপ ব্রতপালনের এই রীতি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। অনেকগুলি ব্রত গ্রামে পালিত হত বটে, কিন্তু শহরেও ব্রত-পার্বণের সংখ্যা কম ছিল না। ফলে, বঙ্গ মহিলাদের সমগ্র জীবনবোধের সঙ্গে এগুলি এত ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিল যে দেবার্চনা বা ব্রতোপবাস বাদ দিয়ে গত শতকের মহিলাদের অস্তিত্বই যেন কল্পনা করা যায় না।

সব মেয়েই যে খুব ভক্তিভরে দেবর্চনা করত, তা নয়। তবে ঐতিহ্য, পারিবারিক রীতি, সংস্কার—সব কিছু মিলে মিশে মেয়েদের দিনের একটি অংশ কোন না কোন ভাবে ব্যয়িত হত ঠাকুরপুজোয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও এই ঐতিহ্য যে চলে এসেছিল, তার প্রমাণ আমরা পাই হেমন্তবালা দেবীর স্মৃতিচারণে। ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুরের জমিদার তনয়া হেমন্তবালা বাড়ির কর্ত্রীদের 'বারব্রত, উৎসব পার্বণ দেবসেবা এবং নিত্য পূজাহ্নিক ছাড়া কথকতা, যাত্রাগান, মনসামঙ্গল'[৪০] প্রভৃতির উল্লেখ যেমন করেছেন,

তেমনি, শুনিয়েছেন তাঁর ছোটবেলায় পালনীয় কর্তব্যাদির কথা।[৪১] উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মকেন্দ্রিক জীবনে আচার অনুষ্ঠান মেয়েদের নিজস্ব জগতের এমন অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছিল যে বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী অনুসারে স্ত্রীশিক্ষার ফলে মেয়েদের মধ্যে ধর্মভাব লোপ পাবে বলে অনেক মহিলা সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। সুবাসিনী সেহানবীশ ধর্মহীন শিক্ষাকে মেয়েদের গুরু দায়িত্বভার সম্পাদনের পরিপন্থী বলে বর্ণনা করেছিলেন।[৪২] উনিশ শতকের নারী ধর্মাচরণকে শুধু জীবনযাত্রার বহিরঙ্গে নয়, অন্তরেও গ্রহণ করেছিলেন।

॥ তিন ॥

ধর্মকর্ম মেয়েদের নিজস্ব জগতের অঙ্গ ছিল নিঃসন্দেহে, কিন্তু প্রধান দিক ছিল না। রক্তমাংসের মানবীর পার্থিব দুঃখ-সুখের ঘাতপ্রতিঘাতের জীবন ছিল আরও বাস্তব। সংসারের সহস্র বাঁধনের 'স্থূল-সূক্ষ্ম নানাবিধ ডোরে' বাঁধা ছিল মেয়েদের দৈনন্দিন জীবন। আর, এই দৈনন্দিনতা থেকেই গড়ে উঠেছিল তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, প্রাত্যহিকতার সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যেই মেয়েরা গড়ে তুলেছিল তাদের নিজস্ব পৃথিবী।

ঘরদোরের কাজের মধ্যে প্রধান ছিল রান্না। ভাল রান্না করার মধ্যে কেবল রন্ধন পটুতাই নয়, অধিকাংশ মেয়ের কাছেই তা ছিল নিকটজনকে প্রায় 'সেবা' করার সমগোত্রীয়। তাই তারা বিশ্বাস করত যে কেবল রাঁধলেই চলবে না, পরিবারের সমস্ত আত্মীয়স্বজনদের সেই রান্না স্বহস্তে পরিবশন করে খাওয়াতে হবে এবং যদি কোন কারণে কোন মেয়ে নিজে রাঁধতে নাও পারে, তার রান্না পরিদর্শন করা ও অন্যদের খাওয়ার সময়ে উপস্থিত থাকা কর্তব্য।[৪৩] রান্নার মধ্যে মেয়েদের একটা মানসিকতা ধরা পড়ত। নিজের হাতে রেঁধে নিজের হাতে পরিবেশন করে খাওয়ানোর মধ্যে তাদের এক বিশেষ তৃপ্তি ছিল। পরিবেশিত খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে থাকত অদৃশ্য স্নেহ, ভালবাসা ও বাৎসল্য। গত শতকের একটি প্রচলিত প্রবাদ ছিল : 'কে রাঁধে গো ? কয়লা কড়াই খুন্তী, রাঁধে তোমার মনটি।' অধিকাংশ বাড়িতে গৃহিণীরা নিজেরাই রান্না করতেন। এমনকি, অসুস্থ অবস্থায়ও যতদিন সম্ভব নিজেরা রান্না করতে চাইতেন। ইন্দিরা দেবী তাঁর মায়ের সম্বন্ধে লিখেছেন যে রুগ্ন ও দুর্বল শরীরেও তিনি ঘরের সব কর্তব্য একাই করতেন, আর, রান্নার কাজে তিনি এত দক্ষ ছিলেন যে তাঁর হাতে রোগীর পথ্য পর্যন্ত সুস্বাদু হত।[৪৪]

অন্যের হাতের সুস্বাদু রান্না নয়, নিজের রান্নার স্মৃতিও মনে থাকত অনেক মহিলার। সুদক্ষিণা সেনও মনে রেখেছিলেন। আত্মজীবনী লিখতে বসে আর পাঁচটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মতই উল্লেখ করতে ভোলেননি 'ভারতাশ্রমে' তাঁর রান্নার স্মৃতি। 'ভারতাশ্রমে'র নিয়ম ছিল, প্রত্যেক মেয়েকে একেক দিন একেকটা তরকারি রাঁধতে হবে। সুদক্ষিণা সেনের পালা যেদিন এল, তিনি ভাঁড়ার থেকে আলু, নারকেল, ছোলা, পরিমাণ মত তেল, ঘি, মসলা বের করে রন্ধনে উদ্যোগী হলেন। লেখিকার বাপেরবাড়ি ছিল পূর্ব বাংলায়। রান্নার উপকরণাদির সমাবেশ দেখে সবাই বলতে লাগলেন, বাঙালদেশের রান্না। দু-একজন সন্দিগ্ধমনা ছদ্ম সংশয় ব্যক্ত করলেন, 'ও কি আর মুখে তোলা যাবে ?' পরিহাস গায়ে না মেখে সুদক্ষিণা সেন রাঁধলেন, এবং 'সেইদিন আমি পরিবেশন করিলে

সকলেই ব্যঞ্জন আস্বাদন করিয়া বলিলেন, “তরকারীর স্বাদটি সুন্দর হইয়াছে, আমরা ত ভাবিয়াছিলাম তরকারী খাওয়াই যাইবে না”।[৪৫] এই যে সকলে খেয়ে ভাল বলেছিলেন, প্রশংসা করেছিলেন, এখানেই লেখিকার তৃপ্তি—তাঁর ‘সৃষ্টিকর্মে’র সার্থকতা। আবার কেবল রাঁধা-বাড়াই নয়, সংসারের বহু খুঁটিনাটির সঙ্গেই ছিল মেয়েদের গভীর মায়া-মমতার সম্পর্ক। রান্নার পরেই ছিল সন্তানপালনের দায়িত্ব। সন্তানপালন মানে শুধু বাচ্চাকে খাওযানো, ঘুম পাড়ানো নয়। বাচ্চাকে বড় করে তোলার মধ্যে একটা নৈতিক দায়িত্বও অর্পিত হত। এই নৈতিক দায়িত্বের জন্যই বোধহয় মাতৃত্বের সঙ্গে দেবত্বকে একত্রিত করা হত। রাঁধা-বাড়ার মত সন্তানপালনেও গত শতকেব মেয়েদের জীবনের একটা বড় অংশ ব্যয় হত। এটি স্পষ্ট বোঝা যায় রাসসুন্দরী দেবীর আত্মজীবনী থেকে। রাসসুন্দরী দেবীর মত আরও অনেক মা-ই নিশ্চয় অনুভব করেছিলেন সন্তান পালনের যুগপৎ কষ্ট ও আনন্দের অনুভূতি : ‘হে দীননাথ। একটি সন্তান পালন করিতে মায়ের যে কত প্রকার যাতনা আব কষ্ট সহ্য কবিতে হয়, তাহা তোমার প্রসাদে আমি বিলক্ষণ জানিযাছি। ছেলের জন্য মায়ের যে এত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয, ইহা আমি পূর্বে জানিতাম না।’[৪৬] যদিও রাসসুন্দরী দেবী যন্ত্রণার কথা লিখেছেন, আসলে এই শব্দটির মধ্যে আনন্দের অভিব্যক্তিই স্পষ্ট। সন্তান পালনের এত ঝঞ্ঝাট সত্ত্বেও কী অসীম মমত্ব দিযে তিনি বড় করে তুলেছিলেন নিজের সন্তানদের। এই কাজে সফল হওয়ার জন্য কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেছেন ঈশ্বরকে।

আর ঠিক তখনই অনুভব করেছিলেন নিজের মায়ের কথা। মা হওয়া নয় মুখের কথা—এ সবাই জানে। কিন্তু নিজের ওপর দায়িত্ব না এলে সম্যক অনুধাবন করা যায় না কর্তব্যের গুরুত্ব। রাসসুন্দরীও পারেননি প্রথমে। পেরেছিলেন নিজে মা হয়ে। আর সেই কারণেই, তাঁর দোষ-ত্রুটির জন্য মা কত কষ্ট পেয়েছিলেন, ভেবে নিজেই অনুতপ্ত হতেন। তিনি মাকে দুঃখ দিযেছিলেন, কেবলমাত্র এটা মনে হওয়াতেই নিজের জীবনের কোন সার্থকতা খুঁজে পাননি : ‘হা বিধাতঃ। তুমি কেনই বা আমাকে মানবকুলে সৃষ্টি করিয়াছিলে ? পৃথিবী মধ্যে পশু পক্ষ্যাদি যে কিছু ইতর প্রাণী আছে সর্ব্বাপেক্ষা মনুষ্যজন্ম দুর্ল্লভ বটে। সেই দুর্ল্লভ জন্ম পাইয়াও আমি এমন মহা পাতকিনী হইয়াছি। আমার নারীকুলে কেন জন্ম হইয়াছিল ? আমার জীবনে ধিক। পৃথিবী মধ্যে মাতার তুল্য স্নেহময়ী আর কে আছে। মাতাকে পরমেশ্বরের প্রতিনিধি বলিলেও বলা যায়।’[৪৭] রাসসুন্দরী দেবীর মায়ের প্রতি ব্যবহারের জন্য এই অনুশোচনা মূলতঃ নিজের মাতৃপদের গুরুত্ব উপলব্ধির ফল। রাসসুন্দরী দেবীর রচনা থেকে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাধারণ মানবীর মনে মাতৃত্ব সম্বন্ধে কী ধারণা ছিল, তার কিছুটা অনুমান করতে পারি। সে যুগের মহিলারা যখন তাঁদের বিভিন্ন লেখায় সন্তানপালনের ওপর এত গুরুত্ব দিয়েছেন, সেটা বোধহয় অনেকটাই তাদের সচেতন বিশ্বাসের প্রতিফলন।

তবে শুধু সন্তানপালনের গুরুত্ব নয়, রাসসুন্দরী দেবীর রচনা আমরা শুনতে পাই নারী জীবনের নিঃশব্দ কান্নাও। মায়ের মৃত্যুকালেও রাসসুন্দরী দেবী মাকে দেখতে যেতে পারেননি। তিনি যে ইচ্ছা করে যাননি, তা-তো নয়। তবু তিনি নিজের জীবনকে ধিক্কার দিয়েছেন। এ ধিক্কার প্রকৃতপক্ষে তাঁর মেয়েজন্মকে ধিক্কার : ‘আমি যদি পুত্রসন্তান হইতাম, আর মার আসন্ন কালের সম্বাদ পাইতাম, তবে আমি যেখানে থাকিতাম, পাখীর

মত উড়িয়া যাইতাম। কি করিব, আমি পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গী।'[৪৮] অতএব দোষারোপ ভাগ্যকে, নিজের কৃতকর্মকে নয়।

এ রকম আরও বহু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বাক্যে বা বাক্যাংশের মধ্য দিয়ে মেয়েদের মনের অনেকটা প্রতিফলন পাওয়া যায় সমসাময়িক লেখাপত্রে। শুধু রাসসুন্দরী নন, এভাবে আরও অনেকেই নারীজন্মের জন্য আক্ষেপ করে গিয়েছেন। পুরুষেরা যতই সমাজে রমণীর উচ্চ স্থান নিয়ে আদর্শগত বাগাড়ম্বর করুন, এমনকি, কিছু মহিলাও সেই মত পোষণ করলেও, সাধারণ বাঙালি ঘরের মহিলা কি নির্দ্বিধায় মেনে নিতে পেরেছিলেন সেই সব মতবাদকে ?

অনুন্নত চিকিৎসাবিজ্ঞানের যুগে বহুবৎসা হওয়ার ফলে অনেক মেয়েরই জীবনে পুত্রশোক পেতে হয়েছিল। এগারোটি সন্তানের মধ্যে ছটি পুত্র-কন্যার মৃত্যু সহ্য করতে হয়েছিল রাসসুন্দরী দেবীকে।[৪৯] রাসসুন্দরী দেবীর পরম আস্তিক মন তবু এত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও ঈশ্বরের মঙ্গলময় হাতের স্পর্শ খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু সবাই এভাবে নিজের মনকে প্রবোধ দিতে পারেননি। যেমন পারেননি কৈলাসবাসিনী দেবী। কৈলাসবাসিনী দেবী আত্মজীবনী লিখতে শুরু করেছিলেন পুত্রের মৃত্যুর বহুদিন পর। তবু সে শোক উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল—'আমি জে [তদেব] এখন লিখিতেচি কিন্তু চকের জলে কাগচ ভিযে জাচ্চে [তদেব]। এ যে কি দুঃখু তাহা আমি বলিতে পারিনে। আমার মাইখেকো ছেলের পুত্র শোক। আমি যে কি করে শয্য [তদেব] করিব।'[৫০] বানান লক্ষ করলেই বোঝা যায় যে খুব বেশি লেখাপডার সুযোগ পাননি লেখিকা। আর, বোধহয় সেই কারণেই সাংসারিক দুঃখশোক খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এসেছে তাঁর লেখায়। শিক্ষার কোন মার্জিত প্রলেপ পড়েনি তাঁর অনুভূতির ওপর।

পুত্রশোকেই নয শুধু, আরও টুকরো টুকরো ছোট ছোট অংশেও ধরা যায় মাতৃত্বের কোমল রূপটি। যেমন উনবিংশ শতাব্দীতে যে কজন উল্লেখযোগ্য মহিলা কবি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, তাঁদের অনেকের কবিতায়।

গার্হস্থ্য ছবি আঁকায় অত্যন্ত কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪)। দীর্ঘ বৈধব্যজীবনের সূচনায় স্বামীর মৃত্যুতে শোকার্তা এই রমনীর কাব্যগ্রন্থ *অশ্রুকণা* গিরীন্দ্রমোহিনীকে সর্বাধিক খ্যাতি দিলেও, তাঁর সব কটি কাব্যগ্রন্থেই মহিলামনের স্বাভাবিক বাসনা-কামনার প্রকাশ চোখে পড়ে। ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত *শিখা* কাব্যগ্রন্থের 'চোর' কবিতায় বাৎসল্য রসের যে স্বাভাবিক স্ফুরণ লক্ষ করা যায়, তা বোধহয় এই কবির একার মানসিক অনুভূতি নয়। সে সময়ে অনেক মা-ই তার শিশুপুত্রের দিকে তাকিয়ে ভাবতেন :

কোথা হ'তে এলি তুই, ওরে ওরে ওরে চোর,
সর্ব্বস্ব লইলি হরি যাহা কিছু ছিল মোর।
কোলের উপরে বসে
হৃদয় লইলি চুষে —
বুকেতে কাটিয়া সিঁধ, এমনি, সাহস তোর,
কোথা হ'তে এলি দুঁদে রে ক্ষুদে সিঁদেল চোর।[৫১]

এখানে মাঝের দুটি পংক্তি বিশেষ লক্ষণীয় : 'কোলের উপরে বসে/ হৃদয় লইলি চুষে'। মায়ের কোলে বসে শিশুর মাতৃস্তন্য পানের দৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে গিরীন্দ্রমোহিনী 'হৃদয় লইলি চুষে'—শব্দ তিনটি ব্যবহার করেছেন। স্তন্য অর্থে 'হৃদয়' শব্দটি ব্যবহার করায় বাৎসল্য রসের পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। শিশু তো কেবল মাতৃদুগ্ধই পান করছে না, সেই মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে মা তার হৃদয়ের একটি অংশও দান করছে শিশুকে। এই মাতৃত্বভাব বোধহয় উনবিংশ শতাব্দীর মহিলাসত্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে ছিল। তাই গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীকেই বলতে শুনি :

মা নাই ঘরেতে যার ছেলে কোলে নাই যার
যত কিছু সব তার মিছে।
চাঁদে চাঁদে হাসাহাসি চাঁদে চাঁদে মেশামেশি
স্বর্গে-মর্ত্যে প্রভেদ কি আছে।[৫২]

মানকুমারী বসুর (১৮৬৩-১৯৪৩) *কাব্যকুসুমাঞ্জলির* (প্রথম প্রকাশ, ১৮৯৩) 'প্রিয়বালা' কবিতাটিতে একই মনোভাবের প্রকাশ দেখি। প্রিয়বালা মানকুমারী বসুর একমাত্র সন্তান এবং এই সন্তানের জন্মের পরই তিনি বিধবা হন। ফলে অনিবার্যভাবে তাঁর কবিতায় প্রবেশ করেছিল দুঃখ-শোকের ছায়া। গত শতকের বহু মহিলা কবির রচনাতেই বিষাদের সুর প্রধান হয়ে উঠেছিল। এঁরা বিষাদ-বিলাসিনী নন, তাঁদের জীবনে দুঃখের ভাগ বেশি বলে বোধহয় তাঁদের রচনারও সর্ব অঙ্গে বিষণ্ণতা ঘিরে থাকত। অধিকাংশেরই জীবন থেকে চাওয়ার মত কিছু ছিল না। তাই সব স্নেহ এসে জমা হত সন্তানের ওপর। মানকুমারী বসুও সেভাবেই তাঁর দুঃখ ভুলতে চেয়েছিলেন। মেয়েকে উদ্দেশ্য করে তিনি লিখেছিলেন :

তোমায় দেখে বিশ্ব গলে
ব'য়ে যায় কি প্রেমের ঢেউ।
থাকে নাকো ঝগড়াঝাটি
পর থাকে না একটি কেউ।
তখন আমার জগৎখানি
কেবল ব্রহ্মময়,

. . .

তখন আমার শব্দগুলো
বেদ-বেদান্তের কথা কয়।[৫৩]

শিশুর প্রতি মেয়েদের এই প্রাণ উজার করা ভালোবাসা কেবলমাত্র নিজের সন্তানদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকত না। সচেতনভাবে বা অবচেতনে, যেখানেই শিশু সেখানেই তাদের জড়িয়ে নিয়ে গত শতকের মহিলারা পেতে চাইতেন আন্তরিক পরিতৃপ্তি। মাতৃত্ব যেমন

নারীসত্তার অবিচ্ছেদ্য দিকস্বরূপ ছিল, তেমনি আবার প্রতিটি শিশুই বোধহয় মাতৃত্বের ভাবোদ্বোধকের কাজ করত। মানকুমারী বসু 'অভ্যর্থনা' কবিতাটি লিখেছিলেন একটি সদ্যোজাত শিশুকে উদ্দেশ্য করে :

আমাদের বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
বুকে বুকে লুকানো গরল,
পরাণেও পাপের কালিমা,
তোরে যাদু কোথা থোব বল ?
তবু যদি — দয়াময় বিধি —
দেছে তোরে এ মর-ধরায়,
দূর হোক বেদনা যাতনা,
আয় যাদু। বুকে আয় আয়।[৫৪]

এভাবে যে কোন শিশুই অবাধে প্রবেশ করেছে মেয়েদের নিজস্ব জগতে, গড়ে উঠেছে বহুভাবে বঞ্চিত মেয়েদের জীবনের একটি অনির্বচনীয় আনন্দের দিক।

॥ চার ॥

সাধারণ বাঙালি বাড়িতে কন্যার জন্মকে খুব সাদরে গ্রহণ করা হত না। মেয়েদের নিজেদেরও বহু ক্ষেত্রে অসন্তোষ থাকত। তবে গত শতকে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা নতুনভাবে ভাবতে শুরু করেছিল। ফলে, নিজেদের অধিকার তারা দৃপ্তভাবে ঘোষণা না করলেও, দুই প্রজন্মের মানসিকতার মধ্যে কিছু ফারাক আমাদের চোখে পড়ে। যেমন, কৈলাসবাসিনী দেবী। এক পুত্রের মৃত্যুর পর কন্যাসন্তানের জন্ম হওয়ায় সবাই কৈলাসবাসিনীকে সান্ত্বনা দিলেন—যা হয়েছে, ভালই হয়েছে, এখন অল্প বয়স, পরে পুত্র সন্তানের মুখ দেখার সুযোগ পাওয়া যাবে ইত্যাদি। সবাই সেভাবে মেনে নিলেও কৈলাসবাসিনী দেবীর শাশুড়ী পারেননি। কৈলাসবাসিনী দেবী লিখেছেন : 'কিন্তু আমার শাসুড়ি [তদেব] ঠাকুরানি [তদেব] বড় দুঃখিত হলেন। বলেন জে [তদেব] সোনা হারিয়ে কাঁচ পাইলাম। আমার স্বামি বড় আহ্লাদিত হইলেন। চিটি নিকিলেন তোমার একটি কন্যা হইয়াচে সুনে [তদেব] কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি তাহা বর্ণনা জায় [তদেব] না। . . . শ্রীশ্রীজগতপিতার কাচে [তদেব] সব সমান। আমাদের কাচে [তদেব] সব সমান ভাবা উচিত।'[৫৫]

যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কৈলাসবাসিনী দেবীর স্বামী কিশোরীচাঁদ মিত্র পুত্র ও কন্যাকে সমানভাবে দেখতে স্ত্রীকে শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই দৃষ্টিভঙ্গিটাই নতুন—এটি একান্তভাবে উনবিংশ শতাব্দীর ধ্যান-ধারণা থেকে জাত। বাঙালি সমাজ যে গত শতকে নর-নারীর সাম্য স্বীকার করে নিয়েছিল, তা নয়। তবে দু-একজনের চিন্তাভাবনায় অন্তত এই ধারণাটা ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করছিল। এখানেই কিশোরীচাঁদ মিত্রর প্রজন্মের সঙ্গে তাঁর মায়েব মানসিক ব্যবধান। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি

মেয়েদের পত্রিকা প্রকাশিত হত। সে সব রচনায় মেয়েদের পত্রিকায় পড়লে বোঝা যায় যে স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্য উপযুক্ত শিক্ষিতা মহিলার সংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বহু মহিলা নিয়মিতভাবে স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখতেন।

গত শতকের যাটের দশকের মধ্যভাগে জনৈক কামিনী দত্ত স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে লিখেছিলেন যে, যেহেতু পুরুষ ও নারী উভয়কে নিয়েই সমাজ সংগঠিত হয়, তাই সমাজের যাবতীয় কর্তব্যের ভার সমানভাবে পুরুষ ও নারীর ওপর অর্পিত। সেই বিচারে, মেয়েরা শিক্ষিত না হয়ে কেবল পুরুষ যদি শিক্ষিত হয়, তা হলে দেশের উপকার সম্ভব নয়।[৫৬] এখানে লক্ষণীয়, একজন মহিলা বিদ্যাবলে বলবতী হয়ে পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে সামাজিক দায়-দায়িত্ব বহন করে নেবার সচেতনতা প্রকাশ করেছেন এমন এক সময়ে যখন অধিকাংশ মেয়ের পক্ষেই লেখাপড়ার অর্থ ছিল সমাজের কর্তাব্যক্তিদের অসংখ্য ভ্রূকুটি।

কামিনী দত্তের এই রচনার পর গত শতকের যে তিন দশকেরও বেশি সময় বাকি ছিল, সে সময়ে শিক্ষিত মেয়েরা নিয়মিতভাবে বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছিল। তাদের ক্ষুদ্র জগতের মধ্যে একটা উপলব্ধি ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছিল যে 'স্ত্রীলোকের উচ্চ শিক্ষার বহুল প্রচার না হইলে বঙ্গদেশের জাতীয় উন্নতি সুদূর পরাহত।'[৫৭] লেখাপড়া যে তাদের জীবনযাত্রাকে উন্নততর করবে, এই প্রত্যয় উত্তরকালের মহিলাদের শিক্ষালাভে উৎসাহিত করেছিল।

কিন্তু এই বিশ্বাসের মধ্যেও মেয়েরা সাধারণতঃ বিচ্যুত হতে চায়নি তাদের বদ্ধমূল ধ্যান-ধারণা থেকে। প্রথমত ছিল সমাজের নানাবিধ বিধি-নিষেধ। তার ওপর, মেয়েরা নিজেরাও সর্ববিধ দেশীয় রীতি-পদ্ধতিকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে বিদেশি শিক্ষার পরানুকরণ একান্ত বাঞ্ছিত মনে করেনি। অন্তত, বয়স্কা রমণীরা তো এর পুরোপুরি বিরোধী ছিলেন। অল্পবয়সী মেয়েদের চিরাচরিত কর্মক্ষেত্রের বাইরে বেরিয়ে এসে স্বচ্ছন্দ পদচারণায় তারা রীতিমত কুণ্ঠিত ছিলেন। তারা প্রায়ই আক্ষেপ করতেন যে সীতা-সাবিত্রীর দেশে জন্মেও মেয়েরা মহান আদর্শকে বিস্মৃত হয়ে 'ভোগলালসা পরিতৃপ্তির জন্য লালায়িত।'[৫৮]

এই আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য অধিকাংশ মহিলা চাইতেন 'ধর্মভাবপূর্ণ' শিক্ষার প্রবর্তন। 'শ্রীমতী চ —' স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে 'রক্ষণশীল' ও 'প্রগতিবাদী' উভয়ের মতামতই তুলে ধরেছিলেন। এক দল বলতেন যে মেয়েরা ঘরের মধ্যে থাকবে, গৃহস্থালির কাজকর্ম করবে, নিজের নাম লিখবে—তা হলেই হল। অপরদিকে, 'প্রগতিবাদী'দের মধ্যে অনেকে অভিলাষী ছিলেন সম্পূর্ণ কেতাবী ঢংএ মেয়েদের শিক্ষা দিতে।[৫৯] 'শ্রীমতী চ —' দুটোর একটাতেও সম্পূর্ণ সুখী হতে পারেননি। মেয়েরা একেবারে আদৌ লেখাপড়া করবে না, এটা যেমন যুক্তিবাদী কোন মনের পক্ষে ঊনবিংশ শতকের শেষে নির্বিচারে মেনে নেওয়া অসম্ভব ছিল, তেমনি এ ধারণাটাও ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না যে খুব বেশি লেখাপড়া করলে মেয়েরা পুরুষে পরিণত হবে। কোন অজ্ঞাত কারণে, বোধহয় প্রচলিত রীতি ও ঐতিহ্যের জন্যও হতে পারে, মেয়েদের মনে কিছু কিছু শিক্ষার সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য একাত্মীকরণ হয়ে গিয়েছিল। ফলে, গত শতকের একেবারে অন্তিম পর্বে এসেও, ইতিহাস, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল বা শরীরতত্ত্ব যে মেয়েদের শিক্ষণীয় বিষয় হতে পারে,

এটা অনেক মহিলাই মেনে নিতে পারেননি। তাই গোঁড়া মনোভাবাপন্ন পুরুষদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তাদের অনেকেই মেয়েদের এই 'পুরুষালি' শিক্ষাকে ধিক্কার জানিয়েছিলেন।

এখানে মেয়েদের মানসজগতে এক ধরনের স্ববিরোধিতা লক্ষ করা যায়। মেয়েরা যে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আবার, তারাই মেয়েদের লেখাপড়ার মধ্যে সীমারেখা টানতে আগ্রহী ছিল। আপাতদৃষ্টিতে এই স্ববিরোধিতার কোন বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে, একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে এক শতাব্দীর ব্যবধানে মানুষের মূল্যবোধে বহু পরিবর্তন দেখা দেয় এবং সেই হিসেবে বিংশ শতাব্দীর মূল্যবোধের মাপকাঠিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মানসিকতা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। গত শতকের মহিলাদের নিজস্ব জগতে সাংসারিক কাজগুলি এমন অচ্ছেদ্য হয়ে থাকত এবং মেয়ে হয়ে জন্মানোর ফলে কতগুলি সাধারণ কর্তব্যবোধ তাদের সংস্কারের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকত যে মেয়েরা প্রায়ই কঠোর বিদ্যাচর্চাকে সেই কর্তব্য সম্পাদনের পক্ষে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী বলে মনে করত। অনেক মহিলা মনে করতেন, পুঁথিগত বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করতে হলে গৃহস্থালির কাজে অবহেলা হয়, সন্তানপালনের মত 'ঈশ্বর নিয়োজিত' কাজ দাস-দাসীদের হাতে ছেড়ে দিতে হয়, অতএব, মেয়েদের পক্ষে পুঁথিগত শিক্ষা 'অস্বাভাবিক'।[৬০] আমরা এ ধরনের রচনাকে গত শতকের মহিলাদের এক বড় অংশের মানসিকতার প্রতিফলক হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। পুঁথিগত শিক্ষাকে বর্ণনা করতে গিয়ে 'অস্বাভাবিক' শব্দটির ব্যবহার এখানে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মেযেরা তাদের বিচরণের ক্ষেত্রকে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক—এই দুই ভাগে ভাগ করে নিয়েছিল। তাদের কাজকর্মের মধ্যে যেগুলি ঐতিহ্য পরম্পরাগতভাবে মেয়েরাই করে আসছিল, সেগুলি হল 'স্বাভাবিক'। এই 'স্বাভাবিক' কাজগুলি কেন মেয়েরাই চিরকাল করে যাবে, এ প্রশ্ন নিয়ে খুব বেশি সংখ্যক মেয়েকে বিব্রত হতে দেখা যায় না। খুব সহজ, সরলভাবে তারা এ কাজগুলি 'ঈশ্বর নিয়োজিত' বলে গ্রহণ করেছিল। অর্থাৎ, মেয়েদের মনে এমন একটা বিশ্বাস পাকাপোক্ত রকম বাসা বেঁধেছিল যে পুরুষ বা নারী হিসেবে তাদের জন্ম যখন নিজেদের হাতে নয়. তখন আবহমানকালব্যাপী মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট কর্মেও তাদের পরিবর্তনের কোন অধিকার নেই।

এই বিশ্বাস থেকে তারা, বিশেষতঃ অপেক্ষাকৃত প্রাচীনা মহিলারা, অনেক প্রচলিত সমাজবিধিকে প্রশ্ন করেননি। অনেক সময়ে তাদের লেখাপত্র পড়লে মনে হয়, এই প্রশ্ন করাকে তারা রীতিমত 'অপরাধ' বলে মনে করতেন। তারা পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে অল্পবয়সী মেয়েদের বিদ্যাভ্যাসের মধ্যে পারিবারিক বিশৃঙ্খলার উৎস খুঁজে পেতেন। বসন্তকুমারী বসু অভিযোগ করেছিলেন যে অল্পবয়সী শিক্ষিতা মেয়েরা বয়স্কা রমণীদের ওপর সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব অর্পণ করে নিজেরা 'বৃথা সময় ক্ষেপণ' করছে এবং এটি ঘোর অনিষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ও এর মধ্যেই আছে সমাজের সামগ্রিক অধঃপতন ও 'গৃহে গৃহে অশান্তি'র কারণ।[৬১] বসন্তকুমারী বসু যে পরিস্থিতিকে 'গৃহে গৃহে অশান্তি' বলে বর্ণনা করেছিলেন, তা ছিল মূলতঃ মেয়েদের নিজস্ব জগতের উত্তেজনা। এই উত্তেজনা সমসাময়িক আরও কয়েকজন মহিলার রচনায়ও পরোক্ষে ধরা পড়ে। রাঁধাবাড়া, সন্তানপালনের যে অচলায়তন জগতের ওপর কাল তার বলিরেখা আঁকতে পারেনি, সেখানে নতুন শিক্ষা, মেয়েদের নতুন জীবনযাত্রার আভাস যে

উত্তেজনার সৃষ্টি করবে, তাতে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না।

মেয়েদের নিজস্ব জগতে এই উত্তেজনা যে কেবল বিদ্যাভাসকে কেন্দ্র করেই দেখা দিয়েছিল, তা নয়। তীব্র ঘাত-প্রতিঘাতময় সময়ে উত্তেজনার ক্ষেত্রটি প্রস্তুত হয়েছিল দুটি প্রজন্মের দুই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির ফলে। অল্প বয়সী মেয়েরা যে খুব বৈপ্লবিকভাবে সব প্রথাকে চুরমার করে নিজেদের কানুন প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিল, সমসাময়িক রচনাদি সে সাক্ষ্য দেয় না। তবে বাঁধা পথ থেকে সামান্য বিচ্যুতি ঘটলেই সেটা বেশি করে চোখে পড়ত। বাঁধা পথটা এতই বাঁধা ছিল ও কাজকর্মের মধ্যে পুরুষ ও নারীর বিভাজন এত সুনির্দিষ্ট ছিল যে মহিলারাও পুরুষদের মতই একটি নির্দিষ্ট স্তরের পরে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা করতে কুণ্ঠিত হয়নি। পুরস্কারপ্রাপ্ত একটি প্রবন্ধের রচয়িত্রী আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে মেয়েরা গল্প-উপন্যাস পাঠ করতে যতটা আগ্রহী, 'অন্য কোন উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ—জীবনচরিত, শিশুপালন, সন্তান শিক্ষা, গৃহ চিকিৎসা কি কোন প্রকার ধর্মগ্রন্থ পড়িতে বড ইচ্ছুক নন।'[৬২] লেখিকা যে ধরনের বই মেয়েদের পাঠের জন্য অনুমোদন করেছিলেন, সেগুলি হয় মেয়েদের দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে উপযোগী ছিল, নইলে ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলার পক্ষে সহায়ক বলে মনে করা হত। এটি কিন্তু অবিকল পুরষদের বক্তব্য। গত শতকের সাময়িক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বহু লেখাতেই রচনাকারের নাম থাকত না। তাই সেগুলি পুরুষের না মহিলার রচনা বোঝা খুব দুরূহ। তবে যে রচনাগুলিতে মহিলাদের নাম থাকত সেখানে লেখার ধরন, অতীতের সঙ্গে বর্তমানকে তুলনা করে অধুনাতন কালে মূল্যবোধের অবনমনের জন্য হা-হুতাশ প্রভৃতি কতগুলি সাধারণ লক্ষণ থেকে অনুমান করা যায় যে এই লেখিকারা ছিলেন যথেষ্ট বয়স্কা। যেমন, নিরুপমা দেবী যখন ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে রচিত একটি প্রবন্ধে 'সেকালে'র (এটা যে কোন অতীত কালই হতে পারে—কুড়ি, চল্লিশ, পঞ্চাশ বছর আগের ঘটনাও 'সেকালে'র অন্তর্গত, কারণ আমরা লেখিকার বয়স জানি না) মেয়েদের সঙ্গে সমসাময়িক কালের (আলোচ্য ক্ষেত্রে বিংশ শতকের সূচনা) মেয়েদের তুলনা করে বলেন যে 'একালে'র মেয়েদের প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে না বলেই মেয়েদের জগতে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে ও মেয়েরা অল্পস্বল্প শিক্ষা পাচ্ছে বলেই আর শ্বশুরবাড়ির 'গঞ্জনা' মুখ বুজে সইতে রাজি নয় বা সেকালের মেয়েরা শ্বশুরবাড়িতে সামান্য অপরাধেও লাঞ্ছনা পেতে হবে জেনে আগে থেকে সাবধান হত কিন্তু ক্ষুব্ধ ছিল না,[৬৩] তখন স্পষ্ট বোঝা যায় যে এই প্রবন্ধ রচনার সময়ে নিরুপমা দেবী একজন বর্ষীয়সী রমণী ছিলেন, যাঁর 'সেকাল' ও 'একাল', দুই কাল সম্বন্ধেই ছিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

এইভাবে, রচনার মূল সুর ও প্রতিপাদ্য বিষয় থেকে লেখিকার বয়স অনুমান করে আমরা সেই বয়সের মহিলাদের মানসিকতার একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দিতে প্রয়াসী হতে পারি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর ক্ষেত্রে এই সূত্র সর্বদা কার্যকর ছিল না। বয়স্কা রমণীরাই যে একমাত্র পুরুষের গলায় কথা বলতেন, তা নয়। অনেক অল্প বয়সী লেখিকাও 'আধুনিক' মেয়েদের সমালোচনা করতেন। যেমন, মুক্তকেশী দেবীর মৃত্যু হয়েছিল মাত্র ষোল বছর বয়সে। তাঁর মৃত্যুর পর *শিক্ষা-পরিচয়* পত্রিকায় (১২৯৪ বঃ) লেখিকার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল (এই প্রবন্ধটি পরবর্তীকালে *অন্তঃপুর* পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল)। মরণোত্তর প্রকাশিত এই প্রবন্ধে মুক্তকেশী দেবী মেয়েদের গৃহকার্য, সতীত্ব, সাংসারিক

কর্তব্য, সন্তানপালন, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এমন সব মত প্রকাশ করেছিলেন যে লেখার ভূমিকায় মুক্তকেশী দেবীর মৃত্যুর সময়ে তাঁর বয়স উল্লিখিত না থাকলে, অনিবার্যভাবে মনে হত এটিও অতি প্রাচীনা কোন রমণীর রচনা। মুক্তকেশী দেবী লিখেছিলেন : 'রন্ধন রমণীগণের গৃহধর্ম্মের মধ্যে একটি প্রধান কর্ম্ম। আজি কালি দেখিতে পাওয়া যায় রমণীগণ এই সুমহৎ ব্যাপার পাচক ঠাকুর কিম্বা পাচিকা ঠাকুরাণীর হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন।'[৬৪]

এরকম ক্ষেত্রে মেয়েদের নিজস্ব জগৎ সম্বন্ধে কোন ধারণা করতে আমাদের একটি প্রধান অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। বর্ষীয়সী রমণীদের পুরুষের গলায় কথা বলার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হয়ত এই যে, তারাও পুরুষদের মত নবীনাদের দ্বারা অধিকারচ্যুত হওয়ার ভয়ে শঙ্কিত ছিলেন।[৬৫] মুক্তকেশী দেবীর মত লেখিকাদের ক্ষেত্রে এই সূত্র প্রয়োগ করা যায় না। আর, সেই কারণেই সাধারণীকরণের বৃত্তের বাইরে এক ভিন্নতর ব্যাখ্যার অনুসন্ধান আবশ্যক হয়ে পড়ে। মুক্তকেশী দেবীর মত অল্প বয়সী লেখিকাদের পুরুষের সুরে কথা বলার মধ্যে কোন স্বার্থগত কারণ ছিল না। আসলে, তাঁরা পুরুষের শেখানো কথা বলতেন এবং হয়ত তা থেকে কিছুটা আত্মতৃপ্তিও পেতেন। আবার, এ ধরনের মত ব্যক্ত করে পারিবারিক ক্ষমতা যারা নিয়ন্ত্রণ করতেন তাদের স্নেহধন্যা হয়ে ওঠার উচ্চাশাও হয়ত এই নবীনাদের মধ্যে কাজ করত। গত শতকের বাঙালি মেয়েদের মধ্যে এই বৈপরীত্য চোখে পড়ে। অগ্রগতি ও পশ্চাৎমুখিতা—দুই বিরুদ্ধ টানের মধ্যে ছিল তারা। কারও এগনো পা একটু বেশি অস্থির, কারও পিছুটান একটু বেশি প্রগাঢ়। এই দুই টানাপোড়েনের মধ্যেই গড়ে উঠেছিল গত শতকের মেয়েদের নিজস্ব জগৎ।

॥ পাঁচ ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর মেয়েদের নিজস্ব জগতের আরও একটি অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য অঙ্গ ছিল পতিভক্তি। স্বামীর কাছ থেকে নিরন্তর অবহেলা ও অপমান সহ্য করলেও, গত শতকের অধিকাংশ মেয়ের কাছেই পতি ছিল পরম গুরু। অবরোধ-মোচন, স্ত্রীশিক্ষা, মেয়েদের সামাজিক উন্নতির মতই গত শতকের বিভিন্ন লেখাপত্রে পতিভক্তির গুরুত্বের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হত। পুরুষদের হয়ত ভয় ছিল যে মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে আর স্বামীকে দেবতা বলে মান্য করবে না। এই ভয় থেকে মেয়েদের লেখাপড়াকে ব্যঙ্গ করে কিছু লেখা বা পতিভক্তির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে পুরুষপক্ষীয় রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য বোঝা খুব দুঃসাধ্য নয়। কিন্তু মেয়েরা নিজেরাও পতিভক্তিকে তাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হিসেবে মনে প্রাণে মেনে নিয়েছিল। স্বামীকে নারীজীবনের দেবতার আসনে বসিয়ে রাখার কথা মেয়েদের রচনায় ঘুরেফিরে বারবার উপস্থিত হয়েছে : 'যে পতি সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে হৃদয়ের একমাত্র দেবতা, তাঁহার প্রতি রমণী হৃদয়ের প্রগাঢ় ভক্তি পবিত্র ভালবাসা সর্ব্বদা বিরাজমান থাকিবে ইহাই জগদীশ্বরে ইচ্ছা। . . . স্ত্রী সহিষ্ণুতা দয়া ক্ষমা গুণে ভূষিতা হইয়া স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইবে।'[৬৬] এটি আমাদের দেশের বহুকাল আচরিত রীতি এবং মেয়েদের তা পারিবারিক তথা সামাজিক জীবনের কর্তব্য হিসেবে খুব ছোটবেলা থেকে শেখানো হত। 'পুন্যিপুকুর' প্রভৃতি ব্রত পালনের শেষের প্রার্থনা থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

বাঙালি মেয়েরা যে স্বামীদের কত ভক্তি করত, তা তাদের সধবা অবস্থার ব্যবহার থেকে যেমন বোঝা যায়, তেমনি বোঝা যায় বৈধব্যের পর তাদের মনোভাব থেকে। স্বামীর কাছ থেকে উপেক্ষা পেয়েছিলেন দিগম্বরী দেবী। ঠাকুরবাড়ির প্রথম কৃতী পুরুষ দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে ১৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে দিগম্বরী দেবীর বিয়ে হয়েছিল। বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান দ্বারকানাথ প্রথম জীবনে আহার-বিহারে অত্যন্ত আচারনিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু ব্যবসা ও সামাজিক পদমর্যাদার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহেবি পান-ভোজনে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে তাঁর পারিবারিক জীবনে সংকট দেখা দেয়। স্বামীর ভ্রষ্টাচারে মর্মাহত হয়ে দিগম্বরী দেবী স্বামীর সঙ্গে সমস্ত সাক্ষাৎ সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন।[৬৭] দিগম্বরী দেবী স্বামী-সংশ্রব ত্যাগ করেছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিচার অনুসারে। কারণ, তাঁর মত ধর্মপ্রাণা মহিলার পক্ষে স্বামীর 'সহধর্মিণী' হয়ে কুলধর্ম রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেও তিনি স্বামীকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করা থেকে বিরত হননি। পণ্ডিতেরা বিধান দিয়েছিলেন যে এরকম স্বামীর সঙ্গে সহবাস করা অবিধেয়, তবে তাঁকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা উচিত। তারপর থেকে দিগম্বরী দেবী নিজের পথ নিজেই স্থির করে নিয়েছিলেন—'তিনি প্রতিদিন দ্বারকানাথের শয্যার কাছে গিয়ে মাটিতে একটি প্রণাম রেখে আসতেন। দ্বারকানাথ সম্পূর্ণ নির্বিকার।'[৬৮]

বৈধব্যদশা বর্ণনা করে রাসসুন্দরী দেবী ছোট একটি কবিতা লিখেছিলেন :

শত পুত্রবতী যদি পতিহীনা হয়।
তথাপি তাহাকে লোকে অভাগিনী কয় ॥[৬৯]

যে অবস্থাকে 'লোকে অভাগিনী কয়' বলে রাসসুন্দরী দেবী বর্ণনা করেছিলেন, তা আসলে তাঁর নিজের অনুভূতি। জীবনের অন্য সব সুখ বর্তমান থাকলেও স্বামী না থাকাকে মেয়েরা জীবনের চরম দুর্ভাগ্য বলে মনে করত।

স্বামী থেকেও না থাকার দুঃখ পেতে হয়েছিল গত শতকের বহু বাঙালি মেয়েকেই। এদের মধ্যে দু-একজন ছাড়া কেউই তাদের মনের কথা লিখে রেখে যায়নি। তিলোত্তমা দাসী (১৮৭৭—১৯০৯) অবশ্য তাঁর মনের ব্যথাকে ছন্দোবদ্ধ রূপ দিয়েছিলেন। সারা জীবন স্বামীর কাছে এত অনাদর সহ্য করেও[৭০] তিলোত্তমা স্বামীর সম্বন্ধে উল্লেখ করতে গিয়ে 'নাথ' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। স্বামীকে উদ্দেশ্য করে তিনি লিখেছিলেন :

ক্ষুদ্র মনে অতি আশা পক্ষিণীর ভগ্নবাসা,
পূরিবে কি আশা কভু দুখিনীর ভালে।
অন্যেরে লইয়ে সুখী, হও তুমি চিরসুখী,
দিনান্তে ভাবিও মনে আছি আমি দাসী।
রহিব যতেক দিন, কাঁদিব ততেক দিন,
স্মরণ করিয়া নাথ তোমার চরণ।
কাঁদিয়া লইছি জন্ম, কাঁদিয়া ফুরাবে কর্ম্ম,
তোমার ও পদে যেন কাঁদিয়া ফুরাই।[৭১]

মাঝের দু-একটি পংক্তি বাদ দিলে মনে হয় এটি বুঝি বা ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে কোন সমর্পিতপ্রাণা সেবিকার স্তুতি। স্বামীর দ্বারা পরিত্যক্তা হয়েও তার মঙ্গল কামনা করতে পারার ক্ষমতা বাঙালি মহিলার মানসিক গঠনের পরিচয়। শুধু তাই নয়, তিলোত্তমা শুনেছেন, তাঁর স্বামীর আবার বিয়ের চেষ্টা হচ্ছিল। তবুও স্ত্রী হিসেবে এ হেন স্বামীর তাঁকে 'দিনান্তে' মনে করাকেই তিনি জীবনের পরম প্রাপ্তি হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। এটা বোধহয় তিলোত্তমার একার মনে কথা ছিল না—এ মানসিকতা গড়ে উঠেছিল দেশজ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও পারিপার্শ্বিক কে ভিত্তি করে। উনবিংশ শতাব্দীর দাম্পত্য ইতিহাসের সবচেয়ে ধারাবাহিক দিক হল পত্নীর পতিপদচিন্তা।

গত শতকের 'নষ্টনীড়'-এর আলোচনা আমরা আগেই করেছি। এখানে লক্ষনীয়, নীড়ভ্রষ্ট পাখিরা এ ব্যাপারটিকে কীভাবে গ্রহণ করত। তিলোত্তমা দাসীর মত স্ত্রীদের বলার আর কী-ই বা ছিল, 'কাঁদিয়া লইছি জন্ম, কাঁদিয়া ফুরাবে কর্ম্ম, তোমার ও পদে যেন কাঁদিয়া ফুরাই' ছাড়া ? তিলোত্তমা দাসী কখনও স্বল্পস্থায়ী স্বামীসঙ্গের স্মৃতি বুকে আঁকড়ে ধরে সান্ত্বনা পেতে চেয়েছিলেন, কখনও চেয়েছিলেন স্বামীকে ভুলে যেতে।[৭২] আবার কখনও বা নিজের প্রেম নিবেদন করে স্বামীর কাছে জানতে চান তিনি তাদের পুরনো প্রেমের স্মৃতি মনে রেখেছেন কি না।[৭৩]

শুধু তিলোত্তমা দাসী নন, আরও বহু মেয়েরই জীবনের সঙ্গে কান্না ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। এক অজ্ঞাতনাম্নী মহিলার কবিতায় একই ধরনের আক্ষেপ শোনা যায় :

ক্ষণিক বিরহানল, নিবাইয়ে আঁখিজল
ভজিতাম হৃদয়ে যাহারে,
নিরাশ সমুদ্রজলে, অনন্ত বিরহানলে
বিসর্জ্জিল এবে সে আমারে।[৭৪]

'পরিত্যক্তা রমনীর খেদ' মেয়েদের কলম থেকে বের হত অনেক সময়ে সাহিত্যিক চরিত্রকে কেন্দ্র করেও। একই বিষয়কে অবলম্বন করে হয়ত পুরুষ কবিরাও কবিতা লিখেছিলেন। কিন্তু মেয়েরা লিখতেন তাদের নিজেদের মত করে। আমরা মেয়েদের লেখা কবিতায় নারীমনের অনুভূতির এক অকৃত্রিম প্রকাশ লক্ষ করি। যেমন, মানকুমারী বসু বঙ্কিমচন্দ্রের *কৃষ্ণকান্তের উইল* গ্রন্থটি পড়ে 'অভাগী ভ্রমর' কবিতাটি লিখেছিলেন:

হায় অভাগী ভ্রমর।
প্রিয় পতি দোষী কিনা,
পরেরে তা সুধাবী না
আপনি মরিবি পুড়ে আগুন ভিতর।
ওই ছিন্নমস্তা-বেশ।
বেশ লক্ষ্মি ! বেশ বেশ।
আপনি আপন হাতে যাবি যমঘর !
কোন্ ছার ধন প্রাণ !

বড় আদরের মান,
পতির সম্মান-ধর্ম্ম সর্ব্বোচ্চ সুন্দর, . . . [৭৫]

বিধবাদের প্রতি সমবেদনা পুরুষদের রচনাতেও পাওয়া যায়। কিন্তু মেয়েদের সমবেদনা যেন অনুভূতির প্রত্যক্ষ স্তর থেকে উৎসারিত। এমনকি, স্বামীকে জীবনে একদিনও না দেখলেও, স্বামীর মৃত্যুর বহু বছর পর তার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে স্বামীর জন্য স্ত্রী বুকফাটা কান্না কেঁদেছিল, গত শতকের এমন নজিরও পাওয়া যায়।[৭৬] অধিকাংশ মেয়েরই বৈধব্যের পর বাকি জীবন স্বামীশোকে অতিবাহিত হত। 'বঙ্গের বিধবারমণী'র বর্ণনা দিতে গিয়ে গত শতকের একটি পত্রিকায় লেখা হয়েছিল :

অবিরামে তুমি নিঃশ্বাসিছ কেন ?
প্রাণনাথ বলি, ভাবিছ কখন
ক্ষণ ভূমে পড়ি, করিছ ক্রন্দন,
শোকানলে যেন, দহিজে জীবন।[৭৭]

একজন 'বঙ্গমহিলা' বৈধব্যদশায় নিজের মানসিক অবস্থার বর্ণনা দিয়েছিলেন : 'আমি আয়নায় মুখ দেখিতেছি। আগেও কত শত দিন দেখিয়াছি—তখন নিত্যই দেখিতে হইত। চুল বাঁধিবার সময়ে, সিঁদূর [তদেব] পরিবার সময়ে নিত্যই দেখিতে হইত। এখন ও আর চুল বাঁধিতে হয় না, সিঁদূর [তদেব] পরিতে হয় না, আয়নায় কোন দরকার হয় না, সেই জন্য মুখ দেখিতেও পাই না। তখন যে মুখ দেখিতাম, আর আজ যে মুখ দেখিতেছি, ইহাতে অনেক প্রভেদ হইয়া গিয়াছে, তখন এই সিঁথিতে সিঁদূর [তদেব] ছিল, এই কেশ বাঁধা থাকিত, এই কর্ণে ভূষণ ছিল, এই মুখে সেই অম্লান হাসি সর্ব্বদাই থাকিত। আজ যে মুখ দেখিতেছি ইহাতে চুল খসিয়া জটাপ্রায় হইয়াছে. সেই সীথিঁ ধূ ধূ করিতেছে, কর্ণে অলঙ্কার পরিবার চিহ্নমাত্র রহিয়াছে, সেই হাসির কেমন ভাব তাহা কল্পনা করিয়াও দেখিতে পাইতেছি না। . . . স্বামি-সুখেই বঙ্গাঙ্গনা বেশ বিন্যাস করে। বঙ্গ-মহিলার সবই স্বামিময়। মন, প্রাণ, গৃহ, গৃহকর্ম্ম, আমোদ আহ্লাদ, ধন, মান, ভরণ, পোষণ, বেশবিন্যাস সবই স্বামিময়।'[৭৮] মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রে স্বামীর মৃত্যুর পর বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা খুঁজে পেত না। কলরব মুখরিত আলোহাস্যময় পৃথিবী থেকে নিজেদের চিরতরে নির্বাসিত বোধ করে তারা সহমরণকেও অনেক সময়ে শ্রেয়স্কর গণ্য করত। খুব আন্তরিকভাবে এই ভাবটি ফুটে উঠেছিল মানকুমারী বসুর 'সহমরণ' কবিতায়, যা তিনি স্বামীর মৃত্যুর পর লিখেছিলেন :

প্রাণের দেবতা সেই পতিধন
বিদায় মাগিয়া চলিলা যবে,
কাঙ্গালিনী তার এ শূন্য শ্মশানে
আধখানি প্রাণে কি করে রবে।

জীবন-রতনে হারায়ে — জীবন —
ছার দেহ-মাঝে কেমনে রয় ?
থাক্ রে জগতে জগতের লোক,
বিধবার তরে জগৎ নয়।[৭৯]

অধিকাংশ মেয়ের কাছেই জীবনের সার্থকতা ছিল স্বামীকেন্দ্রিক। এই কারণেই গত শতকের মেয়েদের বিভিন্ন লেখায় সতীত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ এত চোখে পড়ে। স্বামীকে যেহেতু মেয়েরা জীবনের সর্বস্ব বলে মনে করত, তাই সতীত্বের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তারা কখনও প্রশ্ন তোলেনি। গত শতকের দাম্পত্য জীবনের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনেক সময়েই কোন সম্পর্ক গড়ে উঠত না। বহু ক্ষেত্রেই স্ত্রীরা দিন কাটাত পিতৃগৃহে। কৈশোর অতিক্রান্ত স্ত্রীদের মধ্যে যৌন বুভুক্ষাও যথেষ্ট লক্ষ করা যায়। প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্তী হয়ে মেয়েদের অনেকে এমন কাজ করত যা সামাজিক নিয়মে 'ব্যভিচার'। কিন্তু লক্ষণীয় বস্তু হল মেয়েরা নিজেরাও সেটাকে ব্যভিচার বলেই বিচার করেছে—চিরাচরিত সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে 'ব্যভিচার' ব্যভিচার নয়, এটা প্রমাণ করতে চায়নি। অতএব, যারা পতিব্রতা ছিল, এবং যারা ছিল না, তারা উভয়েই পাতিব্রত্যের আদর্শ মেনে নিয়েছিল। এটাই ছিল গত শতকের মেয়েদের মনসিকতা। এই মানসিকতা মেয়েদের মধ্যে এমন সহজভাবে মিশে ছিল যে সতীত্ব রক্ষা করাকে তারা জীবনের মহত্তম পালনীয় কর্তব্য বলে খুব সহজে স্বীকার করত। কলকাতার চোরবাগান অঞ্চলের এক 'হিন্দু মহিলা' লিখেছিলেন :

পতি বিনা সতীর কে আছে সংসারে,
যে পতি বিহনে সতী তরিতে না পারে।[৮০]

এ ধরনের লেখার পেছনে হয়ত সতীত্ব শিক্ষা দেওয়াও মেয়েদের মনে অনেক সময়ে কাজ করত। সেটা এ ধরনের লেখা প্রকাশের উদ্দেশ্য হতে পারে, কিন্তু এর দ্বারা মেয়েদের বিশ্বাসের জগৎ সম্বন্ধে ধারণায় কোন পরিবর্তন ঘটে না। বরং অধিকাংশ মেয়েই 'কুলবতী রমনীকুলের' সব ধর্ম-কর্মের মধ্যে পতিপরায়ণতাকে প্রধানতম ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে নিশ্চিন্ত থাকতে চেয়েছিল। মেয়েদের পতিভক্তির গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে একজন মহিলা লিখেছিলেন, 'যেমন আহারীয় বস্তুর মধ্যে অন্নই অগ্রগণ্য, অবলা গণের [তদেব] মধ্যে পতিপদ সেবাও তদ্রুপ।'[৮১] অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বামী যেমনই হোক, তাকেই মেয়েরা জীবন-দেবতা হিসেবে গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হত না।[৮২] হেমন্তকুমারী গুপ্ত লিখেছিলেন যে সর্বজনজ্ঞাত দুশ্চরিত্র স্বামীর দুঃখ মেয়েরা নিজেরা মনে মনে বহন করতে পারে কিন্তু বাইরের লোক যদি সেই স্বামীর সমালোচনা করে, তবে তা স্ত্রীর পক্ষে আরও দুঃসহ হয়।[৮৩] এর গূঢ় মনস্তাত্ত্বিক কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে বাস্তবজীবনে স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক যে রকমই হোক না কেন, মেয়েরা যেহেতু স্বামীকে তাদের জীবনের সর্বস্ব মনে করত, তাই বোধহয় মনের কোন নিভৃত স্থানে স্বামীকে একান্ত নিজস্ব সম্পদ বলে ধরে নিত। সেই সম্পদ হাতছাড়া প্রায়ই হয়ে যেত। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'জীবনের রত্ন',

হৃদয়ের ভূষণ বলে জ্ঞান করে 'প্রাণপণে' সেই রত্নকে রক্ষা করার জন্য ব্যাকুল হত।[৮৪] এবং তারা বিশ্বাস করত যে সব বিষয়ে পিছিয়ে পড়া এদেশের মেয়েরা কেবল সতীত্বের গুণেই অন্য দেশের মেয়েদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। সুমতী মজুমদার সতীত্বের মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেয়েদের সঙ্গে ভারতীয় মেয়েদের তুলনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁর মতে, মার্কিনি মেয়েরা সভ্যতার বহিরঙ্গের বিচারে ভারতীয় মেয়েদের তুলনায় অনেক বেশি প্রাগ্রসর, সেখানের মেয়েরা বিজ্ঞান বিচার করে, ঐতিহাসিক হয়, জজ-উকিল হয়—সব কাজেই তারা পুরুষের সমান। তাদের এত সব বিবিধ গুণ থাকা সত্ত্বেও —

কিন্তু সেই আমেরিকা রমণী সমাজ
ভারত সতীর কাছে পাইবেক লাজ।[৮৫]

এগুলি তত্ত্বপ্রচারের জন্য রচিত হয়নি, আন্তরিক বিশ্বাসই মেয়েদের এ ধরনের রচনায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।

নিজেদের মূল্যবোধকে এই ভাবে গড়ে তোলার জন্যই মেয়েরা অনেক কিছু বিশ্বাস করতে পেরেছিল। পেরেছিল নিজেদের ওপর সংসারের সব দাযিত্ব তুলে নিয়ে নির্দ্বিধায় পারিবারিক কর্তব্যকে ঈশ্বরের অভীষ্ট বলে তাঁর ইচ্ছা পালনের দায়ভাগ বহন করতে। মেয়েরা নিজেদের কর্তব্য বলে যা যা স্বীকার ও বিশ্বাস করত, সেগুলি দিয়েই গড়ে উঠেছিল মেয়েদের নিজস্ব জগৎ। 'নারী জীবনে ধর্ম্মভীরুতা, বিশ্বস্ততা, ভক্তি প্রবণতা, লজ্জাশীলতা, সহিষ্ণুতা, সরলতা, নম্রতা ও নিষ্ঠা প্রভৃতি সুন্দর ও মধুর ভাবপূর্ণ গুণগুলি থাকা সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য, এবং গুরুজনদিগকে ভক্তিশ্রদ্ধা, বয়স্কদিগকে প্রীতি, অল্পবয়স্কদিগকে স্নেহ, আতুরের শুশ্রূষা, দাসদাসীর প্রতি সদয় ব্যবহার ইত্যাদি ব্যক্তিমাত্রের প্রতি যথোচিত সদাচরণ করা কর্তব্য।'[৮৬] এ কথা লিখেছিলেন এক শিক্ষিতা মহিলা। এই দায়িত্বগুলি যথাযথ পালন করে যেতে হবে—এটাই ছিল গত শতকের মেয়েদের বিশ্বাস। আর, এই টুকরো টুকরো বিশ্বাস নিয়েই গড়ে উঠেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর মেয়েদের 'নিজস্ব জগৎ'।

উল্লেখপঞ্জী

১। দ্র. *'বাল্য বিবাহ ও অবরোধ প্রথা সম্বন্ধে সমালোচনা', বামাবোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ*, ১২৯০ বঃ, পৃ ৬১
দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'অবরোধ প্রথা', নব্যভারত, মাঘ, ১২৯৩ বঃ, পৃ ৪৬৭
২। 'মহিলাদিগের অবরোধপ্রথা', *মহিলা*, আশ্বিন, ১৩১০ বঃ, পৃ ৬২
৩। নরেশচন্দ্র জানা, মানু জানা ও কমল কুমার স্যান্যাল (সম্পা.), *আত্মকথা* (প্রথম খণ্ড), (কলকাতা, ১৯৮১), পৃ ২১ (রাসসুন্দরী দেবীর আত্মকথা)
৪। ঐ, ২২-২৩
৫। ঐ, ২৮
৬। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর 'স্মৃতিকথা', দ্র. ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী (সম্পা.), *পুরাতনী*

(কলকাতা, ১৮৭৯ শক), পৃ ৯

৭। *আত্মকথা* (প্রথম খণ্ড), (পূর্বোক্ত), পৃ ২৩ (রাসসুন্দরী দেবীর আত্মকথা)

৮। ঐ, ২৮

৯। ঐ

১০। কৈলাসবাসিনী দেবী, *হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি*, (কলকাতা, ১৭৮৭ শক), পৃ ৭-২৪

১১। হেমলতা দেবী, '*আমাদের জীবনে শিক্ষার ফল*', *বামাবোধিনী পত্রিকা*, আশ্বিন, ১২৯০ বঃ, পৃ ১৯২

১২। লীলাবতী মিত্র, 'রমণীর উচ্চশিক্ষা', *অন্তঃপুর*, ভাদ্র, ১৩১১ বঃ, পৃ ৯৮-৯৯

১৩। Nirad C. Chaudhuri, *The Autobiography of An Unknown Indian*, (7th Jaico impression, Bombay, 1984), p. 171

১৪। *আত্মকথা* (প্রথম খণ্ড), (পূর্বোক্ত), পৃ ২৩ (রাসসুন্দরী দেবীর আত্মকথা)

১৫। ঐ, ৭২

১৬। ঐ, ৭৫

১৭। *আত্মকথা* (দ্বিতীয় খণ্ড), (কলকাতা, ১৯৮২), পৃ ৩৭ (কৈলাসবাসিনী দেবীব আত্মকথা)

১৮। ঐ, ৩৫

১৯। আত্মকথা (প্রথম খণ্ড), (পূর্বোক্ত), পৃ ১৭ (সারদাসুন্দরী দেবীর আত্মকথা)

২০। ঐ, ২১-২২

২১। ঐ, ১৭

২২। প্রসন্নময়ী দেবীর সঠিক জন্ম সন জানা যায় না। চিত্রা দেব ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দকে প্রসন্নময়ী দেবীর জন্ম সন ধরলেও (দ্র. *অন্তঃপুরের আত্মকথা*, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ ১৩৭), বোধ হয় ১৮৫৭-র আগেই তাঁর জন্ম হয়েছিল। কারণ আত্মজীবনীতে তিনি বলেছেন, 'সিপাই বিপ্লবের সময়ে আমি যে ঠিক কত বড় তাহা জানি না।' এবং তার অনতিপরেই তিনি 'সিপাহী বিদ্রোহে'র সময়ে নৌকো করে মাতুলালয় থেকে ফেরার সময়ে তাঁর 'বাল্যসুলভ কৌতুহলে'র একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। (দ্র. *পূর্বকথা* কলকাতা, ১৯৮২, পৃ ২৮)

২৩। প্রসন্নময়ী দেবী, *পূর্ব্ব কথা*, (কলকাতা, ১৯৮২), পৃ ২৪

২৪। 'বাল্যক্রীড়া', *বামাবোধিনী পত্রিকা*, বৈশাখ, ১২৯০,বঃ, পৃ ১১-১৩

২৫। *বামাবোধিনী পত্রিকা*, আষাঢ়, ১২৯০ বঃ, পৃ ৬৮

২৬। প্রসন্নময়ী দেবী, *পূর্ব্ব কথা*, (পূর্বোক্ত), পৃ ৮৪

২৭। পরমেশপ্রসন্ন রায়, *মেয়েলি ব্রতকথা*, (দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৩১৫ বঃ), পৃ ৯

২৮। ঐ, ২৩-২৪

২৯। গিরিবালা চৌধুরানী, *ব্রতকথা*, (মৈনা, ১৩০৬ বঃ), পৃ ৮-৯

৩০। কিরণবালা দাসী, *ব্রতকথা*, (কলকাতা, ১৩১৯ বঃ), পৃ ৯৯

৩১। ঐ, ২১

৩২। ঐ, ৫৭

৩৩। শান্তা দেবী, *পূর্বস্মৃতি*, (কলকাতা, ১৯৮৩), পৃ ২৫

৩৪। *মেয়েলি ব্রতকথা*, (পূর্বোক্ত), পৃ ৪৩

৩৫। ঐ, ১১১-১১৪

৩৬। সুহাসিনী দেবী, *মেয়েলী ব্রতকথা* (১৩২৮ বঃ), (কলকাতা, ১৩৯২ বঃ), পৃ ২২৪

৩৭। 'হিন্দু নারীর ব্রত বিধান', *বামাবোধিনী পত্রিকা*, শ্রাবণ, ১২৯১ বঃ, পৃ ১১৯

৩৮। 'স্ত্রী বিদ্যা', *সংবাদ প্রভাকর*, ৭.৫.১৮৪৯

৩৯। সুহাসিনী দেবী, *মেয়েলী ব্রতকথা* (পূর্বোক্ত), পৃ ২৫ ·
৪০। হেমন্তবালা দেবী চৌধুরানী, 'পুরনো দিনের কথা', *গল্পভারতী,* আষাঢ়, ১৩৭৬ বঃ, পৃ ৬৫
৪১। ঐ, ৬৮-৬৯
৪২। *অন্তঃপুর,* মাঘ, ১৩১০ বঃ, পৃ ২২৮
৪৩। 'নাবী জীবনের কর্ত্তব্য', *মহিলা,* কার্তিক, ১৩০৪ বঃ, পৃ ৯০
৪৪। ইন্দিরা দেবী, *আমার খাতা,* (কলকাতা, ১৩১৯ বঃ), পৃ ১৯
৪৫। সুদক্ষিণা সেন, *জীবন স্মৃতি,* (কলকাতা, ১৩৩৯ বঃ), পৃ ৯১-৯২
৪৬। *আত্মকথা* (প্রথম খণ্ড), (পূর্বোক্ত), পৃ ২৬ (রাসসুন্দরী দেবীর আত্মকথা)
৪৭। ঐ, ২৭ .
৪৮। ঐ
৪৯। ঐ, ৩৮
৫০। *আত্মকথা* (দ্বিতীয খণ্ড), (পূর্বোক্ত), পৃ ৩ (কৈলাসবাসিনী দেবীর আত্মকথা)
৫১। *গিবীন্দ্রমোহিনীর গ্রন্থাবলী,* (বসুমতী সাহিত্য মন্দিব সংস্করণ, কলকাতা, ১৩০৪ বঃ), পৃ ৩০৫
৫২। ঐ, ২২৬-২২৭
৫৩। বাণী রায় (সম্পা.), *কবি-চতুষ্টযী,* (কলকাতা, ১৩৮৮ বঃ), প ১২৩-১২৪
৫৪। ঐ, ১৪৩
৫৫। *আত্মকথা* (দ্বিতীয খণ্ড), (পূর্বোক্ত), পৃ ৪ (কৈলাসবাসিনী দেবীব আত্মকথা)
৫৬। *বামাবোধিনী পত্রিকা,* ভাদ্র, ১২৭৪ বঃ, পৃ ৫৮৪
৫৭। *অন্তঃপুব,* ভাদ্র, ১৩১১ বঃ, পৃ ৯৮
৫৮। *অন্তঃপুর,* মাঘ, ১৩১০ বঃ, পৃ ২২৮
৫৯। *মহিলা,* মাঘ, ১৩০৪ বঃ, পৃ ১৬৫-১৬৬
৬০। ঐ, ১৬৬
৬১। বসন্ত কুমারী বসু, *নারী জীবনের কর্ত্তব্য,* (কলকাতা, ১৩১৯ বঃ), পৃ ১৭-১৮
৬২। 'স্ত্রী শিক্ষার অন্তরায ও তদ্দূরীকরণের উপায়', *অন্তঃপুর,* বৈশাখ, ১৩১১ বঃ, পৃ ১৮
৬৩। *অন্তঃপুর,* কার্তিক, ১৩১১ বঃ, পৃ ১৪৬
৬৪। মুক্তকেশী দেবী, 'রমণীর গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য', *অন্তঃপুর,* অগ্রহায়ণ, ১৩০৮ বঃ, পৃ ২৫৫
৬৫। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য বর্তমান গ্রন্থের 'ঘর-গৃহস্থালি' শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
৬৬। গিরিবালা দাসী, 'সাধ্বী', *অন্তঃপুর,* ভাদ্র, ১৩০৮ বঃ, পৃ ১৭০
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আরও পরবর্তীকালে কলকাতার সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান উমেশচন্দ্র মুখার্জি (জন্ম ১৮৪১) খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করার পর তাঁর স্ত্রী কালীতারা মুখার্জি (জন্ম ১৮৪৫) স্বামীর প্রেমে তাঁর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিলেন। কালীতারা তখনও হিন্দু নারীই, ধর্মান্তরিত হননি। ফলে গোড়ার দিকে স্বামীর সংসারেও তিনি স্বপাকে খেতেন। পরবর্তীকালে কালীতারও খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।
দ্র. চিত্রা দেব, 'স্মৃতির অতলে নির্মলাবালা সোম', *দেশ,* ১১ই মে, ১৯৯১, পৃ ৪৪
৬৭। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী* (প্রথম খণ্ড), (কলকাতা, ১৩৮৯ বঃ), পৃ ১২
৬৮। চিত্রা দেব, *ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল,* (কলকাতা, ১৩৯০ বঃ), পৃ ১৩
৬৯। *আত্মকথা* (প্রথম খণ্ড), (পূর্বোক্ত), পৃ ৪৫ (রাসসুন্দরী দেবীর আত্মকথা)
৭০। চিত্রা দেব, *অন্তঃপুরের আত্মকথা,* (পূর্বোক্ত), পৃ ৬৭
৭১। 'পতির উদ্দেশে', তিলোত্তমা দাসী, *আক্ষেপ,* (কলকাতা, ১৩২০ বঃ), পৃ ৫-৬

৭২। **'পতির উদ্দেশে', ঐ, ৪৯**
৭৩। **'স্বামীর পতি', ঐ, ৩৬**
৭৪। **'পতিত্যক্তা রমণীর খেদ',** *পরিচারিকা,* মাঘ, ১২৯৪ বঃ, পৃ ২২০
৭৫। বাণী রায় (সম্পা.), *কবি-চতুষ্টয়ী,* (পূর্বোক্ত), পৃ ১১৩-১১৪
৭৬। *আত্মকথা* (দ্বিতীয় খণ্ড), (পূর্বোক্ত), পৃ ২৯ (নিস্তারিণী দেবীর আত্মকথা)
৭৭। *সাধারণী,* ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১২৮১ বঃ, পৃ ৭৮
৭৮। *প্রিয়-প্রসঙ্গ,* (তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৩২২ বঃ), পৃ ৩৬-৩৭
৭৯। *কবি-চতুষ্টয়ী,* (পূর্বোক্ত), পৃ ১৪৯
৮০। *বঙ্গমহিলা,* জ্যৈষ্ঠ, ১২৮২ বঃ, পৃ ৪৭
৮১। *বসন্ত কুমারী দাসী, যোষিদ্বিজ্ঞান,* (বরিশাল, ১২৮২ বঃ), পৃ ১৮
৮২। *বামাবোধিনী পত্রিকা,* মাঘ, ১২৯০ বঃ, পৃ ৩২০
৮৩। *অন্তঃপুর,* আশ্বিন, ১৩১০ বঃ, পৃ ১২৭
৮৪। শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী, 'সতীত্ব নারীর একমাত্র ভূষণ', *বামাবোধিনী পত্রিকা,* আশ্বিন, ১২৮১ বঃ, পৃ ১৯৪
৮৫। সুমতী মজুমদার, 'সতী মহিমা', *বামাবোধিনী পত্রিকা,* চৈত্র, ১২৯০ বঃ, পৃ ৩৮০
৮৬। *মহিলা,* কার্তিক, ১৩০৪ বঃ, পৃ ৯০

উপসংহার

বর্তমান গ্রন্থে আমরা উনবিংশ শতাব্দীর নারী-বিষয়ক কয়েকটি সূত্র আলোচনার চেষ্টা করেছি। এই রচনায় সমাজ-জীবনে মেয়েদের মর্যাদার বাস্তবিক পরিবর্তনের চেয়েও প্রাধান্য পেয়েছে মেয়েদের নিয়ে বিভিন্ন চিন্তাভাবনা। এই চিন্তাগুলি থেকে মেয়েদের প্রতি বাঙালি সমাজের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা করতে পেরেছি। গত শতকে প্রতীচ্যের ভাবধারার সংস্পর্শে আসার পর সমাজ-সংস্কার বিষয়ক বিভিন্ন আন্দোলন ও আলোচনা সবচেয়ে বেশি আবর্তিত হয়েছিল মেয়েদের সামাজিক মর্যাদাকে কেন্দ্র করে। যুগযুগান্তব্যাপী বাঙালির অচলায়তন সমাজের ওপর পশ্চিমি সভ্যতার প্রভাব অনেকগুলি পুরনো প্রতিষ্ঠান ও বিশ্বাস নিয়ে নতুন ভাবে চিন্তাভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এর অনিবার্য ফল ছিল মেয়েদের সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি। এর পরিণতি, চিন্তাজগতে পরিবর্তন ও পরিবর্তনহীনতার বিভিন্ন প্রসঙ্গ আমরা আলোচনা করেছি এই গ্রন্থে।

এই ফিরে দেখার ফলে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়েছে আমাদের কাছে—উনবিংশ শতাব্দীতে মেয়েদের নিয়ে এত লেখাপত্র হয়েছে, মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা নিয়ে এত উদ্বেগ ব্যক্ত করা হয়েছে, কিন্তু তাদের পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকারের প্রশ্নটি বড় একটা আলোচিত হয়নি। রামমোহন বা বিদ্যাসাগর প্রমুখ দু-একজনকে বাদ দিয়ে কেউই এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেননি। এমন কি, স্ত্রীশিক্ষার পক্ষাবলম্বীরাও পুরুষ ও নারীর শিক্ষার ক্ষেত্রে পার্থক্য টানতে উৎসাহী ছিলেন। গত শতকের চিন্তাবিদরা মেয়েদের উপেক্ষার অন্তরাল থেকে বের করে নিয়ে এসেছিলেন উপযোগিতার প্রকাশ্য দিবালোকে।

অবশ্য, গত শতকের নারী-বিষয়ক চিন্তাভাবনাকে কেবল পুরুষ-নারী বিভাজনের সূত্র ধরে দেখলেই হবে না। নারী-বিষয়ক বিভিন্ন ভাবনার মধ্যে পুরুষের স্বার্থের দিকটি যেমন ধরা পড়ে, অনুরূপভাবে মেয়েদের নিজেদের দায়িত্বও অস্বীকার করা যায়না। আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে পরিবারের বয়স্কা রমণীরা প্রায়শই পুরুষের মতকে সোচ্চাব সমর্থন করতেন। এটা উনিশ শতকের বাঙালি পরিবারের একটি বৈশিষ্ট্য। অন্তঃপুরবাসিনী মেয়েদের একাংশ, বিশেষতঃ যারা বয়সে নবীনা, শিক্ষা পাচ্ছে, এতে পুরুষদের মত বয়স্কা মহিলারাও যথেষ্ট শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। পুরুষদের ভয় ছিল সমাজে তাদের সামগ্রিক প্রতিপত্তি হারানোর। আর, বর্ষীয়সী রমণীদের ভয় ছিল অন্তঃপুরের কর্তৃত্বের অধিকার থেকে বিচ্যুত হওয়ার। ফলে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বর্ষীয়সী মহিলারা অল্পবয়স্কাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন। এমনকি, ছেলের সঙ্গে তার স্ত্রীর সুসম্পর্কও অনেক শাশুড়ী প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেননি। এর পেছনেও সেই একই মানসিকতা কাজ করেছে। পারিবারিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে শাশুড়ী পুত্রবধূকে সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতেন। সেখানে ছেলে বা স্বামীর ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন ছিল শাশুড়ী ও পুত্রবধূর উভয়েরই উচ্চাকাঙ্ক্ষা। যেখানে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর

মানসিক সম্পর্ক ঘনিষ্ট ছিল, সেখানে সমাজের কর্তাব্যক্তিরা ও ছেলের মা নির্বিচারে স্বামীকে স্ত্রৈণ আখ্যা দিয়ে এসেছেন। গত শতকে এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে এত অসংখ্য লেখাপত্র প্রকাশিত হয়েছে যে মনে হয় স্বামী-স্ত্রীর ব্যবহারের দুটি পৃথক পৃথক আদর্শকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হত। পৌরুষের চূড়ান্ত হিসেবে ধরা হত স্ত্রীকে উপেক্ষা করা এবং স্ত্রীর সতীত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ছিল নিঃস্বার্থভাবে নিজের সুখের দিকে দৃক্‌পাত না করে স্বামীসেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখা। এই মানসিকতার খুব বেশি পরিবর্তন উনবিংশ শতাব্দীতে চোখে পড়ে না। মেয়েদের সামগ্রিক অবস্থার দিকে সমাজের দৃষ্টি পড়েছিল সত্য এবং এটাও সত্য যে গত শতকে অনেকেই খুব আন্তরিকভাবে মেয়েদের উন্নতি চাইতেন। কিন্তু এই আন্তরিকতার উর্ধ্বে মেয়েদের উপযোগিতাগত দিকটি এত প্রধান্য পেয়েছিল যে তাদের সামাজিক মর্যাদার খুব বেশি তারতম্য ঘটেনি।

তবে, গত শতকের সূচনায় ও শেষে মেয়েদের অবস্থার যে কোন পরিবর্তন ঘটেনি, এমন দাবি করা অনৈতিহাসিক। মেয়েরা আগের তুলনায় লেখাপড়া বেশি শিখছিল, একজন দুজন করে মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে শুরু করেছিল, এমন কি, মেয়েদের মধ্যে ডাক্তারি পড়ারও সূচনা হয়েছিল—এগুলি নিঃসন্দেহে এক ধরনের অবস্থা পরিবর্তনের সূচক। তবে তার চেয়েও বড় এক মানসিক পরিবর্তন মেয়েদের মধ্যে লক্ষ করা যায়। এই পরিবর্তনটি খুব কম ক্ষেত্রে এবং এত অলক্ষ্যে ঘটছিল যে বাঙালি সমাজের সামগ্রিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা প্রায়শই দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায়। তবু খেয়াল করে দেখলে গত শতকের শেষ ভাগে এসে মেয়েদের মধ্যে নিজস্ব সত্তার জাগরণের প্রথম অস্ফুট লক্ষণ ধরা পড়ে। তখনও মেয়েরা একান্তভাবেই পুরুষের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ছিল। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেনি। এমনকি, সে বিষয়ে তারা প্রশ্ন পর্যন্ত করেনি। সেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও মানসিক সচেতনতা তাদের ছিল না। তবু তারই মধ্যে ধীরে ধীরে নারীসত্তার জাগরণের ক্ষীণ সূচনা লক্ষ করা যায়। মেয়েরা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেনি বটে, কিন্তু দু একজন প্রতিবাদ করতে শুরু করেছিল। খুব সরব, বাঙ্ময় প্রতিবাদ নয়—মেয়েদের অস্তিত্বের মতই অনুচ্চ প্রতিবাদ। তিলোত্তমা দাসীকে তাঁর স্বামী পরিত্যাগ করেছিলেন। তিলোত্তমা শ্বশুরবাড়িতে অনেক নিগ্রহ সহ্য করে অবশেষে পিত্রালয়ে এসে মনের দুঃখে কবিতা লিখতেন—স্বামীর উদ্দেশে। কাকুতি-মিনতিপূর্ণ সেই সব কবিতার প্রধান বক্তব্য ছিল স্বামীকে অনুরোধ: সে যেন অন্য নারীকে নিয়ে সুখী হওয়া সত্ত্বেও দিনান্তে একবার অভাগিনী তিলোত্তমাকে মনে করে। এটাই বাঙালি মেয়ের অসহায়তার চিরাচরিত ছবি। তার পাশাপাশি যদি আমরা বিংশ শতাব্দীর সূচনায় অমিয়বালার জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করি, তা হলে বাঙালি মেয়ের মানসজগতে পরিবর্তনের দিকটি স্পষ্ট ধরা পড়ে। অমিয়বালাকে তার স্বামী প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অমিয়বালাও বাপের বাড়িতে চলে এসেছিলেন। কিন্তু বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর উদ্দেশে সতীত্বের ধ্বজাধারী কবিতা লিখে বাঙালি মেয়ের পতিভক্তি প্রমাণ করতে বসেননি অমিয়বালা। তিনি দিনলিপি লিখতেন। সেই সব দিনলিপিতে আমরা তাঁকে স্বামীর ব্যবহারে যুগপৎ বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হতে দেখি। স্বামী গিয়ে পিসশাশুড়ীর কাছে অমিয়বালার শরীরের 'মহৎ' রোগ নিয়ে কিছু বলে এসেছিলেন। অমিয়বালা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন—পিসশাশুড়ী তো মর্যাদায় মাতৃসমা এবং বয়সে

মায়ের মতই। তার কাছে ঐ সব কথা আলোচনা করতে লজ্জা করল না স্বামীর! তিলোত্তমা দাসী স্বামীর করুণার পাত্রী হয়ে দিন কাটাতে চেয়েছিলেন। তুলনায় অনেক প্রাগ্রসর ছিলেন অমিয়বালা। স্বামী তাকে নিতে চান না শুনে তিনিও স্বামীর কাছে দয়া-ভিখারিণী হয়ে প্রত্যাবর্তন করতে উৎসাহী ছিলেন না : 'যে আমায় চায় না, যে আমায় লইয়া জীবনে কখনও সুখী হইবে না, তিল তিল করিয়া দগ্ধ হইবে বলিয়াছে, তাহাকে তবু বলিতে হইবে—আমায় নাও।' এটাই ছিল তাঁদের প্রতিবাদের ধরন। আমরা সম্পূর্ণভাবে সমর্পিতপ্রাণা মেয়েদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাহীন জীবনযাপনের যুগ থেকে ধীরে ধীরে উপনীত হই তাদের বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের যুগে। অমিয়বালা দীর্ঘজীবন পাননি—মাত্র উনিশ বছর বয়সে তিনি মারা গিয়েছিলেন। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনেই তিনি যেভাবে প্রতিবাদ করেছিলেন, তা গত শতকের নারীসত্তার জাগরণের অভ্রান্ত লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

এক অমিয়বালার জীবন দিয়েই নয়—নারীসত্তার জাগরণের সূচনা আরও কয়েকজন মহিলার স্মৃতিচারণের মধ্যেও ধরা পড়ে। অনেক মহিলাই নিজের জীবনবৃত্তান্ত লিখতে বসে প্রচলিত সামাজিক রীতি-অভ্যাসের বিরোধিতা করতে শুরু করেছিলেন। কৈলাসবাসিনী দেবী *হিন্দু মহিলাদিগের হীনাবস্থা* গ্রন্থে মেয়েদের শিক্ষা না দেওয়ার পেছনে পুরুষের স্বার্থবোধের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। মেয়েদের মধ্যে আত্মসচেতনতা যে ধীরে ধীরে কতটা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'সখি-সমিতি'র প্রতিষ্ঠা থেকে। মেয়েদের স্বার্থরক্ষায় ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারী দেবী এই সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সমিতির 'প্রধান উদ্দেশ্য' ছিল 'অসহায় বঙ্গবিধবা ও অনাথা বঙ্গকন্যাগণকে সাহায্য করা' (*ভারতী ও বালক*, পৌষ, ১২১৫ বঃ)। বিধবা বা কুমারী নির্বিশেষে আশ্রয়হীনা মেয়েদের ভার গ্রহণ কিংবা আর্থিক সাহায্যদান ছিল এই সমিতির অন্যতম প্রধান কাজ। 'সখি সমিতি' বেশ কয়েকবার মহিলা শিল্পমেলার আয়োজন করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে সম্পূর্ণভাবে মহিলা পরিচালিত কোন সমিতি গঠনের পরিকল্পনা ও তাকে দীর্ঘদিন বাস্তবায়িত করা নারীসত্তার জাগরণের আর একটি অভ্রান্ত পথচিহ্ন।

এভাবে বিচার করলে উনিশ শতকের শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে নারীসত্তার উন্মোচনের আরও কয়েকটি পথস্তম্ভ অবশ্যই আবিষ্কার করা যায়। ঐতিহ্য, সংস্কার, দেশজ রীতি প্রভৃতির দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করে যে মেয়েরা একদিন অল্প অল্প করে বিদ্যালয়ে শিক্ষা নিতে শুরু করেছিল, তাদের মধ্য থেকেই আমার আবিষ্কার করি বিলাতি ডিগ্রিধারিণী মহিলা ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলিকে, আবিষ্কার করি *অন্তঃপুর* পত্রিকার সম্পাদিকা বনলতা দেবীকে। কিন্তু এর চেয়েও বড় পরিবর্তন দেখা যায় মেয়েদের আত্মজীবনী রচনার মধ্যে। কয়েকজন মহিলা যে তাদের জীবনকে পরবর্তী কালের জন্য লিপিবদ্ধ করে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করতে শুরু করেছিলেন, এটা কি কম উল্লেখযোগ্য? গত শতকের ঠিক কতজন মহিলা আত্মজীবনী লিখে রেখে গিয়েছিলেন, তা আমাদের জানার কোন উপায় নেই। এঁদের অনেকের লেখাই পাণ্ডুলিপি আকারে রয়ে গিয়েছে। পুস্তকাকারে বা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত আত্মজীবনীর সংখ্যাও খুব বেশি নয়। তবু, সাল-তারিখ মিলিয়ে পড়লে গত শতকের নারীমনের একটি পরিবর্তনের ছবি ভেসে ওঠে। কুণ্ঠিত পদচারণা থেকে আমরা উত্তীর্ণ হই এক আত্মপ্রত্যয়ী দৃঢ়তার স্তরে।

কৃষ্ণভাবিনী দাসী বিদেশে গিয়ে স্ত্রীস্বাধীনতার রূপ দেখে স্বদেশের সঙ্গে মনে মনে তুলনা করে ব্যথিত হন। কিশোরীচাঁদ মিত্রের স্ত্রী কৈলাসবাসিনী দেবী স্বামীকে মদ্যপানের জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করতে কুণ্ঠিত হন না। বিনোদিনী দাসী হতভাগিনী মেয়েদের দুরবস্থার জন্য সরাসরি দায়ী করেন পুরুষ-সমাজকে। নিস্তারিণী দেবী আত্মজীবনী রচনা করতে বসে কৌলীন্য প্রথার দোষত্রুটিগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। এগুলি সবই মেয়েদের নিজস্ব প্রতিবাদের ধরন। পুরুষের একান্ত অনুগ্রহের পাত্রী অবস্থা থেকে মেয়েরা সামাজিক প্রথার সমালোচনা করছে, নিজেদের অবহেলিত মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছে, শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখার জন্য বা মেয়েদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার জন্য পুরুষদের অভিযুক্ত করছে—এই পরিবর্তনগুলিকে আজ প্রায় এক শতাব্দীর ব্যবধানে যতই সাধারণ বলে মনে হোক, গত শতকের সামাজিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে তা ছিল বেশ 'বৈপ্লবিক'। কারণ, সার্বিক ভাবে গত শতকের বাঙালি মেয়েদের জীবন ছিল, প্রসন্নময়ী দেবীর ভাষায়, একান্তই 'দাবীহীন'। শতকের শেষে এসেও মেয়েদের অবস্থা এমন কিছু ঈর্ষণীয় হয়ে ওঠেনি। তবু তারই মধ্যে যে পরিবর্তন চোখে পড়ে, তা প্রধানত মেয়েদের মানসজগতের পরিবর্তন। তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তন। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় রাসসুন্দরী দেবীর মা এক প্রতিবেসিনীকে সখেদে বলেছিলেন, 'মেয়েছেলে হওয়া মিছা'। আর, শতাব্দীর শেষে এসে আমরা কামিনী রায়ের 'আমার স্বপন' কবিতায় পড়ি:

> তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন,
> শুনে যা আমার আশার কথা,
> আমার নয়নের জল রয়েছে নয়নে
> প্রাণের তবুও ঘুচেছে ব্যথা।—'আলো ও ছায়া' (১৮৮৯)

অর্থাৎ, মেয়েদের চোখের জল ফেলার দিন শেষ হয়নি—তবুও কোন কোন মহিলা বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারতেন 'প্রাণের তবুও ঘুচেছে ব্যথা'। এই ঘোষণা আশার প্রকাশ—বাস্তবের সঙ্গে তার সাদৃশ্য না থাকলেও, মেয়েরা তাদের আশাকে ভাষা দিতে সচেষ্ট হচ্ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ যে 'স্বপ্ন' দেখতে শুরু করেছিল, এটা কি মেয়েদের মনোজগতের কম বড় পরিবর্তন ? উনবিংশ শতাব্দী একটা পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। সেই প্রতিশ্রুতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রক্ষিত হয়নি। তবু যাদের মনে সেই প্রতিশ্রুতির স্পর্শ লেগেছিল, তারা হয়ে উঠেছিলেন গত শতকের মর্মবাণীর সার্থক শরীরী প্রতিমা। গত শতকে মেয়েদের সামাজিক অবস্থার উন্নতির শত প্রতিবন্ধকতা থাকলেও এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে উনবিংশ শতাব্দীই সর্বপ্রথম বাঙালি মেয়ের আত্মনিয়ন্ত্রণকারিণী নারী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করেছিল।

গ্রন্থপঞ্জী

[যেখানে কোন গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ভিন্ন অপর কোন সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে গ্রন্থের·নামের পাশে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের সন উল্লিখিত হয়েছে। যেখানে কোন গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ আছে, সেখানেই কেবল প্রকাশকের নাম স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে কোন পুস্তক বা পুস্তিকা লেখকের রচনাবলী থেকে ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে সংকলন গ্রন্থটির নামোল্লেখই কেবল সেই তালিকায় করা হয়েছে। সংকলন গ্রন্থের বিশদ বিবরণ স্বতন্ত্র তালিকায় সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।]

প্রাথমিক উপকরণ

প্রতিবেদন, সরকারি দলিল

Adam, W., *Report on the State of Education in Bengal (1835-1838)*, ed. by A. Basu, Calcutta : 1941

General Report on Public Instruction the Lower Provinces of the Bengal Presidency, For 1858-59, with Appendixes, Calcutta: 1860.

General Report on Public Instruction In the Lower Provinces of the Bengal Presidency, for 1861-62, with *Appendixes*, Calcutta: 1863

Long, Rev, J. (ed.), *Report on Vernacular Education In Bengal And Behar*, Calcutta : 1868

Parliamentary Papers, House of Commons, 1812-13, vol-X; 1821, vol-XVIII; 1823, vol-XVII; 1824-vol-XXIII; 1825, vol-XXIV; 1826-27, vol-XX; 1830-vol, XXVIII

Richey J.A. (ed.), *Selections From Education Records*, (Pt. II) (1922), New Delhi : 1965

সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সমাজসংস্কারমূলক ও মেয়েদের অবস্থা বিষয়ক প্রবন্ধ ও রচনার নির্বাচিত তালিকা

(যেখানে সন তারিখের উল্লেখ নেই সেখানে বঙ্গাব্দ বলে ধরে নিতে হবে)

অন্তঃপুর

'গৃহধর্ম্ম'	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩০৬
'কবিরাজ মহাশয়' (গল্প)	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩০৬
'স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা'	মাঘ, ১৩০৭
'বঙ্গমহিলাদিগের অর্থকরী শিল্পচর্চা'	মাঘ, ১৩০৭
'জাগিয়া উঠিব' (কবিতা)	মাঘ, ১৩০৭
'স্ত্রীশিক্ষার ব্যয়'	ফাল্গুন, ১৩০৭
'সেকালের রমণী'	বৈশাখ, ১৩০৮
'সেকালের কথা'	জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮
'সাধ্বী'	ভাদ্র, ১৩০৮
'রমণীর গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য'	অগ্রহায়ণ, ১৩০৮
'আত্মোন্নতি'	অগ্রহায়ণ, ১৩০৮
'দৈবের তামাসা' (গল্প)	আষাঢ়, ১৩০৯
'ভারত মহিলার শিক্ষা'	ভাদ্র, ১৩০৯
'পত্নীর গুণশীলতা'	কার্ত্তিক, ১৩০৯
'নববধূ'	অগ্রহায়ণ, ১৩০৯
'রমণীর পারিবারিক ও সামাজিক কর্ত্তব্য'	বৈশাখ, ১৩১০
'পরিবারে শিশুশিক্ষা'	জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০
'অন্তঃপুর ও বিলাসিতা'	জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০
'মহিলার স্বাস্থ্য'	আষাঢ়, ১৩১০
'লজ্জাশীলতা'	আষাঢ়, ১৩১০
'গৃহিণী ও গৃহ শৃঙ্খলা'	ভাদ্র, ১৩১০
'পতি'	আশ্বিন, ১৩১০
'একান্নভুক্ত পরিবারের অশান্তি নিবারণের উপায় কি'	পৌষ, ১৩১০
'আমাদের জাতীয় জীবনে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব'	মাঘ, ১৩১০
'রন্ধনে রমণী'	মাঘ, ১৩১০
'হিন্দু সমাজে বঙ্গনারী'	চৈত্র, ১৩১০
'স্ত্রীশিক্ষার অন্তরায় ও তদ্দূরীকরণের উপায়'	বৈশাখ, ১৩১১
'রমণীর উচ্চশিক্ষা'	ভাদ্র, ১৩১১
'সামাজিক সংঘর্ষে হিন্দু মহিলা সম্প্রদায়'	আষাঢ়, ১৩১১
'বর্তমান সময়ে বালিকাদের শিক্ষার অন্তরায় এবং তদ্দরীকরণের উপায় কি ?'	কার্ত্তিক, ১৩১১
'হিন্দুর অন্তঃপুর'	কার্ত্তিক, ১৩১১

জন্মভূমি

'গর্ভাধান ব্যবস্থার মন্তব্য'	মাঘ, ১২৯৭
'নবেলিয়ানা' (গল্প)	ফাল্গুন, ১২৯৮
'নারীতন্ত্র শাসনপ্রণালী'	বৈশাখ, ১২৯৯
'পরিচ্ছদে-প্রমোদিনী'	ফাল্গুন, ১২৯৯
'হিন্দু রমণীগণের অবস্থা ও শিক্ষা'	মাঘ, ১৩০১
'নফরবাবু' (গল্প)	পৌষ, ১৩০২
'হিন্দু রমণীগণের অবস্থা ও শিক্ষা'	
(দ্বিতীয় প্রস্তাব)	জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫
(তৃতীয় প্রস্তাব)	অগ্রহায়ণ, ১৩০৫
'অনুপমা' (গল্প)	অগ্রহায়ণ, ১৩০৭

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

'স্বদেশীয় ভাষায় বিদ্যাভ্যাস'	বৈশাখ, ১৭৭১ শক
'সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের মনের	
ভাব ও সুখের তারতম্য'	অগ্রহায়ণ, ১৭৭৬ শক
'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা'	ফাল্গুন, ১৭৭৬ শক
'বিধবা বিবাহ'	চৈত্র, ১৭৭৬ শক
'বিধবা বিবাহ'	অগ্রহায়ণ, ১৭৭৭ শক
'বহু বিবাহ'	চৈত্র, ১৭৭৭ শক
'বহু বিবাহ'	ভাদ্র, ১৭৭৮ শক
'বিধবা বিবাহ'	পৌষ, ১৭৭৮ শক
'বিধবা বিবাহ'	পৌষ, ১৭৭৯ শক
'ব্রহ্মবাদিনীর প্রার্থনা'	কার্তিক, ১৭৮৩ শক
'কি কি উপায়ে এদেশের উন্নতি হইতে পারে'	ফাল্গুন, ১৭৮৩ শক
'অন্তঃপুর মধ্যে ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচার'	ভাদ্র, ১৭৮৪ শক
'সমাজ সংস্কার'	কার্তিক, ১৭৮৯ শক
'স্ত্রী জাতির অধিকার, স্ত্রী স্বাধীনতা'	শ্রাবণ, ১৭৯৪ শক
'স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতা'	অগ্রহায়ণ, ১৮০০ শক
'নরনারীর প্রকৃতিবৈচিত্র্য'	আশ্বিন, ১৮০৪ শক
'নরনারীর ঐশ্বরিক কার্য্য-নির্দেশ'	কার্তিক, ১৮০৪ শক
'বিবাহ'	পৌষ, ১৮০৪ শক
'নারী মর্য্যাদা'	মাঘ, ১৮০৪ শক
'শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আশা ও দুঃখের কথা'	জ্যৈষ্ঠ, ১৮১২ শক
'স্ত্রী স্বাধীনতা ও মনু'	শ্রাবণ, ১৮১৩ শক

পরিচারিকা

'আর্য্যনারী কুলের উন্নতি'	জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৬
'স্বর্ণরোগ'	জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৬

পতিব্রতাই নারীর ভূষণ'	জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৬
'স্ত্রীজাতির কিরূপে গৌরবলাভ হইতে পারে'	জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৬
'এ দৃশ্য অসহ্য'	আষাঢ়, ১২৮৬
'স্বর্ণরেণু'	আষাঢ়, ১২৮৬
'A Letter'	আষাঢ়, ১২৮৬
'গৃহচিকিৎসা বা পুরুস্ত্রীকৃত্য'	শ্রাবণ, ১২৮৬
'পতিব্রতা ও পাতিব্রত্য'	শ্রাবণ; ১২৮৬
'Letter'	শ্রাবণ, ১২৮৬
'হিন্দু বিধবা'	ভাদ্র, ১২৮৬
'সদালাপ'	আশ্বিন, ১২৮৬
'বিপন্ন নারী জাতি'	আশ্বিন, ১২৮৬
'স্বর্ণরেণু'	আশ্বিন, ১২৮৬
'পুরাতন ও অধুনাতন স্ত্রীশিক্ষা'	কার্তিক, ১২৮৬
'এ আবার কেন ?'	অগ্রহায়ণ, ১২৮৬
'স্বাধীনতা না স্বেচ্ছাচারিতা ?'	পৌষ, ১২৮৬
'নব্য মহিলাদিগের বিনয়'	মাঘ, ১২৮৬
'Letter'	ফাল্গুন, ১২৮৬
'স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিক্ষা'	চৈত্র, ১২৮৬
'নারী মানবকুলের আশ্রয়'	আষাঢ়, ১২৮৭
'পাঠে উন্নতি'	ভাদ্র, ১২৮৭
'স্ত্রী স্বাধীনতার অর্থ কি ?'	কার্তিক, ১২৮৭
'প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা'	মাঘ, ১২৮৭
'স্ত্রী ও পুরুষের শিক্ষা প্রণালী একরূপ হওয়া উচিত কি না'	ফাল্গুন, ১২৮৭
'প্রমিলার শিক্ষা'	চৈত্র, ১২৮৭
'সতীত্ব ও পাতিব্রত্যে বিভিন্নতা কি ?'	বৈশাখ, ১২৮৯
'স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী'	বৈশাখ, ১২৮৯
'কলহপ্রিয়তা'	আষাঢ়, ১২৮৯
'মানব শরীরে ঈশ্বরের জ্ঞান কৌশল'	শ্রাবণ, ১২৮৯
'স্ত্রীগণের পরীক্ষা বিষয়ে নিয়মাবলী'	শ্রাবণ, ১২৮৯
'বিধবা বিবাহ'	শ্রাবণ, ১২৮৯
'সহধর্ম্মিনী'	ভাদ্র, ১২৮৯
'বেণীবাবুর পরিবর্তন'	আশ্বিন, ১২৮৯
'অপ্রসূতি মাতা'	কার্তিক, ১২৮৯
'প্রগলভতা'	কার্তিক, ১২৯১
'পরিচ্ছন্নতা'	অগ্রহয়ণ, ১২৯১
'নববধূ লক্ষণ'	ফাল্গুন, ১২৯১
'স্ত্রীজাতির নীতিবোধ'	ফাল্গুন, ১২৯১
'স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্য'	বৈশাখ, ১২৯২
'নারীজীবন'	বৈশাখ, ১২৯২
'অমৃত শীকর'	বৈশাখ, ১২৯২

'স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য'	জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২
'সতী ও সতীত্ব'	আষাঢ়, ১২৯২
'একান্নভুক্ততা'	আষাঢ়, ১২৯২
'ধৈর্য্য'	আষাঢ়, ১২৯২
'মিলনের সুখ'	মাঘ, ১২৯২
'বিবাহ বন্ধন কি অনিত্য'	মাঘ, ১২৯২
'অবরোধ প্রথা'	চৈত্র, ১২৯২
'স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্য'	বৈশাখ, ১২৯৩
'নারীজীবন'	বৈশাখ, ১২৯৩
'নারীর সৌন্দর্য্য'	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১২৯৩
'শ্বশ্রূ ও ননন্দা'	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১২৯৩
'সে কালের ও একালের নারীজাতির উন্নতি'	শ্রাবণ, ১২৯৩
'স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা'	শ্রাবণ, ১২৯৩
'চিত্তবিকার'	চৈত্র, ১২৯৩
'পরিত্যক্তা রমণীর খেদ' (পদ্য)	মাঘ, ১২৯৪
'আদর্শ পত্নী'	চৈত্র, ১২৯৪
'রন্ধন শিক্ষা'	ভাদ্র, ১২৯৫
'দুয়ে এক কিরূপে'	কার্ত্তিক, ১২৯৫
'স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্য'	ভাদ্র, ১২৯৬
'পারিবারিক সুখ'	বৈশাখ, ১২৯৭
'সময়ের আদর'	জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭
'উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীশিক্ষা এবং ভিকটোরিয়া কলেজ'	শ্রাবণ, ১২৯৭[৮]
'বঙ্গীয় নারী সমাজ'	ভাদ্র, ১২৯৭
'স্ত্রীশিক্ষার সুফল'	আশ্বিন, ১২৯৭
'অবলার বল'	কার্ত্তিক, ১২৯৭
'কয়েকটি সৎ পরামর্শ'	অগ্রহায়ণ, ১২৯৭
'ভদ্রমহিলা'	পৌষ, ১২৯৭
'বিবাহের সম্বন্ধ'	আষাঢ়, ১২৯৮
'শিক্ষিতা বঙ্গমহিলা'	ভাদ্র, ১২৯৮
'স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে অর্দ্ধশিক্ষিতা হিন্দু মহিলাদিগের মতামত'	ভাদ্র, ১৩০৮

বঙ্গমহিলা

'পতি সতীর একমাত্র গতি'	জ্যৈষ্ঠ, ১২৮২
'স্ত্রীলোকের প্রকৃত স্বাধীনতা'	আষাঢ়, ১২৮২
'নারীজন্ম কি অধর্ম্ম'	শ্রাবণ, ১২৮২
'বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার'	শ্রাবণ, ১২৮২
'স্ত্রীশিক্ষা'	ভাদ্র, ১২৮২
'পারিবারিক সংস্কার'	মাঘ, ১২৮২
'বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার'	চৈত্র, ১২৮২
'স্ত্রী-স্বাধীনতা'	মাঘ, ১২৮৩

বামাবোধিনী পত্রিকা

'বিদ্যা বিষয়ক কথোপকথন'	ভাদ্র, ১২৭০
'স্ত্রীর প্রতি স্বামীর উপদেশ'	আশ্বিন, ১২৭০
'মেয়েছেলে এত অনাদরের কেন ?'	মাঘ, ১২৭০
'কন্যার প্রতি মাতার উপদেশ'	বৈশাখ, ১২৭১
'কন্যার প্রতি মাতার দ্বিতীয় উপদেশ'	জ্যৈষ্ঠ, ১২৭১
'স্ত্রী ও পুরুষজাতির পরস্পর সম্বন্ধ'	শ্রাবণ, ১২৭১
'স্ত্রী ও স্বামীর পরস্পর সম্বন্ধ'	আশ্বিন, ১২৭১
মধুমিতা গঙ্গোপাধ্যায়, 'বামাগণের রচনা'	অগ্রহায়ণ, ১২৭১
'দেশাচার। বিবাহ প্রণালী'	অগ্রহায়ণ, ১২৭১
'বিবাহ-প্রণালী'	মাঘ, ১২৭১
'অলঙ্কার পরিধান'	আষাঢ়, ১২৭২
'শিশুদের আহার'	বৈশাখ, ১২৭৩
যোগমায়া গোস্বামী, 'বামাগণের রচনা'	ভাদ্র, ১২৭৩
'সন্তানরক্ষা'	অগ্রহায়ণ, ১২৭৩
'বিদ্যা ব্যতীত স্ত্রীলোকের মন কি প্রকার'	বৈশাখ, ১২৭৪
'শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান'	জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৪
'স্ত্রীজাতির বিশেষ কার্য্য'	জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৪
'স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ব্যবহার'	আষাঢ়, ১২৭৪
'স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা'	শ্রাবণ, ১২৭৪
কামিনী দত্ত, 'স্ত্রীশিক্ষা'	ভাদ্র, ১২৭৪
'বিবাহ'	ভাদ্র, ১২৭৪
'ধাত্রীবিদ্যা'	আশ্বিন, ১২৭৪
'গর্ভাবস্থায় প্রসূতির শুশ্রূষা'	কার্তিক, ১২৭৪
'সূতিকাগার'	অগ্রহায়ণ, ১২৭৪
'স্ত্রীশিক্ষার দুরবস্থা'	ফাল্গুন, ১২৭৪
'ধাত্রীবিদ্যা'	ফাল্গুন, ১২৭৪
'ধাত্রীবিদ্যা'	জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৫
'সূতিকাগারে প্রসূতির শুশ্রূষা'	আষাঢ়, ১২৭৫
"স্ত্রীজাতির বিশেষ কার্য্য'	আষাঢ়, ১২৭৫
'স্বামী ও স্ত্রীর কথোপকথন'	কার্তিক, ১২৭৫
ঐ	ফাল্গুন, ১২৭৫
'স্ত্রীলোকদিগের স্নান প্রণালী'	শ্রাবণ, ১২৭৬
'পতিব্রতা ধর্ম্ম'	ভাদ্র, ১২৭৬
'স্বামীর উপর স্ত্রীর প্রভাব'	ফাল্গুন, ১২৭৬
'স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার সহিত ধর্ম্মশিক্ষার আবশ্যকতা'	জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৭
'পতিব্রতা এবং সতী'	জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৭
'বঙ্গীয় স্ত্রীসমাজ'	আশ্বিন, ১২৭৭
কুন্দমালা দেবী, 'বিদ্যা শিখিলে কি	

গৃহকর্ম্ম করিতে নাই ?'	আশ্বিন, ১২৭৭
যোগমায়া দেবী, 'বামাগণের রচনা'	ফাল্গুন, ১২৭৭
'বামাগণের রচনা'	চৈত্র, ১২৭৭
'স্ত্রীজাতির পরিশ্রম'	চৈত্র, ১২৭৭
'ইনস্‌পেক্‌ট্রেস নিয়োগের আবশ্যকতা'	বৈশাখ, ১২৭৮
'স্ত্রী জাতির সামাজিক উন্নতি'	জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৮
'বঙ্গদেশীয় মহিলাগণের স্বাধীনতার বিষয়'	জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৮
'সরমা ও সুশীলার কথোপকথন'	আষাঢ়, ১২৭৮
'নারীদিগের কোমলতা'	কার্ত্তিক, ১২৭৮
'গার্হস্থ্য চিকিৎসা প্রণালী'	পৌষ, ১২৭৮
'আদর্শ জননী'	পৌষ, ১২৭৮
নিস্তারিণী দেবী, 'বিদ্যার সমান বন্ধু নাই'	মাঘ, ১২৭৮
'বামাগণের মানসিক উন্নতি'	ফাল্গুন, ১২৭৮
'স্ত্রীজাতির বিশেষ শিক্ষা'	শ্রাবণ, ১২৭৯
'সন্তান পালন রীতি'	শ্রাবণ, ১২৭৯
'নারীগণের গণিত শিক্ষার আবশ্যকতা'	শ্রাবণ, ১২৭৯
'নব্যবঙ্গমহিলা'	ফাল্গুন, ১২৭৯
'স্ত্রীগণের ধর্ম্মহীন শিক্ষা সমুচিত কি না'	চৈত্র, ১২৭৯
'এদেশের স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ব্যবহার'	বৈশাখ, ১২৮০
'বামাকুলোন্নতি বিভাগ'	বৈশাখ, ১২৮০
'বঙ্গদেশের স্ত্রীশিক্ষা বিবরণ'	বৈশাখ, ১২৮০
'স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী'	জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০
ঐ	আষাঢ়, ১২৮০
ঐ	শ্রাবণ, ১২৮০
'বঙ্গীয় যুবতীদিগের ধর্ম্মভাব'	অগ্রহায়ণ, ১২৮০
'বঙ্গমহিলা'	বৈশাখ, ১২৮১
'বারংবার স্বামী ও স্ত্রী গ্রহণ'	আষাঢ়, ১২৮১
'আমাদিগের নারীজাতির অবস্থা'	শ্রাবণ, ১২৮১
'ভার্য্যার গুণশীলতা'	আশ্বিন, ১২৮১
'সতীত্ব নারীর একমাত্র ভূষণ'	আশ্বিন, ১২৮১
'নব্য বঙ্গমহিলা'	আশ্বিন, ১২৮১
'হিংসা'	অগ্রহায়ণ, ১২৮১
'স্ত্রীলোকের আমোদ'	মাঘ ও ফাল্গুন, ১২৮১
'স্ত্রীশিক্ষা'	বৈশাখ, ১২৮৮
'বঙ্গ-সংসার'	আষাঢ়, ১২৮৮
'গার্হস্থ্য শিক্ষা'	আশ্বিন. ১২৮৮
'নারীদিগের কোমলতা'	কার্ত্তিক, ১২৮৮
'স্ত্রীজাতির প্রকৃত উন্নতি কি'	পৌষ, ১২৮৮
'স্ত্রীজাতির সদ্‌গুণ বিষয়ে কথোপকথন'	মাঘ, ১২৮৮
'বঙ্গদেশের শিক্ষা বিবরণ ও স্ত্রীশিক্ষা'	ফাল্গুন, ১২৮৮
'বাল্যক্রীড়া'	বৈশাখ, ১২৯০

'বাল্য বিবাহ ও অবরোধ প্রথা সম্বন্ধে আলোচনা'	জ্যৈষ্ঠ, ১২৯০
'বাল্যক্রীড়া'	আষাঢ়, ১২৯০
হেমলতা দেবী, 'আমাদের 'জীবনে শিক্ষার ফল'	আশ্বিন, ১২৯০
অনুজানন্দিনী রায়, 'মহিলাদিগের বিদ্যাভ্যাসের সহিত ধর্ম্মশিক্ষার আবশ্যকতা'	কার্ত্তিক, ১২৯০
'নারীজীবনের উদ্দেশ্য'	মাঘ, ১২৯০
'হিন্দু নারীর ব্রত বিধান'	শ্রাবণ, ১২৯১
'নারী জীবন'	ভাদ্র, ১২৯১
'স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দুই-এক কথা'	অগ্রহায়ণ, ১২৯১
'স্ত্রীলোকদিগের কুস্তী করা উচিত কি না'	কার্ত্তিক, ১২৯১
'হিন্দু বিবাহের বাসর ঘর ও স্ত্রী-আচার'	আষাঢ়, ১২৯২
'আমাদের অভাব'	ভাদ্র, ১২৯২
'শিক্ষিতা মহিলাদিগের ত্রুটী'	বৈশাখ, ১২৯৪
'বাল্যবিবাহ'	শ্রাবণ, ১২৯৪
'হিন্দু শিষ্টাচার'	আশ্বিন, ১২৯৪
'স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসা শিক্ষা'	মাঘ, ১২৯৪
'বামাজাতির সংস্কার'	চৈত্র, ১২৯৪
'বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের বর্ত্তমান অবস্থা'	জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৮
ঐ	আষাঢ়, ১২৯৮
'যেমন দেবা তেমন দেবী'	ভাদ্র, ১২৯৮
'মেয়েদের নীতিশিক্ষা'	আশ্বিন, ১২৯৮
'লজ্জাশীলতা'	ফাল্গুন, ১২৯৮
'স্ত্রীশিক্ষা'	অগ্রহায়ণ, ১২৯৯
'বিবাহিতা কন্যার প্রতি উপদেশ'	জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০
'আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা'	বৈশাখ, ১৩০৪
'ধর্ম্ম ধার্ম্মিককে রক্ষা করে'	বৈশাখ, ১৩০৪
'দুর্ব্বলা রমণীর অপরাজেয়া শক্তি'	জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৪
ঐ	আষাঢ়, ১৩০৪
'পরার্থের সূত্রপাত—বিবাহ'	শ্রাবণ, ১৩০৪
'রমণীর অপরাজেয়া শক্তির উৎস কোথায় ?'	শ্রাবণ, ১৩০৪
'সংসারপ্রান্তরে বটচ্ছায়া'	ভাদ্র, ১৩০৪
'নরনারীর সাম্য'	ভাদ্র, ১৩০৪
'গার্হস্থ্য-প্রবন্ধ'	আশ্বিন, ১৩০৪
'প্রকৃত জীবন'	অগ্রহায়ণ, ১৩০৪
'প্রকৃত স্ত্রী'	পৌষ, ১৩০৪
'আদর্শ হিন্দু পরিবার'	পৌষ, ১৩০৪
ঐ	মাঘ, ১৩০৪
'সাধ্বী কৈলাসকামিনী'	চৈত্র, ১৩০৪

বিদ্যাদর্শন (সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র থেকে)

'হিন্দু স্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষা'	আষাঢ়, ১৭৬৪ শক
'বহুবিবাহ'	শ্রাবণ, ১৭৬৪ শক
'হিন্দু স্ত্রীদিগের দুঃখমোচনীয় সম্বাদ'	আশ্বিন, ১৭৬৪ শক
'এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের ব্যভিচারের কারণ'	কার্তিক, ১৭৬৪ শক

বেদব্যাস

'পারিবারিক উন্নতি'	শ্রাবণ, ১২৯৩
'নারীধর্ম্ম'	বৈশাখ, ১২৯৬
'বালিকা বিবাহ ও বালিকা সহবাস'	ভাদ্র, ১২৯৭
'স্ত্রীস্বাধীনতা ও শিক্ষা'	অগ্রহায়ণ, ১২৯৭

ভারত-মহিলা

অমৃতলাল গুপ্ত, 'দেবী'	অগ্রহায়ণ, ১৩১২
শিবনাথ শাস্ত্রী, 'নারীর সখিত্ব'	ফাল্গুন, ১৩১২
শিবনাথ শাস্ত্রী, 'গৃহধর্ম্ম ও সামাজিক রীতি'	আষাঢ়, ১৩১৩
'প্রাচীন ও নব্যভারতে নারীজাতিব অবস্থা'	শ্রাবণ, ১৩১৩
হেমলতা সরকার, 'নাবী জাতির শিক্ষা'	বৈশাখ, ১৩১৪
রাজকুমারী দাস, 'অবরোধ প্রথা'	জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪
রজনীকান্ত গুপ্ত, 'কয়েকটি অদ্ভুত প্রথা'	জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪
হেমলতা সরকার, 'নারীজাতির শিক্ষা'	আষাঢ়, ১৩১৪

মহিলা

'একটি সুপত্নী'	শ্রাবণ, ১৩০৪
'নারীজীবনের কর্ত্তব্য'	কার্তিক, ১৩০৪
'নারীজাতির প্রকৃত উন্নতি কিরূপে হয়'	কার্তিক, ১৩০৪
'নারীজাতির কিরূপ শিক্ষা হওয়া উচিত'	মাঘ, ১৩০৪
'প্রাচীন ও নব্য শ্রেণীর বঙ্গমহিলা'	শ্রাবণ, ১৩০৮
'স্ত্রীশিক্ষা'	কার্তিক, ১৩০৮
'নারী কি নরের সমকক্ষ ?'	ভাদ্র, ১৩১০
'মহিলাদিগের অবরোধ প্রথা'	আশ্বিন, ১৩১০
'অর্দ্ধাঙ্গী'	আশ্বিন, ১৩১০
'সুগৃহিণী'	মাঘ, ১৩১০
'বঙ্গীয় গৃহিণীদিগের নিত্যকার্য্য'	চৈত্র, ১৩১০
'স্ত্রীশিক্ষা'	শ্রাবণ, ১৩১১
'স্ত্রীশিক্ষার ফল'	ফাল্গুন, ১৩১১
'বঙ্গনারীদিগের অবস্থা'	কার্তিক, ১৩১৩

'রক্ষণশীলা ও উন্নতিশীলা নারী'	পৌষ, ১৩১০

সাধারণী

'পত্নী ভক্তি ও পত্নী ভয়'	১৭ই চৈত্র, ১২৮০
'বঙ্গের বিধবা রমণী' (কবিতা)	২৮শে অগ্রহায়ণ, ১২৮১
'দুঃখিনী মহিষী' (কবিতা)	১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৮২
'উন্নতি'	৯ই ফাল্গুন, ১২৮২
'কন্যাবিক্রয়'	৭ই চৈত্র, ১২৮২
'ভারত মহিলা'	১১ই আষাঢ়, ১২৮৩
'মেয়ে মহলে গণ্ডগোল' (প্রেরিত পত্র)	৩রা পৌষ, ১২৮৩
'বাঙ্গালীর বিবাহ ব্যয়'	৬ই চৈত্র, ১২৮৩
'নারীজাতি'	২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৪
'ক্রুদ্ধা বরাঙ্গনার প্রতি' (কবিতা)	২৯শে শ্রাবণ, ১২৮৪
'স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা'	৯ই আষাঢ়, ১২৮৬
'নাতিনীর প্রতি ঠাকরুণ দিদি'	২২শে পৌষ, ১২৮৬
'স্ত্রীলোকদিগের নিমন্ত্রণ ও নূতন করের সৃষ্টি'	২৮শে পৌষ, ১২৮৬
'পুরুষের অত্যাচার'	১৯শে মাঘ, ১২৮৬
'গৃহিণীগণের গৃহকার্য্য করা চাই'	৪ঠা শ্রাবণ, ১২৮৭
'স্বামী বশীকরণ মন্ত্র'	১৪ই ভাদ্র, ১২৮৭
'বঙ্গমহিলার সন্তানাদি লালন পালনের কথা'	১৬ই কার্তিক, ১২৮৭
'বঙ্গমহিলার কলহ ও নিন্দাপ্রিয়তা'	১৬ই কার্তিক, ১২৮৭
'বঙ্গমহিলার সংসার যাত্রায় সহায়তা'	৩০শে কার্তিক, ১২৮৭
'বঙ্গমহিলা কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন ?'	২১শে অগ্রহায়ণ, ১২৮৭
'বঙ্গমহিলার শিক্ষা'	৫ই পৌষ, ১২৮৭
'বঙ্গমহিলার আচার অনাচারের কথা'	১২ই পৌষ, ১২৮৭
'বাঙ্গালির বিবাহ'	১০ই ফাল্গুন, ১২৮৭
'বঙ্গীয় সধবা রমনী'	২১শে চৈত্র, ১২৮৭
'সেকালের এবং একালের বঙ্গমহিলা'	২০শে বৈশাখ, ১২৮৮

সংবাদ প্রভাকর

'স্ত্রী বিদ্যা'	৭. ৫. ১৮৪৯
'অমরচন্দ্র ঘোষ প্রেরিত পত্র'	১২. ৬. ১৮৪৯
'সম্পাদকীয় রচনা'	১৩. ৬. ১৮৪৯
'সম্পাদকীয় রচনা'	২৪. ৭. ১৮৪৯
'"কস্যচিৎ রাজারহাট নিবাসী ভদ্রজনস্য" প্রেরিত পত্র'	৯. ৮. ১৮৪৯
'প্রণয়ের খুন'	১০. ৬. ১৮৫২
'"বঙ্গদেশীয় পীড়িতজনস্য" প্রেরিত পত্র'	৩০. ৭. ১৮৫২
'"কস্যচিৎ প্রভাকর পাঠকস্য" প্রেরিত পত্র'	১৪. ৮. ১৮৫২

'আশ্চর্য্য প্রতারণা'	১০. ৯. ১৮৫২
'সম্পাদকীয় রচনা'	২১. ২. ১৮৫৩
'প্রেরিত পত্র'	১. ৩. ১৮৫৩
'সম্পাদকীয় রচনা'	১১. ২. ১৮৫৪
'কালস্য কুটিলা গতিঃ'	২১. ৬. ১৮৫৪
'"বাসভ্রষ্ট বারাঙ্গনানাং" প্রেরিত পত্র'	১৮. ৯. ১৮৫৪
'সম্পাদকীয় রচনা'	১৪. ১১. ১৮৫৪
'"বিয়ে পাগলা" প্রেরিত পত্র'	১৩. ২. ১৮৫৬
'পদ্য'	১৫. ৮. ১৮৫৬
'পদ্য'	১৬. ১০. ১৮৫৬
'হিতাবলী'	১৬. ১০. ১৮৫৬
'স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবা বিবাহ'	১৩. ১. ১৮৫৭

সোমপ্রকাশ

'একাদশী দিবসে বিধবা কন্যার 'মাতার খেদ' (কবিতা)	১লা অগ্রহায়ণ, ১২৭০
'অলঙ্কার ধাবণ এদেশীয় বমণীগণেব চিত্তের লঘুতার এক প্রধান কাবণ'	৮ই অগ্রহায়ণ, ১২৭০
'বিবাহবাসবগৃহ'	১৫ই অগ্রহায়ণ, ১২৭০
'সমাজ সংস্কারেব আবশ্যকতা'	১৪ই পৌষ, ১২৭০
'এ দেশের বাস্তবিক উন্নতি কতদূব হইয়াছে ?'	২রা চৈত্র, ১২৭০
'হিন্দু সমাজ ও বিধবাবিবাহ'	১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৪
'বিধবাবিবাহ ও তাহাব প্রতিবাদিগণ'	২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৪
'বাল্যবিবাহের বিষময় ফল'	২১শে শ্রাবণ, ১২৭৪
'বেশ্যাবিবাহ'	১৮ই ভাদ্র, ১২৭৪
'সমাজকন্টক'	১৪ই কার্তিক, ১২৭৪
'কোণের বউ'	১৫ই বৈশাখ, ১২৮৭
'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের দ্বিচারিণী হইবার কারণ কি ?' (পত্র)	২৯শে আষাঢ় ও ৫ই শ্রাবণ, ১২৮৭
'একান্নবর্ত্তিতা'	২৬শে শ্রাবণ, ১২৮৭
'বাল্যবিবাহ নিষেধক বিধি'	১৫ই ফাল্গুন, ১২৮৯

The Calcutta Review

'The English in India—Our Social Morality', vol. I, May-Aug, 1844

'The Kulin Brahmins of Bengal' , vol II, Oct-Dec, 1844

'Bengal as it is', vol.III, Jan-June, 1845

'The Early or Exclusively Oriental Period of Government Education in Bengal', vol. III, Jan-June, 1845

'English Women in Hindustan', vol. IV, July-Dec, 1845

'The First Protestant Missionary to Bengal', vol. VII, Jan-June, 1847

'Calcutta Domestic Life', vol. XII, July-Dec, 1849

'Popular Literature of Bengal', vol. XIII, Jan-June, 1850

'Educational Establishment of Calcutta', vol. XIII, Jan-June, 1850

'Hindu Caste', vol. XV, Jan-June, 1851

'Bengali Poetry', vol, XVII, Jan-June, 1852

'Vernacular Education For Bengal' vol. XXII, Jan-June, 1854

'Native Female Education', vol. XXV, July-Dec, 1855

'Marriage of Hindu Widows', vol. XXV, July-Dec, 1855

The Friend of India (Quarterly Series)

'On the Effect of the Native Press in India', no. 1, Sept, 1820

'On the State of Female Society in India', no. 2, Dec, 1820

'On the Female Immolation', no. 3, March, 1821

সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার সংকলন

বিনয় ঘোষ (সম্পা.) *সাময়িক বাংলার সমাজচিত্র* (প্রথম খণ্ড) কলকাতা ঃ ১৯৭৮ ; (দ্বিতীয় খণ্ড) কলকাতা : ১৯৭৮ ; (তৃতীয় খণ্ড), কলকাতা : ১৯৮০ ; (চতুর্থ খণ্ড) কলকাতা : ১৯৮০ ; (পঞ্চম খণ্ড) কলকাতা : ১৯৮১ ; (ষষ্ঠ খণ্ড) কলকাতা : ১৯৮৩

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.) *সংবাদপত্রে সেকালের কথা* (প্রথম খণ্ড) (১৩৩৯ বঃ) কলকাতা : ১৩৭৭ বঃ ; (দ্বিতীয় খণ্ড) (১৩৪০ বঃ) কলকাতা : ১৩৮৪ বঃ

Chattopadhyay, Gautam (ed.) *Bengal : Early Nineteenth Century*, Calcutta : 1978

Ghose, Benoy (ed.) *Selections from English Periodicals of 19th Century Bengal*, vol.3 Calcutta : 1980; vol. 6, Calcutta : 1981

Moitra, S.C. (ed.) *Selections from Jnanannesan*, Calcutta : 1979

সমসাময়িক বা প্রায়-সমসাময়িক সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পুস্তক-পুস্তিকা

অক্ষয়কুমার দত্ত, *ধর্মনীতি*, কলকাতা : ১৮৫৬

বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, কলকাতা : ১৮৫৬

অক্ষয়চন্দ্র সরকার, *সমাজসমালোচন*, কলকাতা : ১৮৭৪

আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত, *গৃহিণীর কর্ত্তব্য* (১২৯১ বঃ) কলকাতা : ১৩২৯ বঃ

ঈশানচন্দ্র বসু ,*নারী-নীতি*, কলকাতা : ১২৯১ বঃ

—, *স্ত্রীদিগের প্রতি উপদেশ*, কলকাতা : ১৮০৭ শক

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *বিধবাবিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা : ১৮৫৫

—, (দ্বিতীয় খণ্ড) কলকাতা : ১৮৫৬

—, *বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার* (প্রথম খণ্ড) কলকাতা : ১৮৭১

—, *অতি অল্প হইল*, কলকাতা : ১৮৭৩

(প্রতিটি লেখাই *বিদ্যাসাগর বচনা সংগ্রহ*, দ্বিতীয খণ্ডে সংকলিত)

উইলিয়াম কেরী, *কথোপকথন* (১৮০১), *পুবাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন*, (প্রথম খণ্ডে সংকলিত)

কালীপ্রসন্ন ঘোষ, *নাবীজাতি বিষযক প্রস্তাব*, কলকাতা : ১৮৬৯

—, *সমাজ সংশোধনী*, কলকাতা : ১৮৭২

কাশীনাথ দাসগুপ্ত. *কন্যাপণ বিনাশিকা*, কলকাতা : ১৮৫৯

কুচবিহাব বাজকুমাবেব সহিত বাবু কেশবচন্দ্র সেনেব কন্যাব বিবাহ বিষযক প্রতিবাদ, *কলিকাতা* : ১২৮৪ বঃ

কুল কালিমা, কলকাতা : ১২৮০ বঃ

কৈলাসবাসিনী দেবী, *হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি*, কলকাতা : ১৭৮৭ শক

—, *হিন্দু মহিলাগণেব হীনাবস্থা*, কলকাতা : ১৮৬৩

কৃষ্ণপ্রিয়া চৌধুরাণী, *নারী-মঙ্গল*, কলকাতা : ১৩০১ বঃ

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা*, কলকাতা : ১৩০৭ বঃ

গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, *মাতৃশিক্ষা*, কলকাতা : ১৮৭০

গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, *স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক*, কলকাতা : ১৮২২

—, (*পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন*, দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত)

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *মনোরমার গৃহ*, কলকাতা : ১২৯৯ বঃ

চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, *বঙ্গবিবাহ*, কলকাতা : ১২৮৮ বঃ

চন্দ্রনাথ বসু, *হিন্দু বিবাহ*, কলকাতা : ১২৯৪ বঃ

জগচ্চন্দ্র মজুমদার, *নীতিগর্ভ প্রসূতি প্রসঙ্গ*, কলকাতা : ১২৭৫ বঃ

টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র), *রামারঞ্জিকা* (১৮৬১) কলকাতা : ১৩১৯ বঃ

—, *এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা*, কলকাতা : ১৮০০ শক (*প্যারীচাঁদ রচনাবলী গ্রন্থে* সংকলিত)

তারকনাথ বিশ্বাস, *বঙ্গীয় মহিলা*, কলকাতা : প্রকাশ সন অজ্ঞাত

তারাশঙ্কর তর্করত্ন, *ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা*, কলকাতা : ১৮৫১

ত্রৈলোক্যনাথ দেব, *অতীতের ব্রাহ্মসমাজ* (১২৯১ বঃ) কলকাতা : ১৯৭৯

ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষাল, *সমাজ সংস্করণ*, কলকাতা : ১৮৮৩

দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, *বিধবাবিবাহবাদ*, কলকাতা : ১২৬১ বঃ

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, *বিবাহ সংস্কার*, কলকাতা : ১৮৬৯

ধীরেন্দ্রনাথ পাল, *স্ত্রীর সহিত কথোপকথন* (প্রথম খণ্ড) কলকাতা : প্রকাশ সন অজ্ঞাত

—, (দ্বিতীয় খণ্ড) কলকাতা : ১২৯১ বঃ

—, *নরনারীতত্ত্ব*, কলকাতা : ১৮৮৫

নগেন্দ্রবালা সরস্বতী, *গার্হস্থ্য ধর্ম*, কলকাতা : ১৯০৪

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, *সমাজ-সংস্করণ*, কলকাতা : ১২৭৬ বঃ

নারীশিক্ষা, কলকাতা : ১২৭৫ বঃ

পীতাম্বর সেন কবিরত্ন, *বিধবাবিবাহ নিষেধ*, কলকাতা : ১৮৫৫

পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত, *চিরসঙ্গিনী*, কলকাতা : ১২৯১ বঃ

প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত, *স্ত্রীশিক্ষা* (১৮৭৪) কলকাতা : ১৯১৪

প্রাণনাথ পণ্ডিত, *অসতী বিধবার বিষয়াধিকার বিষয়ে বক্তৃতা*, কলকাতা : ১৭৮৫ শক

বসন্তকুমারী দাসী, *যোষিদ্বিজ্ঞান*, বরিশাল : ১২৮২ বঃ

বসন্তকুমারী বসু, *নারীজীবনের কর্ত্তব্য*, কলকাতা : ১৩১৯ বঃ

বামাসুন্দরী দেবী, *কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে*, কলকাতা: ১৭৮৩ শক

বিনোদ বিহারী রায়, *শিশুপালন*, রাজশাহী : ১২৯৭ বঃ

বিহারীলাল মিত্র, *সংসার-রহস্য*, কলকাতা : ১৮২১ শক

ভূদেব মুখোপাধ্যায়, *পারিবারিক প্রবন্ধ*, কলকাতা : ১৮৮২

—, *সামাজিক প্রবন্ধ* (১৮৯২) কলকাতা : ১৯৮১

—, *আচার প্রবন্ধ*, কলকাতা : ১৮৯৫

মনোমোহন বসু, *হিন্দু আচার ব্যবহার* (প্রথম ভাগ), কলকাতা : ১৮৭৩

মানকুমারী বসু, *বাঙ্গালী রমণীদিগের গৃহধর্ম*, কলকাতা : ১৮৯০

যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, *ধাত্রীশিক্ষা এবং প্রসূতি শিক্ষা*, চুঁচুড়া : ১৮৭১

রাজনারায়ণ বসু, *সেকাল আর একাল* (১৮৭৪), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা : ১৩৮৩ বঃ

রাধাপ্রসাদ রায়, *বঙ্গের বর্ত্তমান বিবাহ প্রণালী*, কলকাতা : ১৮০৭ শক

রামচন্দ্র দত্ত, *বাল্যবিবাহ*, কলকাতা : ১২৯৪ বঃ

রামধন তর্কপঞ্চানন, *বিধবাবেদন নিষেধক*, কলকাতা : ১২৭৪ বঃ

রামমোহন রায়, *সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ*, কলকাতা : ১৮১৮ (*রামমোহন রচনাবলী* গ্রন্থে সংকলিত)

—, *সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ*, কলকাতা : ১৮১৯ (ঐ গ্রন্থে সংকলিত)

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, *কৌলিন্য সংশোধিনী*, ঢাকা : ১৮৭১

—, *কুলীন কীর্ত্তন*, ঢাকা : ১৮৮৬

শরচ্চন্দ্র ধর, *অবলাবান্ধব*, কলকাতা : ১৯৪৯ সম্বৎ

শশধর তর্কচূড়ামণি, *ধর্ম্মব্যাখ্যা*, কলকাতা : ১৮০৬ শক

শিবচন্দ্র দেব, *শিশুপালন* (১৮৫৭), কলকাতা : ১৮৬৪

শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, *বিধবা বিবাহ খণ্ডন*, কলকাতা : ১২৯২ বঃ

শিবনাথ শাস্ত্রী, *জাতিভেদ* (১২৯১ বঃ), কলকাতা : ১৩৭০ বঃ

—, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* (১৯০৪), কলকাতা : ১৯৮৩

শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ ভট্টাচার্য, *বিধবাবিবাহ নিষেধ*, শ্রীরামপুর : ১৮৭৪

সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, *ললনা সুহৃদ*, কলকাতা : ১২৯৪ বঃ

—, *দম্পতী-সুহৃদ*, কলকাতা : ১২৯৭ বঃ

সমালোচক গণ্ডূষলসঞ্চাবিসফর (ছদ্ম), *বিধবাবিবাহবিধায়ক প্রবন্ধ সকলের সমালোচনা*, কলকাতা : ১২৯২ বঃ

সারদা প্রসাদ হাজরা চৌধুরী, *সংসার-ধর্ম্ম ও বিষয়-কর্ম্ম*, কলকাতা : ১৩১৩ বঃ

স্ত্রী স্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা, আর্য্য মিশন ইনস্টিটিউশন, কলকাতা : ১৮৯৩

হরনাথ ভঞ্জ, *সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়*, (প্রথম খণ্ড-১৮৭৫, দ্বিতীয় খণ্ড-১৮৭৭) অলোক রায় (সম্পা.) কলকাতা : ১৯৭৬

হরিহর শেঠ, *ঘরের কথা*, চন্দননগর : ১৩৩১ বঃ

Acland, T., *A Popular Account of the Manners and Customs of India*, London, 1847

Banerjee. Rev. *K. M.. Native Female Education* (2nd Edition) Calcutta, 1848

Bose, Shib Chunder, *Hindoos as They Are : A Description of the Manners, Customs and Inner life of Hindoo Society in Bengal*, Calcutta, 1881

Chapman, Priscilla, *Female Hindoo Education*, London, 1839

Craufurd, Quintin, *Sketches Chiefly Relating to The History, Religion,*

Learning and Manners of the Hindoos, vol. II, London, 3rd edn, 1792

—, *Researches Concerning the Laws, Theology, Learning, Commerce etc. of Ancient and Modern India*, vol. II, London, 1817

Dall, C. H., *A Lecture on Women in America and in Bengal*, Calcutta : 1857

Dutta, Hur Chunder, *Bengali Life and Society, A Discourse*, Calcutta : 1853

Ghosh, Jogendra Chandra, *Conduct in Society: A Treatise on Morals*, Calcutta: 1889

Kerr, James, *The Domestic Life, Character, and Customs of the Native, of India*, London : 1865

Mazumdar, Pratap Chandra, *The Improvement of Women*, Bombay : 1877

—, *The Faith and Progress of the Brahmo Samaj*, Calcutta : 1882

Mitter, Soores Chunder, *A Discourse on the Domestic Life and Condition of the Bengali*, Calcutta : 1856

O'reilly, Rev., Bernard, *The Mirror of True Womenhood : A Book of Instruction For Women in the World*, Dublin : 2nd edn, 1883

Rai Chaudhuri, Gyanendra Kumar, *Hindu Customs and Manners*, Taki : 1888

Roy, Rammohon, *Brief Remarks Regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females* (1823), Calcutta : 1856

Sketches of India; Or, Observations Descriptive of the Scenery in Bengal, London : 1816

Trevelyan, Charles Edward, *On the Education of the People of India*, London : 1838

Ward, William, *Account of the Writings, Religion and Manners of the Hindoos*, 4 vols, Serampore : 1811

—, *A view of the History, Literature and Mythology of the Hindoos*, vol. I, Serampore : 1818

—, *A view of the History, Literature and Religion of the Hindoos*, vol. II, Serampore : 1815

Weitbrecht, M, *The Women of India and Christian Work in the Zenana*, London : 1875

গ্রন্থাবলী ও রচনা সংকলন

অমৃতলাল বসু, *অমৃতলাল গ্রন্থাবলী* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা : প্রকাশ সন অজ্ঞাত

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), *পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন* (প্রথম খণ্ড) কলকাতা : ১৯৭৮ ; (দ্বিতীয় খণ্ড) কলকাতা : ১৯৮১

— (সম্পা.), *পুরাতন বাংলা নাটক সংকলন*, কলকাতা : ১৩৮২ বঃ

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, *ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী*, (বসুমতী সাহিত্য মন্দির), কলকাতা : প্রকাশ সন অজ্ঞাত

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ* (দ্বিতীয় খণ্ড), স্বাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা : ১৯৭২

গিরিশচন্দ্র ঘোষ, *গিরিশ রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা : ১৯৬৯ ; (দ্বিতীয় খণ্ড) সাহিত্য সংসদ, কলকাতা : ১৯৭১ ; (তৃতীয় খণ্ড) সাহিত্য সংসদ, কলকাতা : ১৯৭৩

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, *কবিরাণী গিরীন্দ্রমোহিনীর গ্রন্থাবলী*, (বসুমতী সাহিত্য মন্দির), কলকাতা: ১৩৩৪

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), *রস-গ্রন্থাবলী*, কলকাতা : ১৩১২ বঃ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্য সংগ্রহ*, কলকাতা : ১৯৬৯

দাশরথি রায়, *পাঁচালী*, কলকাতা : তৃতীয় সংস্করণ, ১৩২৫ বঃ

দীনবন্ধু মিত্র, *দীনবন্ধু রচনাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা : ১৯৮১

প্যারীচাঁদ মিত্র, *প্যারীচাঁদ রচনাবলী*, কলকাতা : ১৯৭১

প্রফুল্লকুমার পাল (সম্পা.), *প্রাচীন কবিওয়ালার গান*, কলকাতা : প্রকাশ সন অনুল্লিখিত

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিম রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা : ১৩৬১ বঃ

বাণী রায় (সম্পা.) *কবি-চতুষ্টয়ী*, কলকাতা : ১৩৮৮বঃ

বামা রচনাবলী (প্রথম ভাগ), কলকাতা : ১৮৭২

বিনোদিনী দাসী, *নটী বিনোদিনীর রচনা সমগ্র*, কলকাতা : ১৩৯৪ বঃ

বৈষ্ণবচরণ বসাক (সংক.), *বিশ্বসঙ্গীত*, কলকাতা : ১২৯৭ বঃ

ভারতচন্দ্র, *ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের গ্রন্থাবলী*, কলকাতা : ১২৯৫ বঃ

—, *ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী*, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা : প্রকাশ সন অনুল্লিখিত

—, *ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী*, কলকাতা : ১৩৫৭ বঃ

ভারতী রায় (সম্পা.), *সেকালের নারীশিক্ষা. :বামাবোধিনী পত্রিকা*, (১২৭০—১৩২১ বঃ), কলকাতা : ১৮৮৪

মাইকেল মধুসূদন দত্ত, *মধুসূদন রচনাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা : ১৯৮০

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, *যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা : ১৯৭৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী* (সপ্তম, নবম, দশম ও ত্রয়োদশ খণ্ড), জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, কলকাতা : ১৯৬১

রমেশচন্দ্র দত্ত, *রমেশ রচনাবলী*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা : ১৯৮২

রসভাণ্ডার, কলকাতা : ১৩০৬ বঃ

রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতি কবিওয়ালাদিগের গীত সংগ্রহ, কলকাতা : ১৮৬২

রামনারায়ণ তর্করত্ন, *রামনারায়ণ তর্করত্ন রচনাবলী*, কলকাতা : ১৯৯১

রামপ্রসাদ—ভারতচন্দ্র রচনাসমগ্র, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা : ১৯৮৬

রামমোহন রায, *রামমোহন রচনাবলী*, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা : ১৩৮০ বঃ

—, *রামমোহন রচনাবলী*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা : ১৩৮০ বঃ

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, *রামেন্দ্র রচনা সংগ্রহ*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা : ১৩৭১ বঃ

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, *রোকেয়া রচনাবলী*, ঢাকা : ১৯৭৩

শরৎকুমারী চৌধুরাণী, *শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী*, কলকাতা : ১৩৫৭ বঃ

শিবনাথ শাস্ত্রী, *শিবনাথ রচনা সংগ্রহ* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা : ১৯৭৫

স্বর্ণকুমারী দেবী, *স্বর্ণকুমারী দেবীব বচনাবলী*, কলকাতা : ১৩৮৪ বঃ

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা : ১৯৮০

Roy, Rammohun, *The English Works of Raja Rammohun Roy*, Calcutta : 1958

সমসাময়িক অন্যান্য রচনা (উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, কবিতা প্রভৃতি)

অবলা কি অ-বলা? কলকাতা : ১২৯২ বঃ

অমৃতলাল বসু, *বিবাহ বিভ্রাট*, কলকাতা : ১৮৮৪

—, *তাজ্জব ব্যাপার*, কলকাতা : ১৮৯০

—, *অবতার*, কলকাতা : ১২৯৯ বঃ

—, *বাবু*, কলকাতা : ১৩০১ বঃ

—, *গ্রাম্য বিভ্রাট*, কলকাতা : ১৮৯৭

— *বৌমা*, কলকাতা : ১৮৯৭

(প্রতিটি রচনাই *অমৃতলাল রচনাবলী* গ্রন্থে সংকলিত)

অম্বিকাচরণ গুপ্ত, *কলির মেয়ে ছোট-বৌ*, কলকাতা : ১২৮৮ বঃ

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *যোগেশ*, কলকাতা : ১৮৮০

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *অযোগ্য পরিণয়*, কলকাতা : ১২৮৬ বঃ

উমেশচন্দ্র মিত্র, *বিধবা-বিবাহ নাটক*, কলকাতা : ১৮৫৬

কামিনী রায়, *আলো ও ছায়া*, কলকাতা : ১৮৮৯

কালিদাস মুখোপাধ্যায়, *কলির নবরঙ্গ*, কলকাতা : ১৮৭৬

কালিপদ মুখোপাধ্যায়, *অনন্তলীলা*, নতুন সংস্করণ, কলকাতা : ১৩১৭ বঃ

কালীপ্রসন্ন সিংহ, *হুতোম প্যাঁচার নকশা* (১৮৬২), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা : ১৩৯১ বঃ

কুঞ্জবিহারী বসু, *তুই না অবলা ! ! !*, কলকাতা : ১৮৭৪

কেদারনাথ দত্ত (ভাঁড়), *সচিত্র গুলজার নগর* (১৮৭১), কলকাতা : ১৯৮২

গিরিশচন্দ্র ঘোষ, *প্রফুল্ল*, কলকাতা : ১৮৮৯

—, *সভ্যতার পাণ্ডা*, কলকাতা : ১৮৯৪

—, *পাঁচ কণে*, কলকাতা : ১৮৯৬

(প্রতিটি নাটকই *গিরিশ রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত)

—, *য্যায়সা-কা-ত্যায়সা*, কলকাতা : ১৯০৭ (*গিরিশ রচনাবলী* প্রথম খণ্ডে সংকলিত)

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, *অশ্রুকণা*, কলকাতা : ১৮৮৭ (*কবিবাণী গিরীন্দ্রমোহিনীর গ্রন্থাবলী* গ্রন্থে সংকলিত)

গোঁসাইদাস গুপ্ত, *বৌ বাবু*, কলকাতা : ১৮৮৩

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, *উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম*, কলকাতা : ১৮৭৬

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, *কিঞ্চিৎ জলযোগ*, কলকাতা : ১৮৭২ (*জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাট্য সংগ্রহ* গ্রন্থে সংকলিত)

টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র), *আলালের ঘরের দুলাল* (১৮৪৮), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা : ১৩৯১ বঃ

তারকচন্দ্র চূড়ামণি, *সপত্নী নাটক*, কলকাতা : ১৮৫৮

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *স্বর্ণলতা* (১৮৭৩) কলকাতা : ১৯৮৪

তিলোত্তমা দাসী, *আক্ষেপ*, কলকাতা : ১৩২০ বঃ

দীনবন্ধু মিত্র, *বিয়ে-পাগলা বুড়ো*, কলকাতা : ১৮৬৬

—, *সধবার একাদশী*, কলকাতা : ১৮৬৬

—, *লীলাবতী*, কলকাতা : ১৮৬৭

—, *জামাই বারিক*, কলকাতা : ১৮৬৭

(*দীনবন্ধু রচনাবলী* গ্রন্থে সংকলিত)

দুর্গাদাস দে, *ছবি*, কলকাতা : ১৮৯৬

দুর্গাদাস দে, *দ-বাবু*, কলকাতা : ১৮৯৮

দেবীপদ ভট্টাচার্য (সম্পা.), *রেভঃ লালবিহারী দে ও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান*, কলকাতা : ১৯৬৮

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সতী কি কলঙ্কিনী*, কলকাতা : ১২৮৬ বঃ

নবীনচন্দ্র দাস, *অযোগ্য বিবাহ*, কলকাতা : ১৮৬৮

নবীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, *বুঝলে কি না!!!*, কলকাতা : ১২৭৩ বঃ

নভেল নায়িকা, রচনাকারের নাম ও প্রকাশ সন অজ্ঞাত

পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত, *চিরসঙ্গিনী*, কলকাতা : ১২৯১ বঃ

প্রসন্নকুমার পাল, *বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক নাটক*, কলকাতা : ১৮৬০

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *ইন্দিরা*, কলকাতা : ১৮৭২

—, *বিষবৃক্ষ*, কলকাতা : ১৮৭৩

—, *চন্দ্রশেখর*, কলকাতা : ১৮৭৫

(*বঙ্কিম রচনাবলী*, প্রথম খণ্ডে সংকলিত)

বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, *হিন্দু মহিলা নাটক*, কলকাতা : ১৮৬৯

বিপিন মোহন সেনগুপ্ত, *হিন্দু মহিলা নাটক*, কলকাতা : ১৮৬৮

বিনোদবিহারী বসু, *সরসীলতার গুপ্তকথা*, কলকাতা : ১৮৮৩

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, *আচাভুয়ার বোম্বাচাক*, কলকাতা : ১৮৮০

—, *খণ্ড প্রলয়*, কলকাতা : ১৮৭৮

বীরেশ্বর পাঁড়ে, *অদ্ভুত স্বপ্ন বা স্ত্রী পুরুষের দ্বন্দ্ব*, কলকাতা : ১২৯৫ বঃ

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *কলিকাতা কমলালয়*, কলকাতা : ১৮২৩

—, *নববাবু বিলাস*, কলকাতা : ১৮২৩

—, *দূতীবিলাস*, কলকাতা : ১৮২৫

—, *নববিবিবিলাস*, কলকাতা : ১৮৩০

(*পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন*, দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত)

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, *সমাজ কুচিত্র* (১৮৫৬), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা : ১৩৯১ বঃ

—, *হরিদাসের গুপ্তকথা*, কলকাতা : ১৩১৫ বঃ

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, *পাঁচ পাগলের ঘর*, কলকাতা : ১৮৮০

ভুবনমোহন সরকার, *ডাক্তারবাবু*, কলকাতা : ১৮৭৫

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, *আপনার মুখ আপনি দেখ* (১৮৬৩), কলকাতা : ১৯৮৩

—, *ভ্যালারে মোর বাপ*, কলকাতা : ১২৯৩ বঃ

মনোমোহন বসু, *প্রণয় পরীক্ষা*, কলকাতা : ১৮৬৯

মাইকেল মধুসূদন দত্ত, *বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ* (১৮৬০) ; বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২) ; (*মধুসূদন রচনাবলী* গ্রন্থে সংকলিত)

মানকুমারী বসু, *কাব্যকুসুমাঞ্জলি*, কলকাতা : ১৮৯৩ (*কবি-চতুষ্টয়ী* গ্রন্থে সংকলিত)

মেয়ে পার্লেমেন্ট বা ভগ্নীতন্ত্ররাজ্য (প্রথম খণ্ড), দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা : ১৩০০ বঃ

যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, *চপলাচিত্তচাপল্য*, কলকাতা : ১৮৫৭

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, *চিনিবাস-চরিতামৃত*, কলকাতা : ১২৯২ বঃ

—, *মডেল ভগিনী*, কলকাতা : ১২৯৩ বঃ

—, *বাঙ্গালী-চরিত*, পঞ্চম সংস্করণ, কলকাতা : ১৩১৪ বঃ

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, *স্ত্রী ও স্বামী*, কলকাতা : ১৩০১ বঃ

যোগেন্দ্রনাথ দে, *স্নেহলতা*, কলকাতা : ১৮৯৪

রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, *এই এক রকম*, কলকাতা : ১৮৭২

রমেশচন্দ্র দত্ত, *সংসার*, কলকাতা : ১৮৮৬

—, *সমাজ*, কলকাতা : ১৮৯৪

(দুটি উপন্যাসই *রমেশ রচনাবলী* গ্রন্থে সংকলিত)

রাখালদাস ভট্টাচার্য, *স্বাধীন জেনানা*, কলকাতা : ১৮৮৬

—, *সুরুচির ধ্বজা*, কলকাতা : ১৮৮৬

রাধাবিনোদ হালদার, *ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি*, কলকাতা : ১৮৮৫

—, *পাশ করা মাগ*, কলকাতা : ১৮৮৮

রামচন্দ্র দত্ত, *বাল্যবিবাহ নাটক*, কলকাতা : ১২৮১ বঃ

রামনারায়ণ তর্করত্ন, *কুলীনকুল সর্বস্ব* (১৮৫৪), কলকাতা : ১৯৮৬

—, *নব নাটক*, কলকাতা : ১৮৬৬

—, *চক্ষুদান*, কলকাতা : ১৮৬১

'শম্ভুনাথ বিশ্বাস, *কচ্‌কে ছুঁড়ীর গুপ্তকথা*, কলকাতা : ১৮৮৩

শিবনাথ শাস্ত্রী, *যুগান্তর* (১৩০১ বঃ) কলকাতা : ১৩৭৪ বঃ

শিশিরকুমার ঘোষ, *নয়শো রুপেয়া*, কলকাতা : ১৮৭৪

শ্যামাচরণ শ্রীমান, *বাল্যোদ্বাহ-নাটক*, কলকাতা : ১৭৮২ শক

সুকুমারী দত্ত, *অপূর্বসতী নাটক*, কলকাতা : ১২৮২ বঃ

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, *আক্কেল-গুড়ুম বা কুলের প্রদীপ*, কলকাতা : ১২৮১ বঃ

হরিমোহন কর্মকার, *মাগ-সর্বস্ব*, কলকাতা : ১৮৭০

হরিশচন্দ্র মিত্র, *ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে*, ঢাকা : ১৮৬৩

হেমলতা দেবী, *অকল্পিতা*, কলকাতা : প্রকাশ সন অজ্ঞাত

আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা, দিনলিপি প্রভৃতি

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ঘরোয়া* (১৩৪৮ বঃ), কলকাতা : ১৩৭৭ বঃ

অমিয়বালা দেবী, 'অমিয়বালার ডায়েরী', *মানসী ও মর্মবাণী*, ভাদ্র ও আশ্বিন : ১৩২৭ বঃ

অরুণকুমার মিত্র (সম্পা.), *অমৃতলাল বসুর স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি*, কলকাতা : ১৯৮২

ইন্দিরা দেবী, *আমার খাতা*, কলকাতা : ১৩১৯ বঃ

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, 'জীবনকথা', *এক্ষণ*, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৯৯ বঃ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *বিদ্যাসাগর-চরিত* (১৯৪৮ সংবৎ) (*বিদ্যাসাগর বচনা সংগ্রহ*, তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্গত)

কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়, *স্বর্গীয় দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবন চরিত* (১৯০৪), কলকাতা : ১৯৬৩

কৃষ্ণকুমার মিত্র, *আত্মচরিত* (১৩৪৩ বঃ), কলকাতা : ১৩৮১ বঃ

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, *ইতিবৃত্ত* (১৮৬৮), (*আত্মকথা*, দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত)

কৃষ্ণভাবিনী দাসী, *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা*, কলকাতা : ১৮৬৫

কৈলাসবাসিনী দেবী, 'আত্মকথা', *মাসিক বসুমতী*, জ্যৈষ্ঠ-অগ্রহায়ণ, ১৩৯৫ বঃ (*আত্মকথা*, দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত)

জ্যোতির্ময়ী মুখোপাধ্যায়, *তত্ত্বভূষণ জীবনী*, কলকাতা : ১৩৬৬ বঃ

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, 'স্মৃতিকথা' (*পুরাতনী* গ্রন্থের অন্তর্গত)

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, *বাল্যজীবন* (১৩১৬ বঃ), (*আত্মকথা*, প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত)

গিরিশচন্দ্র সেন, আত্মজীবন, কলকাতা : ১৯০৭

গিরিশচন্দ্র সেন, *ব্রহ্মময়ী চরিত*, কলকাতা : ১৮৬৯

দীনেন্দ্রকুমার রায়, *সেকালের স্মৃতি*, কলকাতা : ১৩৯৫ বঃ

দীনেশচন্দ্র সেন, *ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য* (১৩২৯ বঃ), কলকাতা : ১৯৬৯

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আত্মজীবনী* (১৮৯৮), কলকাতা : ১৯৬২

দেবেন্দ্রনাথ দাস, *পাগলের কথা*, কলকাতা : ১৩১৭ বঃ

নবীনচন্দ্র সেন, *আমার জীবন* (প্রথম ভাগ), কলকাতা : ১৩১৪ বঃ

নিস্তারিণী দেবী, '*সেকেলে কথা*', (*আত্মকথা*, দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত)

নীলমণি চক্রবর্তী, *আত্মজীবনস্মৃতি* (১৩২৭ বঃ), কলকাতা : ১৩৮২ বঃ

প্রকাশচন্দ্র রায়, *অঘোর-প্রকাশ*, কলকাতা : ১৩৬৪ বঃ

প্রফুল্লময়ী দেবী, 'আমাদের কথা', *প্রবাসী*, বৈশাখ, ১৩৭৭ বঃ

প্রসন্নময়ী দেবী, *পূর্ব কথা* (১৯১৭), কলকাতা : ১৯৮২

প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, *জীবনপ্রসঙ্গ ও উপদেশাবলী* (১৯৩৬), কলকাতা : ১৯৭৩

প্রিয়-প্রসঙ্গ, 'কোন বঙ্গমহিলা প্রণীত,' কলকাতা : তৃতীয় সংস্করণ, ১৩২২ বঃ

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, *জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি* (১৩২৬ বঃ), কলকাতা : ১৩৮৯ বঃ

বিনোদিনী দাসী, *আমার কথা* (১৩১৯ বঃ), কলকাতা : ১৩৭৬ বঃ

বিপিনচন্দ্র পাল, *আমার জীবন ও সমকাল* (প্রথম পর্ব), (অনু. শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়) কলকাতা : ১৯৮৫

বিষ্ণুচরণ বসু, *আমার জীবনী*, কলকাতা : ১৩৩৮ বঃ

মনোদা দেবী, 'জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী' *মাসিক বসুমতী*, ফাল্গুন, ১৩৬১ বঃ—ভাদ্র, ১৩৬২ বঃ

মানদা দেবী, *শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত* (১৩৩৬ বঃ), কলকাতা : ১৩৯৩ বঃ

মোক্ষদা দেবী, *কল্যাণ-প্রদীপ*, কলকাতা : ১৩৩৫ বঃ

যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'যাদবচন্দ্রের আত্মকাহিনী' *সাহিত্য*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯ বঃ (*আত্মকথা*, প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, *ছেলেবেলা* (দুটি লেখাই *রবীন্দ্ররচনাবলী*, দশম খণ্ডের অন্তর্গত)

রাজনারায়ণ বসু, *আত্মচরিত* (১৩১৫ বঃ), (*আত্মকথা*, প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত)

রাসসুন্দরী দেবী, *আমার জীবন* (১২৭৫ বঃ), (*আত্মকথা*, প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত)

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, *সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত* (১৮৮১), (*আত্মকথা*, দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত)

লীলাবতী মিত্র, *লীলাবতী মিত্র*, কলকাতা : প্রকাশ সন অজ্ঞাত

শান্তা দেবী, *পূর্বস্মৃতি*, কলকাতা : ১৯৮৩

শিবনাথ শাস্ত্রী, *আত্মচরিত*, নতুন সংস্করণ, কলকাতা : ১৩৯৫ বঃ

শ্রীনাথ চন্দ, *ব্রাহ্ম সমাজে চল্লিশ বৎসর*, ঢাকা : ১৩২০ বঃ

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস*, কলকাতা : ১৯১৫

সরলা দেবী চৌধুরাণী, *জীবনের ঝরাপাতা*, নতুন সংস্করণ, কলকাতা : ১৯৮২

সরলাবালা সরকার, *হারানো অতীত*, কলকাতা : ১৩৬০ বঃ

সারদাসুন্দরী দেবী, *কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা* (১৯১৩), (*আত্মকথা*, প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত)

সুদক্ষিণা সেন, *জীবনস্মৃতি*, কলকাতা : ১৩৩৯ বঃ

হেমন্তবালা দেবী, 'নিজের কথা', *এক্ষণ*, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৮৯ বঃ

হেমন্তবালা দেবী চৌধুরাণী, 'পুরনো দিনের কথা', *গল্পভারতী*, আষাঢ়, ১৩৭৬ বঃ

Bute, Marchioness of, (ed.) *The Private Journal of The Marquess of Hastings* (1858), Allahabad: 1907

Chaudhuri, Nirad C., *The Autobiography of an Unknown Indian* (1951)

Gangooly, Joguth Chander, *Life and Religion of the Hindoos With A Sketch of My Life And Experience*, London : 1860

Heber, Reginald, *Narrative of A Journey Through The Upper Provinces of India*-3 vols., London : 1828

Hutchisson, W. H. Florio, *Pen and Pencil Sketches : Being Reminiscences During Eighteen years' Residence in Bengal*, London : 1883

Parkes, Fanny, *Wanderings of A Pilgrim & Search Of The Picturesque* (1850), Karachi : 1975

Sleeman, W. H, *Rambles and Recollections of an Indian Official* (1844), Oxford : 1980

Sunity Devee, *The Autobiography of an Indian Princess*, London : 1921

চিঠিপত্রের সংকলন

ইন্দিরা দেবী—প্রমথ চৌধুরী পত্রাবলী, সুভাষ চৌধুরী (সম্পা.) কলকাতা : ১৯৮৫

কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী, ক্ষেত্র গুপ্ত (সম্পা.) কলকাতা : ১৩৭০ বঃ

চিঠিপত্র (প্রথম খণ্ড), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলকাতা : ১৩৭২ বঃ

পুরাতনী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী (সম্পা.) কলকাতা : ১৮৭৯ শক

Unpublished Letters of Vidyasagar, A. Guha (ed.) Calcutta : 1971

দ্বৈতীয়িক উপকরণ

পত্র-পত্রিকা

অভী দাস, 'বাঙ্গালী চরিত্র দুই শতাব্দী পূর্বে,' *দেশ*, ৮. ২. ১৯৮৬

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, 'বঙ্কিম উপন্যাসে নারী : পুনর্বিচার' *দেশ*, ২. ৯. ১৯৮৯

অম্বুজেন্দ্র ঘোষ, 'উনিশ শতকের মড়াকাটা-ঝড়', *দেশ*, ৩১. ১. ১৯৮৭

অম্লান দত্ত, 'নারীমুক্তি,' *দেশ* (শারদীয়) ১৩৯৩ বঃ

অশোক মিত্র, 'নারী সাম্য ও বঙ্কিমচন্দ্র,' *দেশ*, ২. ১২. ১৯৮৯

আনিসুজ্জামান, 'বাঙালি নারী : সাহিত্যে ও সমাজে,' *এক্ষণ* (শারদীয়), ১৪০১ বঃ

কালীকিঙ্কর দত্ত, 'অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত', *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ৮১ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

চিত্রা দেব, 'স্মৃতির অতলে নির্মলাবালা সোম', *দেশ*, ১১. ৫. ১৯৯১

তপতী বোস, 'বাঙালি মেয়েদের লেখাপড়া', *আনন্দবাজার পত্রিকা*, শারদীয়, ১৩৯৮ বঃ

দীপঙ্কর চক্রবর্তী, 'প্রসঙ্গ রামমোহন', *অনুষ্টুপ*, শারদীয়া ১৩৯১ বঃ

দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, 'রাজা রাধাকান্ত দেব,' *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, ৯১ বর্ষ, ২-৪ সংখ্যা

দেবাশিস বসু, 'মধুসূদন গুপ্ত : এক বিস্মৃত বিজ্ঞান-পথিক,' *এক্ষণ*, শীত-গ্রীষ্ম, ১৩৯২-৯৩ বঃ

নারায়ণ দত্ত, 'কাদম্বিনী ও তাঁর বিলিতি ডিপ্লোমা,' *দেশ*, ১৪. ৩. ১৯৮৭

নীতা সেন সমর্থ, 'তিনশো বছরের কলকাতা : নারীদের ভূমিকা', *দেশ*, ১৭. ৩. ১৯৯০

পরমেশ আচার্য, 'বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ,' *অনুষ্টুপ*, শারদীয় ১৩৯১ বঃ

বসন্তকুমার সামন্ত, 'উত্তরপাড়া হিতকারী সভা ও অন্তঃপুরিকা পরীক্ষা,' *দেশ*, ১৬. ১১. ১৯৮৫

বিনয়ভূষণ রায়, 'মহিলা সমাজ : সেকালের প্রগতি চেতনা', *এক্ষণ*, শারদীয়, ১৪০১ বঃ

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, 'সহবাস-সম্মতি বিল (১৮৯১) : সেদিনের সামাজিক আন্দোলন,' *দেশ*, ৩১. ৫. ১৯৮৬

মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, 'নারীমুক্তির সেকাল-একাল,' *দেশ*, ১৯. ৩. ১৯৮৮

মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়, 'শিকল কাটার দিন,' *দেশ*, ১৯. ৩. ১৯৮৮

যশোধরা বাগচী, 'নারীমুক্তিবাদী জ্যোতির্ময়ী দেবী,' *আকাদেমি পত্রিকা*, ৩য় সংখ্যা, মে, ১৯৯০

শৈলেনকুমার দত্ত, 'সখি সমিতি,' *সুকন্যা*, ১—১৫ ডিসেম্বর, ১৯৮৫

শ্যামলী বসু, 'সখি সমিতি : শতবর্ষের আলোয়,' *দেশ*, ৭. ৬. ১৯৮৬

শ্রবসী ঘোষ, 'দায়মালী কারাগার ভাঙার গান,' *অনুষ্টুপ*, শারদীয়, ১৩৯২ বঃ

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সোনার চেয়ে দামী,' *দেশ*, ২৯. ৭. ১৯৮৯

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাঈনাচ বনাম খেমটা : উনিশ শতকের বাংলা সংস্কৃতিতে শ্রেণী-বৈষম্য,' *বারোমাস*, শারদীয়, ১৯৮৬

Amin, Sonia, 'Bengali (Muslim) Identity and the Women's Question : The Debate Over Terminology', *Theoretical Perspectives*, vol 1, no 1, 1994

Bagchi, Jasodhara, 'Positivism and Nationalism': Womanhood and Crisis in Nationalist Fiction, Bankimchandra's Anandamath' *Economic*

and Political Weekly (1985), vol XX, no 43, Oct 26, 1985.

—, 'Representing Nationalism : Ideology of Motherhood in Colonial, Bengal'. *Economic and Political Weekly* (1990), Oct 20-27, 1990

Bandyopadhyay, Sibaji, 'Producing and Re-producing the New Women : A Note on the Prefix "re", *'Social Scientist*, vol-22, nos. 1-2, Jan-Feb., 1994.

Banerjee, Sumanta, 'Bogey of the Bawdy : Changing concept of "Obscenity" in 19th Century Bengali Culture,' *Economic and Political Weekly* (1987), vol-XX, no. 29, July 18, 1987

—,'The "Beshya" and the "Babu" : Prostitute and her Clientele in 19th Century Bengal, *Ecnomic and Political Weekly* (1993), vol -XXVIII, no. 45, Nov 6. 1993

Bannerji, Himani, 'Fashioning a Self : Educational Proposals for and by Women in Popular Magazines in Colonial Bengal'. *Economic and Political Weekly* (1991) vol XXVI, no 43, Oct, 26, 1991

Bhattacharji, Sukumari, 'Motherhood in Ancient India,' *Economic and Political Weekly* (1990), Oct 20-27, 1990

Chandra, Sudhir, 'Conflicted Beliefs and Men's Consciousness *about Women : Widow Marriage in Later Nineteenth Century Indian* Literature, *Economic and Political Weekly* (1987), vol-XXII, no 44, oct 31, 1987

Chatterjee, Ratnabali, 'Prostitution in Nineteenth Century Bengal : Construction of Class and Gender,' *Social Scientist*, vol-21, nos, 9-11, Sept-Nov. 1993

Forbes, Geraldine H, 'In Search of the "Pure Healthen": Missionary Women in Nineteenth Century India,' *Economic and Political Weekly* (1986) vol XXI, no 17, April 26, 1986

Ghosh. Srabashi, 'Birds in a Cage': Changes in Bengali Social Life as Recorded in Autobiographies by Women, *'Economic and Political Weekly* (1986), vol XXI, no 43, Oct 25, 1986

Karlekar, Malavika, 'Kadambini and the *Bhadralok* : Early Debates Over Women's Education in Bengal,' *Ecomomic and Political Weekly* (1986) vol XXI no. 17, April 26, 1986

Mani, Lata, 'Production of an Official Discourse on *Sati* in Early Nineteenth Century Bengal', *Economic and Political Weekly* (1986) vol XXI, no. 17, April 26, 1986

Mukherjee, S. N., 'Bhadraloke in Bengali Language and Litereture : An Essay on the Language of Class and Status,' *Bengal Past and Present*, July -Dec, 1976

Ray, Rajat K. 'Man, Woman and the Novel : The Rise of New Consciousness in Bengal (1958 - 1947),' *The Indian Economic and Social History Review* . Jan-March, 1979

Sarkar, Sumit, 'Intellectuals in a Colonial Situation—a case study of Ninteenth Century Bengal', *Calcutta Historical Review*, July,-Dec, 1977

Sarkar, Tanika, 'Nationalist Iconography : Image of Women in 19th Century Bengali Literature,' *Economic and Political Weekly* (1987), vol- XXII, no 47, Nov 21, 1987

—,'A Book of Her Own, A Life of Her Own : Autobiography of a Nineteenth Century Woman,' History Workshop, no. 36, Autumn, 1993

Swaminathan, Padmini, 'State and Subordination of Women,' *Economic and Political Weekly* (1987) vol XXII, no. 44, Oct 31, 1987

Vaid, Sudesh, 'Ideologies on Women in Nineteenth Century Britain, 1850s-'70s,' *Ecnomic and Political Weekly* (1985). vol-XX, no. 43, Oct 26,. 1985

পুস্তক পুস্তিকা

অজয়েন্দ্রনাথ সরকার, *উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা বিতর্ক রচনা*, কলকাতা : ১৯৮২

অতুল সুর, *বাঙলার সামাজিক ইতিহাস* , কলকাতা : ১৯৭৬

অন্নদাশঙ্কর রায়, *বাংলার রেনেসাঁস* (১৩৮১ বঃ), কলকাতা : ১৩৮৮ব.

অমিয়কুমার সামন্ত, *প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর*, কলকাতা : ১৯৯৪

অমৃত লাল গুপ্ত, *পুণ্যবতী নারী*, কলকাতা : ১৯২৩

অরবিন্দ পোদ্দার, *রামমোহন/উত্তরপক্ষ*, কলকাতা : ১৯৮২

—, *রেনেসাঁস ও সমাজমানস*, কলকাতা : ১৯৮৩

কালীকৃষ্ণ ঘোষ, *সেকালের চিত্র*, কলকাতা : ১৯১৮

ক্ষিতিমোহন সেন, *প্রাচীন ভারতে নারী*, কলকাতা : ১৩৫৭বঃ

চিত্তরঞ্জন দেব, *বাংলার লোক-সাহিত্যে নারীর দান*, কলকাতা : ১৯৯০

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.) *দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*, কলকাতা : ১৯৮১

চিত্রা দেব, *পুঁথিপত্রের আঙিনায় সমাজের আলপনা*, কলকাতা : ১৯৮১

—, *ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল* (১৩৮৭ বঃ), কলকাতা : ১৩৯০বঃ

—, *অন্তঃপুরের আত্মকথা*, কলকাতা : ১৯৮৪

—, *মহিলা ডাক্তার : ভিন গ্রহের বাসিন্দা*, কলকাতা : ১৯৯৪

জয়শ্রী ভট্টাচার্য, *বাংলার প্রবাদে নারীমন*, কলকাতা : ১৯৯১

তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, *হিন্দু আইনে বিবাহ*, কলকাতা : ১৩৬২ বঃ

দক্ষিণারঞ্জন বসু, *আত্মচরিতে সমাজচিত্র (প্রথম পর্ব)*, কলকাতা, ১৩৮৫ বঃ

দিলীপ বিশ্বাস, *রামমোহন—সমীক্ষা*, কলকাতা : ১৯৮৪

দেবনারায়ণ গুপ্ত, *বাংলার নট-নটী* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা : ১৯৮৫

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, *মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত*, কলকাতা : ১৮৮১

নমিতা চক্রবর্তী, *বঙ্গদেশে শিক্ষা-প্রসার*, কলকাতা : ১৯৮০

নরহরি কবিরাজ (সম্পা.), *উনিশ শতকের বাংলার জাগরণ : তর্ক ও বিতর্ক*, কলকাতা : ১৯৮৩

নারায়ণ দত্ত, *জন কোম্পানীর বাঙালী কর্মচারী*, কলকাতা : ১৯৭৬

নির্মলকুমার বসু, *হিন্দু সমাজের গড়ন*, কলকাতা : ১৩৫৬ বঃ

নির্মলচন্দ্র চৌধুরী, *বঙ্গ রমণীর বিস্মৃত ইতিহাস*, কলকাতা : ১৩৯৫ বঃ

নিশীথরঞ্জন রায় ও অশোক উপাধ্যায় (সম্পা.), *প্রাচীন কলিকাতা*, কলকাতা : ১৩৯০ বঃ

নীরদচন্দ্র চৌধুরী, *বাঙালী জীবনে রমণী* (১৩৭৪ বঃ), কলকাতা : ১৩৮৯ বঃ

—, *আত্মঘাতী বাঙালী*, কলকাতা : ১৯৮৮

পঞ্চানন মণ্ডল, *চিঠিপত্রে সমাজচিত্র*, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, শান্তিনিকেতন : ১৯৬৮

—, *চিঠিপত্রে সমাজচিত্র*, প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ, শান্তিনিকেতন : ১৯৮৫

পূর্ণেন্দু পত্রী, *গত শতকের প্রেম*, কলকাতা : ১৯৮২

প্রভাত বসু, *মহারাণী সুচারু দেবীর জীবন-কাহিনী*, কলকাতা : ১৩৬৯বঃ

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, *বাংলার নারী জাগরণ*, কলকাতা : ১৯৪৬

প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী* (তিন খণ্ড), কলকাতা : যথাক্রমে ১৩৮৯ বঃ, ১৩৯১ বঃ ও ১৩৯৪ বঃ

বিনয় ঘোষ, *নতুন সাহিত্য ও সমালোচনা* (১৯৪০) ,কলকাতা : ১৯৮১

—, *বাংলার নবজাগৃতি* (১৩৫৫ বঃ), কলকাতা : ১৩৯১ বঃ

—, *জনসভার সাহিত্য* (১৩৬২ বঃ), কলকাতা, ১৩৮৫ বঃ

—, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ* (১৯৭৩), কলকাতা : ১৯৮৪

বিনয় ঘোষ, *অটোমেটিক জীবন ও সমাজ*, কলকাতা, ১৯৭৮

বিনয়কৃষ্ণ দত্ত, *ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বরূপ*, কলকাতা : প্রকাশ সন অজ্ঞাত

বিনয় ভূষণ রায়, *বাংলায় সতীদাহ : সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন*, কলকাতা : ১৯৮৬

—, *ঊনিশ শতকের বাংলায় বিজ্ঞান সাধনা*, কলকাতা : ১৯৮৭

বিপিন বিহারী গুপ্ত, *পুরাতন প্রসঙ্গ* (প্রথম পর্যায় ও দ্বিতীয় পর্যায়), কলকাতা : যথাক্রমে ১৩২০ বঃ এবং ১৩৩০ বঃ

বিহারী লাল সরকার, *বিদ্যাসাগর*, কলকাতা : ১৩১৭ বঃ

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় নাট্যশালা, ১৭৯৫-১৮৭৩*, কলকাতা : ১৩৫০বঃ

—, *বঙ্গসাহিত্যে নারী*, কলকাতা : ১৩৫৭ বঃ

—, *সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী*, কলকাতা : ১৩৫৭ বঃ

—, *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস*, কলকাতা : ১৩৬৮ বঃ

মন্মথনাথ ঘোষ, *রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়* (১৯১৭), কলকাতা : ১৯৮২

মোহিতলাল মজুমদার, *বাংলার নবযুগ*, কলকাতা : ১৯৬৫

যোগানন্দ দাস, *রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলন*, কলকাতা, দ্বিতীয় সং, প্রকাশ সন অনুল্লিখিত

যোগেশচন্দ্র বাগল, *বাংলার স্ত্রীশিক্ষা*, কলকাতা : ১৩৫৭বঃ

—, *বাংলার নব্য সংস্কৃতি*, কলকাতা : ১৯৫৮

রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম নিয়োগী (সম্পা.), *ভারত-ইতিহাসে নারী*, কলকাতা : ১৯৮৯

রামগোপাল সান্যাল, *হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী* (১৮৮৭), কলকাতা : ১৯৮৪

লোকনাথ ঘোষ, *কলকাতার বাবু বৃত্তান্ত (অনু.)*, কলকাতা : ১৯৮৩

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, *বিদ্যাসাগর জীবনচরিত* ও *ভ্রমনিরাশ*, কলকাতা : ১২৯৮ বঃ

শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারীচরিত্র*, কলকাতা : ১৯৯১

শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, কলকাতা : ১৯৮৩

সমীরণ মজুমদার, *পুরুষ সমাজে নারী*, কলকাতা : ১৯৮৫

সুকুমার সেন, *মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী*, কলকাতা : ১৩৫২ বঃ

সুনীতি দেবী, *শিবনাথ (১৩২৮ বঃ)*, কলকাতা : ১৩৭৩ বঃ

সুনীতিরঞ্জন রায় চৌধুরী, *ঊনিশের শতকে নব্য-হিন্দু আন্দোলনের কয়েকজন নায়ক*, কলকাতা : ১৩৮৮ বঃ

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় রেনেসাঁসে পাশ্চাত্যবিদ্যার ভূমিকা*, কলকাতা : ১৩৮৬ বঃ

সুধীর রায়চৌধুরী, *সে যুগের কেচ্ছা এ কালের ইতিহাস*, কলকাতা : ১৯৭০

সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাক্-পলাশী বাংলা*, কলকাতা : ১৯৮২

—, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী)*, কলকাতা, ১৯৮৫

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙালী*, কলকাতা : ১৩৬৮ বঃ

সুশীলকুমার গুপ্ত, *ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ* (১৯৫৯), কলকাতা : ১৯৭৭

স্বপন গুপ্ত, *সতী*, কলকাতা : ১৯৭৮

—, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস*, কলকাতা : ১৯৮৫

A Rapid Sketch of Life of Raja Radhakanta Deva Bahadur, with some notices of his ancestors, and testimonials of his character and learning, Calcutta *: 1859*

Agnew, Vijay, *Elite Women in Indian Politics*, New Delhi : 1979

Ahmed, A. F. S., *Social Ideas and Social Change in Bengal, 1818-1830* (1965), Calcutta : 1976

Altekar, A. S., *The Position of Women in Hindu Civilization* (1938), Delhi : 1983

Asthana, Pratima, *Women's Movement in India*, Delhi : 1974

Bagal, Jogesh Chandra, *Women's Education in Eastern India : The First Phase*, Calcutta : 1956

Banerjee, Gooroodass, *The Hindu Law of Marriage and Stridhana* (3rd edn.) Calcutta : 1913

Banerjee, Sumanta, *The Parlour and the Streets : Elite and Popular Cultures in Nineteenth Century Calcutta*, Calcutta : 1989

Baumer, R. V. M. (ed.), *Aspects of Bengali History and Society*, Hawaii : 1974

Beauvoir, Simone de, *The Seeond Sex* (1949), Middlesex : 1983

Bhattacharyya, Panchanan, *Ideals of Indian Womenhood*, Calcutta : 1921

Borthwick, Meredith, *The Changing Role of Women in Bengal, 1849 - 1905*, Princeton : 1984

Bose, N. S., *Indian Awakening and Bengal*, Calcutta : 1960

Branca, Patricia, *Women in Europe since 1750*, London : 1978

Broomfield, J.H., *Elite Conflict in a Plural Society : The Twentieth Century*, California : 1968

Busteed, H. E., *Echoes From Old Calcutta*, Calcutta : 1888

Carey, W. H., *The Good old Day of Honourable John Company* (1882), Calcutta : 1964

Chakraborti, Smarajit, *The Bengali Press*, Calcutta : 1976

Chakraborty, Usha, *Condition of Bengali Women Around the 2nd half of the 19th Century*, Calcutta : 1963

Claviere, R. de Mauldela, *The women of the Renaissance : a Study of Feminism*, Translated by George Herbert, Ely (1900), London : 1905

Das, S. K., *The Shadow of the Cross*, Calcutta : 1974

—, *Sahibs and Munshis*, Calcutta : 1978

Datta, K. K., *Education and Social Amelioration of Women in Pre-Mutiny India*, Patna : 1936

—, *Survey* of *India's Social Life and Economic Condition in the Eighteenth Century India, 1707- 1813*, Calcutta : 1961

Deb, Binay Krishna, *The Early History and Growth of Calcutta (1908)*, Calcutta : 1947

Dodwell, H. H. (ed.), *The Cambridge History of India*, vol, VI, Cambridge : 1932

Dyson, K. K., *A Various Universe*, Delhi : 1970

Edwards, T., *Henry Derozio, The Eurasian Poet, Teacher and Journalist*, Calcutta : 1884

Embree, A. T., *Charles Grant and British Rule in India*, London : 1962

Everett, J. M., *Women and Social Change in India*, New Delhi : 1979

Forster, Margaret, *Significant Sisters : The Grassroots of Active Feminism, 1839 - 1939* (1984), Middlesex : 1986

Ghosh, Chitra, *Women Movement Politics in Bengal*, Calcutta : 1991

Ghosh, S. C., *Social Condition of the British Commnity in Bengal, 1757 - 1800*, London : 1970

Ghoshal, Ram Chandra, *A Biographical Sketch of the Rev. K. M. Banerjee* (1893), Calcutta : 1980

Gupta, A. C. (ed.), *Studies in the Bengal Renaissance*, Jadavpur : 1958

Gupta, Kamala, *Social Status of Hindu Women in Northem India (1206—1707 A.D.)*, New Delhi : 1987

Hauswirth, Frieda, *Purdah : The Status of Indian Women*, London : 1932

Henriques, Fernando, *Modern Sexuality*, London : 1968

Hundred Years of the University of Calcutta, Calcutta : 1957

Inden, Ronald B., *Marriage and Rank in Bengali Culture*, New Delhi : 1976

Joshi V. C. (ed.), *Rammohun Ray and the Process of Modernization in India*, New Delhi : 1975

Kopf, D., *British Orientalism and Bengal Renaissance*, Calcutta : 1969

—, *The Bramho Samaj and the Shaping of Modern Indian Mind*, Princeton : 1979

Kumar, Nita (ed.), *Women as Subjects : South Asian Histories*, Calcutta : 1994

Karlekar, Malavika, *Voices From Within : Eardy Personal Narratives of Bengali Women* (1991), Delhi : 1993

Laird, M.A., *Missionaries and Education in Bengal*, Oxford : 1972

Leach, E. and Mukherjee S.N.(ed.), *Elites in South Asia*, Cambridge : 1970

Liddle, Joanna and Joshi, Rama, *Daughters of Independence : Gender, Caste and Class in India*, New Delhi : 1986

Long, Rev. James, *Calcutta and Its Neighbourhood*, Calcutta : 1974

Majumdar, Biman Behari, *Heroines of Tagore : A Study in the Transformation of Indian Society, 1875-1991*, Calcutta : 1968

Marshman, J. C., *The Life and Times of Carey, Marshman and Ward*, vol I, London : 1859

Mathur, Y.B., *Womens Education in India, 1813 - 1966* , Bombay, 1973

McGuire, John, *The Making of a Colonial Mind*, Canberra : 1983

Mill, J. S., *The Subjection of Women*, London : 1977

Misra, B. B., *The Indian Middle Class : Their Growth in Modern Times (*1961), New Delhi : 1983

Mitter, Dwarka Nath, *The Position of women in Hindu Law*, Calcutta : 1913

Mukherjee, Amitabha, *Reform and Regeneration in Bengal*, Calcutta : 1968

Mukerjee, Prabhati, *Hindu Women : Normative Models*, Calcutta : 1978

Mukherjee S.N., *Calcuta : Myths & History*, Calcutta : 1977

Mulla, D. F., *Principles of Hindu Law,* (1912). Bombay : 1986

Murshid, Ghulam, *The Reluctant Debutante : Response of Bengali Women to Modernization, 1849 - 1905,* Rajshahi, 1983

Nag, Kalidas (ed.), *Bethune School and Collage Centenary Volmme, 1849-1949,* Calcutta : 1949

Nanda B.R. (ed.), *Indian Women : From Purdah to Modernity,* Delhi : 1976

Pollard, Edward B., *Oriental Women,* Philadelphia : 1907

Ranganathananda. Swami, *Indian Ideal of Womanhood,* Calcutta : 1966

Rao Shastri, Shakuntala, *Women in the Sacred Laws* (1953), Bombay :1960

Ray, Alok (ed.), *Nineteenth Century Studies.* 3 vols, Calcutta : 1973, 1974, 1975

— (ed.), *Society in Dilemma : Nineteenth Century India,* Calcutta : 1979

Ray, Niharranjan (ed.), *Rammohun Roy,* New Delhi : 1974

Ray, Rajat Kanta, *Social Conflict and Political Unrest in Bengal, 1975 - 1927,* Delhi : 1984

Ray, M., *Bengali Women,* Chicago : 1975

Ray Chowdhury, Tapan, *Europe Reconsidered : Perceptions of the West in Nineteenth Century Bengal,* Delhi : 1988

Rowbotham, Sheila, *Women, Resistance and Revolution,* London : 1972

—, *Hidden From History : 300 years of Womens Oppression and the Fight Against It,* (3rd ed.) London : 1977

Sangari, Kumkum and Vaid, Sudesh (ed.), *Recasting Women : Essays in Colonial History,* New Delhi : 1989

Sanyal, Rajat, *Voluntary Associations and the Urban Public Life in Bengal,* Calcutta : 1980

Sarkar, Sumit, *The Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908,* New Delhi : 1973

—, 'The "Women's Question" in Nineteenth Century Bengal' in *A Critique of Colonial India,* Calcutta : 1985

Sarkar, Sushobhan, *Bengal Renaissance and other Essays,* New Delhi : 1970

Sastri, S., *History of the Brahmo Samaj* vols. I & II (1911 - 12), Calcutta : 1974

Sen, Asok, *Iswar Chandra Vidyasagar and His Elusive Milestones*, Calcutta : 1977

Sen Sukumar, *Womens Dialect in Bengali*, Calcutta : 1979

Sen Gupta, Sankar, *A Study of Women of Bengal*, Calcutta : 1970

Sinha, N. K. (ed.), *The History of Bengal, 1757- 1905*, Calcutta : 1967

Sinha, Pradip, *Nineteenth Century Bengal : Aspects of Social History*, Calcutta : 1965

—, *Calcutta in Urban History*, Calcutta : 1978

Smith Rosenberg, Carroll, *Disorderly Conduct : Visions of Gender in Victorian America*, New York : 1985

Srinivas, M. N., *Social Change in Modern India*, 1972, New Delhi : 1988

Stokes, Eric, *English Utilitarians and India*, Oxford: 1959

Stone, Lawrence, *Family, Sex and Marriage in England, 1500 - 1800*, London : 1977

Storrow, Edward, *The Eastern Lily Gathered*, London : 1856

Thomas, P., *Indian women : Through the Ages*, Bombay : 1964

Tattvabhushan, Sitanath, *Social Reforrm in Bengal* (1904), Calcutta : 1982

Tripathi Amales, *Vidyasagar : The Traditional Modernizer*, Calcutta : 1974

Urquhart, M. M., *Women of Bengal : A Study of the Hindu Pardanasins of Calcutta*, Calcutta : 1925

Wollstonecraft, Mary, *Vindication of the Rights of Women* (1792), London : 1977

Woolf, Virginia, *A Room of One's Own*, London, 1929

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা

অপূর্বকুমার রায়, *বাঙলা গদ্যচর্চা : বিদ্যাসাগর গোষ্ঠী*, কলকাতা : ১৩৮৯ বঃ

আমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *ঊনবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যেতিহাসচর্চা*, কলকাতা : ১৩৭৯ বঃ

অরবিন্দ পোদ্দার, *মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ*, কলকাতা : ১৯৫৮

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায, *উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য*, কলকাতা : ১৩৭৭ বঃ

অশোককুমার দে, *বাংলা উপন্যাসের উৎস সন্ধানে*, কলকাতা : ১৯৭৪

অসিতকুমাব বন্দ্যোপাধ্যাব, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত*, কলকাতা : ১৩৭৭বঃ

—, *উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য*, কলকাতা : ১৯৬৫

—, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (চতুর্থ খণ্ড), কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৮৫

—, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (পঞ্চম খণ্ড), কলকাতা : ১৯৮৫

আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, কলকাতা : ১৯৭১

আবুল কাশেম চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যে সামাজিক নকশা : পটভূমি ও প্রতিষ্ঠা*, ঢাকা : ১৯৮২

আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন*, কলকাতা : ১৯৬৪

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, *বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব*, কলকাতা : ১৩৮৯

উমা সেন, *প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সাধাবণ মানুষ*, কলকাতা : ১৯৭১

গীতা মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধাবা*, কলকাতা : ১৯৮১

গোলাম মুরশিদ, *সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক*, ঢাকা : ১৯৮৪

—, *কালান্তরে বাংলা গদ্য*, কলকাতা : ১৩৯৯ বঃ

জগদীশ ভট্টাচার্য, *কবিমানসী (প্রথম খণ্ড) (১৩৬৯ বঃ)*, কলকাতা : ১৩৭৮ বঃ

—, *কবিমানসী* (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, ১৩৭০ বঃ

জয়ন্ত গোস্বামী, *সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন*, কলকাতা : ১৩৮১ বঃ

—, *বাংলা পথ-সাহিত্য : পথ-পুস্তিকা*, কলকাতা : ১৯৮২

জ্ঞানেশ মৈত্র, *নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য*, কলকাতা : ১৯৮৭

ঝরা বসু, *উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে কেশবচন্দ্র*, কলকাতা : ১৯৮০

তপোব্রত ঘোষ, *রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ*, কলকাতা : ১৯৯০

দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা, ও সাহিত্য*, (দুই খণ্ড) (১৮৯৬), কলকাতা ঃ ১৯৮৬

—, বঙ্গসাহিত্য *পরিচয়* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা : ১৯৯৪

দেবীপদ ভট্টাচার্য, *উপন্যাসের কথা (প্রথম পর্ব)*, কলকাতা : ১৯৮২

নিরঞ্জন চক্রবর্তী, *উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য*, কলকাতা : ১৮৮০

নীলিমা ইব্রাহিম, *উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ ও বাংলা নাটক*, ঢাকা : ১৯৬৪

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, *উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব*, কলকাতা : ১৯৮১

প্রণবরঞ্জন ঘোষ, *উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য*, কলকাতা : ১৩৭৫ বঃ

প্রমথনাথ বিশী, *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প* (১৩৬১ বঃ), কলকাতা : ১৩৮৭ বঃ

ভবতোষ দত্ত, *চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র* (১৯৬১), কলকাতা : ১৯৭৩

—, *কাব্যবাণী*, কলকাতা : ১৯৬৬

ভবতোষ দত্ত, (সম্পা.), *বঙ্কিমচন্দ্র : ঈশ্বরগুপ্তের জীবনচরিত ও কাব্য*, কলকাতা : ১৯৬৮

রমাকান্ত চক্রবর্তী (সম্পা.), *বিস্মৃত দর্পণ*, কলকাতা : ১৩৭৮ বঃ

রমেন্দ্র নারায়ণ সেনগুপ্ত, *উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে সাম্যচিন্তা*, কলকাতা : ১৯৮২ বঃ

রাজনারায়ণ বসু, *বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা* (১৮৭৮), কলকাতা : ১৯৭৩

রামগতি ন্যায়রত্ন, *বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (১২৮০ বঃ)*,কলকাতা : ১২৯৪ বঃ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *কবি ভারতচন্দ্র*, কলকাতা : ১৩৮১ বঃ

সনৎকুমার মিত্র, *শেকসপীয়র ও বাঙলা নাটক*, কলকাতা : ১৩৯০ বঃ

সনাতন গোস্বামী, *কবি ভারতচন্দ্র*, কলকাতা : ১৯৭৮

সবিতা চট্টোপাধ্যায়, *বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক*, কলকাতা : ১৯৭২

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* (১৯৬২), কলকাতা : ১৯৮০

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের সামাজিক ব্যাকরণ*, ঢাকা : ১৯৮৩

সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা : ১৩৫৩ বঃ

সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান*, কলকাতা : ১৩৮৪ বঃ

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *বর্তমান শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য*, কলকাতা : ১২৮৮ বঃ

Das Gupta, Harendra Mohan, *Studies in Western Influence on Nineteenth Century Bengali Poetry* (1935), Calcutta : 1969

De, Sushil Kumar, *Bengali Literature in the Nineteenth Century* (1919), Calcutta : 1962

হিন্দুশাস্ত্র, ব্রত, পূজা ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বাংলার ব্রত* (১৩৫০ বঃ), কলকাতা : ১৩৫৪ বঃ

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী (সঙ্ক.) *বাংলার স্ত্রী-আচার*, কলকাতা : ১৩৬৩ বঃ

কিরণবালা দাসী, *ব্রতকথা*, কলকাতা : ১৩১৯ বঃ

গিরিবালা চৌধুরানী, *ব্রতকথা*, মৈনা : ১৩০৬ বঃ

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, *বাংলার পালপার্বণ*, কলকাতা : ১৩৫৯ বঃ

পরমেশপ্রসন্ন রায়, *মেয়েলি ব্রতকথা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা : ১৩১৫ বঃ

মুরারিমোহন সেন শাস্ত্রী (সম্পা.), *মনুসংহিতা*, কলকাতা : ১৯৮৫

শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি (সম্পা.), *আহ্নিককৃত্য* (দ্বিতীয় ভাগ), পঞ্চম সংস্করণ, কলকাতা : ১৩৫২ বঃ

শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি *লক্ষ্মীপূজা,* দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা : ১৩৫২ বঃ

সুহাসিনী দেবী, *মেয়েলী ব্রতকথা* (১৩২৮ বঃ), কলকাতা : ১৩৯২ বঃ

গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রিকার তালিকা

কুণাল সিংহ, *প্রাচীন গ্রন্থসংগ্রহ,* কলকাতা : ১৯৭২

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায, *বাংলা সামযিক সাহিত্য, ১৮১৮—১৮৬৭*, কলকাতা : ১৩৫০ বঃ

—, *বাংলা সামযিক-পত্র* (প্রথম ও দ্বিতীয খণ্ড), কলকাতা : যথাক্রমে ১৩৭৯ বঃ ও ১৩৮৪ বঃ

Long, Rev. J., *Descriptive Catalogue of Vernacular Books and Pamphlets*, Calcutta : 1867

গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত গবেষণা-নিবন্ধ

Sonia Nishat Amin, *The World of Muslim Women In Colonial Bengal : 1876-1939,* University of Dhaka : 1993.

নির্দেশিকা